আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

সপ্তদশ বর্ষ।

(১৩২০ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ সংখ্যা।)

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ;

ও

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

—কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা কার্য্যালয়,

১০৮ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

হাওড়া, ৬নং তেলকলঘাট রোড. কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১॥৹ টাকা। মাশুল ৶৹ আনা

১৩২০ সালের সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। নববর্ষ ...	১
২। প্রার্থনা।	২
৩। ভক্তিই সরল পথ	২
৪। পুরাণপ্রসঙ্গ ...	৩
৫। পল্লী-সেবক ...	৫, ৪৪
৬। পুনর্ম্মিলন ...	১৩
৭। চণ্ডীদাস ...	১৭
৮। পুষ্পবতী ...	২৫, ৭৬, ১০৯, ১৭৩, ২১৩, ২৩৯, ২৮৪, ৩৪৭।
৯। বিফল ..	২৮
১০। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলন ...	২৮
১১। মন্তব্য ও সমালোচনা ...	৩১, ৯৬, ১২৮, ১৫২, ১৭৬, ৩৪৯।
১২। ব্রহ্মতত্ত্ব ...	৩৩
১৩। বাঙ্গালা সাহিত্য	৩৪
১৪। দময়ন্তী ...	৩৭
১৫। মা আমার ...	৪৩
১৬। মিবার কলঙ্ক...	৫৫, ১০৬
১৭। পাগলের কথা	৫৮
১৮। ধ্রুব ...	৬৩
১৯। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল	৬৪
২০। মাঙ্গলিক ...	৬৫
২১। প্রকৃতির পূজা...	৬৫
২২। বৈশালিনী ...	৭১
২৩। কাঁদো ...	৮৪
২৪। চন্দ্রের প্রতি ...	৮৬
২৫। অদৃষ্ট বিরহী ..	৮৬
২৬। চাপি, চুপি ...	৮৭
২৭। স্বর্গীয় শিশিরকুমার	৮৮, ২৭২।
২৮। গ্রহের চোর ...	৮৯
২৯। জাতীয় জীবন...	৯৫
৩০। দৃষ্টিহারা ...	৯৭
৩১। শ্রীশ্রীচণ্ডী ...	৯৭
৩২। যথার্থ দারিদ্র্য	১০৮
৩৩। বাঙ্গালাভাষার উৎপাত	১১৯
৩৪। কথক	১২২
৩৫। নির্ব্বাসিতের খেদ	১২৪
৩৬। সঙ্গীত ...	১২৫
৩৭। সতী মা ..	১২৬
৩৮। ঝাঁটা ...	১২৮
৩৯। হিরণ্যগর্ভ দেবতা	১২৯, ১৭৭, ২৩৫, ২৪৭
৪০। বন্যা ...	১৩৩
৪১। সততাই উন্নতির মূল ...	১৩৫
৪২। সে কি ধন ...	১৩৭
৪৩। সতীধর্ম্ম ...	১৪১
৪৪। প্রেম-ভক্তিযোগ	১৪৯
৪৫। আগমনী ...	১৫৩
৪৬। চির নূতন কথা	১৫৪, ২০৫।
৪৭। সুধা ...	১৫৯
৪৮। গীত ...	১৫৯, ৩০২।
৪৯। নারী-অধিকার	১৬০
৫০। গো-রক্ষা ...	১৬১
৫১। চন্দ্রেরনামে পুরাতত্ত্ব	১৬৫
৫২। দারিদ্র্য ও প্রতিভা	১৬৮
৫৩। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক	১৬৯
৫৪। ব্রহ্মানন্দ কেশব	১৭৫
৫৫। বর্ষায় বঙ্গনারী	১৭৫
৫৬। মৎস্যজীবী ...	১৮১
৫৭। পিতামাতার কর্ত্তব্য	১৮২
৫৮। অদৃষ্টলিপি ...	১৮৭
৫৯। কোকিল ...	১৯২
৬০। পথিক ...	২০০
৬১। চাতক পাখীর প্রতি	২০০
৬২। মহাশক্তি ...	২০০
৬৩। জাতীয়ত্ব ...	২০১
৬৪। কবিসম্রাট রবীন্দ্র	২০৫
৬৫। শিবের ত্রিশূল ও শিঙা ...	২০৯
৬৬। জয়মতী ...	২১১
৬৭। কন্যার উক্তি ...	২১৩
৬৮। দেশের উন্নতি...	২১৮
৬৯। মায়া ...	২২০
৭০। সপত্নী ও প্রতিমা	২২৫
৭১। অবসান ...	২২৫, ৩২৬।
৭২। পুরী বা জগন্নাথ-ক্ষেত্র ...	২২৮
৭৩। গান ...	২৩১, ২৬১ ৩৪০।
৭৪। যোগতত্ত্ব ...	২৪১, ৩০৪।
৭৫। জাতি বিচার...	২৫০, ২৯৫, ৩২২।
৭৬। শ্রীরাধাতত্ত্ব ...	২৫৩
৭৭। স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ	২৫৮
৭৮ শ্রেষ্ঠ কে? ..	২৬০
৭৯। দুটী কথা ...	২৬০
৮০। আঁধারে ...	২৬১
৮১। রামপ্রসাদ ...	২৬২, ২৭৫।
৮২। সতী সংবাদ ...	২৬৯
৮৩। আমাদের অতীত	২৭৩
৮৪। আউলচাঁদ ...	২৯৩
৮৫। চন্দ্রের শশী নামের মূলতত্ত্ব ...	৩০০
৮৬। আকাশ ...	৩০২
৮৭। অজ্ঞান ও জ্ঞান	৩০২, ৩১৭।
৮৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ...	৩০৫
৮৯। বিক্রয়কারী বণিক্	৩১৪
৯০। সংযম ও সম্ভোগ	৩২০
৯১। গো-জাতির অবনতি ও ভারতের কৃষি...	৩২৯
৯২। বিশ্ব মিউনিসিপালিটী...	৩৩৭
৯৩। শ্রীগৌরাঙ্গ গীতিকা	৩৩৮
৯৪। নেপাল ব্যাসিনী	৩৩৯
৯৫। ৺চন্দ্র[illegible] বসু	৩৪০
৯৬। বাবু ...	৩৪৫

সমাপ্ত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

ওঁ নমঃ কালীকায়ৈঃ।

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

সপ্তদশ বর্ষ।] বৈশাখ, সন ১৩২০ সাল। [১ম সংখ্যা।

নব বর্ষ।

(১)

হের,—অতীতে বিদায় দিয়ে,—
আসিয়াছে নব বর্ষ ;—
এনেছে কি সাথে শুধু
নব সুখ নব হর্ষ ?

(২)

কে বলিতে পারে হায়,
কত দুঃখ কত হর্ষ,
আসিয়াছে নিয়ে সাথে
আজিকে এ নব বর্ষ

(৩)

যথা, নাট্যশালা—যবনিকা
দৃশ্য নাহি দেখা যায় ;—
তেমতি নূতন বর্ষ—
আসিয়াছে এ ধরায়।

(৪)

আজিকে এ নব বর্ষে,
কিবা নর কিবা নারী,
গাও সবে মিলে মিশে'
বিভূ-গান প্রাণ ভরি!

(৫)

রচি-মোন কুসুমার্ঘ্য
সকলে অঞ্জলি ভরি'।
অরপন কর আজি
বিভুর চরণ স্মরি।'

(৬)

মাগ তাঁর পূত পদে
সবে এই আশীর্ব্বাদ।
সুখে যেন যায় বর্ষ
নাহি সাধে তাতে বাদ।

প্রার্থনা।

চাইনা হরি অমরার শান্তি নিকেতন,
কনক কিরীট কিংবা রত্ন সিংহাসন।
চাইনা আমি কুবেরের রতন ভাণ্ডার,
রাজার রাজত্ব আর সম্পদ অপার।
হীরামতি চুনী কিংবা পরশ রতন,
নীলকান্ত পদ্মরাগে নাহি আকিঞ্চন।
কোহিনুর মহাজ্যোতিঃ কস্তুভ রতন,
সে সবে আমার প্রভু নাহি প্রয়োজন।
রম্ভা সম কন্যা কিংবা দেবেন্দ্র কুমার,
ত্রৈলোক্যের অধিকার চাহিনা তোমার।
স্বর্গীয় অমৃত কুম্ভ মলয় পবন,
চাইনা হরি পারিজাত কুসুম রতন,
চাইনা আমি হয়-হস্তী কনক-কস্তুরী,
মেনকা উর্ব্বশী আদি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বাসন্তী-কৌমুদী-ভাতি কোকিল কূজন,
অপ্সরা-সঙ্গীত-সুধা ভ্রমর-গুঞ্জন,
কন্দর্পের রূপ আর অনন্ত যৌবন,
এসবে আমার প্রভু নাহি প্রয়োজন।
অষ্ট সিদ্ধি, ঋদ্ধি বুদ্ধি প্রতিভা অপার,
চাইনা আমি জ্ঞানদার বিদ্যার ভাণ্ডার।
ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব কিবা শিবত্বের লাগি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি নহি অনুরাগী।
সালোক্য, সারূপ্য কিংবা মুকতি নির্ব্বাণ,
সে সব চাহে না প্রভু ক্ষুদ্র এ পরাণ।
মধুকর মধুপানে মুগ্ধ নিরন্তর,
মকরন্দ হ'তে লোভ না করে ভ্রমর;
নিরোগ এ দেহ হোক্ নির্ব্বিকার মন,
নিশিদিন স্মরি হরি তোমার চরণ;
দীন আমি ক্ষুদ্র আমি অধম দুর্ব্বল,
চাহি নাথ রাঙাপদ পূজিতে কেবল।
আমি দাস তুমি প্রভু সাধনার ধন,
এই ভাব থেকে হোক্ অনন্ত জীবন।
চাইনা হরি, রাঙা পদ পেলে কিছু আর,
দাস বলি পদে রেখ প্রার্থনা আমার।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

ভক্তিই সরল পথ।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের শেষ মীমাংসা ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষাৎ শ্রুতি তাহার মূল। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মলাভ বহু বিলম্বে ঘটে, বর্ত্তমান কালের স্বল্পায়ুতে কুলায় না। দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া তিনই দর্শন। বিশ্বের কর্ত্তাও যিনি, কর্ম্মও তিনি, ক্রিয়াও তিনি। সাংসারিক জ্ঞানে আমাদের তিনজন কর্ত্তা—চক্ষু, হস্ত ও মন; এই তিনেরই কাছে আমাদের আত্ম সমর্পণ করিতে হয়। আমি দ্রষ্টা, বস্তু দৃশ্য ও বিষয় দেখা তিনই; তিনেই এক। পঞ্চভূত জীব-শক্তির সমষ্টি। নিখিল পঞ্চ পদার্থে ব্রহ্মরূপ দর্শন করিতে হইবে। কিন্তু পদার্থ মাত্রই মায়াময় বলিয়া, নশ্বর, অনিত্য বলিয়া দর্শনকারদিগের মতে "নেতি নেতি" করিতে গেলে কত জীবন কাটিয়া যাইবে, ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইবে না। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিব আবার "নেতি নেতি" বলিব এ কিরূপ যুক্তি? জগতের তাবৎ পদার্থই যখন ব্রহ্মময়, তখন "নেতি নেতি" ইহা ব্রহ্ম নয়, আবার বলি

কেন? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জগতের কোন পদার্থ যখন ব্রহ্ম ছাড়া নহে, তখন "নেতি নেতি" ইহা নয়, ইহা নয় বলিবার স্থল কোথায়? দর্শনকারগণ বলিবেন, যতক্ষণ ভ্রমজ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ "নেতি নেতি" কথা থাকিবে; ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞান হইবে, তখন বুঝিবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে থাকিবে না, মধ্যে থাকে মাত্র—অর্থাৎ এই বিশ্ব এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সবই অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে এ সবই সত্য, সবই নিত্য। ব্রহ্ম যাঁহার আশ্রয় তাহা ত অনিত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব সবই অনিত্য মায়াময় বলিয়া, সংসার ত্যাগ না করিয়া ভক্তির বলে, প্রেমের বলে সবই নিত্য সত্য বলিয়া উপলব্ধি করি না কেন? অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া সংসার আছে ও থাকিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত, তখন সংসারময় তিনি ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, সুতরাং ব্রহ্মকে বুঝিতে গেলে ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিলে চলিবে না. দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নেই ভগবৎদর্শন লাভ হয় না; তিনি দয়া করিয়া যাঁহাকে দর্শন দেন, তিনিই দেখিতে পান। নরনারায়ণের নর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন যে নৈষ্কর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, আমরা তাহা বুঝিবার স্পর্দ্ধা করি! কিন্তু দর্শনশাস্ত্র অবজ্ঞার বিষয় নহে, পরন্তু দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে অভ্রান্ত জ্ঞান লাভই হয়। কিন্তু কতকাল ধরিয়া বিচার বিতর্ক, যুক্তি, কত যুগের জ্ঞানে তবে সেই সিদ্ধিলাভ হয় ভাবিয়া দেখুন। জ্ঞানের পথ অত্যন্ত জটিল—অতি দুর্গম; ভক্তিমার্গ সরল ও সহজ-লভ্য; অল্প পরমায়ু লইয়া ভক্তিমার্গই আমাদের অবলম্বনীয়। সাধন বলে জগদম্বার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারিলে আমার ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; আমি তখন বালকবালিকায়, নরনারীতে মৃত্তিকায় পাষাণে, স্থাবরজঙ্গমে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। তখন বুঝিব সর্ব্বভূতে তিনি চিতিরূপে সংস্থিত; তখন জানিব "বিদ্যা সমস্ত তব দেবী ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" যতক্ষণ অভিমান, যতক্ষণ ভেদজ্ঞান, যতক্ষণ স্ত্রীপুরুষ—ততক্ষণ তিনি শিব, তিনি ব্রহ্মময়ী। অভিমান গেলে, অহঙ্কার ঘুচিলে, ভেদজ্ঞান রহিত হইলে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইব।

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত বর্ম্মা।

পুরাণ প্রসঙ্গ।

ক্ষমার মহত্ব।

মনুষ্যের যত প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে ক্ষমা একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার মহত্বের সীমা নাই, সকল দেশের সাধু পুরুষেরা ক্ষমার মহত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। পরম জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিলেন—"আমার যদি কেহ অনিষ্ট করে, আমি তাহাকে অনুরাগ দিয়া ঘেরিয়া রাখিব, আমার প্রতি কেহ বিদ্বেষ করিলে, আমি ভালবাসা দিয়া তাহার মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিব। প্রেমাবতার মহাত্মা যীশুর উপদেশ বাণী এই—"কেহ

একগণ্ডে আঘাত করিতে আসিলে, অপর গণ্ডও তাহার নিকট প্রসারিত করিয়া দাও।" হৃদয়ের কি উচ্চভাব, ক্ষমার মহত্বের কি জীবন্ত উদাহরণ! আবার ঐ দেখ ভাই পাপী জগাই মাধাই "কলসীর কাণা লইয়া মারিতে যাইতেছে, ক্ষমার অবতার পরমদয়াল নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে গদগদ হইয়া বলিতেছেন—

"মেরেছিস কলসীর কাণা, তাবলে কি প্রেম দিবনা (মাধাইরে)

ক্ষমা ধর্ম্মের কি সুন্দর পরিচয়! ক্ষমার মহত্ব কিরূপ, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখাইবার জন্য আমরা নীতিমূলক একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিতেছি, পাঠকগণের অন্তর্নিহিত ক্ষমাগুণের উদ্বোধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

উপাখ্যানটি এই—

কোশল দেশে দীর্ঘশোক নামে এক রাজা বাস করিতেন। ব্রহ্মদত্ত নামে অপর এক প্রতিবেশী রাজা তাঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘশোককে পরাজিত করিয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। দীর্ঘশোক পরাভূত হইয়া ব্রহ্মদত্তের রাজধানী কাশীতে ছদ্মবেশে পত্নীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার একটী পুত্র হইল। পুত্রের নাম দীর্ঘায়ু। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদিন এক গুপ্তচর দীর্ঘশোকাদির ছদ্মবেশের বিষয় রাজা ব্রহ্মদত্তকে অবগত করাইল। তিনি ইহা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দীর্ঘশোক ও তাঁহার পত্নীকে ধরাইয়া আনিলেন। অবশেষে দম্পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া, শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন।

রাজপুরুষেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘশোক ও তদীয় পত্নীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পথে পথে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। পুত্র দীর্ঘায়ু দৌড়িয়া পিতার মাতার নিকট গিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দীর্ঘশোক পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাপ্ দীর্ঘায়ু! শত্রুর প্রতি বিদ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ করিও না,—বিদ্বেষ দ্বারা শত্রুতা যায় না—শত্রুকে ভালবাসা দিয়া জয় করিতে হয়।"

শত্রুর প্রতি পিতার এই ভাব দেখিয়া পুত্র দীর্ঘায়ু অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ও উচ্চভাবে পূর্ণ হইল; তিনি শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব কদাপি পোষণ করিবেন না বলিয়া পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অবশেষে ব্রহ্মদত্তের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিবার পর দীর্ঘশোকের মৃত্যু হইল। দীর্ঘায়ুর মাতাও তাঁহার অনুগমন করিলেন। শোকে দুঃখে দীর্ঘায়ুর প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি সংসারে একাকী;—বনগমনই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ; এই ভাবিয়া বনে গিয়া তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। বিজন বনে বাস করিতে করিতে পিতার প্রতি ব্রহ্মদত্তের নৃশংস অত্যাচারের বিষয় তিনি যত ভাবিতে লাগিলেন, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা তত তাঁহার প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই পিতার শেষ কথা মনে হইল,—তিনি ভালবাসা দ্বারা শত্রু-জয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন,মধ্যে মধ্যে এই কথা জাগিয়া উঠিত,—তাই তিনি প্রতিশোধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

বনবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া দীর্ঘায়ু পুনরায় ব্রহ্মদত্তের রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার ভৃত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। দীর্ঘায়ু বেশ বাঁশী বাজাইতে পারিতেন,—রাজা ব্রহ্মদত্তও গান শুনিতে ভাল বাসিতেন: বাঁশীর গানে মোহিত হইয়া ব্রহ্মদত্ত একদিন দীর্ঘায়ুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে নিজ শরীর রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

দীর্ঘায়ু এক্ষণে সামান্য ভৃত্যের পদ হইতে দেহ-রক্ষকের পদে আরূঢ়; তাঁহার প্রতি রাজার অসীম বিশ্বাস; একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত সদলে শিকারে বহির্গত হইলেন। শিকার করিতে করিতে তিনি গভীর বনমধ্যে গিয়া পড়িলেন; দীর্ঘায়ু ব্যতীত সকলেই রাজার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। রাজা ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন এবং দীর্ঘায়ুর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বিজন অরণ্য; নীরব—নিস্তব্ধ; রাজা ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কোলে ঘুমাইতেছেন। দীর্ঘায়ু নিদ্রিত রাজার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন "এই সেই ব্রহ্মদত্ত, যিনি আমাকে পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, যাঁহার অত্যাচারে আমি নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছি; ইঁহার প্রতি এক্ষণে কি করা উচিত? প্রতিশোধ—দারুণ প্রতিশোধ লইবার এইত সুসময় উপস্থিত।" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিজ কটিদেশে বদ্ধ খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া রাজার মস্তকচ্ছেদ করিবার জন্য যেমন উহা উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি পিতার সেই শেষ কথা—"ভালবাসার দ্বারা শত্রুজয়ের কথা" তাঁহার মনে উদিত হইল; তিনি উত্তোলিত তরবারি সংযত করিয়া রাখিলেন; হস্তের তরবারি কিছুক্ষণ হস্তেই থাকিল। এই সময় সহসা রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দীর্ঘায়ুর ভাব দেখিয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তখন দীর্ঘায়ু মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দীর্ঘশোকের ক্ষমা শিক্ষার গুণে, আজ দীর্ঘায়ুর হস্ত হইতে নরপতির প্রাণরক্ষা হইল। রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন দীর্ঘায়ুকে প্রেমালিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া বলিলেন—"দীর্ঘায়ু! আজ তুমি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। তোমার পিতৃভক্তি জগতের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাকিবে। তুমি আজ যে ক্ষমাগুণের পরিচয় প্রদান করিলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব, জানি না।" যাহা হোক, অবশেষে উভয়েই অকৃত্রিম প্রণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এস ভাই, এই উপাখ্যানোক্ত ক্ষমা শিক্ষার জীবন্ত উদাহরণ আমাদের মানসচক্ষে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া শত্রুর প্রতি উদার প্রতিশোধ দিবার জন্য অগ্রসর হই।

শ্রীরসিক লাল দে।

পল্লী-সেবক। *

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র—পল্লীগ্রাম; ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র—সহর।

বাঙ্গালাদেশে কয়েকবৎসর হইতে শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে। দেশের আধু-

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত।

নিক শিক্ষা যে দেশবাসীর উপযোগী নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন। নূতন প্রকারের অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন কি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কিন্তু এই বিদ্যালয় এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত অভাব মোচন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। দেশবাসী কাহারা এবং দেশবাসীদের প্রকৃত অভাব কি—এ বিষয়ে আমাদের অনেক সময়ে ভুল ধারণা থাকে। কেবল মাত্র ধনী এবং মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় লইয়া দেশ, নহে, কয়েকটি সহর মিলিয়া দেশ গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশকে বুঝিতে হইলে সহরের বড় রাস্তা, আফিস-আদালত ছাড়িয়া শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছায়া-সুনিবিড় পল্লীগ্রামে আসিতে হইবে। দেশবাসীর হৃদয় বুঝিতে হইলে স্বদেশহিতৈষীর বক্তৃতা এবং উকিল-হাকিমের জারিজুরীর প্রতি মনোযোগ না দিয়া, যে কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে রামপ্রসাদী গান ধরিয়াছে, তাহার গান শুনিতে হইবে। বাস্তবিক বাঙ্গালা-দেশে সহরের সংখ্যাই বা কত? খুব জোর ১৯০, কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ২০৩,৬৫৪। দেশ-বাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন পল্লীগ্রামে এবং কেবল মাত্র ৫ জন সহরে বাস করে। সুতরাং বাঙ্গালীর কোন অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আয়োজন করিবার সময় যদি পল্লীবাসীদের কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান বলা যায় না।

বাস্তবিকপক্ষে "দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরেই জাতির জীবন"—এ কথা আমাদের দেশের প্রতি বিশেষ প্রযোজ্য। ইহার কারণও আছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর সহরের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এজন্য সেখানে সহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ। কয়লার খনি, অথবা শিল্প-দ্রব্যের উপাদান যেখানে সহজে পাওয়া যায়, দ্রব্য প্রস্তুত-করণ বা দ্রব্যবিক্রয়ের যেখানে সুবিধা আছে, যেখানে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অসংখ্য শ্রমজীবী এবং ব্যবসায়ী আসিয়া সেখানে সহর সৃষ্টি করে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি-মূলক সভ্যতা সহরেই পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাকৃতিক জন্ম-নিকেতনের প্রভাব হেতু আমাদের দেশ কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া অতি প্রাচীন কালেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য-জগতে সহরগুলি যেরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের গ্রামগুলি সেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ জন্য ভারত-বর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছে—সহরে, রাজধানীতে নহে। আধুনিক ইউরোপের সমস্ত বড় বড় সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলি সহরে উদ্ভূত হইয়া সেখানকার চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে পল্লীগ্রামে

পৌঁছিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত। আমাদিগের অতীত ইতিহাসের সমস্ত আন্দোলনগুলি পল্লীগ্রামের চিন্তা দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। আমাদিগের যাবতীয় দর্শন এবং বিজ্ঞানের সত্যসমূহ তপোবনেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ, কপিল, বিশ্বামিত্র, শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, গুরুগোবিন্দ, রামদাস, তুকারাম, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত, যাঁহারা ভারতবর্ষের শিক্ষা-গুরু, যাঁহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদিগের সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লীজীবনের চিন্তা এবং কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পল্লী ও নগরের ভাব-বিনিময়।

কিন্তু পল্লীগ্রামে যে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে সহরগুলিও অনতিবিলম্বে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষের প্রধান নগরগুলি অধিকাংশই দেবতার আবাসভূমি, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। বৎসর বৎসর অসংখ্য তীর্থযাত্রিগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পল্লীসমূহ হইতে যখন সেই সকল নগরীতে উপস্থিত হইত, তখন নানাধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইত, নূতন বিজ্ঞান এবং দর্শনবাদের মীমাংসা হইত, যাহা সত্য তাহা গৃহীত এবং তাহারই প্রচার হইত। এইরূপে মহানগরী এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহেই ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মের আন্দোলনগুলির শৃঙ্খলা ও সমন্বয় সাধিত হইত। ভারতবর্ষের সমস্ত মহাপুরুষগণ সাধু এবং বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট তাঁহাদিগের সত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সকল স্থানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিতেন। অসংখ্য নরনারীর চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগের সত্যগুলি এইরূপে একটা বিচিত্র এবং অসীম শক্তি লাভ করিত, তখন প্রচার-কার্য্যের আর কোন বিঘ্ন থাকিত না। মহর্ষি বশিষ্ঠের ধর্ম্মজীবনের সহিত অযোধ্যানগরী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মিথিলানগরী বিশেষ সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সূচনা পাটলিপুত্র নগরীতেই হইয়াছিল, বাবা নানক এবং গুরুগোবিন্দের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে অমৃতসহরনগরী, তুকারাম এবং রামদাসের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে পুণা ও সতারানগরী এবং চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে গৌড়নগরী ও শ্রীধামক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট। পল্লীগ্রাম এবং নগর-জীবনের মধ্যে এরূপ ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকায় আমাদিগের দেশে সত্য আবিষ্কার এবং সত্যপ্রচারের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

সহর এবং পল্লীগ্রামের সে সম্বন্ধ এখন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে সম্পূর্ণ নূতন নূতন শক্তিপুঞ্জের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশে অসংখ্য রেলের রাস্তা স্থাপিত হইতেছে, সহরের ছাপাখানায় অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ছাপা হইয়া প্রত্যহ

গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আর পুরাতন নিয়মে চলিতেছে না। পোষ্টমাষ্টার বাবু এবং পিয়নের সঙ্গে ব্যাপারী এবং পাইকারগণও দেখা দিয়াছে। গুরুমহাশয়ের টোল উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে নিম্ন-প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। মাঝে মাঝে নর্ম্মাল স্কুল পাশ ইন্‌স্পেক্টর বাবুও দেখা দিতেছেন। হাট-বাজারে কেবলমাত্র স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য যে বিক্রয় হয় তাহা নহে, সহর হইতে চিনি, বিলাতী কাপড় এবং কেরোসিন তৈলের আমদানী হইতেছে। মণিহারী দোকান বেশ পসার জমাইয়াছে।

পল্লীগ্রামগুলি সমস্ত বিষয়ে সহরের অনুগামী হইবার জন্য ব্যস্ত। সহরে যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি, সমস্ত গ্রামগুলি তাহাই অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত। পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্ব্বেকার ভাব-বিনিময়ের সম্বন্ধ আর নাই। নগরগুলিই এখন দৃষ্টান্তস্থল এবং পল্লীগ্রাম তাহার অনুগামী মাত্র।

আধুনিক ভারতের পরানুকরণ

আমাদিগের একটা বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে,—ইউরোপ তাহার কত শতাব্দীর বিপুল প্রয়াস, দুঃখ এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ফলে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা নকল করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করি। সে অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্য সমাজের কিরূপ বল এবং সামর্থ্য আবশ্যক তাহা ভাবিয়া দেখি না। সে অবস্থায় আমাদিগের সমাজ তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর থাকে না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে—ইউরোপের সেই অবস্থা ইউরোপীয় সমাজের পক্ষেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিদায়ক কি না এবং মানবসভ্যতার কত দূর পরিপোষক, তাহা আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদিগের দেশে বৈষয়িক অবনতি হইয়াছে, অমনি আমরা ইউরোপের অর্থোৎপাদন-প্রণালীগুলি নকল করিয়া চারিদিকে কল-কারখানা খুলিতেছি। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা ধনী হইয়াছে, অমনি আমরা কৃষি-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সহরে আসিয়া উপস্থিত। ইউরোপীয় সভ্যতা নগর-জীবন-গঠনকেই তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, এই জন্যই পল্লীজীবনের প্রতি আমাদিগেরও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, নাগরিক জীবনকে আদর্শ মনে করিয়া আমরাও স্বকীয় সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতেছি। ফলতঃ, ভারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুকরণ করিয়া তাহার পল্লী-জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র যে তাহার সভ্যতাবিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে—তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ইউরোপকে এ বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদিগের যে একটি জাতীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ কাজ হইবে—তাহা নিঃসন্দেহ।

আমাদিগের দেশে আধুনিককালে কতকগুলি সহর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের এখনও হৃদয়ের কোন সংযোগ হইতে পারে নাই। ইউরোপ হইতে আমরা আমাদিগের সহরে সভা সমিতি, ইউনিয়ন, ক্লাব, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি সমস্ত লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এগুলির সেরূপ প্রমাণ নাই। উহাদিগকে আমরা আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই।

ভারতবর্ষের সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এখনও আপনার নিগূঢ় প্রাণশক্তিদ্বারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের নগরজীবনে ইউরোপীয় নগরজীবনের অন্ধ এবং মূঢ় অনুকরণ হইয়াছে মাত্র।

অন্যদেশের মাটী হইতে শিকড় উৎপাটন করিয়া কোন গাছকে যদি সম্পূর্ণ বিভিন্নস্থানে আনা যায়, সে ঐ নূতন মাটীর রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় বিবিধ অনুষ্ঠানগুলিরও আমাদিগের দেশে আসিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সনাতন-ভূমির সঙ্গে উহাদিগের কোন পরিচয় হয় নাই এবং কখন হইবে কিনা তাহা বলা যায় না। অধিকন্তু, আমাদের স্বকীয় বস্তুত্বটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য জড় অংশকে সহজে অনুকরণ করিবার ফলে আমাদিগের বিশেষত্ব—সামাজিক জীবনের নিষ্ঠা-সংযম, আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্য ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ভগবানে অবিশ্বাস, অর্দ্ধ-ঐপাধিকতা, গৃহবন্ধনের শৈথিল্য, চরিত্রহীনতা, বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি পাপ আমাদিগের নাগরিক জীবনকে আক্রমণ করিয়াছে।

পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্যলোপে আধুনিক ইউরোপের অবনতি

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় নগরজীবন এবং পল্লীজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এখন ভাবিবার বিষয়। সেখানকার পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা কি আমাদের আদর্শ হইবার যোগ্য? আমাদিগের অনুকরণ স্থল? পাশ্চাত্য জগতে গ্রামগুলি সমস্ত বিষয়েই সহর এবং নগরীকে অনুকরণ করে। নগরগুলি এরূপে সমস্ত বিষয়ে গ্রামের চিন্তা এবং কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার ফলে জাতীয় সভ্যতা বিভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতেছে, বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের নিজস্ব-রুচি আর নাই, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," এ কথা এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যজগতে খাটে না। যাহা সহরের রুচি তাহাই গ্রামে আদৃত হইবে। এ জন্য লণ্ডন, প্যারী, নিউইয়র্কের হাটবাজারে দ্রব্য যাচাই না করিয়া কোন ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হয় না, কারণ সেখানে যদি উহার আদর না হয়, তাহা হইলে দেশের কেহই উহা লইবে না। যাহা কিছু নূতন—বিলাসের সামগ্রী হউক অথবা চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর গবেষণার ফল বা পাগলের বিকৃত মস্তিষ্কের নিদর্শন হউক না কেন,—উহার দ্বারা যদি সহর একবার মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার আদরের সীমা থাকে না। রাজধানী হইতে সমস্ত দেশ

জুড়িয়া শতধারায় যে বন্যার জল বহিতে থাকে, তাহাতে পল্লীগ্রাম ও সহরের সকল বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধুইয়া যায়। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য শিল্পকলা, গ্রাম্য আচার-ব্যবহার এবং আমোদ-প্রমোদ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। গ্রামের আপনার হৃদয় বা প্রাণ নাই, গ্রাম এখন সহর এবং রাজধানীর ছায়ামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ সহরগুলি তাহাদিগের নিজেদের মাপকাঠির দ্বারা দেশের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মকে বিচার করিতেছে। এই ঐক্য ও সমতা এখন সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব লুপ্ত হইয়া জাতীয় সভ্যতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিতেছে।

ইউরোপ তাহারই সভ্যতার জন্মস্থান পল্লীগ্রামকে এখন ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন পল্লীগ্রাম হইতে মহাপ্রাণ মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইত, তাহার ফলে ইউরোপীয় জগৎ তাঁহাদিগের প্রতিভা এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে স্তব্ধ হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামের সে দিন আর নাই। ইউরোপীয়েরা এখন অসংখ্য রেলরাস্তা স্থাপন করিয়াছে, অসংখ্য কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে, বৈষয়িক উন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অসংখ্য জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে এখন ইউরোপের কুঠি এবং বাণিজ্যাগারের উপকরণ যোগাইতেছে। অসংখ্য শ্রমজীবী পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরের কলকারখানায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইলেও প্রকৃতিজাত দ্রব্যের অভাব নাই, কারণ বিদেশ হইতে দ্রব্যের আমদানী হইতেছে। যতই গ্রামগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, শ্রমজীবিদিগের সংখ্যা, ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তাহার পল্লীগ্রামগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছে—বিপুল অর্থলাভের জন্য তাহার সামাজিক জীবনের সুখ এবং শান্তি চিরকালের জন্য হারাইয়াছে।

আদর্শ সভ্যতার লক্ষ্য।

কিন্তু সমাজের এক স্থানের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভাবিয়া দেশের অন্যান্য স্থানের চিন্তা ও কর্ম্মজীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে বিচার ও নিয়ন্ত্রিত করিলে, জাতীয় সভ্যতাকে দরিদ্র করা হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন ও চিন্তাজীবনের বিকাশের পথ রোধ করা হয়। পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পল্লীজীবন এবং নগরজীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করে। পল্লীগ্রামে জাতির বৈষয়িক এবং সামাজিক জীবনের সমস্ত উপাদান এবং উপকরণগুলি উৎপন্ন হয়। পল্লীগ্রামে সমাজের নিত্য আহারের সংস্থান হয়। পল্লীগ্রামের প্রকৃতিজাত বস্তু সহরে আনীত হইলে, সহর তাহার কলকারখানার সাহায্যে উহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য এবং বিলাস সামগ্রী প্রস্তুত করে। এইরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক অভাবমোচনোপযোগী দ্রব্যাদির

উপকরণ যোগাইয়া পল্লীগ্রামগুলি যেরূপ বৈষয়িক জীবন যাপনের সহায় হয়, সেরূপ সামাজিক জীবনের উপাদানগুলিও পল্লীগ্রামের আব্‌হাওয়াতেই উৎপন্ন হয়। নগর এই সমস্ত উপকরণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মের গতি ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। নগরে শক্তির ব্যবহার এবং বিকাশ, কিন্তু শক্তির জন্ম পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামই ভাবুকতার জন্মভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রই বিরাট এবং মহনীয় ভাব আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ স্থান। পল্লীগ্রামে চতুরতা প্রশ্রয় পায় না, নিষ্ঠা, প্রেম, সংযম, মহত্ত্ব পবিত্রতা এবং সত্যানুরাগ, মানব-হৃদয়ের সমস্ত দেবভাবগুলি পল্লীগৃহেই অঙ্কুরিত হয়। গ্রামের চিন্তার মধ্যে স্বভাবতই একটা সরস মৌলিকতা এবং ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়, যাহার জন্য তাহারা অনেক সময়ে অসীম শক্তি লাভ করে। বাস্তবিক, যে সমস্ত বিপুল আন্দোলন অতীতকাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ আলোড়িত করিয়া মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে, সে সমস্তই সহরের কর্ম্মময় ব্যস্ততা হইতে অনেক দূরে পল্লী-জননীর নিভৃত-ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, কনফুশিয়াস, সাদী, হাফিজ, সেণ্টফ্রান্সিস, মার্কস, পেষ্টালাজ সকলেই বিশ্বপ্রকৃতির নিকট তাঁহাদিগের শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অরণ্য, প্রান্তর, মরুভূমি অথবা গিরিগহ্বরেই তাঁহারা জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামগুলি এই সমস্ত জগদ্‌গুরুগণকে লালনপালন করিয়া জগতকে সভ্য করিয়াছে। পল্লীগ্রামই সভ্যজগতের জন্মভূমি।

ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা

ভারতবর্ষের পল্লীজীবন আজকালকার নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। প্রতীচ্যের প্রভাব ভারতবর্ষের নগরেই প্রথম আসিয়াছে, এমন কি আজকালকার নগরগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই সৃষ্ট। কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতের জীবন-প্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রাণ এখনও পল্লীগ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে সজীব রহিয়াছে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শগুলি এখনও বিদ্যমান। পল্লীসমাজে এখনও পরনির্ভরতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বায়ত্তকর্ম্ম এখনও সেখানে বিকাশ লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা পল্লীগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বটে, কিন্তু তবুও সেখানে চরিত্রের মাহাত্ম্য, ত্যাগস্বীকার, কর্ত্তব্যবোধের নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবন এবং মহাপ্রাণতা এখনও পল্লীগ্রামকে উন্নত রাখিয়াছে। এখন আমাদের স্বদেশসেবকগণকে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি দ্বারা পল্লীগ্রামের এই সনাতন জীবনপ্রবাহকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চরিত্রদোষে পল্লীসমাজ এখন কঠোর দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত। পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রাভাব এখন তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

দারিদ্র্যদোষে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার আদর্শ মলিন হইয়া পড়িয়াছে। নানা উপায়ে এই দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে. দারিদ্র্য মোচন করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সুমহান্ আদর্শকে জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য তখন সম্মিলিত হইয়া একটা মহা-জীবনের সূচনা করিয়া দিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই মহামিলনের কেন্দ্রস্থল হইবে, ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম।

কয়েকটি পাশ্চত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানের আলোচনা।

যৌথ ঋণ-দান-মণ্ডলী।

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা সেখানকার দেশহিতৈষিগণ দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের দেশের পক্ষে সে গুলি উপযোগী কি না প্রত্যেক সমাজ-সেবকের তাহা আলোচনার বিষয়। বিশেষতঃ যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কৃষক-কূলের দারিদ্র্য-হ্রাস এবং ধনবৃদ্ধি, সে গুলি আমাদের দেশে প্রযোজ্য কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে বিপুল বাণিজ্য-ব্যবসায়ের আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার ফলে ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই কলকারখানার বিরাট আয়োজন করিয়া পৃথিবীর বাণিজ্য করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় জগতে আর একটি আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, ইহার দ্বারা সেখানকার কৃষি-কার্য্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইহার নাম সমবায়-আন্দোলন, বা কৃষিকার্য্যে যৌথ-কারবার প্রচলন। সুল্জ, রাইফেজেল, হাস, উলেমবার্গ, লুজাতি, ডুর্পোট প্রভৃতি সমাজ-সেবকগণ আপনাপন সমাজের দারিদ্র্য-পীড়িত এবং ঋণভারগ্রস্ত কৃষিজীবিগণের দুঃখ মোচন করিবার জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জর্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষিসমাজ নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে। কৃষিজীবিগণকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহা নিম্নে নির্দ্দেশিত হইল।

কোন কৃষকের ঋণ গ্রহণের সময় যদি তাহার ঋণভার অন্য কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে মহাজনের অর্থনাশের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং সুদের হার সে কম করিয়া দিতে পারে। কয়েকজন কৃষক এইরূপে একটি মণ্ডলী স্থাপন করিয়া মণ্ডলীর নিকট হইতে অল্প সুদে ধার লইতে পারে। মণ্ডলী কৃষক-গণকে ঋণ দিবার জন্য যে দেনা করে, তাহার জন্য কোন একজন কৃষক বা সমস্ত কৃষক মিলিয়া দায়ী থাকে। ইহাকে অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট ঋণ-দান-মণ্ডলী বলা যায়। কৃষকগণও যাহাতে মণ্ডলীতে আমানত রাখে, তাহার জন্য তাহা-দিগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সব শেষে যখন

মণ্ডলীর সভ্যগণের আমানত টাকা উহার বাহিরের দেনার সমান হয়, তখন বাহিরের টাকা ফেরত দিয়া আমানত টাকাই সমিতির মূলধনরূপে পরিণত হয়।

প্রত্যেক কৃষকের ঋণের জন্য মণ্ডলীর অন্য সভ্যেরা দায়ী বলিয়া তাহার গৃহীত ঋণ যাহাতে যথাকার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অতি অল্প ব্যয়ে যাহাতে ঋণ-গ্রহণকারীর অভীষ্টকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও সকলে লক্ষ্য রাখে। সভ্যেরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্যপ্রণালী বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। উপরন্তু এ কারণে উহাদিগের কর্ম্মশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সমবেত কার্য্য-প্রণালী বিভিন্নপ্রকারে সমাজের মঙ্গলসাধন করে। আমাদিগের দেশে এইরূপ ঋণ-দান-মণ্ডলীস্থাপনের ফলে কেবলমাত্র ঋণভার হইতে কৃষকগণ যে মুক্ত হইতেছে তাহা নহে। অনেক স্থলে বিবাহশ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপে কত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত, তাহাও সমিতির দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রামে হিংসা-বিদ্বেষ এবং দলাদলির ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, মামলা মোকদ্দমা অনেক সময় সমিতির দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়াছে, দরিদ্র কৃষকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছে, এরূপে তাহাদিগের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীরাধা কমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।

পুনর্ম্মিলন।

(ক্ষুদ্র গল্প)

নবযুবক আহম্মদ আলি লক্ষ্ণৌ সহরের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের অধিবাসী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার লাহোর ভ্রমণে গমন করিয়া তিনি তথাকার এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পিতৃ-মাতৃহীন, অসামান্যা সুন্দরী কিশোরীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতিদানও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। তিনি বাঞ্ছিত মরি-য়মকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে হইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন।

বিবাহের পর প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় সুধাধারায় অভিষিক্ত করিয়া দুইটী অল্পজীবী বৎসর চলিয়া গেল। এই দুই বৎসর তাঁহারা কপোতদম্পতীর ন্যায় পরস্পর সম্মিলিত হৃদয়ে এই বিস্তৃত জগতের মধুময় সৌন্দর্য্য রাশি উপভোগ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাহার পর আহম্মদের জীবনে এক পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই সময়ে তিনি ঘোর সাহিত্যসেবী হইয়া উঠিলেন। প্রেমিকার প্রতি তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়-প্রবাহ দৃঢ় আবেগে সাহিত্যকে আলিঙ্গন করিল, সাহিত্য জগতের কতকটা সুযশও তাঁহার ভাগ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অবশেষে এরূপ ঘটিল যে তাঁহার অবসর কাল-টুকুও সাহিত্যিক বন্ধুগণের সংস্রবে কাটিয়া যাইতে লাগিল; সুতরাং এই সাহিত্য চর্চ্চার অন্তরালে মরিয়মের প্রাপ্য হৃদয়খানি একবারে চাপা পড়িয়া গেল।

সাধারণ রমণীগণ হয়ত এক্ষেত্রে একজন

খ্যাত্যাপন্ন উপন্যাসিকের পত্নীরূপে সুসজ্জিত হর্ম্ম্য ও মূল্যবান্ অলঙ্কার রাশিতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, কিন্তু মরিয়মের প্রকৃতিতে এইরূপ সাধারণত্ব ছিল না। শৈশবে মাতাপিতা বিহীন হইয়া এই সুবিমল সৌন্দর্য্যাধার বন্য-কুসুম লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কেহ তাহার দিকে যাইত না, তাহাকে আপনার করিবার চেষ্টা করিত না— তাহার লাভ অথবা ক্ষতিতে, সুখ অথবা বেদনাতে কাহারও হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইত না, সে একরূপ ভাল ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে যুবক আহম্মদ স্বর্গের সৌন্দর্য্য পূর্ণ হৃদয়খানি কেন তাহার জন্য বিস্তৃত করিয়া দিলেন যদিই বা তিনি তাহাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিলেন, তবে আবার এ উপেক্ষা কেন? অভিমানিনী মরিয়মের হৃদয়ে প্রতিশোধ প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়া উঠিল সে আর স্থির থাকিতে পারিল না।

একদিন সন্ধ্যাকালে আহম্মদ দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন বর্ষীয়সী পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার পত্নী মরিয়ম কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি পত্নীর প্রত্যাগমনের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু বিফল সে প্রতীক্ষা—মরিয়ম ফিরিল না। এই ঘটনা আহম্মদের সমস্ত অনুভূতি উত্তেজিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে অতীতের সমস্ত দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়া দিল। পত্নীর প্রতি অজ্ঞাতসারে প্রদর্শিত তাঁহার সমস্ত উপেক্ষা আজ বজ্রের মত তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল। তাঁহার নয়নদ্বয় সজল হইয়া উঠিল।

এ দিকে একদিন দুইদিন করিয়া সুদীর্ঘ দুইটী মাস চলিয়া গেল, তথাপি মরিয়মের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

[২]

আহম্মদ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী কাসেম আলির এক নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইলেন। কাসেম আলি তাহার গুণগ্রাহী বন্ধু। তাহার অবসরের অভাব ছিল না। তাহার বিশ্রামগৃহটী সর্ব্বপ্রকার বিলাসোপকরণ বক্ষে লইয়া তাহার ধনের পরিচয় প্রদান করিত। ধনী সন্তান কাসেম সময়ে সময়ে আহম্মদকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনুগৃহীত করিতেন।

উপবেশনাগারে বসিয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে করিতে হঠাৎ কাসেম বলিল— আজ আর তোমার বাড়ী যাওয়া হবে না, আহম্মদ তোমাকে একটা নূতন পদার্থ দেখাতে চাই। মা তাঁর ভগিনীর বাটী হ'তে এক অদূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়াকে এখানে আনতে গিয়েছেন। শুনেছি সে হুরী হে—স্বর্গের হুরী। তোমার সেরূপ একবার দেখা উচিত। উপন্যাস রচনার একটা নূতন উপাদান"—

কথা সমাপ্ত হইল না। উন্মুক্ত গৃহদ্বার পথে কাসেমের বৃদ্ধা জননী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা - একি! এ যে আহম্মদের পত্নী মরিয়ম! যাহার জন্য তিনি শূন্য- ভগ্নহৃদয়ে এই দুইমাস প্রতীক্ষা করিতেছেন—এ যে সেই!

আহম্মদকে দেখিয়া মরিয়মের গণ্ডদ্বয় বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া

দিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় গৃহপ্রান্তে কাসেম জননীর নিকট দণ্ডায়মান হইল। বৃদ্ধা আহম্মদের সহিত কয়েকটী কথামাত্র কহিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেও চলিয়া গেল।

জননীর প্রস্থানের পর কাসেম আলি, আহম্মদের সম্মুখে হৃদয়ের রুদ্ধ উৎস মুক্ত করিয়া দিয়া শতমুখে জননীর এই নবীনা সঙ্গিনীর রূপ গুণ—কমনীয়তা, নম্রতা প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিল। আহম্মদ ইচ্ছা করিলেই সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া কাসেমের সমস্ত সুখস্বপ্ন দূরীভূত করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অতিকষ্টে সে অভিপ্রায় দমন করিলেন। তাঁহার গৃহত্যাগিনী পত্নী—ঈশ্বর জানেন সে আজিও পবিত্রা কি না! সে পবিত্রা হইলেই বা কি? আহম্মদ আপনার পূর্ব্ব ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, মরিয়ম স্বেচ্ছায় আর তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। এইমাত্র সে তাহার আভাসও দিয়া গিয়াছে।

সে রাত্রিতে তিনি আর বাটীতে গেলেন না।

[৩]

রাত্রি দুইপ্রহর। আহম্মদের নয়নে আদৌ নিদ্রা আসিতেছিল না। তিনি গৃহদ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন আকাশে ষষ্ঠীর চন্দ্র সবেমাত্র উদিত হইয়াছে। পৃথিবীর উপর জ্যোৎস্নাবরণ আসিয়া পড়িয়াছে। মৃদু বায়ু হিল্লোলে পুষ্পসৌরভ ছুটিয়া আসিতেছে। আহম্মদ অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকারের উত্তেজনাপূর্ণ চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে দাবানলের প্রবাহ বিস্তার করিতে লাগিল। হৃতরত্নের সন্ধান মিলিয়াছে। একবার যদি মিরিয়মের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ ঘটিত! একবার যদি তিনি তাহাকে একাকী প্রাপ্ত হইতেন—তাহা হইলে যাহা হউক একরূপ মীমাংসা করিতে পারিতেন—অন্ততঃ জানিতেও পারিতেন কি বন্দোবস্তের বিনিময়ে সে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইবে!

ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একবার বাটীর পশ্চাৎ দ্বারের নিকট হইলেন। মরিয়ম এই দ্বারের নিকট হইতে বহুক্ষণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ তাহার দিকে আহম্মদের দৃষ্টিপাত হইল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় একলম্ফে তাহার পার্শ্বে আসিয়া উভয় হস্তে তাহার কোমল করপল্লবদ্বয় ধারণ করিয়া সপ্রেম বচনে বলিলেন, মরিয়ম, প্রিয়তমে! কবে আমাদের এই লুকোচুরি সমাপ্ত হ'বে? কবে আমরা আবার পূর্ব্বের মত অনন্তসুখ উপভোগ কর্ত্তে সমর্থ হব?"

মরিয়ম হাত ছাড়াইয়া লইল না। আহম্মদের প্রতি প্রেমকোমল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, হাঁ—আমি বাড়ী ফিরে যাব বটে কিন্তু এখন নয়। তার আগে যেন আমি জানিতে পারি যে আমরা পরস্পরের জন্য একটা অভাব অনুভব কর্চ্ছি

(৪)

প্রভাতে কাসেম ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বিশ্রাম গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহ

মদ তখন সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। কাসেম আসিয়াই প্রথমে কোন কথা না বলিয়া উত্তেজিত ভাবে পাত্রের পর পাত্র তীব্র সুরা গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিকৃতস্বরে বলিল, ঈশ্বরের দিব্য আহম্মদ, আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। গত রাত্রিতে আমি মরিয়ম বিবির কাছে বিবাহ প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু সে তা'তে অসম্মতি প্রকাশ ক'রেছে। কি ঘৃণা আহম্মদ! আমি মজবদার বাইজান্দার আলির বংশধর কাসেম আলি, আমার জননীর এক আশ্রিতার কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। কিন্তু আমার আহত প্রবৃত্তি মোটেই খেলার সামগ্রী নয়! আমি একবার দেখতে চাই।"

আহম্মদ কোন উত্তর করিলেন না। সে দিবসও তাঁহার গৃহে যাওয়া হইল না। এই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য ইন্দ্রিয়-পশুর হস্তে মরিয়মকে ফেলিয়া যাইতে তাঁহার ভরসা হইল না।

অপরাহ্নে কাসেমের জননী তাঁহার পল্লী-নিবাসে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি কাসেমকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কাসেম বিরসবদনে বলিল, "আমার শরীর বড় অসুস্থ মা। তুমি বরং আমার বন্ধু আহম্মদ আলি সাহেবকে সঙ্গে লও। আর যাচ্ছ ত গাড়ীতে! তবে দেখো যেন কোন কারণে সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব করো না। মরিয়ম বিবি একাকী রইলেন।"

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ব্যস্তভাবে মরিয়ম বলিয়া উঠিল, "আমিও মা, তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তাহার যাওয়া হইল না। বৃদ্ধা, পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী পল্লিভবনে যাত্রা করিলেন। সঙ্গী হইলেন—নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আহম্মদ। বিভিন্ন অনুভূতির ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। আর কোনরূপে দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করিয়া মরিয়ম শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

(৫)

অপরাহ্নে কাসেম বহির্ব্বাটী হইতে আসিয়া পরিচারিকাকে বলিল,—"মরিয়ম বিবিকে বল, মা সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি একটা ভোজের আয়োজন কর্ত্তে সঙ্কল্প করেছেন; আমি এখনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা কর্ব্বো। অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে আদেশ দিয়াছি। তিনি যদি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর জন্য একখানা শিবিকা প্রস্তুত হ'তে বলি।"

একথা শুনিয়া মরিয়মের অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতে লাগিল। এই ভীতিপূর্ণ অনভ্যস্ত নির্জ্জনতা তাহার নিকট অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতেছিল। সে বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইল। কাসেম মরিয়মকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল। একজন পরিচারিকা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন সূর্য্যদেব দিম্মণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

আহম্মদ শকটারোহণে যাইতে যাইতে বৃদ্ধার সহিত নানাবিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন, কাসেমের পল্লি-

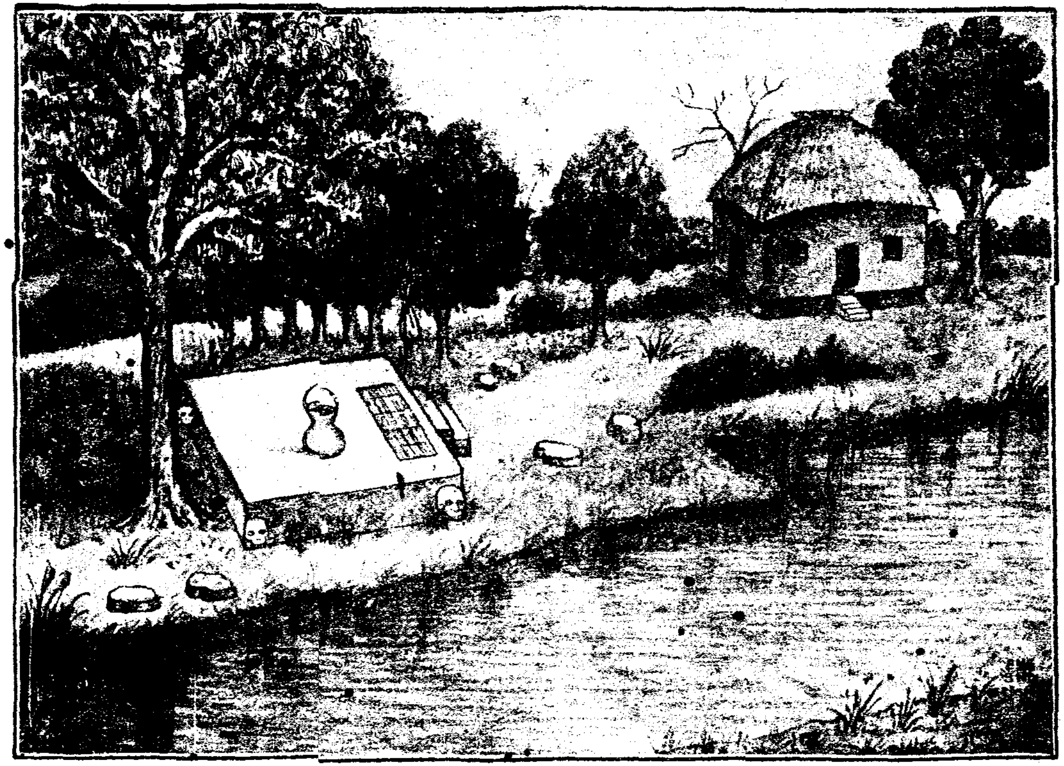

তারাপীঠে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসন।

নিবাসই তাহাদিগের পৈতৃক বাসস্থান। তবে স্থানটী বড়ই নির্জ্জন, এই জন্য এখন সেখানে আর বাস করা হয় না। এখন একজন শ্রবণ-শক্তিহীনা বৃদ্ধা পরিচারিকা সে বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর তাঁহাদিগের বিষয় সম্পত্তির কথা উঠিল। কাসেমের পিতা কাসেমের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার একটি বিবাহ দিতে পারিলেই জননীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়। তা—সে বিষয়ও বৃদ্ধার মুষ্টিমধ্যগত হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা মরিয়মের সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পল্লীনিবাসের কার্য্য সম্পন্ন হইল। বৃদ্ধা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু এবার তিনি আহম্মদকে তাঁহার সঙ্গী পাইলেন না। যুবক আহম্মদ এই নিভৃত আবাসের চতুর্দ্দিকস্থ উদাস প্রাকৃতিক দৃশ্যে হৃদয়ে একটা স্পন্দন অনুভব করিতেছিলেন। মরিয়ম—তাঁহার মরিয়ম তাঁহাকে প্রত্যাখান করিয়াছে? কি তাহার উদ্দেশ্য? প্রকৃতির ধীরপ্রবাহিত দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বক্ষে বুঝি অবসাদরাশি ঢালিয়া দিয়া গেল! প্রকৃতির আরক্তিম ললাটে তিনি বুঝি আপনারই হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি সে দিবস প্রত্যাবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন না। বৃদ্ধা পরিচারিকা ফতেমা পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থিতি সংবাদ জানিতে পারিল না।

(৬)

রাত্রি দেড়প্রহর অতীত হইয়াছে। জনশূন্য সুবৃহৎ শয়নাগারে শায়িত আহম্মদের নয়নে নিদ্রা আসিতেছিল না। অন্ধকার রাশি জমাট বাঁধিয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইতেছিল! এই সময়ে তিনি বাহিরে শিবিকা বাহকগণের চিৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। একখানি শিবিকা সেই বাটীর দিকেই আসিতেছে। আহম্মদ শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, বাহকগণ চীৎকার করিয়া ফতেমাকে ডাকিতে লাগিল। তাহাদের স্বরের মধ্যে তিনি কাসেমের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইয়া, ব্যাপার জানিবার জন্য জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দিলেন।

বৃদ্ধা ফতেমার হস্তস্থিত আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন—সে একজন অবগুণ্ঠিতা রমণীকে তাঁহারই অধিকৃত কক্ষাভিমুখে আনয়ন করিতেছে। তিনি এক কক্ষে দেওয়াল বিলম্বী যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন এবং একটী ছিদ্রদ্বারা সমস্তই দেখিতে লাগিলেন।

অবগুণ্ঠিতা, আলোক হস্তে একাকী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একখানি টেবিলের উপর আলোকটী রাখিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে তাহার অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিল। আহম্মদ স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এ তাঁহারই মরিয়ম!! মরিয়ম রাত্রিতে কাসেমের সহিত একাকী এই নির্জ্জন পল্লীনিবাসে আসিয়াছে। তাঁহার মস্তকে অগ্নিপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। হৃদয় সংযত করিবার নিমিত্ত তিনি বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি একবার মরিয়মের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন, আবার কি ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন, দুইহস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিয়া তিনি দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন।

(৭)

অনতিবিলম্বে পদশব্দ শ্রুত হইল। মরিয়ম অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

গৃহ প্রবেশ করিয়া কাসেম বলিল,—"ফতেমাকে বলেছি যে আমরা বাড়ীতে আহারাদির পর যাত্রা করেছি। আমাদের আর এখন কিছুরই প্রয়োজন নাই। সে শয্যাগ্রহণ করেছে, সে আমায় বলেছে যে এই ঘরে শয্যা প্রস্তুত আছে। যাক্—বড় পরিশ্রম হয়েছে, না মরি'? এই কথা বলিয়া সে মরিয়মের দিকে অগ্রসর হইল।

মরিয়মের অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল, তখন তাহার মুখমণ্ডল হইতে শোণিতের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে মুখ যেন প্রেতের। সে সহিষ্ণুভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"মহাশয় আমি যদি আপনার সম্মান না রাখতে পারি, তার জন্য আমায় মার্জ্জনা কর্ব্বেন! আমি বিশ্রাম করেছি। শিবিকা প্রস্তুত হ'তে বলুন, আমি এখনি যাত্রা কর্ব্বো।"

পিশাচ কাসেমের ব্যবহার বিদ্যুদ্বেগে পরিবর্ত্তিত হইল, সে কর্কশস্বরে বলিল "দেখ মরিয়ম, আমি গতকল্য রাত্রিতে তোমায় বলেছি যে আমি সমস্ত জীবনের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছি, আর চিরকাল বাসবো ও আমি তোমাকে বিবাহ কর্ত্তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি—তুমি আমাকে প্রত্যাখান করেছ।" অতঃপর সে সম্মুখদিকে হেলিয়া পড়িল। তাহার গণ্ডদেশ প্রায় মরিয়মের গণ্ডস্পৃষ্ট হইল। তাহার মুখে ও চক্ষুর্দ্বয়ে—পৈশাচিক ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে আবার বলিল, "বিবাহ—সুন্দরী আজ রাত্রিতে আমরা একেবারে বিবাহের নাম বিস্মৃত হতে চাই। হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আহম্মদ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। পরমুহূর্ত্তে হতভাগ্য মাংস পিণ্ডের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে সুদূর গৃহপ্রান্তে পতিত হইল।

ললাটের ঘর্ম্ম অপসারণ করিয়া আহম্মদ কোমল বচনে বলিলেন—"মরিয়ম—আমার মরিয়ম! এখনও কি পরস্পরের মধ্যে আমাদের অভাব অনুভব হয় নাই? তোমার আর আমার?"

তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুধারায় বক্ষঃ অভিষিক্ত করিয়া অস্ফুট সরে মরিয়ম বলিল,—"আমায় ঘরে নিয়ে চল, প্রিয়তম!—ওগো আমায় ঘরে নিয়ে চল।"

তাহার পর এই হর্ষবিষাদের মধ্যে দুইটী মিলনাকাঙ্ক্ষী বিচ্ছিন্ন হৃদয় আবার এক হইয়া গেল।

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ।

চণ্ডীদাস।

বীরভূমির কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব কোকিল-মধুর পঞ্চমস্বরে গাহিয়া ভারতে কৃষ্ণ প্রেমের উষার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাহারপর দুইশত বৎসর অতীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বীরভূমি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার স্থানে তন্ত্র সম্মত শাক্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীরাচারে বীরভূমি প্লাবিত হইয়াছে। বীরভূমির বহু

পীঠস্থানে শাক্ত ধর্ম্মের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দুবিল্বের পূর্ব্বে এই বীরভূমির নান্নুর গ্রামে বিশালক্ষী দেবীর মন্দিরে চণ্ডীদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার মন্ত্রপানে বিভোর হইয়া রক্তজবা দিয়া ভক্তিভরে বাশুলী দেবীর চরণ পূজা করিতেছেন! বাশুলীর কৃপায় এই মাতাল চণ্ডী ক্রমে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়া গেলেন। তিনি বীরাচার সম্মত প্রথানুসারে রজককন্যা রামীকে 'প্রকৃতি' করিয়া রাধাকৃষ্ণের আরধনা করিতে লাগিলেন। এই প্রেম চণ্ডীর হৃদয়ে আবদ্ধ রহিল না। ক্রমে ক্রমে তাহা পদাবলী রূপে বহির্জগতে আত্ম প্রকাশ করিল। চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক বিশাল মহাকাব্য রচনা করিলেন। জানিনা কত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দীন লেখক চণ্ডীদাসের অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়াছে। এইগুলি লইয়া চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যা ৮৫০ বলা যাইতে পারে। ইহা একটী প্রকাণ্ড কাব্য। পূর্ব্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, মান কলহান্তরিত প্রেম বৈচিত্ত, গোষ্ঠলীলা, দান নৌকাখণ্ড, রাসলীলা, মাথুর, কংসবধ, নন্দবিদায়, ভাবসন্মিলন ও রসাত্মিক পদ এই কয়েক খণ্ডে এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। খণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং কেহ মনে করিবেন না যে চণ্ডীদাস কেবল কতকগুলি পদই রচনা করিয়াছেন, ইহাতে সকল রসেরই সমাবেশ আছে। এইপ্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। অতএব আমাকে বহুকষ্টে লেখনী সংযত করিয়া তাঁহার অদ্ভুত কবিত্বের সামান্যরূপ পরিচয় দিতে হইবে।

চণ্ডীদাস কখন অবিভূর্ত হইয়া ছিলেন, তিনি কি ছিলেন, এ সম্বন্ধে একটা বিচারের অবতারণা করিয়া আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। সকলেই উহা জানেন—তাহা অপেক্ষা বেশী কথা আমি বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন, প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হন এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, বিদ্যাপতির সমসাময়িক, এবং সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

পূর্ব্বরাগ।

চণ্ডীদাস যখন পদ রচনা করেন তখন বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র রচিত হয় নাই। সুতরাং তিনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের ভগবান বড় দয়ালু। তিনি প্রেম বিতরণের জন্য সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। মানবকে কৃপা করিবার জন্য তিনি সদাই লালায়িত। কিন্তু মানব তাঁহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাঁহাকে লইতেছে না। যে তাঁহাকে চাহিবে সেই তাঁহাকে পাইবে। সুপাত্র দেখিলেই তিনি তাহার হৃদয়ে প্রেম-সুধা সেচন করিতেছেন। ভক্তের জন্য আমাদের হরি সদাই ব্যাকুল। তাই রাধিকার জন্য কৃষ্ণের হৃদয় প্রথমেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের—

কি হ'ল অন্তরে　　হিয়া জর জর
বিঁধিল সন্ধান শরে।

জর জর কৈল পরাণ পুতলি
মনমথ হাতীবরে ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ সখা সুবলকে এই কথা বলিলেন। সুবল শ্রীকৃষ্ণের "মরম ব্যথিত", তাই তিনি পক্ষশিশু সঙ্গে লইয়া রাধিকার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা রাধিকার সমক্ষে খেলা ছলে নানা চিত্র প্রদর্শন করিয়া শেষে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধিকার মূর্চ্ছা হইল। বৃকভানু রাজার পুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিছু-তেই তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলনা! অবশেষে সুবল তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইলেন। রাধিকা মূর্চ্ছা ভঙ্গে বলিয়া উঠিলেন ঃ—

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

তাহার পর সুবলের পরামর্শে বৃকভানু রাজা ব্যাধিশান্তির জন্য রাধিকাকে যমুনায় স্নান করিতে পাঠাইলেন। তথায় তাঁহার কৃষ্ণ দর্শন হইল।

রাধিকার পূর্ব্বরাগ।

ফিরিয়া আসিয়া রাধিকা উদ্ভ্রান্ত চিন্তা হইলেন।

যমুনা যাইয়া শ্যামারে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যাম রূপ খানি ॥
তখন ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সখীগণ চিন্তিতা হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন—

আগো, রাধার কি হল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেন যোগিণীর পারা ॥
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বদনে চাহে মেঘ পানে
কি চাহে দু হাত তুলি।
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

রাধিকার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। প্রেম সন্তপ্তা রাধিকা, মেঘ, নিজ কেশ ও ময়ূর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রূপের সাদৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল হইয়া তাহাই দেখিতেছেন। অনাহারে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে। তিনি যোগিণীর ন্যায় রক্তবাস পরিধান করিয়াছেন। কাহারও সহিত কথা নাই। সদাই বিরলে বসিয়া আছেন।

প্রেম বিহ্বলা এই রাধিকার চিত্র সাহিত্য জগতে অতুলনীয়। আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি, কাহার সাধ্য নাই যে চণ্ডীদাস চিত্রিত এই অদ্ভুত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ! ভক্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণও ব্যাকুল, শ্রীকৃষ্ণও—

না বাঁধে চিকুর, না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে সুধি॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরে সোঙরে তোহার নাম॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।
তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না বহে জীব।"

তাহার পর মিলন, দৌত্য, দান, নৌকাখণ্ড, কত হইল। রাধাকৃষ্ণের হৃদয়ে কত প্রেমের লহরী বহিয়া গেল। এইরূপে যে প্রেমের উৎপত্তি হইল, তাহার কি তুলনা আছে? মানুষে কি এই প্রেম সম্ভব?

এমনি পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জিয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেও নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

এ প্রেমের জন্য রাধিকা সব করিতে প্রস্তুত।

বঁধুর পিরিতি আদর দেখিতে
মোর মন যেবা করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
অনল ভেজাই ঘরে।
আপনার সুখ দুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরিতি
শুনিতে জগৎ সুখী।

রাধিকা অভিমান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কাতর ভাবে বলিতেছেন:—

হাত দিয়ে দেখ, বড়াই মোর কলেবর।
ধান দিলে খৈ হয় বিরহ অনল॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে আমার বুক হৈল সলি॥
আমি মৌনে মরিব বড়াই তার নাহি দায়।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কূলে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল ভরিবারে।
মরিবার বলে রাধা সেভিরাও বাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা॥

রাধিকাও বিচ্ছেদ ভয়ে সদাই ব্যাকুল,—

অনেক সাধের পিরিতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমনি সে মনে লয়।

তাহার পর প্রেম বৈচিত্ত। প্রেমের এমন বিশ্লেষণ অপর কোথায় দেখা যায় না। রাস-লীলায় চণ্ডীদাস অদ্ভুত কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া

যাইবে। শরদ জ্যোৎস্না বিধৌত বনস্থলীতে যখন রাসান্তে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল, তখন সেই যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া চণ্ডীদাসের হৃদয়ে ভবিষ্যৎ অবতার গৌরাঙ্গ দেবের মুর্ত্তির ছায়া পড়িল।

কালার ছাটায় কালরূপ ধরে
এসব তরুর ফুলে।
গৌর দেহেতে গৌর বরণ
ধরিয়াছে অবহেলে।
সখীর বচন, হাসিয়া যখন
সকল গৌর দেখি।
আপনার দেহ দেখল গৌর
দেখল সকল সখী।
নিকুঞ্জ ভুবন সেইত গৌর
গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর দেখল বেকত
গৌর আপন তনু॥
সকল গৌর দেখিয়ে সখিনী
মনেতে লাগিল ধন্ধ।
চণ্ডীদাস কহে ও নব নাগর
গৌর হইল কৃষ্ণ।

ভক্ত এই পদে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সূচনা দেখিয়া পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই।

রাসলীলার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলারও অবসান হইল। গোপীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া শ্রীহরি মথুরার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মথুরাপতি কংস স্বীয় যজ্ঞে কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও কংসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মথুরা যাইতে উদ্যত। সমগ্র ব্রজমণ্ডলে একটা শোকের ঝড় বহিতে লাগিল। যশোদা নন্দ কৃষ্ণ কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন :—

একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই কি আছিল তোর মনে
গোকুলের কত লোক পাইয়া দারুণ শোক
তখনি মরিব তুয়া গুণে।
ব্রজ শিশু কতজনে ভাবিতে তোমার গুণে
তারা এবে ত্যজিব পরাণে।
গোঠে মাঠে ধেনু সনে কে আর ফিরিব বনে.
কে আর করিব নানা খেলা।
আর না শুনিব বাণী মধুর বচন খানি
কে আর করিব পান মেলা॥
শ্রীমুখ বদন মেলি দিব ছানা দুধ ননি
কে আর ডাকিব মা বলিয়ে।
কাঁদে নন্দ ঘোষ রায় অবনীতে গড়ি যায়
কাঁদে রাণী গলায় ধরিয়ে॥

প্রাণসখা কৃষ্ণ তাহাদের ত্যাগ করিয়া যাইবেন শুনিয়া ব্রজের বালকগণ কাঁদিতে লাগিল। গোপীগণ রথচক্র ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন —

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধূলায়ে ধূসর তনু।
গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথাবে যাইবে কানু।
কে আর করিব দয়া মোহ অতি
কারে সে করিব মান।
আর না শুনিব শ্রবণ পুরিয়া
মধুর বাঁশীর তান॥
ইহাই বলিয়া, বরজ রমণী
পড়ল কতহি ঠামে।

উচ্চস্বর করি কাঁদে ব্রজনারী
করিয়া তাহার নামে ॥
কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কার পানে চাহিয়ে বদনে
লোরে না দেখয়ে আঁখি ॥
ধরণী উপরে চিত্রের পুতলি
বরজ রমণী ধনী।
নাহিক নিশ্বাস নাহি কোন ভাব
কপালে হুকর হানি ॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়ল ঐছন গতি।
কোথায় পড়িল আভরণ ভার
তাঁহা সে না জানি রাতি।
কেহবা যমুনা কিনারে পড়ল
যেখানে উঠিল রথ।
সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহল পথ।
কেহকার মুখে বারি ঢারি দেই
চেতনা নাহিক হয়ে।
উর্দ্ধবাহু করি ধুলাতে পড়িয়া
চণ্ডীদাস তঁহি রহে ॥

নিঠুর কানাই কাহারও দিকে দৃকপাত না করিয়া চলিলেন। তখন,—

ধেনুগণ সব করি হাম্বারব
মথুরা মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি বিয়োগ পাইয়া
কেহ দুধ নাহি খায়।
পুচ্ছ উচ্চ করি, যায়ে পরিহরি
মথুরা গমন দিগে।
যথা সে রসিক নাগর শেখর
সে দিকে গমন ভাগে ॥
খগ মৃগগণ রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ শ্যাম শ্যাম করি
রাতিদিন নাম লয় ॥
মৃগগণ আতি চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি মোহে
এ সব হইলা ভোর ॥
সেই পিকু রবে এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ নাহিক আপদ
সে ডাল চলল ছাড়ি ॥
ভ্রমর ভ্রমরা সদাই গুঞ্জরি,
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী চাতক চাতকী
তাহা না শবদ করে।

সমস্ত বৃন্দাবন যেন একটা শোকের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল।

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেন। মথুরা বাসী শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল :—

বেশ করেছ এমন রূপের ছটা!
ভুবনমোহন যেমন মেঘের ঘটা।
বনফুলে চূঁড়া বাঁধি কিবা ছলে থাট।
সোণার খোপে ক'সে বাঁধে যেন মুকুতার হাট ॥
মণি মাণিকে গাঁথা মালা তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ূর পাখা উড়ে বায়ে কিরণ মাখা চূড়া ॥
কোন যুবতী বাঁধে চুড়া সেই সে আপন মনে।

হাসির ঠাটে জগৎটুটে মধুঝরে ঘনে ॥
গলার মালা ভুবন আলা, হাতে মোহন বাঁশী ॥
মদন দেখি রূপরাশি মাঝারে জলদ পশি ॥

তাহার পর কংসবধ, বসুদেব দেবকীর সহিত মিলন ও নন্দবিদায়। সমস্তই করুণরসে পরিপূর্ণ। বড়ই দুঃখিত হইলাম যে বাহুল্য ভয়ে কোন পদই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। নন্দ যখন একাকী বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন তখন বৃন্দাবনে ক্রন্দনের রোল উঠিল, যশোদা গোপীগণ সকলেই নন্দকে বেড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর রাধিকার বিরহ, চণ্ডীদাস যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্য নহে। তবে কৃষ্ণ বিরহে রাধিকার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অকথন বেয়াধি এ কহনে না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরে কাঁদে তাঁর চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ধূলায় লোটায় ॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
তুমি কি দেখেছ কালা কহনারে সখি।

তাহার পর মথুরায় সখীর গমন, শ্রীকৃষ্ণকে শ্লেষপূর্ণ ভৎর্সনা, বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। রাধিকার অবস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার ব্রজে আসিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে রাধিকা বলিতেছেন :—

সই জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়।
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস বলে সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল ॥

তার পর রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। মিলনের প্রথম আবেগ শান্ত হইলে উভয়ে পরস্পরের নিকট যে মনোভাব বর্ণনা করিতেছেন,—তাহা সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত। একটী মাত্র উদ্ধৃত করিব।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরমে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁস।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়।
না ঠেলিহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

রাগাত্মিক পদে চণ্ডীদাস নিগূঢ় ভজন প্রথার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। তবে রজকিনীর সহিত তাঁহার যে অবৈধ প্রণয় ছিল না, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতে জানা যায়।

শুন রজকিনী বাণি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ-বাসিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকচিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি-এ।

পুষ্পাবতী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাপ্তান স্পায়ার্স।

জোতারাম গোপনে গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাণীর আদেশক্রমে কৈক্তীর রাজা বেহারী সানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। যাওয়ার পূর্ব্বে কুমারের দ্বারা ভারতবর্ষের মাননীয় গবর্ণর জেনারল বাহাদুর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের নিকট বেহারী সানের বিরুদ্ধে পত্র লেখাইলেন। সেই পত্রে এই কথা উল্লেখ থাকিল যে বেহারীসান জোতারামের প্রাণ-নাশের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কয়েক-জন ঘাতকও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাঁহার এজেণ্টের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলেন এবং তিনি বেহারী সানের ও শেখর রাজার পত্রও পাইলেন। গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের এ চক্রান্ত বুঝিতে বাকী থাকিল না, তিনি কাপ্তান স্পায়ার্সের উপর তদন্তের ভার দিলেন।

কাপ্তান স্পায়ার্স বিশেষরূপে তদন্ত করিতে বসিলেন। তিনি উভয় পক্ষকে নিজ সম্মুখে ডাকাইয়া সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিলেন। কাপ্তান সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে বেহারী সান নির্দ্দোষী, তাহাকে অনর্থক লাঞ্ছনা দেওয়ার জন্য এইরূপ চক্রান্ত হইয়াছে। তখন সসৈন্য জোতারামকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। এবং জোতারামকে সম্মুখে ডাকাইয়া বলিলেন,—বেহারী সান নির্দ্দোষী, আপনারা বৃথা তাঁহাকে

জন্য করিয়াত এরূপ করেছেন। ইহা আপনাদের পক্ষে বড় অন্যায়। আমি এখনই গবর্ণর জেনারল্ বাহাদুরের নিকট রিপোর্ট করিব, এবং যদি ভবিষ্যতে এরূপ করেন, তবে আপনাকে এ রাজ্যের বাহিরে পাঠাতে বাধ্য হ'ব।" জোতারাম ভয়ে কম্পান্বিত হইলেন. তিনি বলিলেন—"হুজুর! সব সত্য, আমি মিথ্যা বল্‌বার লোক নহি। বেহারীসান সরকারি অনিষ্টকারী, মহারাণী ও মহারাজকুমারের পত্র দেখিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। বেহারী সানের বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ এই যে, বেহারীসান সৈন্যগণের প্রাপ্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার জন্য দায়ী।" কাপ্তান স্পায়ার্স এক দরবার বসাইলেন, জয়পুরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। জোতারাম প্রকাশ্য দরবারে বেহারীসানের বিরুদ্ধে উক্ত টাকা দাবী করিলেন! কাপ্তান স্পায়ার্স বলিলেন—"বেহারীসান! আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহা সত্য কিনা?" বেহারীসান জোড় হস্তে বলিলেন—"হুজুর! আমার নিকট এক কপর্দ্দক পাওনা নাই, এ সব মিথ্যা কথা।" তার পর জোতারাম সাক্ষী উপস্থিত করিলেন, সাক্ষীরা এক এক জন এক এক কথা বলিল। কাপ্তান সাহেব বুঝিলেন—এও মিথ্যা অভিযোগ, তখন তিনি জোতারামকে ধমকাইয়া দিলেন। জোতারামের বুদ্ধি ও কৌশল ইংরেজ রাজপুরুষের নিকট সব ব্যর্থ হইল, তিনি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কাপ্তান সাহেব অবশেষে মহারাণীকে সংবাদ দিলেন যে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ ভবিষ্যতে হইলে জোতারামের পক্ষে মঙ্গল হইবে না। মহারাণী দেখিলেন—জোতারামের বুদ্ধি কার্য্যকরী হইল না। তখন তিনি এ বিষয় কিছুই অবগত নন বলিয়া উত্তর দিলেন। কাপ্তান স্পায়ার্স সব বুঝিলেন, তিনি পূর্ব্বাপর ঘটনা শুনিলেন, তারপর রূপাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সে যদি অন্তঃপুরে খারাপ ব্যবহার করে ও জোতারামের সঙ্গে মিশে, তবে তাহাকেও এ রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন। রূপা কাঁদিয়া এই কথা মহারাণীকে জানাইল, মহারাণী বলিলেন—"তোর ভয় কি? যত দিন আমি বেঁচে আছি, তত দিন তোর কোন অনিষ্ট হবে না।" রূপা শান্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত, সমস্ত নিস্তব্ধ। পেচকেরা এক একবার বিকট চীৎকার করিতেছে। এমন সময়ে রাজবাটীর একটী গৃহে বসিয়া মহারাণী চিন্তায় নিমগ্ন। জোতারামের কৌশল ব্যর্থ হইল, বেহারীসান বিচারে মুক্ত হইল—কাপ্তান সাহেব বুঝিয়া গেলেন, এ সব জোতারামের চক্রান্ত, হয়ত তিনি মহারাণীকেও চক্রান্তের জন্য দায়ী করিতে পারেন। রূপা তাঁহার বড় বিশ্বাসী—রূপা না থাকিলে এক

দিনও রাজ-অন্তঃপুরের কার্য্য চলিবে না" রূপা কুমারকে ভালবাসে। এই সব কথা মহারাণীর মনে উদয় হইতে লাগিল। জোতারাম তাঁহার হিতকারী, বেহারীসান শত্রু, কিরূপে পুনরায় বেহারীসানকে জব্দ করা যায়, এ সব বিষয়ও মনে উদিত হইল। অদ্য নিদ্রা নাই—শয়নের ইচ্ছাও নাই, মহারাণী রাজ্যের ভবিষ্যত ভাবিতেছেন। ইংরেজগণ অল্প দিন হইল, ভারতের রাজা হইয়াছেন—ইংরেজের প্রবল প্রতাপ—ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য লইতে পারেন—উহাঁদিগকে হস্তগত করিবার উপায় কি? এ সব কথাও চিন্তার-স্রোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাণী আরও ভাবিলেন যে কুমারের পরিণাম কি হইবে, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে জোতারাম ও রূপা ব্যতীত কুমারের সহায় আর কেহ নাই। এই সব বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে খট্ খট্ করিয়া কি এক শব্দ হইল, পরক্ষণেই রাণী দেখিলেন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাণী ভয়ে চীৎকার করিতেছিলেন, সন্ন্যাসী বলিলেন—"মা! কোন ভয় নাই, আমার সর্ব্বত্র গতি, আমি মনে করলেম-তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবো। রাজ্যের মঙ্গলা-মঙ্গল তোমার উপর নির্ভর করছে। যদি আমার উপদেশ শুন, রাজ্যের মঙ্গল হবে; আর যদি না শুন, তবে তোমাদের অমঙ্গল হবে। আমি রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী।" রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী রাজস্থানের একজন সিদ্ধ পুরুষ, তিনি কখন কোথা থাকেন কেহ জানে না। ব্রহ্মচারীকে ভয় বা ভক্তি না করে, এমন লোক সে সময়ে ছিল না। রামস্বরূপ ব্রহ্মচারীর বয়ঃক্রম কত কেহ বলিতে পারে না। মহারাণী হঠাৎ ব্রহ্মচারীর নাম শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। মহারাণী বলিলেন—"প্রভো! আমাদের প্রতি এত দয়া হবে, তাহা জানতেম না। যখন দয়াই হয়েছে, তখন আমাদের রক্ষার উপায় করুন।" ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"রক্ষার উপায় ঈশ্বরের হাতে, তবে আমি যত দূর জানি, জোতারাম ও রূপার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হবে। যদি উহাদিগকে ত্যাগ করিতে পার, তবেই তোমার মঙ্গল, নতুবা তোমার অমঙ্গল অনিবার্য্য।" মহারাণী উত্তর করিলেন—"উহারা আমার রাজ্যের উপকারী, আমি উহাদিগকে ত্যাগ করতে পারবো না, প্রভু অমন আদেশ করবেন না।" ব্রহ্মচারী এইবার হাসিলেন, রাণীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"অদৃষ্ট লিপি খণ্ডন করা যায় না, আমার চেষ্টায় কি হবে, আমি বলিতেছি—এই রূপার দ্বারা তোমার সর্ব্বনাশ হবে। এখন সাবধান হও, যদি না শুন, তুমিই ফলভোগ করবে।" মহারাণী রূপার কক্ষের দিকে দৃষ্টি করিলেন, রূপা তাঁহার পার্শ্বের ঘরে শয়ন করে। তারপর ব্রহ্মচারীর দিকে নয়ন ফিরাইলেন, দেখিলেন সে স্থানে আর তিনি নাই। তখন বিস্ময়ান্বিত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীকে আর পাইলেন না। মহারাণী ব্রহ্মচারীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন—তবে কি রূপা আমার সর্ব্বনাশ করবে? রূপা বাল্যাবধি আমার নিকট আছে—রূপা কুমারকে ভালবাসে—রূপা ও জোতারাম রাজ্যের মঙ্গলা-

কাঙ্ক্ষী—তবে কি ব্রহ্মচারী মিথ্যা কথা বলিলেন? তাহাও হইতে পারে না, রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী একজন সিদ্ধ পুরুষ! মহারাণী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, বাতায়নে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে চন্দ্রমা উদিত হইয়া বাতায়নের নিম্নস্থ পুষ্করিণীর জল স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি নাচিয়া নাচিয়া চন্দ্র কিরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। মহারাণী একবার সেই জলের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া রাম স্বরূপ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী জলদগম্ভীর স্বরে পুনরায় বলিলেন,—"এখনও সাবধান—নইলে ফলভোগ করতে হবে।" ইহার পর আর তাঁহাকে দেখা গেল না! মহারাণী কতকক্ষণ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি রূপাকে ত্যাগ করতে পারবো না, ইহাতে যাহা হইবার তাহাই হইবে।" রাত্রি অনেক হইয়াছিল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। মহারাণী বাতায়ন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন, স্বপ্নেও এই সব দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ।

বিফল।

কুমুদিনী রহে ফুটি' কতদূরে—জলে,
তবু আকাশের চাঁদ তারি প্রেমে হারা;
কোথা মেঘ! চাতকিনী তবুও বিরলে,
চাহি নিত্য তারি পানে, যাচে বারিধারা।
কতদূরে রহে সিন্ধু, তবু অবিরাম
তটিনী, তরঙ্গ রঙ্গে তারি পানে ছোটে;
কোথা সূর্য্য! তবু তার চির প্রাণারাম
কিরণ-সোহাগ স্পর্শে, কমলিনী ফোটে।

যেখানেই থাক্ মধু আনে তা' ভ্রমর,
যেখানেই থাক্ শোভা কবি তাহা হরে;
যেখানে চুম্বক থাকে, লৌহ-কলেবর
আপনি আকৃষ্ট হ'য়ে, তারি গুণ ধরে।
পলাইয়া, লুকাইয়া কি ফল নিঠুর!
প্রেমের রাজত্বে কিছু নাহি—নাহি দূর।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলন।

এবার চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পড়িয়া কেহ কেহ মোহিত, কেহবা স্তম্ভিত আবার কেহবা আর কিছু হইয়াছেন। সাপ্তাহিক পত্রে, সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার ভাব ও ভাষা পাঠ করিয়া "বসুমতীর" অঙ্গ জর জর হইয়াছে। সরকার মহাশয়ের পুরাতন বন্ধুর পরিচালিত, কোন মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আবার তাঁহার কোন কোন পুরাতন সুহৃদের ভাঙ্গা গলা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এমন কেন হইল?

বাস্তবিক, সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠ করিয়া অনেকেই বলিতেছেন, এমন কেন হইল? অমন প্রবীণ সাহিত্যসেবী সরকার মহাশয়ের

মুখে, নব্য লেখকের বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে 'নব-আলোচনার ন্যায় ভাসা ভাসা, মাজা-ঘসা কথা শুনিবেন বলিয়া কেহ আশা করেন নাই।

বলি, সরকার মহাশয়ের তো তিন কাল গিয়া এক কাল ঠেকিয়াছে। তা, এখন পরিণাম চিন্তা ছাড়িয়া, "পরিশিষ্ট" রচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। সরকার মহাশয়ের এ সকল কৌশল যৌবনেই শোভা পাইত। এখনও কি "পরিশিষ্ট" রচনা করিয়া তাঁহাকে নিজের ঢাক নিজে কাঁধে করিয়া বাজাইয়া বলিতে হইবে—"ওগো আমি একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক ও সমালোচক।" বলি, সান্‌কিভাঙ্গার সাপ্তাহিকের সেবক, সেনহাটির মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত আধা বাঁধা সাহিত্যিক কুলজী গ্রন্থে "পিতা ও পুত্রের" লম্বা চওড়া কাহিনী পড়িয়া ও দশম বৎসরের "হস্তাক্ষর" দেখিয়া কি লোকে তাহা বুঝিতে পারে নাই?

রহস্য ছাড়িয়া, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ইহা অবশ্য বলিতে হয় যে, সরকারি বক্তৃতায় আমরা কোন অভিনব তত্ত্বকথা শুনিতে পাই নাই, বা বিজ্ঞ জনোচিত উক্তির আভাস পাই নাই। যাহা শুনিয়াছি, তাহা না, শুনিলেও কোন ক্ষতি বোধ হইত না বরং শুনিয়াই আপশোষ হইল।

তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রায় সকল পুরাতন ও নূতন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, বরং আরও অনেক বেশী সংবাদ পাওয়া যায়। তবে, তিনি যে কেবল, বঙ্কিম বাবুকে তদীয় উপন্যাস মধ্যে মাতৃভাবের প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এ কথা সকলে না জানিলেও, তাঁহার মত প্রবীণ লোকে ইহা অবশ্য অবগত আছেন যে, সাহিত্য সভার অধ্যক্ষ রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া ছিলেন এবং পরে পরলোকগত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সরকার মহাশয় সে কথাগুলি বলিলে কি তাঁহার বক্তৃতার গৌরব কমিয়া যাইত?

সরকার মহাশয় যে কেমন সমালোচক তাহার পরিচয় "পরিশিষ্টে" এমনই ফুটিয়াছে যে আলোয় সাহিত্য-ক্ষেত্র আলোকময় হইয়া গিয়াছে! একে চন্দ্র তাহে অক্ষয়—যেন সোণায় সোহাগা! আবার কথাই আছে—

"একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারা গনৈরপি।"

সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের আলোচনা করা অবান্তর হইলেও না হয় ভগ্ন স্বাস্থ্য সাহিত্তিকগণ নীরব হইতে পারেন, এক পক্ষে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকাদি প্রচার বাঞ্ছনীয় কিন্তু শুধু পুস্তক প্রচারে কি হইবে, দেশে যে খাদ্য দ্রব্যের অভাব। তৎপরে গ্রন্থ আলোচনা করিতে বসিয়া, "কোন্ সভায় কে বক্তৃতা করে" "কাহার সঙ্গে কাহার পীরিত নাই।" এ সকল অদ্ভুত ও উদ্ভট-তত্ত্ব কথা যে অপরূপ হইয়াছে। এখানে "ধান ভানিতে" কেবল "শীবের গীত নহে"—নন্দী ভৃঙ্গীর ও গীত রটিয়াছে।

কথাটা কেমন কেমন শুনাইতেছে, না?

তা সত্য কথা বলিতে গেলে এ সকল নিঃসঙ্কোচে বলিতে হয়। আচ্ছা আমাদের কথায় কাজ কি, সরকার মহাশয়ের মুখেই পরিচয়টা লউন। তিনি বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সহিত প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীর কোন সংস্রব নাই। অথচ এ সভায় মুসলমান আসিয়া বক্তৃতা করেন। ইত্যাদি।

বলিহারি দাদা—এক ঢিলিতে এই রূপে দুই পাখী মারিবার ইহা অপূর্ব্ব কৌশল বটে! বলি, চৈতন্য-সভার সহিত, অতুল কিম্বা সমতুল অথবা অপ্রতুল—কোন গোস্বামী প্রভুর কতটুকু পীরিত আছে, কতটুকু নাই সে কথা শুনিবার জন্য কি যোড়া বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ জড় হইয়াছিলেন? না, এই উক্তি, সাহিত্য সন্মিলনীর সভাপতির মুখ দিয়া উচ্চারিত হইবার জন্য, ব্যক্তি বিশেষের মাথা ব্যথা হইয়াছিল? ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দীর রচিত পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া, এই যে গৎ আওড়ান হইল, ইহাতে লোকে পুস্তকখানির কতটুকু পরিচয় পাইল? এরই নাম সরকারি সমালোচনা!

আর এই কথাগুলিই কি সব সঠিক? প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণের ঐ সভার সহিত সম্বন্ধ নাই, তাহা সরকার মহাশয় ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কোন কালে যে সংস্রব ছিল না, এমন কথা, সরকার মহাশয় কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন? ঐ সভায়, মুসলমান বক্তা, বক্তৃতা করিয়া উহাকে অস্পৃশ্য করিয়া দিবার পরেই যে অতুলকৃষ্ণ ঐখানে গিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আর ঐ সভায় সেই দিন, সভাপতি, শ্রীবৃন্দাবন-বাসী, গোল ভট্ট-বংশীয়, বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় যে স্বয়ং 'মুরলীধারী অতুল কৃষ্ণের' বর্ণনা করিয়াছিলেন—ইহা যে আমরা স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছি। সরকার মহাশয়ের তাহা জানা না থাকিতে পারে, কিন্তু বহু লোকে তাহা জানেন। তাই বলি, প্রভুপাদ এই সভায় আর যান্না কেন? সে সংস্রব ঘুচিল কেন? আর, উক্ত সভার আচার্য্যগণের মধ্যে ও উহার ব্যবস্থা-পত্রে কি প্রভুপাদের নাম নাই?

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই সভায় মুসলমান আসিয়া বক্তৃতা করেন। না, গো মহাশয়, এখন আর করেন না। যে দিনে ঐ সভায় অতুল প্রভুর পদার্পণ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে বক্তৃতা করিত বটে, তৎপরে আর করে নাই। আর সেই মুসলমান, হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও শিক্ষা করিবার জন্যই এ সভায় আগমন করিত। মহাপ্রভু অবিচারে সকলকে কোল দিয়াছিলেন। মুসলমানেও তাঁহার ভক্ত হইয়াছিল।

সরকার মহাশয়ের সমালোচনায় রাং রূপায় পরিণত হইয়াছে, আবার পিত্তল সোণার মত উজ্জ্বল দেখাইয়াছে। আবার যে সকল ছোকরা-বাবুরা সরকার মহাশয়কে একটু "পাকড়াইতে" পারিয়াছেন ও দুবেলা তাহার বাটীর চৌকাট চসিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের জয়-জয়-কার হইয়াছে। সে সকল ছোকরা-

বাবুদের ছাই ভস্ম, লেখার প্রশংসা হইয়াছে, অথচ পূজনীয় পণ্ডিত-বর "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথাপূর্ণ গ্রন্থদ্বয়,—"রায় রামানন্দ" ও "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" সরকারী সমালোচনায় তেমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ কি জানেন? দুইখানি গ্রন্থে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব কথা আছে—তাহা সরকার মহাশয়ের ভাল না লাগিতে পারে, সাধারণে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন। ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মটা, স্থূলভাবে দেখিতে হইবে, ইহার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব পাঠ করিতে হইলে শিহরিয়া উঠিতে হইবে! শুধু সাহিত্যিক হইলেই কি এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়?

সরকার মহাশয়ের সমালোচনা কিন্তু সকলের বেলায় সমানভাবে হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তি পরের ধনে পোদ্দারী" করিয়া, অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থকারের রচিত ও পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক খণ্ড, কোন শিষ্যের ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া, উপরে নিজের নামটীতে সম্পাদক যোগ করিয়া, এক হাত বেশ বাহবা লইয়াছেন। বলি, ইহাতে সম্পাদক অপেক্ষা, প্রাচীন পদকর্ত্তার ও উহার প্রচারে যিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃতিত্ব যে বেশী, ইহাই লোকে বুঝিয়াছে। সরকার মহাশয় কিন্তু টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা বিহীন সম্পাদকতায় মোহিত হইয়াছেন। প্রবীন সাহিত্যিকের এরূপ একদেশদর্শিতা বড়ই দুঃখের বিষয়—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

চট্টগ্রামবাসীগণের পক্ষে তাঁহাদের অতিথি-সৎকারের কোন প্রকার ত্রুটি হয় নাই। সুদূর চট্টগ্রামে যেরূপ অতিথি সৎকার হইয়াছিল, অনেক ভাল ভাল জেলায়ও তাহা হয় না!

শ্রীগজপতি বিদ্যা দিগ্‌গজ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নববর্ষে প্রার্থনা।—কাল আবহমান কাল ঠিক সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। ইহার নূতন পুরাতন কিছুই নাই। তবে অল্পায়ু মানব তাহাদের জীবনের মাপ-কাঠি ঠিক রাখিবার জন্য বর্ষকে নূতন ও পুরাতন নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আমরা সেই প্রথানুসারে বিশ্বজননী মায়ের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। মা! সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন। আমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধন্য হই।

তারাপীঠ!—হিন্দুর মহাতীর্থ; রঘুকুল-গুরু বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসন এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত; কত কাল ধরিয়া কত সাধক এই আসনে যোগ সাধন করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করিয়াছেন। সেদিন শাক্তভক্ত "বামা ক্ষেপাও" এই আসনে সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আলোচনা সম্পাদক "বামাক্ষেপার" সচিত্র সুবৃহৎ জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন! তাহা পুস্তকাকারে ছাপা হইতেছে, সেই পুস্তকের ছবি নমুনা—বশিষ্ঠের সেই সিদ্ধাসন এবার আলোচনায় প্রকাশিত হইল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।—বিগত গুড ফ্রাইডের ছুটিতে ঢাকা সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। বরিশালের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হইল। সুযোগ্য সভাপতির নেতৃত্বাধীনে সভার কার্য্য অতিশয় সুচারুরূপে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল।

নূতন খাতা।—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও গরাণহাটার বিখ্যাত জুয়েলার মণিলাল কোম্পানীর নূতন খাতা উপলক্ষে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সত্বাধিকারী রামপদ বাবু একজন সাহিত্যিক বলিয়া উহা সাহিত্য সভারই অধিবেশন বলিতে হইবে। সভাপতি হইয়াছিলেন সুসঙ্গের মহারাজা, সভায় বিখ্যাত সাহিত্যসেবীগণ উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। আমরা এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতি দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

প্রীতিভোজ। গত ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময় নশীপুর রাজধানী মধ্যে নশীপুরবাসীদিগের দ্বারা অনারেবল মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুরকে ভারত সভার সচীব পদে মনোনীত হওয়ার জন্য সাধারণ হইতে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়। নশীপুরের মাননীয় শ্রীযুক্ত জগৎ শেট মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন। জাফরাগঞ্জের নবাব বংশ এবং আরও অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ সেন এম,এ, বি,এল, সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা মহারাজের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় তৎপরে বাবু যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সুমিষ্ট ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিলে পর বাবু জ্যোতিষ চন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল উকীল মহোদয়, প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা প্রসাদ সেন প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। রাত্রি৮টার সময় সামান্য জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রীতি।—একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক, *শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।* ইহাতে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে, আনন্দবাজার, ভক্তি, সাহিত্য-সংবাদ প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন না হইলে ও পুস্তক রচনায় এই নূতন ব্রতী। কিন্তু কবিতাগুলির ভাব ও ভাষার পারিপাট্য হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহাকে, একজন কৃতী লেখক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। আমরা তাঁহার এই পুস্তক পাঠে অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। মূল্য ।০ আনা। হাওড়া, কর্ম্মযোগ প্রেসে পাওয়া যায়।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

এবার আমরা আলোচনা উৎকর্ষ সাধনে আমাদের ক্ষমতার কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না; এক্ষণে গ্রাহক মহোদয়গণের কৃপা ও সাহায্য আমাদের একমাত্র ভরসা, তাঁহারা স্ব স্ব দেয় সত্বর পাঠাইয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। আমরা ক্রমশঃ সকলের নামেই ভিঃ পিঃ করিব, কাহার আপত্তি থাকিলে পূর্ব্বে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

স্বর্গীয় ধ্রুবলাল দত্তের ১৭শ বয়সের ছবি।

স্বর্গীয় ধ্রুবলাল দত্ত।

২০শ বয়সের ছবি।

আলোচনা, ২য় সংখ্যা, ১৭শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে ঃ—

আনীদ বাতং স্বধয়া তাদক্ তস্মাদ্ধান্যন্ন
পরঃ কিঞ্চনাস" ॥
ঋক্‌বেদ ॥১০মঃ, মঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন প্রাকৃতিক কোন বস্তু ছিলনা, তখন ভুবায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া জীবিত থাকিতে না হয় এই প্রকার একটী প্রাণ বা পুংতত্ত্ব স্বধা বা স্ত্রী-তত্ত্বের দ্বারা বিরাজিত ছিলেন।

ঋক্‌বেদের উক্ত বচনের মধ্যে স্বধা শব্দ তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ স্বধা দ্বারা প্রাণের বিকাশ ছিল, এই প্রকার বর্ণনা ঋক্‌বেদে আছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে স্বধার সহিত প্রাণের সাপেক্ষ্য সম্বন্ধ আছে। আর যে বস্তু সাপেক্ষ্য সম্বন্ধযুক্ত সেই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভবে না। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায় কোন স্থানে কোন প্রকার অস্তিত্ব বা শক্তির বিকাশ হইলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলিবেন যে শক্তি যখনই প্রকাশ হয় তখনই বুঝিতে হইবে একটী শক্তি স্বপ্রকাশ হইতে পারে না পরন্তু শক্তিদ্বয় অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাবে তৃতীয়া বিভক্তির সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া অর্থাৎ এক অপরের দ্বারা প্রকাশ্য প্রকাশক ভাবে যুগলে একত্রীভূত হইয়া একটী শক্তিরূপে বিকশিত হয়। ঠিক সেই প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবৎ তত্ত্ব স্বধা এবং প্রাণ এই দুই স্ত্রী এবং পুংতত্ত্ব তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হইয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাবে অর্থাৎ এক অপরের প্রকাশক হইয়া যুগলে বা মিথুনে একত্ব ভাবে স্বপ্রকাশ ছিলেন। এই যুগল স্বপ্রকাশ তত্ত্বকে বেদ এবং উপনিষদে ব্রহ্ম এবং আত্মা আর ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর পরতত্ত্ব উপাসক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই যুগল স্বপ্রকাশ-তত্ত্বকে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবেন। অনেক শাস্ত্র এং বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, দেহ দেহী, নাম নামী, শক্তি শক্তিমান ইত্যাদি ভেদ প্রাকৃতিক পদার্থে সম্ভবে কিন্তু ভগবৎতত্ত্বে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে না। ইহা মহাপ্রভুর বাক্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই ভগবৎতত্ত্ব, মিথুনীভূত যুগলতত্ত্ব। বিশেষত ইহা তৃতীয়া বিভক্তি সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ একতত্ত্বের দ্বারা অপরতত্ত্ব প্রকাশ হয়। সুতরাং এক অপর হইতে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক হইলে উভয়ের অস্তিত্ব থাকে না। অতএব যুগল ভগবৎতত্ত্ব চির অবিকারী বা চির অবিশ্লিষ্ট, অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—যে ভগবৎতত্ত্ব নিত্য শুদ্ধ, সদাযুক্ত এবং বিভু।

"কিং ভদ্রং কিম্ ভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিসৎ।
বাচোদিতং তদনৃতঃ মনসা ধ্যাতমেব চ॥"

ভাগবত হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাশয়কে শিক্ষা দেন যে, দ্বৈত বস্তু মাত্রই অবস্তু। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একটীর তুলনায় অপরটীর ভাল মন্দ বিচার করা মনের ধর্ম্ম। কাজে কাজেই ইহা ভ্রম মাত্র। কেন না যাহা বাক্যোক্ত,যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা যাহা মনের দ্বারা ধ্যাত, তাহারই নাম অবস্তু অর্থাৎ তাহা ব্রহ্ম বা ভগবৎতত্ত্ব নহে।

পরে প্রসঙ্গ ক্রমে আর এক প্রশ্ন উত্থাপন হইয়াছিল যে যদি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব চির অবিশিষ্ট হয় তবে—

"রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেবাত্মা যাবপি ভূবিপুরা দেহ ভেং গতৌ তৌ॥"

ইত্যাদি শ্লোকের অর্থের সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে? ইহার প্রত্যুত্তরে বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে, ভগবানে নিত্য-লীলা অনাদি কাল হইতে প্রকটভাবে পর্য্যায়ক্রমে এক এক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয় তাই শ্রীভগবানের নিত্য লীলাপ্রকাশক রূপ গোস্বামী।

ওঁ পূর্ণমদঃপূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

ইতি বেদ বচনের অর্থ জগতকে এই ভাবে বুঝাইয়াছেন যে, অদ্বয় যুগল ভগবৎতত্ত্ব জগতে অবতার বা অবতীর্ণ রূপে লীলা করিবার ইচ্ছায় তিনি তাহার স্বরূপ শক্তি যোগমায়া প্রভাবে যে কোন প্রকার দেহ ভেদ স্বীকার করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার যুগলীভূত অদ্বয় পূর্ণ তত্ত্বের কোন প্রকার বিকার হয় না। উক্তবেদ বচনের অভিপ্রায় ঠিক রাখিয়া রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি ইতি শ্লোকের দ্বারা জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন যে পরতত্ত্ব বা যুগল রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব গোলকে চির একাত্মা থাকিয়া জগতীতলে লীলা করিবার বাসনায় তাঁহার স্বরূপ শক্তি যোগমায়া প্রভাবে অনাদিকাল হইতে রাধা এবং কৃষ্ণ এই দুই স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে দেহ ভেদ স্বীকার করিয়া অনেক প্রকার লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় যোগমায়া প্রভাবে যে দেহ ভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে পরতত্ত্ব বা যুগল রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব পূর্ণভাবে এক দেহে বিরাজিত হইয়াছিলেন। গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করা এই শ্লোকের অভিপ্রায়। এই সমস্ত বিচারের দ্বারা বুঝিতে হইবে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-তত্ত্বই পরতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ।

ডাক্তার শ্রীপ্রিয় নাথ নন্দী।

বাঙ্গালা-সাহিত্য।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে। এই প্রকার আন্দোলন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, ইহাতে আমরা দোষের কিছুই দেখি না। আমাদের সাহিত্য-বোধ যদি নিতান্ত অসাড় এবং পঙ্গু হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ—বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া একেবারেই কোনও আলোচনা হইত না, কিন্তু আশার বিষয় তাহা না হইয়া সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবলভাবে

বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে সাধারণের মনে সাহিত্য-জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হওয়া এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকার হওয়াকে আমরা সুলক্ষণ বলিয়াই স্বীকার করি।

প্রত্যেক আন্দোলনের মধ্য দিয়া সাধারণের মনে সেই বিষয় সম্পর্কে ভাবানুশক্তি জাগিয়া উঠে। সাধারণের কোনও বিষয়ে যদি আলস্য এবং ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে আন্দোলনের দ্বারাই উহাদিগকে বিনষ্ট করা যাইতে পারে।

তবে, আন্দোলন করায় যে একেবারেই ভয়ের কারণ কিছু মাত্রও নাই—এইরূপ বলা যায় না। আমরা অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হইয়া আন্দোলনেই অভিন্নভাবে জড়িত হইয়া পড়ি এবং আন্দোলনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া যাই। তখন আন্দোলন করাই লক্ষ্য হইয়া পড়ে; সাহিত্য-সংস্কার ছলমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। যখন এই মিথ্যা ভাবটা আমাদের উদ্যমকে ঠেলিতে থাকে, তখন আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। একবার এই কুহকের আবর্ত্তে পড়িলে, তাহার ঘূর্ণী হইতে আপনাকে উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়ে। সমালোচনার সমর-প্রাঙ্গণে এই অবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। এই প্রকারেই অনেকে মার্জ্জন করিতে গিয়া অভ্যাসক্রমে অবশেষে মার্জ্জনী উদ্ধার ধারণ করিয়া ফেলেন। আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সমালোচনা করিবার সদিচ্ছা-পোষণ করা অপরাধ নহে কিন্তু যেন সমালোচক বলিয়া খ্যাতি লাভের প্রতি লোভ না জন্মায়, কেননা প্রত্যেক কর্ম্মেই অনেক প্রকার প্রলোভনের ভয় আছে, সমালোচনা করাতেও আছে।

আর এক কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। গালাগালি অপেক্ষা সুবুদ্ধি যে বেশী হৃদয়গ্রাহী এবং স্থায়ী প্রভাব-স্থাপনক্ষম তাহা সকল স্থির-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে। সমালেচনায় কটু কাটব্য যতই পরিহার করিতে পারা যায় ততই ভাল। সমালোচনা দোষ নির্দ্দেশ করিবে, কিন্তু দোষ খাড়া করিবে না—ভাল সমালোচনার ইহাই স্বভাব।

এখন দেশে এমনই অসংযত ভাবে সমালোচনাদি করা হয় যে সমালোচনার নাম শুনিলে লোকে বিরক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সমালোচকের আদর্শ খুব উচ্চ।

শ্রেষ্ঠ সমালোচক সত্যানুরাগী, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী এবং প্রভূত পরিমাণে মঙ্গলকামী। ভাল সমালোচক ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নজর রাখেননা,তিনি স্থির দৃঢ় এবং সুস্পষ্টভাবে সুতীব্র নজর রাখেন সমষ্টির কল্যাণের প্রতি। তিনি যেখানেই দোষ দর্শন করেন সেই খানেই পীড়া অনুভব করেন। তাঁহার সেই পীড়া-জনিত আর্ত্তস্বরে উত্যক্ত না হইয়া বরং সহানুভূতি দেখানই উচিত। সাহিত্য যে ব্যক্তি অপেক্ষা লক্ষগুণ মূল্যবান তাহা না মানা বাহাদুরী নহে, হঠকারিতা। মানব প্রকৃতির আলোচনায় বুঝা যায় যে, যে সকল কথা, দৃশ্য বা ভাব মানবের প্রবণতাকে বিকৃত করিয়া পাপের এবং অধঃপতের দিকে নমিত করে, সকল কথা, দৃশ্য এবং ভাবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

সাধারণকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত কিম্বা আদেশ করা দুষ্ট স্বভাবের পরিচয় নহে। যে সকল ভাবপূর্ণ ভাষার অন্তর্গত থাকিলে জাতীয় চরিত্রের হানি-জনক হইতে পারে, সেই সকল ভাবের সর্ব্বদা অপনোদন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজের এবং দেশের মঙ্গলে কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যিকের নামের অপেক্ষা কোনও অংশে অল্প গুরুত্ব-বিশিষ্ট নহে। সমাজের মঙ্গল যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে, ইহাতে যদি কোনও ব্যক্তির নামের ও যশের কিছু হানি হয়—তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু যেখানে সমাজের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে সেখানে অবশ্যই সংশয়ান্বিত হইতে হইবে এবং প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণকে যথেষ্ঠ মান্য করিতে পারি—এমন কি পূজা করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ত্রুটিগুলির প্রতি ভক্তিবশতঃ অন্ধ হইতে পারি না; হওয়াত উচিত নহে। বঙ্কিম বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি পরলোক-গত এবং জীবিত সাহিত্য-সম্রাটগণকে আমরা হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি যে বঙ্কিম বাবু কিম্বা রবীন্দ্র বাবু তাঁহাদের নাম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত নহেন, সাহিত্যের প্রভাবেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা না হইলে বঙ্কিম বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু কি? কিছুই নহেন। এই কারণেই সাহিত্যের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য যদি তাঁহাদের প্রতি কোথাও কোথাও কটাক্ষ-পাত হইয়া পড়ে তাহাতে লজ্জিত হইবার কোনও কারণ দেখি না। বঙ্কিম বাবু কিম্বা রবি বাবুর জন্য সাহিত্যের আবিলতা প্রচ্ছন্ন এবং অব্যাহত থাকিতে দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

আমার এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া "বসুমতী" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বলিয়াছিলেন যে "সাহিত্য সমাজের দর্পণ।" আমরা একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই মাত্র বলি যে সাহিত্য সমাজের দর্পণ হইতে পারে কিন্তু পাংশুল নহে। যেখানে সাহিত্য পাংশুল-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সেই খানেই ভাবিবার কথা! উপরোক্ত সম্পাদক মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন যে পোপের এবং ড্রাইডেনের কবিতা পাঠ কালীন শিক্ষক ও ছাত্রকে লজ্জায় অবনত মস্তক হইতে হয় কিন্তু ইংরাজেরত পোপ এবং ড্রাইডেনের কবিতাগুলিকে সুরুচিসঙ্গত করিয়া শোধন করিতে চাহে না। ইংরাজী এই নজিরটি আমাদের ভাল লাগিল না। পঠন-পাঠন সময়ে শিক্ষক এবং ছাত্রকে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে, এমন বিষয় যে কবিতা-নিচয়ে কিম্বা পুস্তকাদিতে আছে তাহাদের কি অনুমোদন করা যাইতে পারে? আরও জিজ্ঞাসা করি—যে আমাদের স্বরস্বতী দেবীকে কি বিলাতী স্বরস্বতী ঠাকুরাণীর অঞ্চল ধরিয়া তীব্র-গন্ধবিশিষ্ট আবর্জ্জনাসমাকীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া নির্লজ্জভাবে, অনাবৃত আস্যে, উগ্র হাস্য-কৌমুদি ধারণ করিয়া বীরদাপে চলিতে হইবে? পুনরায় একথাটিও ঠিক নহে,—বিলাতে দুই প্রকার দলই আছে। একদল সংস্কার প্রয়াসী; অপর দল স্থিতিশীল। বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় এই সম্বন্ধে খণ্ড সত্যের আশ্রয় লইয়া-

ছেন। এই প্রকার করিলে মজা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য বলা হয় না। তিনি সত্য সত্যই মজাই করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কাব্যভাণ্ডারে নয় প্রকার রস সঞ্চিত আছে। রসজ্ঞ কাব্যামোদী নয় প্রকার রসই আস্বাদন করিতে পারেন। আমরা কিন্তু একথার সমর্থন করি না। এমন অনেক রস আছে যাহার মাত্রাধিক্য হইলে নেশা চড়াইয়া দেয়,এমন কি সংজ্ঞালোপ হইতে অস্তিত্বলোপ পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। আদিরস তাহার প্রমাণ। বেশী হইলেই ঢলাঢলি হইবার ভয়। আবার একটি রস আছে—বীভৎস। এই রস যে সেব্য নহে, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

আর এক পক্ষ বলিয়া থাকেন স্বভাবে যাহা আছে তাহারই বিবৃতি মঙ্গলজনক। একথাও আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না। স্বভাবের মধ্যে উদ্যম এবং উদ্গার দুই আছে। বীর রসে উদ্যমের প্রশংসা করা যাইতে পারে, কিন্তু উদ্গারের কোনও স্থলেই নহে; যদিও উদ্গার উদ্যম অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক আবার পৃথিবীর মধ্যে নদীও আছে নালাও আছে। নদী কবিতার বিষয় হইলেও, নালা কখনও হইতে পারে না। আম ও আমড়া দুই ফল, কিন্তু আমের সম্বন্ধে কবিতা সুমধুর হইতে পারে। কিন্তু আমড়ার কবিতা বোধ হয় নিতান্ত হাস্যরসাত্মক হইবে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য. এই যে সাহিত্যের শুচিতাসম্পাদন করা প্রয়োজন। সাহিত্যকে সংযত, সুশৃঙ্খল এবং পবিত্র করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাহিত্যের মধ্যে পঙ্কিলতা প্রবেশ করিতে দেওয়া কখনও বিধেয় নহে। প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যকে নির্ম্মল এবং তাহাদের মলাক্ষালনপূর্ব্বক শুভ্র করিয়া ফেলিতে হইবে। সাহিত্যের বায়ু যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ হয় এবং রোগবহ না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাহিত্যে জাতীয় চরিত্রগঠনে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়া থাকে এই কারণে সাহিত্যের কলুষরাজীকে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিয়া সাহিত্যের উপকারিতা বর্দ্ধন করিতে হইবে! ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মনুষ্য মাত্রেই টিকিতে পারে না। সাহিত্যকেও সেই জন্য ধর্ম্ম এবং পুণ্যভাবে মণ্ডিত করিয়া দিতে হইবে। ভারতের বিশেষত্ব—ধর্ম্মভাব। ভারতের সাহিত্যও ধর্ম্মভাববর্জ্জিত হইলে চলিবে না। ধর্ম্মই প্রকৃত বল। সাহিত্য ধর্ম্মহীন হইলে যে অনিষ্টকর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মিত্র।

দময়ন্তী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা বিদর্ভ নগরের পথপ্রান্তে উপনীত হইলেন। তখন রাজা রাণীকে তাঁহার পিতৃভবনে যাইবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান ও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিব্রতা সতী পতিকে দুঃখের ক্রোড়ে, হিংস্র জন্তুসঙ্কুল বিজন গহন বনে পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই একাকিনী পিত্রালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। তিনি

বলিলেন,—নাথ! আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃভবনে যাইতে পারিব না। পিতৃ নিকেতনের রাজ-ঐশ্বর্য্য কেন, ত্রিলোকের সম্পদও তোমার ঐ পাদপদ্মের তুলনায় আমার নিকট অতি তুচ্ছ। তুমিই আমার মন ও প্রাণ, তুমিই আমার সর্ব্ব সুখের একমাত্র নিদান। নাথ! তুমিত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, তুমি কি জাননা যে পতিই পত্নীর একমাত্র জীবনধন ও পূজা-ভক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ। স্ত্রীর নিকট স্বামীর তুল্য দেবতা আর নাই। পতি নীচকুলজাত, দুর্দ্দশা-গ্রস্ত, হীন চরিত্র, দুরাশয়, গণ্ড মূর্খ বা দীন দরিদ্র কি পথের কাঙ্গাল যাহাই কেন না হউন, তিনি সকল অবস্থায় সর্ব্বদাই পত্নীর নিকট পূজা ভক্তি পাইবার যোগ্য-পাত্র। যে পত্নী প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী দানে সর্ব্বদা পতিপদ সেবা করিতে পারেন, তাঁহার নারী জন্ম সার্থক; এবং তাঁহাকে কুত্রাপি যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। পতিব্রতার জন্য সুরসেবিত সর্ব্বজনবাঞ্ছিত স্বর্গ রাজ্যের দ্বার সদা উন্মুক্ত। পিতা মাতা, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, অতিথি ও দেবতা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূজ্য; কিন্তু স্ত্রীর নিকট স্বামীই চির পূজ্যতম। দেবতা ও স্বামী-দেবতা একত্র অবস্থান করিলে পতিব্রতা সতী, অগ্রে পতিপদ বন্দনা করিয়া পরে দেবার্চ্চনা করিবেন। নাথ! তুমি আমার সেই শ্রেষ্ঠতম দেবতা ও সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়া আমাকে তোমার পদ সেবায় বঞ্চিত করিয়া পিতৃভবনে যাইবার জন্য বৃথা আদেশ ও অনুরোধ করিতেছ কেন? আমি জীবন থাকিতে কিছুতেই তোমায় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব না। পতিশূন্য স্বর্গবাস অপেক্ষা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ সেবিত এ বিজন বনেও তোমার পদ-সেবা করিতে পারিয়া অধিকতর সুখে আছি। নাথ! তুমি আমার এ সুখ নষ্ট করিতে বৃথা প্রয়াস পাইও না। আমি তোমার পদসেবার বিনিময়ে ত্রৈলোকের ঐশ্বর্য্যও চাই না।

বিধাতার চক্র বড়ই বাঁকা। অদৃষ্ট চক্রের নিষ্পেষণে অতিবড় মনস্বী ব্যক্তিরও বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। বিপৎকালে ধর্ম্ম বীর মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ নলের বিপরীত বুদ্ধি হইল। তিনি পতিব্রতা সাধ্বী সতী দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় সেই বনে রাখিয়া তাঁহারই অর্দ্ধ বস্ত্র সহ প্রস্থান করিলেন। হায়, হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বিজন বনে ব্যাঘ্র, ভল্লুকের করাল কবলে সোণার প্রতিমা অবহেলে বিসর্জ্জিত হইল।

(৩)

দময়ন্তীর ঘুম ভাঙ্গল। নিদ্রোত্থিতা দময়ন্তী স্বামী বিরহে প্রাণের আকুলতায় ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটী ও ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী উচ্চ বিলাপ নিনাদে আর্ত্তনাদ ও নিয়ত উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সে হৃদয়ভেদী করুণ ক্রন্দনে হৃদয় ফাটিয়া যায়, বনের পশু পক্ষীর প্রাণেও করুণার সঞ্চার হয়।

পতিবিচ্ছেদবিধুরা দময়ন্তী বনবনান্তরে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপধ্বনী করিয়া ভর্ত্তার অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন। কুশ কণ্টকে তাঁহার কোমল কুসুমনিভ সুকোমল পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার

সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি অর্দ্ধ উন্মাদিনী উন্মাদিনীর ন্যায় বনের বৃক্ষ, লতা, পশু, পাখী, সিংহ, ব্যাঘ্র, নিশাচর, তাপস, তস্কর যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহারই নিকট পতির সংবাদ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও পতির দর্শন ও সন্ধান মিলিল না। হায়! দময়ন্তীর সে শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—শোক দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজন গহন বনে বিশালবপু এক ভীষণ বিষধর অজগর দময়ন্তীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি ভয়-ব্যাকুলান্তকরণে কোথা প্রাণেশ্বর! কোথায় মহারাজ নল! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন! সহসা এক বনচর ব্যাধের বিষম বিষবাণে সে ভয়াবহ বিষধর ভুজঙ্গমের পতন হইল। কিন্তু অভাগিনী দময়ন্তী বিষধর সর্পের করাল-গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া নিষাদরূপী মানব ভুজঙ্গমের বিষময় কবলে পতিত হইলেন। পাপাত্মা ব্যাধ বল পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র নারীধর্ম্ম বিনাশ করিতে প্রয়াসী হইল। ব্যাধের পাপ অভিলাষ পূর্ণ হইল না। সাধ্বী সতী দময়ন্তীর অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রদীপ্ত তেজ তাঁহার চিরপবিত্র শরীর হইতে যেন অনল-শিখা বহির্গত করিতে লাগিল। সতীত্বের দুর্জ্জয় প্রভাবে নিষাদের পাপ বাসনা ভস্মীভূত হইল। নিষাদের সব ফুরাইল, তাহার নিষাদ লীলার অবসান হইল, সতীত্বেরই জয় হইল। ভুজঙ্গ-কবল ও নিষাদ হস্তে মুক্তি লাভ-করিয়া সতী দময়ন্তী, উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমন করিয়া স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কতিপয় সদাশয় বণিকের সহায়তায় তিনি সুবাহু নগরে উপনীত হইলেন। জন মানব বিহীন অরণ্যবিহারিণী, পতিপ্রেমপাগলিনী সতী বহুদিন বনবাস ক্লেশ ভোগান্তে জনাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ছিন্ন অর্দ্ধবসনাবৃতা, অঙ্গসংস্কারবিবর্জ্জিতা, অস্নাতা অনশন-ক্লিষ্টা দময়ন্তীর সে উন্মাদিনীর বেশ দেখিলে দর্শকের প্রাণ ভয়-বিস্ময়ে মুহূর্ত্তে চমকিয়া উঠে এবং পিশাচী, রাক্ষসী, খেচরী কি ছদ্ম-বেশ-ধারিণী অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী বা দেবী বলিয়া মানুষের মনে কি এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়, পথের লোক ভয়ে বিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া অনিমিষ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে। এমনি উন্মাদিনীর শোচনীয় বেশে, জনৈক ব্রাহ্মণের সস্নেহ মধুর উপদেশে পতিবিয়োগবিধুরা উন্মাদিনী রাজরাণী দময়ন্তী, সুবাহু রাজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

সুবাহু রাজ মহিষী দময়ন্তীর মাতৃস্বসা। কিন্তু তিনি জন্মাবছিন্ন কখনও দময়ন্তীকে দেখেন নাই, পক্ষান্তরে দময়ন্তীও কখন মাসীকে দর্শন করেন নাই। সুতরাং কেহ কাহাকে চিনিলেন না। উন্মাদিনী দময়ন্তী কাহাকেও আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া আপনাকে বিদেহ রাজ মহিষীর সৈরিন্ধ্রী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, রাজকুমারী সুচরিত্রা সুনন্দার সখী রূপে রাজ ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী রাজকুমারী সুনন্দার সহিত সখীত্বের মধুর বন্ধন কালে তাঁহার যাত্রা কোন রূপ

হীন কর্ম্ম না করা হয়, এবং কর্ম্মানুরোধে তাঁহাকে কখন ও কোন পুরুষ সন্নিধানে প্রেরণ করা না হয়, সে জন্য রাজমহিষী ও রাজ কুমারীর নিকট বিনয় মধুর নম্র বচনে অনুমতি চাহিয়া লইলেন। রাজ মহিষীও তাঁহাকে স্বীয় প্রাণাধিকা দুহিতার ন্যায় মাতৃ স্নেহের মধুর আবরণে আবরিয়া নিয়ত প্রীতি, স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শনে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মহারাণী সৈরিন্ধ্রী মলিনবেশধারিনী দময়ন্তীকে উত্তম বেশ ভূষা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া সেই অতি ছিন্ন অতি মলিন অর্দ্ধ বস্ত্র খণ্ড মাত্র পরিধান—এবং স্বাদবিহীন কটু কষায় ফলমূল ভক্ষণ ও ভূতল শয্যায় শয়ন করিয়া যোগমগ্না যোগিনীর ন্যায় পতি-পদ চিন্তায় নিরত থাকিয়া সময়পাত করিতে লাগিলেন।

শত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত বুদ্ধি-ভ্রষ্ট মহারাজ নল, পতিব্রতা পত্নীকে বিজন বনে বিসর্জ্জন দিয়া উন্মাদের ন্যায় বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন। ত্যাগের বহুক্ষণ পরে রাজার জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি ভার্য্যা-বিরহে যার পর নাই অনুতপ্ত ও শোকাভিভূত হইয়া পুনরায় তীব্র গতিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! তখন দময়ন্তী কোথায়? রাজা বনবনান্তরে সহধর্ম্মিনীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজা বহু অন্বেষণেও রাণীর দর্শন পাইলেন না বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজা, অনশন অনিদ্রায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জন-শূন্য গহন বনে সহসা এক বিষধর সর্পের দুঃসহ দংশন-জ্বালায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। বিষম বিষের জ্বালায় তাঁহার সোণার অঙ্গ কালী হইয়া গেল। দৈব কৃপা-প্রভাবে তিনি প্রাণদান পাইলেন। কিন্তু শারীরিক পূর্ব্ব কান্তি আর ফিরিয়া পাইলেন না। কন্দর্প-বিনিন্দিত পরম সুন্দর পুরুষ মহারাজ নল অদৃষ্টের নিষ্ঠুর তাড়নায় যার-পর-নাই বিবর্ণ ও হতশ্রী হইয়া জীবিত রহিলেন। অতঃপর শোক-দুঃখ-ক্লিষ্ট শ্রীভ্রষ্ট রাহুক নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া সারথীর ছদ্ম বেশে ঋতুপর্ণ রাজার দেশে তাঁহারাই ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট-লিপির অনন্ত প্রতাপে দুর্ভাগ্যেরই জয় হইল।

একদিকে যথা সময় পুরোহিত-সহ রাজপুত্র চন্দ্রসেন ও রাজকন্যা ইন্দ্রসেনী মাতামহ ভবনে বিদর্ভ রাজ নিকেতনে উপনীত হইলেন। নল-দময়ন্তীর বন যাত্রা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীম রাজা ও মহিষী জামাতা ও দুহিতার দুর্ব্বিসহ শোকে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণ সম দৌহিত্রীকে স্নেহের মধুর আবরণে আবরিয়া লইয়া কন্যা ও জামাতার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে বহু লোক প্রেরণ করিলেন।

দূতরূপে প্রেরিত ব্রাহ্মণেরা বহুস্থান অন্বেষণ করিলেন; কোথাও নল-দময়ন্তীর সন্ধান মিলিল না। বহুদিন পরে সুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণচর সুবাহু নগরে দময়ন্তীর দর্শন পাইলেন! সুবাহু রাজ অন্তঃপুরে সরোবরতীরে স্নানান্তে দময়ন্তী যখন স্বীয় অর্দ্ধছিন্ন অতি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড আতপতাপে শুষ্ক করিয়া লইতেছিলেন,

তখন সুদেব অন্তঃপুর-সন্নিহিত রাজপথ হইতে কৌশলে তাঁহার সেই কাঙ্গালিনীর বেশ দেখিয়া তাঁহাকে ভীমরাজ নন্দিনী দময়ন্তী বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইলেন,যথাকালে দময়ন্তীর বিপ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দীর্ঘকাল অন্তে পিতা মাতার সংবাদ পাইয়া দময়ন্তী আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। সুবাহু রাজ-মহিষী দময়ন্তীর মাতৃস্বসা। তিনি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ভগিনী-সুতার এরূপ শোচনীয় পরিণাম এবং তাঁহারই ভবনে সৈরিন্ধ্রীর ছদ্ম-বেশে অবস্থান জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাসীমাতার ঐকান্তিক অনুরোধেও দময়ন্তী রসনাতৃপ্তিকর কোন-রূপ বিলাস বস্তু ভক্ষণ বা বসন ভূষণ গ্রহণ করিলেন না। মাতৃস্বসা প্রদত্ত বহুমূল্য রত্না-ভরণ ও উপাদেয় ভোজ্য পদার্থগুলি তিনি দীন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া মাসীর পদে নমস্কার এবং সখীস্থানীয় স্নেহের ভগিনী সুবাহু রাজ-নন্দিনী সুনন্দাকে আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন করিয়া দ্বিজ সুদেবসহ পিতৃভবনে গমন করিলেন।

যথাকালে দময়ন্তী পিতৃভবনে উপনীত হইলেন। সুদীর্ঘকাল অন্তে হারাণ কন্যার পুনঃ দর্শনে জনক জননী আনন্দ সলিলে নিমগ্ন হইলেন। রাজপুরী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইল। কিন্তু পতি বিরহবিধুরা দময়ন্তীর বিষাদবিমণ্ডিত বদনমণ্ডল দর্শনে ও জামাতা নলের অভাবে সকলেই যুগপৎ হর্ষ বিষাদসংযুক্ত হইলেন।

স্বামী-বিরহিণী রাজনন্দিনী দময়ন্তী স্বামীর জন্য উন্মাদিনী প্রায় হইয়া উঠিলেন। তিনি অন্ন-জল ও শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ভূতলে শয়ন এবং শুধু বনের ফলমূল ভক্ষণ ও জল মাত্র গ্রহণ করিয়া, পতির পাদপদ্ম চিন্তা এবং তাঁহা-রই মঙ্গলার্থ শিব পার্ব্বতীর আরাধনায় নিয়ত সময় পাত করিতে লাগিলেন। রাজ বৈভবের কোনরূপ বিলাসিতাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি পতির অভাবে প্রাণের গভীর আকুলতায় মণিহারা ফণিনীর ন্যায় নিয়ত অস্থির ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পিতামাতা, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কি পিতার বিপুল রাজ ঐশ্বর্য্য কিছুতেই তাঁহার প্রাণে শান্তি সঞ্চার করিতে পারিল না; তনয়ার সদা অশ্রুসিক্ত বিষাদ-ম্লান মুখচন্দ্র দর্শনে পিতামাতা কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু দময়ন্তী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। তিনি বলিলেন—আপনারা গুরুজন, আপনারা অবশ্য জানেন যে পতিই স্ত্রীলোকের ব্রত, নিয়ম, তপস্যা ও দান, পতি, পত্নীর দ্বিতীয় প্রাণ অথবা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম অমূল্য রত্ন। জীবিতা থাকিয়াও আমি আমার সেই পতিধনে বঞ্চিতা,—পতি বিরহিনীর বৃথাজন্ম; অতএব আমার জীবনেই বা ফল কি? প্রভু বিহনে আমার অন্ন বস্ত্র বা শয্যার প্রয়োজন কি? আমি যতদিন না তাঁহার দর্শন পাইব, ততদিন এই বেশে অনাহারে অনিদ্রায় থাকিব এবং নিয়ত যোগিনীর ন্যায় তাঁহারই পাদপদ্ম চিন্তায় সময় কাটাইব। তবুও যদি দর্শন না পাই তবে তাঁহারই পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রাণের জ্বালা

জুড়াইব; ইহাই আমার দৃঢ়পণ ও মনের এক-মাত্র সঙ্কল্প। অতএব আপনার উপাদেয় ভোজ্য ও সুশোভন বসন ভূষণের জন্য বৃথা আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। পিতামাতা মহাগুরু, প্রত্যক্ষ দেবতা। গুরুজনের অনুরোধ রক্ষা না করা মহাপাপ। কন্যার এসব কথার পর রাজা ও রাণী তাঁহাকে আর অনুরোধ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। মহারাজ নলের অনুসন্ধানে দিগদিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল।

সুদীর্ঘকাল অতীত হইল, মহারাজ নলের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। জনৈক ব্রাহ্মণ দূতের মুখে দময়ন্তী শ্রুত হইলেন যে ঋতুপর্ণ রাজার জনৈক সারথী দময়ন্তীর সংবাদ শ্রবণে আগ্রহ প্রদর্শন ও অশ্রু বর্ষণ করিয়া ছিলেন। ইহাতে দময়ন্তী স্থির করিলেন, মহারাজ নল ছদ্ম বেশে ঋতুপর্ণ রাজার দেশে আছেন। অনন্তর পতিলাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় দময়ন্তী এক অদ্ভুত ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ঋতুপর্ণ রাজার নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে মহারাজ নলের মহিষী দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ংবরা হইবেন; সে স্বয়ংবরসভায় মহারাজ ঋতুপর্ণের আগমন প্রার্থনীয়।

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ংবর সভার অদ্ভুত নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া রাজা ঋতুপর্ণ যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর কৌতূহল নিবৃত্তি মানসে রাজা ছদ্মবেশী সারথী বাহুককে (নলকে) সঙ্গে লইয়া অতিক্রতগামী রথে ভীমরাজ ভবনে উপনীত হইলেন। রাজা ভীমভবনে উপস্থিত হইয়া, স্বয়ংবরসভার কোনরূপ অনুষ্ঠানই দেখিতে পাইলেন না। রাজকন্যা দময়ন্তী গুপ্ত চর দ্বারা ঋতুপর্ণকে জানাইলেন যে, ইহা কোনও বিশেষ কার্য্যোদ্ধারের জন্য একটা কৌশল মাত্র।

কাল প্রভাবে মহারাজ নলের প্রতি শনির প্রভাব অন্তর্হিত হইল। তাঁহার কুরূপ-কুৎসিত আকৃতি দূর হইল। তিনি মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় পুনরায় পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া পাইলেন। নল-দময়ন্তীর পরিচয় হইল। কিন্তু মহারাজ নল স্বয়ংবরাভিলাসিনী একাকিনী বনচারিণী দময়ন্তীকে পুনঃগ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামীর নিদারুণ বাক্যে দময়ন্তীর মস্তকে যুগপৎ সহস্র বজ্রপাত হইল; আত্মীয়েরা মহা প্রমাদ গণিলেন। সাধ্বী সতী দময়ন্তী আপনার সকল অবস্থা স্বামীকে বুঝাইয়া বলিলেন; তখন কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, এ স্বয়ংবর-বার্ত্তা একটা কৌশলপূর্ণ ছলনা মাত্র। কিন্তু ইহাতে নলের সংশয় দূর হইল না; তিনি দময়ন্তীকে পুনঃ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। যখন নল কিছুতেই পতিব্রতা পত্নীকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন সহসা দৈববাণী হইল যে, "দময়ন্তী কায়মনোবাক্যে সতী এবং তাঁহার দ্বিতীয় বার স্বয়ংবর ঘোষণাটা ছদ্মবেশী পলায়িত পতি নলকে পুনঃ প্রাপ্তির একটা অদ্ভুৎ ছলনা মাত্র।" দৈববাণী শ্রবণে মহারাজ নলের সন্দেহ বিদূরিত হইল। অতঃপর তিনি চির-পুণ্য পবিত্রতাময়ী দময়ন্তীকে সাদরে বুকে জড়াইয়া লইয়া কৃতার্থ হইলেন। বারশ বর্ষ

ব্যাপী সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পতি-পত্নীর পুনঃমিলন হইল। সেই পবিত্র সম্মিলনের আনন্দ কোলাহলে রাজপুরী মুখরিত হইল।

দম্পতির পবিত্র মিলনের মাঙ্গলিক উৎসবের অবসান হইলে, মহারাজ নল পুনরায় পাশা খেলিয়া আপনার হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। জগতে ধর্ম্মের জয়, পাতিব্রত্যের জয়, সত্যের জয় বিঘোষিত হইল। সাধ্বী-সতী দময়ন্তী আজীবন পতিসেবা সুখ ভোগ করিয়া চরমে স্বর্গবাসিনী হইলেন। সতীর পতিসেবা সার্থক হইল।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

মা আমার।

(১)

মা আমার কত ভালবাসেন আমায়
কি দিয়া গড়েছে বিধি, মাতা হেন রত্ন নিধি ?
কি কৌশলে স্নেহরাশি দিয়েছে তাঁহায় !
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়।

(২)

মার মত দয়াময়ী কে আছে ধরায়
দেখিয়া আমার মুখ, পান তিনি কত সুখ
পেলেছেন সযতনে আপন মায়ায়
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়।

(৩)

আছে কি তুলনা মম মার করুণায় !
শৈশবে ছিলনা বল, ফেলিয়াছি অশ্রুজল,
তা দেখে মা লয়েছেন কোলেতে আমায়
মা আমার কত ভাল বাসেন আমায়

(৪)

মার মত স্নেহময়ী আছে কি ধরায় ?
বিদ্যালয়ে গেলে পরে, মা র'ন ভাবিতা ঘরে
থাকেন নিয়ত চাহি পথপানে হায় !
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়।

(৫)

ছেলেবেলা কত দিন লইয়া আমায়
দিতেন মা উপদেশ, যাহাতে না পাই ক্লেশ
থাকিয়া অবনী মাঝে সুখী হই যায়,
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়।

(৬)

কিছু সমতুল নহে মার মমতায়।
অসুখ হইলে পরে, সব সুখ যায় দূরে
শিয়রে বসিয়া রন মগ্ন ভাবনায়।
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়।

(৭)

পরম দেবতা মাতা বিশাল ধরায়।
মায়ের স্নেহের কথা, চিরকাল রবে গাঁথা
অনন্ত অক্ষরে মোর হৃদি মাঝে হায় !
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়।

(৮)

পারিব কি শোধিবারে কিছু ঋণ তাঁর !
জননীর ঋণভার কিবান যে বড় ভার
মার ঋণ এ জগতে শোধা নাহি যায়,
মা আমার কত ভালবাসেন আমায়।

৺ধ্রুবলাল দত্ত।*

---

* স্বর্গীয় কুসুম ধ্রুবলাল অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। ফুটিতে পাইল না; সৌরভ ছড়াইতে পারিল না, মুকুলিত অবস্থাতেই ঝরিয়া পড়িল। কালের শাসন এমনি নির্ম্মম, আমরা বিগত ১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যায় তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিয়াছি, তখন তাহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত না হওয়ায়, দেওয়া হয় নাই। এই সংখ্যায় তাহার দুই বয়সের দুইখানি চিত্র পরিবেশিত হইল। আঃ সং

পল্লী সেবক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী এবং যৌথ-শস্যভাণ্ডার।

পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবলমাত্র ঋণদান-মণ্ডলী স্থাপনের দ্বারা যে কৃষকসমাজের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল—তাহা নহে। আরও অনেক প্রকার সমবায় অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। কৃষকগণ যাহাতে তাহাদিগের পণ্যদ্রব্য সুবিধা মত বিক্রয় করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছিল। সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া সমিতির উপর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার প্রদান করিয়া ইউরোপীয় কৃষকগণ বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। কৃষি প্রধান দেশে দালাল এবং পাইকারগণ কৃষিজাত দ্রব্যের লাভাংশ আত্মসাৎ করে, কৃষকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে শস্যোৎপাদনের জন্য ঋণগ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে শস্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, ফলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি লাভ করিয়াও কৃষকগণ লাভবান হইতে পারে না। এ স্থলে গ্রাম্যসমিতি কেবল মাত্র ঋণদানে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি কৃষকগণের পণ্য-দ্রব্যের বিক্রয়ভার লইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ মঙ্গল সম্ভাবনা। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াও যে লাভবান হইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ তাহারা দালালগণের নিকট হইতে দাদন লইয়া উহাদিগকে অত্যল্প মূল্যে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহা বুঝা যাইবে। পাট চাষের জন্য কৃষকেরা আষাঢ় মাসে ৫৲ অথবা ৫৷৷০ দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে এক মণ পাট দিয়া থাকে। এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া দালালেরা ৯৲, ১০৲ পাইয়া থাকে। সুতরাং কৃষকগণ অর্থাভাব এবং দাদন গ্রহণের জন্য লাভের অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। তিসি অথবা বুট চাষের জন্য দালালেরা কৃষককে ৫৲ অথবা ১৷৷০ ঐ দুইটি ফসল উৎপাদনের জন্য দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে দালালেরা কৃষকের নিকট এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহা ৭৲ অথবা ২৷৷০ দরে সহরের হাটে বিক্রয় করে। এস্থলে যদি কৃষকগণ কোন গ্রাম্যসমিতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সমিতির দ্বারাই তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। আধুনিক অবস্থায় কৃষকগণ নয়ালির সময় (যে সময় নূতন শস্যের আমদানী হয়) শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তখন শস্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। যৌথ-বিক্রয় সমিতি এবং যৌথ-ভাণ্ডার স্থাপন করিলে বাজার মন্দা হলেও পণ্য দ্রব্য 'ধরিয়া রাখা' যাইতে পারে; উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে ন্যায্য দরে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইবে। মধ্যবর্ত্তী সময়ে কৃষকগণের সংসারখরচের জন্য সমিতি তাহাদিগকে ঋণ দিবে। বাস্তবিক পল্লীগ্রামে যৌথ-ভাণ্ডার এবং যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলীস্থাপন বিশেষ বাঞ্ছনীয়

ইহাদিগের দ্বারা কৃষকসমাজ পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের, সুবিধা লাভ করিয়া স্বকীয় পরিশ্রম সার্থক করিতে পারিবে। তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে তখন ঋণ-গ্রহণের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী ।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানের জন্য যৌথ-ঋণ-দানসমিতি, শস্য-ভাণ্ডার এবং বিক্রয়-সমিতি যেরূপ প্রয়োজনীয় যৌথ-ক্রয়-সমিতিও সেরূপ আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদনের জন্য অভিনব যন্ত্র এবং কৃত্রিম সারাদির ব্যবহার আবশ্যক। ইহাদিগের মূল্য অধিক বলিয়া পরস্পরের সহায়তা ভিন্ন ঐগুলি ক্রয় করা অসাধ্য। যৌথ ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিলে পরস্পরের সাহায্যে পাইকারী দরে উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র এবং সার-ক্রয় এবং বীজ শস্য সংগ্রহ করা খুব সুবিধাজনক হইবে। হলাণ্ড, বেলজিয়াম, জর্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, বোহিমিয়া, মোরাভিয়া প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রকার যৌথ-ক্রয়-সমিতির দ্বারা সেখানকার কৃষকেরা নানাপ্রকার যন্ত্র এবং কৃত্রিম সার ব্যবহারের সুবিধা লাভ করিয়া স্বকীয় আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি-সাধন করিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে সমবায় ।

আমাদিগের দেশের কৃষিজীবনের মধ্যে সমবায়-প্রণালীর প্রচলন বিশেষ আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়-প্রণালী প্রয়োগ না করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি অসম্ভব। ব্যবসায়ে যেমন কলকারখানার আয়োজন না করিলে ফললাভ করা সুকঠিন, সেরূপ কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহায়তা দ্বারা শস্যোৎপাদন এবং শস্য-বিক্রয়ের সুবিধা না থাকিলে উহা বিশেষ লাভজনক হয় না। কৃষিকার্য্যে কলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। মানুষ তাহার বুদ্ধি এবং পরিশ্রম নিয়োগ করিয়াও শস্যোৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারে না। এজন্য কৃষিকার্য্য ক্ষুদ্র আয়োজনেই সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। অনেক ব্যবসায়ে যেমন মূলধন অধিক করিয়া আকরি বৃদ্ধি করিলেই লাভ অধিক হয়, কৃষিকার্য্যে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ কৃষিকার্য্যে বৃহৎ ব্যবসায় লাভজনক নহে। অথচ ঋণ গ্রহণ, শস্যোৎপাদন ও শস্যবিক্রয় সম্বন্ধে অল্প মূলধনবিশিষ্ট সামান্য কৃষকের অনেক অসুবিধা আছে। এই সকল অসুবিধা অনেক-গুলি কৃষক মিলিত হইয়া কাজ করিলে দূরীভূত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল এইরূপ নানা ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা অবলম্বিত হইতেছে। সমবায়ের সেই সকল সুবিধা আমাদের দেশে চিরকালই বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে ইউরোপের নিকট নূতন করিয়া শিখিতে হইবে না।

আত্মনির্ভরতা এবং সমবায় প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মজ্জাগত ।

আমাদিগের দেশের কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। গ্রামে অনেকগুলি

কৃষককে মিলিত হইয়া জমি চাষ করিতে প্রায়ই দেখা যায়। অনূন ১৫, ২০ জন এরূপে প্রত্যহ একজন বন্ধুর জমি তৈয়ারী করে। যাহার জমি তৈয়ার হইল, সে তাহার সমস্ত বন্ধুদিগের জমি যতদিন না তৈয়ারী হয় ততদিন তাহাদিগের সঙ্গে পরিশ্রম করে। এরূপে অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে সকলেরই জমিতে লাঙ্গল এবং সার দেওয়া হয়। ইহাকে প্রচলিত কথায় 'জাত' বলে। গুড় তৈয়ারী করিবার সময় কৃষকদিগের সহকারিতার আর একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্ত কৃষক মিলিত হইয়া একটি ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র ক্রয় করে বা ভাড়া লয়। ইক্ষু চাষ শেষ হইলে কৃষকেরা সমবেত হইয়া ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রস বাহির করিয়া গুড় তৈয়ারী করে। প্রত্যেক কৃষকের হালের বলদ রস বাহির করিবার সময় নিযুক্ত হয়। এই প্রকার পরস্পরের সহায়তায় কার্য্যকরণপ্রণালীর (Co-operation) উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। দুই তিনটী গ্রামের কৃষকেরা অনেক সময় সমবেত হইয়া কয়েকজন রাখাল বালক নিযুক্ত করে। কাহারও গো-মহিষাদি অপরের জমিতে আসিয়া শস্য নষ্ট না করে, তাহা দেখিবার ভার রাখালবালকদিগের উপর ন্যস্ত হয়। যাহার গরু বা মহিষ অপরের জমিতে আসে, তাহাকে কিছু জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার টাকায় বালকদিগের মাহিয়ানা দেওয়া হয়। এরূপে কয়েকটি গ্রাম সমবেত হইয়া খোঁয়াড়ের কার্য্য অল্প ব্যয়ে এবং বিনা পরিশ্রমে চালাইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে সমবেত কার্য্যকরণ এবং পরস্পর বিশ্বাসের (Co-operation) উদাহরণ আমাদিগের পল্লীজীবনে এখনও ভূরি ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্রামে মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে এখনও পল্লীসমাজ তাহার মণ্ডলকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। মণ্ডল এখনও গ্রাম্য-বিবাদ, জাতি-বিবাদ, গৃহবিবাদ, ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। গ্রামবাসী অধিকাংশ স্থলেই মণ্ডলের পরামর্শ না লইয়া আদালতে যায় না। মণ্ডলও কখন কোন ব্যক্তির অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরামর্শ দেন না প্রত্যেক গ্রামবাসীর সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, তাই পল্লীসমাজস্থ কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হয়। মণ্ডল শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। রাজদণ্ড অপেক্ষা মণ্ডলের নিকট অপমান এবং লাঞ্ছনা পল্লীবাসীরা অধিক ভয় করে। বাস্তবিক আমাদিগের দেশের জনসাধারণ চিরকালই রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা ভার সমর্পণ করতঃ গ্রামের মণ্ডলের অধীন থাকিয়া, গ্রাম্যজীবনে সুখ এবং শান্তিস্থাপনের জন্য আপনাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত। জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা এবং উদ্যোগে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবিধান বিশেষ কঠিন হইত না। ইহার ফলে আমাদিগের পল্লীগ্রামগুলি স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পথে বিকাশলাভ করিতে পারিত। প্রাচীন [illegible] আমাদিগের দেশের সমাজের [illegible]

করায়ত্ত করিতে পারে নাই। সমাজের জীবন-শক্তি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত থাকায়, রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি অবনতির সঙ্গে আমাদিগের জাতীয় শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। পল্লী-গ্রাম সমূহ এরূপে স্বাধীন চিন্তা এবং কর্মশক্তির আধার হইয়া সমগ্র সমাজের আত্মশক্তি, আত্ম-নির্ভরতা, পরস্পর সহানুভূতি এবং সমবায় প্রবৃত্তিকে আজও পর্য্যন্ত সজীব রাখিতে পারিয়াছেন।

আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের এই সনাতন প্রেম, সৌহার্দ্দ্য, মিলন ও আত্মনির্ভরতা অনেক কারণে দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। এখন অমাদিগকে আমাদের পুরাতন জিনিসই নূতন নামে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমাজের এই প্রকৃতিগত সমবায়প্রবৃত্তি এবং আত্মনির্ভরতাকে অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় নিয়োজিত করিয়া আমাদিগের দেশের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে ঋণ-দান সমিতিতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ঋণ-জাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গো-মহিষাদি পশু, এবং উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র, সার এবং বীজ-শস্য, সংগ্রহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গ্রামের উৎপন্ন শস্যসমূহ ন্যায্য দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে শস্যগোলা স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে সাময়িক ভরণপোষণের নিমিত্ত অল্প সুদে শস্য কর্জ্জ দিতে হইবে। বিদেশী মহাজনকে শস্য কর্জ্জদান, শস্যসঞ্চয় এবং শস্যরপ্তানি ইত্যাদি ব্যবসায়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না দিয়া, গ্রাম্য সভার দ্বারাই গ্রামের শস্য আদান-প্রদান-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অপরিমিত পরিমাণে শস্যরপ্তানি বন্ধ করিয়া গ্রামের সঞ্চিত শস্য যাহাতে দুর্ব্বৎসরে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কৃষিজীবিগণের জন্য বস্ত্র, তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া মড়ক ইত্যাদিতে গো-মহিষাদির জীবন-বিমা করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া আনিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্পজীবিগণের জন্য যৌথ-ঋণ-দান-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পকর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ পাইকারী দরে ক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পিগণের প্রস্তুত দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তন্তুবায়গণের জন্য তন্তুবায়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সুতা, রেশম, রং শিল্পকার্য্যের অন্যবিধ সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্ত্র-বয়নের পর তন্তুবায়গণের যাহাতে বস্ত্রবিক্রয়ের কোন অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য বিক্রয়-সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর স্থানান্তরে বস্ত্র-বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। সূত্রধরগণের জন্য মণ্ডলী স্থাপন করিয়া বড় বড় গাছ কিনিবার জন্য উপযুক্ত টেকিং [illegible]

করাত বিতরণ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ ঘৃত এবং মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে, প্রত্যেক গৃহস্থ গরুর দুগ্ধ সমিতির কারখানায় আনিয়া কারখানার কলে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ঘৃত মাখন প্রস্তুত করাইয়া লইবে। পল্লী-সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামে কয়েকটি ইক্ষু পেষণ-যন্ত্র, ধান এবং ডালভাঙ্গার যন্ত্র, আম, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং বনের মধু হইতে বিবিধ প্রকার আচার এবং মোরব্বা প্রস্তুতকরণ-যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এ সমস্ত যন্ত্রাদি গ্রামবাসিগণের যৌথ-সম্পত্তি, সুতরাং সকলেরই ব্যবহার্য্য হইবে। গ্রামে মৎস্য রক্ষা এবং সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া ধীবরগণকে নিকারীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে হইবে। গ্রামকে মহামারী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমবেত সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে কূপ খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল কাটিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জল-সরবরাহ, বনজঙ্গল পরিষ্কার, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, অবৈতনিক কৃষিবিদ্যালয়স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লীসেবকের আবশ্যকতা।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পল্লীসেবক আবশ্যক। আমাদিগের দেশের জনসাধারণ একেবারেই অজ্ঞ এবং নিরক্ষর এবং নানা কারণে নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমহীন। তাহাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। ইহাদিগের উপকারিতা একবার বুঝিতে পারিলেই তাহারা উদ্যোগী হইয়া নিজেদের কাজ নিজেরাই করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে প্রচার আবশ্যক এবং প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য অসংখ্য কর্ম্মবীরের উৎসাহ এবং ব্যাকুলতা আবশ্যক। বহুবৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া উহার কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাণী বাঙ্গালা শুনে নাই। তাঁহার কুড়ি বৎসর পরে একজন সন্ন্যাসী দীন-দরিদ্রের জন্য প্রাণে প্রাণে কাঁদিয়া ভারতবাসীর নিকট তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা এবং অদম্য উৎসাহ দানস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। অগ্নিময় বিশ্বাসের সহিত তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, "যাও এই মুহূর্ত্তে সেব পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীন-দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক-চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পতিতা রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট

এক মহাবলি প্রদান কর—বলি—জীবন বলি, তাঁহাদের জন্য, যাঁহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিতদের জন্য।" বিবেকানন্দের আহ্বান ভারতবাসীর নিকট ব্যর্থ হয় নাই। তাহার পর আজ চারি পাঁচ বৎসর হইল আর একজন বাঙ্গালা শিক্ষা-প্রচারক প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে আগাগোড়া বদলাইয়া নিঃস্বার্থ সমাজসেবা এবং কর্ম্মোপাসনার ভিত্তির উপর শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রচারের গোড়ার কথা—সাধনার বীজমন্ত্র এই,—ফ্যাক্টরীতে, 'কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ যথেষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের হিসাবটা বাড়িয়াছে। পণ্ডিত হইয়া সকলে নিজেকেই বড় করিতে শিখিয়াছেন। সেরূপ পাণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্নশ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী মানুষের সৃষ্টি করা যায় কি না, দূরদর্শী ব্যক্তিগণের তাহাই ভাবিবার বিষয়।" গ্রামে গ্রামে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়া, পল্লীতে পল্লীতে দেশের বিচিত্র কথা শুনাইয়া পল্লীজীবনে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিবার জন্য তিনি দেশের শিক্ষিত লোককে পরহিতব্রত গ্রহণ করিতে এবং প্রচারকের জীবন অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। "যেখানে অতি নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকেরা শ্রম বিনোদন করিতেছে, যেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়ই কোন চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সাধনা করিতেছে, যেখানে সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর এখনো বেশী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দু মুসলমান একমন, একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজ করিয়া থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সমস্ত লোকই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান, যেখানকার আম কাঁঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনও অপসৃত হয় নাই—সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার, আমাদিগের পল্লীসমাজে নূতন নূতন কথা শুনাইয়া পল্লীবাসীদের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে—দেশের কোথায় কোন চিন্তা, কোন কাজ হইতেছে। সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্য জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের সঙ্গে সহরের যে বিরোধ কিছুকাল হইল ঘটিয়াছে, এবং এজন্য পল্লীতে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতীকার করিবার জন্য ঘরে ঘরে— হিন্দু মুসলমান, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ, জোলা তাঁতী সকলকে শিক্ষাদান করিয়া স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে।"

এই বিপুল শিক্ষাদান এবং সেবার কার্য্য করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে দরিদ্রবন্ধু এবং শিক্ষা প্রচারক অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে লোকশিক্ষা-প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক

জেলায় এবং কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন, জাতীয় বিদ্যালয়, সুহৃদ-সমিতি, শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষৎ, অবৈতনিক পাঠশালা, গ্রন্থাগার, সান্ধ্য শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। বিদ্যালয়াদিতে ছাত্রদিগকে ইতিহাস, সাধারণ হিসাব, ভূগোল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য এবং বড় লোকের প্রতিকৃতি দেখান হইতেছে। স্থানে স্থানে কৃষি এবং শিল্প-শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে।

দুর্দ্দশার পরিমাণ।

কিন্তু দেশে কার্য্য আরম্ভ হইলেও প্রয়োজনের অনুরূপ কিছুই আয়োজন হয় নাই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য লোক একেবারে নিরক্ষর ও দারিদ্র-পীড়িত। পল্লীবাসীদিগের এখন অসংখ্য অভাব, সে সমস্ত মোচন করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পল্লীগ্রামে শিবমন্দির, কালীমন্দির প্রভৃতি দেবালয় এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গ্রামের হরিসভার জন্য চাঁদার খাতায় অনেক টাকা বাকী পড়িতেছে, কথকতা যাত্রাগান, কবির গান প্রভৃতি উৎসাহ অভাবে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, পানীয় জল পানায় ভরাট হইয়াছে, নদীগুলি সংস্কার অভাবে ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে; সমৃদ্ধিশালী নগরীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধনীলোকের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ তাঁহাদিগের জন্মস্থানের দারিদ্র্যের অবধি নাই। তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভদ্রাসন—পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে এতকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমস্ত দেশ এখন বন-জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে, জলসরবরাহ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অসংখ্য গ্রাম একসঙ্গে উজাড় হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত লোক কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারা আপনাদের পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া সহরে চাকুরী খুঁজিতেছে। অনেক গ্রাম এরূপে এখন একেবারেই লোকশূন্য। যে গ্রামে প্রায় কুড়ি ত্রিশটি টোলে শাস্ত্রজ্ঞগণ অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রেরা আসিয়া যেখানে শিক্ষালাভ করিত, যে গ্রামে "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে" মুখরিত থাকিত, দুর্গা এবং কালীপূজার সময় প্রায় দুই তিন শত বাড়ীতে মহোৎসব হইত, বারোয়ারী পূজার বিপুল সমারোহ জন সাধারণের হৃদয়ে বল এবং মনে আনন্দ সঞ্চার করিত, হরিনাম কীর্ত্তন, রামায়ণ এবং চণ্ডীর গান জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীকে আরও মধুর করিয়া তুলিত, সে গ্রাম এখন নিস্তব্ধ, নিরানন্দ,—শৃগাল ব্যাঘ্রের রঙ্গভূমি, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন গ্রামে কোন এক ভীষণ মহামারী গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মাঝে মাঝে বনজঙ্গলের ভিতর হইতে দুই একটা পতনোন্মুখ কোঠা বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়, উহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কেহই

সেখানে বাস করে না। যে সকল গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগেরও ক্রমাবনতি হইতেছে। অধিকাংশ গ্রামের কৃষি এবং শ্রমজীবিগণকে অন্নাভাবে অনশনে থাকিতে হয়। কৃষকগণের সমস্ত পরিশ্রম জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই ব্যয়িত হয়। একবার ঋণ গ্রহণ করিলে সে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, অবশেষে সাহায্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় বহন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। অন্নাভাব বশতঃ কৃষকদিগের রোগাধিক্য এবং পরিশ্রমকাতরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সঙ্গে বার্ষিক দুর্ভিক্ষ, জলাভাব, গোবংশের অবনতি এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস জড়িত হইয়াছে, কৃষকদিগের দুর্গতির সীমা নাই। শিল্পজীবিগণকেও দারিদ্র্য হেতু পাইকার প্রভৃতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, ন্যায্যদরে তাহাদিগের দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা নাই বলিয়া তাহারা পরিশ্রমোপযোগী ফল লাভ করিতে পারে না। উপরন্তু, বিদেশ হইতে পল্লীর হাট বাজারে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের আমদানী হইয়াছে। গ্রামের শিল্পজাত দ্রব্যের আদর কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হেতু কাঠ, পিত্তল, মাদুর এবং মাটীর কাজ ব্যতীত সমস্ত শিল্পই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় চাকুরীর লোভে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য সহরে আসিতেছেন, চাকুরী পাইলে তাঁহারা ভ্রমক্রমেও নিজবাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন না। জমিদারবর্গ নানা কারণে ভোগ বিলাসের লীলাভূমি নগরীতে আসিতে বাধ্য হন—এবং ক্রমশঃ আপনাদিগের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান। প্রজাদিগের উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সমাজের শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত এবং ধনীসম্প্রদায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে দলাদলি, বিবাদ, মামলা, মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় সমাজে গুরুস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে, নৈতিক শিক্ষার অভাবে জনসাধারণের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের ধনী এবং মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবী অথবা চিরপ্রবাসী এবং জনসাধারণ—যাহা লইয়াই দেশের সমাজ এবং দেশের বল—রুগ্ন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট এবং ঋণভারগ্রস্ত, চিরদারিদ্র্যকে একমাত্র সখা করিয়া কালাতিপাত করিতেছে। হিতোপদেশে আছে—

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্যবিশ্রামঃ॥

বাস্তবিক বাঙ্গালীসমাজ এরূপ জীবন যাপনে কতদিন সন্তুষ্ট থাকিবে?

পল্লীসেবকের কর্ম্মক্ষেত্র।

যে সমাজে এই সমস্ত বিপুল অভাব সেখানে দুই একজন ভাবুক কর্ম্মী বা দুই একটী শিক্ষা-পরিষৎ বা সাহিত্য-পরিষৎ কি করিবেন! এখন পল্লীতে পল্লীতে কর্ম্মোপাসক ভাবুকের প্রয়োজন, গ্রামের হাট বাজারে পল্লীসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যাকুলতার প্রয়োজন। দুঃখের কথা—আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা রব উঠিয়াছে—"দেশের ব্রাহ্মণ

করিবার সুযোগ কোথায়?" তাঁহারা কর্ম্ম-ক্ষেত্রই খুঁজিয়া পান না! বড়ই অনুতাপের বিষয় এই যে—তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা এবং কতকগুলি হুজুগ সৃষ্টি করাই দেশের কাজ মনে করেন। সমাজব্যাপী দেশভরা এতগুলি অভাব রহিয়াছে। স্থিরভাবে সংযত-ভাবে সেইগুলি পূরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে সকলেরই সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কোন বিঘ্ন বা বাধা পাইবার কারণ নাই।

শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন পল্লীতে বাস করিতে হইবে, হাটে হাটে ভ্রমণ করিতে হইবে, পল্লীবাসীকে দেশবিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকৃষিকর্ম্মের কথা শুনাইতে হইবে, তাহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নানা উপায়ে উন্নত করিতে হইবে। গ্রামের রাস্তায়, ঘাটে প্রত্যেক লোককে সাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নতির নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ গ্রামের ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান হইবেন। গ্রামের পুষ্করিণীগুলি প্রতিবৎসর সংস্কৃত করাইতে হইবে। নদীর গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। যেখানে কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে, সেখানে গিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া কৃষকের কর্ম্মে সাহায্য করিতে হইবে। [illegible]ষ-আবাদের কি কি অসুবিধা আছে, তাহা-[illegible]গের হালের গরু এবং যন্ত্রাদির কিরূপ অভাব, জলসেচনের ব্যবস্থা কিরূপ, শস্যসমূহের বীজ-সংগ্রহ এবং সারের ব্যবস্থা কি প্রকার—এই সমুদায় তথ্য অবগত হইয়া চাষীদের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যা প্রয়োগ করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তি-গণকে খাঁটী কৃষক হইতে হইবে। গ্রামে মহাজনের অত্যাচার আছে কি না; গ্রামের কত জন কৃষক ঋণভারগ্রস্ত, কত জন লোক মহা-জনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হই-য়াছে; গ্রামের সুদের হার কত, কিস্তিখেলাপ সুদ কিরূপ; গ্রামে সওয়া, দেড়ী, বাড়ী প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত; গ্রামের পাইকার আড়ৎদার কিরূপ দাদন দিয়া থাকে, এই সকল অবস্থা বুঝিয়া ধনবিজ্ঞানের উপদেশ গুলি গ্রাম্য সমাজে কাজে লাগাইতে হইবে।

যাঁহারা শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিখিয়া পণ্ডিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য এখন এই সমুদয় তথ্যসংগ্রহে এবং গ্রাম্য জীবনের উন্নতি বিধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সহরে বসিলে বিজ্ঞানপ্রচার শিল্পপ্রচার, ব্যবসায়-প্রচার হইবে না। এখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে স্বয়ং গ্রামে বসিয়া কৃষকের অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পূর্ণ করিতে হইবে—হাতে-কলমে কাজ দেখাইয়া শিল্পীদিগকে উন্নত শিল্প-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে উৎসাহিত করিতে হইবে! গ্রামে যাইয়া প্রাচীন পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রাচীন গীত, ছাড়া বচন, জনপ্রবাদ প্রভৃতি সঙ্কলন করিতে হইবে। পল্লীসমাজের আমোদপ্রমোদ ধর্ম্মকর্ম্ম, মেলাউৎসব প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সরলতা ও সজীবতা প্রদান করিতে হইবে।

যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, "মন তুমি কৃষিকাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা"; যেখানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান," যেখানে মাঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদাস প্রাণে গাহিতেছে "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারিনা,"—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীরতা বুঝিতে হইবে। তাহাদের নিকট সরলতা ভক্তি ও তন্ময়তা শিখিতে হইবে। গম্ভীরার গান, ভাটিয়াল গান, বিষহরির গান, রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরী সম্বন্ধীয় গান ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলির আদর বাড়াইতে হইবে। গ্রামে যখন সকলেই সুপ্ত তখন যে মুদী দোকানে আলোক জ্বালিয়া গুণ গুণ স্বরে আপন মনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পাঠ করিতেছে, তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ঐ পুস্তকগুলি সেখানে কিরূপ মূল্যে পাওয়া যায়, সুলভ সংস্করণ অথবা বিনামূল্যে ঐগুলি বিতরণ করিলে উহাদিগের আদর হয় কি না, কোন্ সংবাদপত্র তাহারা পাঠ করে, উহাদের মধ্যে কোন্গুলি তাহাদের নিকট ভাল বোধ হয়। তাহার পর লোকশিক্ষার জাতীয় প্রণালী বুঝিতে হইবে; কথকতা, যাত্রা এবং কবির গান, রামমঙ্গল গান, চণ্ডীর গান, হরিনাম এবং গৌর নিত্যানন্দ নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতিতে বাঙ্গালার পল্লীসমাজে কেমন আনন্দের ভিতর শিক্ষা প্রচারের বিপুল আয়োজন হইয়াছে—তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রচাররীতি স্থির রাখিয়া ইহাদের বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায় কি না, তাহা ভাবিতে হইবে। গ্রামে কোথায় কোন ভাল কথক, কবি, যাত্রাওয়ালা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সামান্য কুটীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে লোকশিক্ষা প্রচার কার্য্যে যথাসম্ভব নিযুক্ত করিতে হইবে গ্রামের ভিক্ষুক ভিক্ষুনী যাহারা ঘরে ঘরে হরিনাম করিয়া 'ঠাকুরুণ বিষয়' রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া আসিতেছে, তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি পল্লীসমাজের আধ্যাত্মিক বোধকে সজীব রাখিয়া যাহাতে আরও সার্থক হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এইরূপ নানক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসেবকগণকে দেশের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

পল্লীবাসীদিগের অসংখ্য অভাব অভিযোগ, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিবার এবং বুঝিবার জন্য এখন গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানকারীর প্রয়োজন। গ্রামের সমস্ত কৃষক, সমস্ত শিল্পী, সমস্ত শ্রমজীবীর নিকট হইতে তাহাদিগের পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে—পরিবারের মধ্যে কয়জন উপার্জ্জন করে, স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন আছে কি না, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনে পরিবারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি না, যদি কর্জ্জ করিয়া থাকে ঐ কর্জ্জ কত বৎসরের, কর্জ্জের কারণ

কি, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় ব্যয়ের জন্য কি না, যদি পরিবারের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে, উহা কিরূপে প্রয়োজিত হয়, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় কি না। গ্রামের হাটে হাটে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে পল্লীর হাটে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, সে সমস্ত দ্রব্য পল্লীগ্রামেই প্রস্তুত হইতে পারে কি না, গ্রাম হইতে শস্যের রপ্তানি কি পরিমাণে হয়; উহার সঙ্গে পল্লীগ্রামের দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। প্রত্যেক মণ ধান, পাট, গম, বুট সরিষার জন্য কৃষক অথবা পাইকারগণ কত লাভ করে; গ্রামে জমি বন্ধক দিবার জন্য কি প্রণালী অনুসৃত হয়; খায়খালাসী, কটকবালা প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত ইত্যাদি নানা-বিষয়ক অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেখানে জোলা, তাঁতী, ভাস্কর, কাঁসারী তাহাদিগের আপনাপন কুটিরে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাদের উপকরণ সামগ্রী কিরূপ মূল্যে ক্রয় করে; তাহাদিগের প্রস্তুতদ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় হয় কি না; পাইকারেরা তাহাদিগের দ্রব্য সহরে বিক্রয় করিয়া কিরূপে লাভ করে; তাহাদিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সহরের ধনী এবং মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় কিরূপ সাহায্য করিতে পারে। তাহার পর প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডলের নিকট সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, গ্রামে দলাদলি আছে কি না, মোকর্দ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে, গৃহবিবাদ, গ্রাম্যবিবাদ প্রভৃতি মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ঐ কার্য্যে কোনরূপ সহায়তা করা যায় কি না। গ্রামের নৈতিক অবস্থা কিরূপ, গ্রামে কতজন মদ্যপায়ী, তাড়িখানার সংখ্যা এবং আবগারীর আয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, মদ্যপান নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত।

আমাদের ভবিষ্যৎ।

এই উপায়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যখন জনসাধারণের গভীরতর ভাব-বিনিময় হইতে থাকিবে, তখন শিক্ষিত সমাজ অপামর জনসাধারণের সুখ দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি আর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন না। তখন তাঁহারা বুঝিবেন, পল্লী-সমাজই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থল। যুগ যুগান্তকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর যে চিন্তাস্রোত অব্যাহতভাবে বহিয়া আসিতেছে সে স্রোত সহরের আফিস, আদালত, কলকারখানার মধ্যে আবিল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পল্লীসমাজে এখনও তাহা নিরাবিল এবং প্রবল। তখন পল্লীজীবনের শান্তি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দ তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের একমাত্র অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া বোধ হইবে। ইহার ফলে পল্লীজীবনে গৌরব বোধ জন্মিবে, সমগ্র সমাজ ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িবে, দেশের সর্ব্বত্র শীঘ্রই একটা বিপুল আন্দোলন সৃষ্ট হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রকৃত জন-নায়কগণ দেখা দিবেন। অসংখ্য জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য মোচন এবং শিক্ষার

ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাহাদিগের পিতা-স্বরূপ হইবেন।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

জনসাধারণের সমস্ত আশা-ভরসা আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ এই জন-নায়কগণের জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। কতশত বৎসর ধরিয়া যে বেদনা অব্যক্ত ও অস্ফুট ছিল, তাহা এখন প্রকাশের সুযোগপাইবে। এত দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জগতের নিকট যে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করিতেছিল, তাহা এখন সার্থক হইবে। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষিশিল্পবিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানাগার খোলা হইবে এবং সমবেত প্রণালীতে কৃষি এবং শিল্পকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকিবে। লোক-শিক্ষা এবং সমবায়-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন চলিতে থাকিবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভারত-বর্ষের পল্লীবাসীর দারিদ্র মোচন করিবে। ভারতীয় পল্লীবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন তখন নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দলাভ করিতে পারে নাই। এজন্য সাম্য-নীতিমূলক সমাজ-তন্ত্র এবং অতীন্দ্রিয় ভাবাপন্ন সাহিত্য ও চিত্রকলার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সমাজের প্রতিযোগিতা, অনৈক্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কার্ল্ মার্কস্ ও এঞ্জেলস্, রস্কিন এবং মরিশ প্রভৃতি কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর-গণ ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কার এবং পরি-শোধন কার্য্যে বিফল হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পল্লীসেবকগণকে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতবর্ষের পল্লীসেবক বিজ্ঞানসাহায্যে ভারতীয় পল্লীজীবনের দারিদ্র্য দুঃখ মোচন করিয়া এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া দিবেন। এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সামাজিক জীবনে সুখশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে।

এই উপায়ে ভারতবর্ষের পল্লীসেবক নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া বিশ্বজগতকে একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার দিবেন।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।

মিবার কলঙ্ক।

(কাব্য)।

দ্বিতীয় সর্গ।

সুসজ্জিত কক্ষে এক রাজ-অন্তঃপুরে
চিতোরের সুকোমল সুখ শয্যোপরি
সুষুপ্ত মিবার-পতি সংগ্রাম-নন্দন।
থাকি' থাকি' নিদ্রা-ঘোরে হেরি'ছে কতই
বিচিত্র স্বপন ;—'যেন রত্নহার জ্ঞানে,
সুচারু-দর্শন এক তীব্র বিষধরে
পরেছে সাদরে কণ্ঠে। কোথা হ'তে আসি'
হিতৈষী অশীতিপর বর্ষীয়ান্ এক,
করি'ছে নিষেধ কত ; প্রতিষেধে তাঁর
ঠেলিয়ে অবজ্ঞা-ভরে, আপাত দর্শন

লোচন-আনন্দ-কর হেরি ভুজঙ্গের
বিমল বরাঙ্গপ্রভা ; গরল-আগার
শিরজ সুদীপ্ত মণি। পেয়ে অবসর,
করিলা দংশন তীব্র কুটিল-ভুজঙ্গ
বক্ষোপরি। হেনকালে, শুনি' অকস্মাৎ
"মহারাণা", "মহারাণা",—বামা কণ্ঠে মৃদু,
উঠিলা চমকি' জাগি' ; মেলিয়া নয়ন,
হেরিলা বিস্ময়ে, যেন সুশ্বেত-বসনা
দাঁড়া'য়ে শিয়রে এক প্রবীণা মূরতি !
অনির্ণীত শঙ্কাভরে হায়রে, সহসা
উঠিল কাঁপিয়া ঘন হৃদয় রাণার ;
বহিল বিদ্যুৎ প্রতি শিরায় শিরায়,
পড়িয়া চকিতে মনে স্বপনের স্মৃতি ;—
রতন ভুজঙ্গ-হার, হিতৈষী বৃদ্ধের
প্রশান্ত মূরতি খানি, হায় অবশেষে
খলের স্বভাব-সিদ্ধ দারুণ দংশন।
মর্দ্দি' করতল দ্বয়ে জড়তা-আবৃত
নয়ন যুগল, পুনঃ মেলিলা যখন,
শিরোপার শ্বেতাম্বরা সেই মূর্ত্তিখানি
দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ, আলেক্ষ্য প্রতিম
নীরব, নিস্পন্দ, দৃষ্টি বদ্ধ ধরাতলে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ত্বরা বসিলা এবার
শয্যাপরি মহারাণা, সুধিলা বিস্ময়ে ;—
"ধাই মা, কেন এ হেন ঘোর নিশাকালে
এসেছ হেথায় ? বল, কোন্ অভিপ্রায়
সাধিবে বিক্রম তব ? জননী-অধিক
আশৈশব অভাগারে করিছ পালন,
পারি নাই অনুমাত্র ঋণধার তার
শোধিতে এখনো। তোমার ও স্নেহজালে
মায়ের অভাব আমি আছি পাসরিয়া।"

এত বলি', বরষিলা অশ্রুবিন্দু দু'টি,
পড়িলে স্মৃতির পথে জননীর সেই
পবিত্র বদনখানি—বাৎসল্য-আগার।
"বৎস-বিক্রম", বৃদ্ধা উত্তরিলা ধীরে,
স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে তুলি' বিনত বদন,
"আসি নাই নেহারিতে অশ্রু-উছলিত
নয়ন-যুগল তব, জাগায়ে হৃদয়ে
মাতৃ স্মৃতি। নহে তব অশ্রু-বর্ষণের
সময় এখন হায়, বনবীরাধিক্
পালিয়াছি আশৈশব পুত্র-স্নেহে তোমা
হেরিলে অঙ্গেতে তব একটি আঁচড়,
বাজে এ হৃদয়ে তাই শত তীক্ষ্ণ শেল।
কেমনে বাছনি, তবে শত শেলাধিক
আসন্ন পৈশাচ হেন চক্রান্ত-কবলে,
নিরখি' নয়নে আজি নিপতিত তোমা,
রহিব নিশ্চিন্তে স্থির ?" চমকি', বিস্ময়-
স্ফুরিত নয়নে পুনঃ কহিলা রাজন ;—
"একি কথা কহি'ছ ধাইমা ? বিন্দুমাত্র
নারিনু কিছুই এর বুঝিতে চক্রান্ত !
কিসের চক্রান্ত ! কা'র বিরুদ্ধে ! আমার ?
ধাইমা, জ্ঞানতঃ কারু, সাক্ষ্য রুদ্রদেব,
করিনি অহিত কোন এ জীবনে কভু।
কে তবে কিসের লাগি', কোন্ অভিপ্রায়ে,
কোন গূঢ় অভিসন্ধি, কি হেন অভীষ্ট
সাধিতে, বিরুদ্ধে মম করিছে চক্রান্ত ?"
উত্তরিলা বর্ষীয়সী সজল নয়নে ;—
"হায় বৎস, তব সম এ ধরিত্রী যদি
হত পবিত্রতা-মাখা, সারল্য-আকর,
ভুঞ্জিত মানবগণ নরক-নিন্দিত—
থাকিয়ে ধরণী-তলে ত্রিদিব-সুভোগ।

ধরিত 'নন্দন'-শোভা এ সংসার মরু।
কৃতঘ্নতা, কপটতা দুরিত পূরিত
হ'ত না এ বসুন্ধরা দ্বিতীয় নিরয়।
যদ্যপি এ ধরণীর প্রতি ধমনীর
রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তব হেন ধরমের হায়,
প্রবাহিত সুপবিত্র অনাবিল স্রোত,
তা' হ'লে কি কভু আজি, বিদরে হৃদয়,
পুণ্য শ্লোক পিতৃ পিতামহদের তব
অন্নে, যাহাদের পিতৃ পিতামহগণ
হয়েছে প্রতিপালিত ; এবেও যাহারা
নির্ব্বিবাদে, অযাচিত অনুগ্রহে তব,
যোগ্যতার নির্ব্বিশেষে ভুঞ্জি'ছে নিয়ত,
সুউচ্চ শিখরে বসি' রাজ-সম্মানের,
অতুল বৈভব রাশি ; শার্দ্দূল-সুলভ
হেন কৃতঘ্নতা পাপ অভীষ্ট সাধনে
হত অগ্রসর ধর্ম্মে দলি' পদ তলে ?
তা' হ'লে কি কভু বৃদ্ধ অশীতি পরের—
চির-অসম্ভব যাহা এ মার্ত্তণ্ড তলে,—
পিতৃ-স্বতঃ-প্রবৃত্ত কৃপাবশে তব,
মন্ত্রিত্বের উচ্চতম শিখরের পরে,
ঐশ্বর্য্যের সুকোমল কুসুম আসনে
আরূঢ় যে জন এবে, লোলুপ নয়ন
পড়িত বিক্রম, তব সিংহাসনোপরি ?
তা' হ'লে কি কভু তোমা, এ বৃদ্ধ বয়সে
হ'ত নিরখিতে আজি এ পোড়া নয়নে,
শৃঙ্খলিত চক্রান্তের দুর্ভেদ্য নিগড়ে ?"
এত বলি,' নীরবিলা বরষি' প্রবীণা
অশ্রুবিন্দু ঝর্ ঝরে, তিতি মর্ম্মরিত
কক্ষতল। ক্ষণক্ষণে মুছি' নেত্রাসার,
আরম্ভিলা দৃঢ়কণ্ঠে হৃদি-উন্মাদিনী
জীবন্ত বচনে ; যেন প্রলয় কালীন
বরষিলা কাল মেঘ কালাগ্নির ধারা।
"বিক্রম, •
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে হেথা অন্তঃপুর মাঝে
এখনো রয়েছ বদ্ধ রত্ন-কারাগারে ?
জান না অভাগা, তব মস্তক উপরে
কালের কঠোর অসি ঝলসি' নয়ন,
নামিতেছে ধীরে ধীরে অদৃশ্যে তোমার!
এখনো রয়েছ বসি' কুসুম শয্যায় ?
হেরিছ না হতভাগ্য, দুগ্ধ ফেন-নিভ
সুকোমল আস্তরণ অন্তরাল হ'তে,
সুপ্তি ঘোরে অতর্কিত অঙ্গ-বিমর্দ্দিত
গর্জ্জিতেছে কালসর্প ফণা আস্ফালিয়া !"
কালসর্প নামে হৃদে পড়িল সহসা
ভীষণ স্বপ্নের স্মৃতি—ভুজঙ্গের হার—
উঠিলা শিহরি রাণা ! ভয়-বিস্ফারিত
চাহিলা চকিত নেত্রে শয্যাতল পানে।
"কি হেরিছ মুদি নেত্র ? অভেদ্য আঁধারে
দর্শিবে কি ফল অন্ধ, নয়ন নিক্ষেপে ?"
কহিতে লাগিলা সেনী; 'শুন তবে তা'র—
এ গভীর চক্রান্তের রহস্য আমূল।
সুপ্রকাশ্য কালি রাজসভাস্থলে, যেই
বার্দ্ধক্য-পীড়িত তব সচিব প্রধান
কম্মচাঁদে, সসম্মানে দানি' অব্যাহতি
মন্ত্রিত্বের দুর্ব্বিসহ গুরুভার হ'তে,
মহান্ দায়িত্ব-পূর্ণ বুধ-বাঞ্ছা সেই
শুভস্থল-অভিষিক্ত করি অন্যতম
জ্ঞান-বৃদ্ধ, সুবিশ্বাসী, সুদূর-দরশী,
সুযোগ্য মন্ত্র-পুঙ্গবে, বংশ-উপযোগী
দেখায়েছে ঔদার্য্যের, গুণ-গ্রাহিতার

পরিস্ফুট পরিচয়, হায়, আজি সেই
মহত্ত্ব-পাদপে তব, জীবনান্তকারী
ফলিয়াছে বিষফল। মাৎসর্য্য'তাড়নে,
জগ্‌মল, কানজী আছি মিবারের যত
সামন্ত-শার্দ্দূল কুল উপলব্ধি'তাহে
দারুণ পক্ষপাতিত্ব, ঘোর অপমানে,
হয়েছে সঙ্কল্প বদ্ধ দৃঢ়, অসিমুখে
লইতে অচিরে যোগ্য প্রতিশোধ তা'র।
সশস্ত্র কিরাত দল ঘোর বনে পশি,
মৃগ-কুল-অবতংশে বিতংশে যেমতি
ঘেরে চতুর্দ্দিক হ'তে, তেমতি তোমায়
করিছে বেষ্টন সবে ষড়যন্ত্র-পাশে।
কপট-হিতৈষী তব ক্ষুদ্ৰ কর্ম্মচাদ,
পল্লবন-লুক্কায়িত ভুজঙ্গ যেমতি,
করিতেছে সৈনাপত্য শ্বেত-শ্মশ্রু-রাশি
অন্তরাল হ'তে, পাপ সে অভিযানের।

ক্রমশঃ—

শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাগলের কথা।

(সমালোচনা) *

৺দেবেন্দ্র নাথ দাস প্রণীত "পাগলের কথা" বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। কোন কোন সমালোচক এ খানিকে গ্রন্থকারের আত্ম-জীবন কাহিনী বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনার সহিত ইহার সামান্যই সম্বন্ধ আছে। পুস্তক খানিতে তাঁহার স্বভাব, রুচি ও প্রকৃতির পরিপূর্ণ চিত্র আছে বটে; তাঁহার ধর্ম্মমত, সামাজিক মত, শিক্ষা সম্বন্ধীয় মত ইহাতে উজ্জ্বল ভাবে, পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তিনি ইহাতে জীবনের যে সকল ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আত্মজীবন কাহিনী নিতান্ত অল্পই আছে; প্রায় সব কাহিনী রহস্য ছলেই লিখিত। উপন্যাস-সম্রাট বঙ্কিম বাবুর "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত্র" বঙ্গ সমাজের ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, ইহার সহিত দেবেন্দ্র বাবুর সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাঁহার রচনাচাতুর্য্য এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে যাঁহারা তাঁহার সহিত আদৌ পরিচিত নহেন, তাঁহাদের স্বতঃই ভ্রম হইবে যে বাস্তবিকই ইহা গ্রন্থকারের জীবন চরিত।

পুস্তক খানির নাম "পাগলের কথা।" এখানি যদি পাগলের কথা হয়, তবে জ্ঞানীর কথা কাহাকে বলিব, জানি না। যিনি এই পুস্তক পাঠ করিবেন তিনিই গ্রন্থকারের অগাধ স্বদেশ ভক্তি, প্রগাঢ় মাতৃভাষানুরাগ, অতুলনীয় মাতৃভক্তি, তাঁহার সারল্য, অমায়িকতা, স্নেহ, মমতা পরিপ্লুত হৃদয়, তাঁহার সহৃদয়তা বা মহানুভবতার অসংখ্য নিদর্শন পাইয়া মুগ্ধ হইবেন। পুস্তক খানিতে খুব প্রাণ খুলিয়া মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া উহার প্রত্যেক অংশ পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে। কাব্যই বল, উপন্যাসই বল, নাটকই হউক, জীবন চরিত হউক বা প্রবন্ধ পুস্তকই হউক, পুস্তকের ভাব

---

* 'পাগলের কথা" পুস্তক খানি গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখকের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহির না হইলে অন্তরে গিয়া লাগিতে পারে না। ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইলেও পাঠকের মনে তাহা স্থায়ীভাব জন্মাইতে পারে না; ভাষার চটক দুদিন থাকে মাত্র; কিন্তু সে পুস্তকের ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। সে জন্য কত উপন্যাস, কত নাটক, কত কাব্য কত প্রবন্ধ-পুস্তক, কত গল্পের বহি বাঙ্গালা সাহিত্যে উদয়ও বিলয় হইতেছে। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ খানিতে ভাষার প্রবাহ তরতর বেগে বহে নাই, তাহার প্রবল বেগ পাঠককে পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই সত্য; কিন্তু গ্রন্থকারের মনের কথা এত সরল, এত সহজ, এত পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, যে পুস্তকখানি আরম্ভ করিয়া আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া থাকা যায় না। যিনি সারাজীবন ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষার চর্চ্চা করিয়াছেন, জীবনের প্রধান ভাগ যিনি বিলাতে কাটাইয়াছেন, তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি এত অনুরাগ ও মাতৃ-ভাষায় গ্রন্থ লেখা অনেক বিলাত প্রত্যাগত স্বদেশীর অনুকরণের বিষয়। এরূপ মহাজনের লেখাতে স্থানে স্থানে ভাষার ত্রুটি অবশ্যই মার্জ্জনীয়; অথচ তাঁহার বঙ্গ ভাষায় অধিকার দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার পুস্তকের ক্রিয়াপদগুলি অনুকরণীয় না হইলেও পুস্তকের আগাগোড়া তিনি যে খাঁটি বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়া বিদ্যা দেখাইবার জন্য তিনি যে সংস্কৃত কথা ব্যবহার করেন নাই, বিলাতের কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়া আসিয়া, সংস্কৃতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি যে সংস্কৃত কথা ব্যবহারের লোভ সংবরণ করিয়াছেন, সে জন্য শত মুখে তাঁহাকে সাধুবাদ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

"পাগলের কথা" দেবেন্দ্র বাবুর আত্ম-জীবন কাহিনী নহে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম লিখিত ভূমিকা পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার পিতা জীবনে একদিন ও চাকুরী করেন নাই; তিনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, এক সময়ে তাঁহার জজ হইবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। অথচ কোন সমালোচক ২৪৪ ও ২৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ঘটনার উল্লেখ করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "তিনি বুঝি গ্রন্থখানি পড়েন নাই।" উক্ত দুই পৃষ্ঠায় লিখিত প্রধান দুইটি ঘটনাই, উপন্যাসের কথা—গল্প মাত্র। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত পরিচিত সকলেই অবগত আছেন, তিনি কোন কালে অফিসে চাকরী করেন নাই; বিলাতে ও স্বদেশে অধ্যাপকের কার্য্য ও সেক্রেটারি কলেজ স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার উপজীবিকা ছিল।

"পাগলের কথা" হইতে আমরা দেবেন্দ্র বাবুর রুচি ও প্রকৃতির কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"আমি এককালে কোমল ও কঠিন, অমায়িক ও অভিমানী, নিরীহ ও সাহসী ছিলাম; যেমন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতাম, তেমনি দুঃখে গলিয়া যেতাম; যেমন পরের অবশ ছিলাম, তেমনি হিতৈষীও ছিলাম। পরের ভর্ৎসনা বা প্রহার কখনও সহিতে পারিতাম না, কিন্তু কেহ আমার প্রতি স্নেহ বা মমতা দেখাইলে তাহা

চিরকাল আমার হৃদয়ে আঁকা থাকিত। আমার দুর্ভাগ্য যে লোকে তখন আমার এই বিষম স্বভাব বুঝিতে পারিত না।" কেবল দেবেন্দ্র বাবুর দুর্ভাগ্য নহে,সজ্জন মাত্রেরই ইহা দুর্ভাগ্য, এ সংসারে মানুষ স্থূলদর্শী; গুণ গ্রহণের সূক্ষ্ম-দর্শীতা ও বিশাল হৃদয় তাহার নাই; মানুষ দোষ গ্রহণে সদাই সমুৎসুক, তাহাতেই পরমানন্দ বোধ করে। নিন্দা করাই অনেকের প্রকৃতি; আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রকৃতি মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিতের অধিক, ছোট লোক অপেক্ষা বড় লোকের অধিক।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাহ্যিক কঠিনতার মধ্যে তাঁহার হৃদয় যে কত কোমল ছিল, কত সরল ছিল, তাঁহাতে যে প্রেম ছিল—তাহার নমুনা দেখুন :—

"আমার প্রথম ও একমাত্র সুখের স্থান—তোমায় বিদায়। আমার শান্তির ধাম, প্রথম প্রণয়ের আবাস, বিশুদ্ধ আনন্দের ভবন, নির্ম্মল আমোদের আকর, পবিত্র জীবনের আলয়—তোমায় বিদায়। আমার বাল্যখেলা, আমার বন্ধুক্রীড়া, আমার প্রকৃতি সহবাস—সকলকেই বিদায়। * * * প্রথম প্রণয়ের আস্বাদ বাল্য হৃদয়ের মিলন কি সুখকর! আবার বিচ্ছেদ কি কষ্ট কর! এইবার আমরা পৃথক হইয়া চলিলাম।"

সংসারের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য :—

"যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে কম কষ্ট সহিয়াছে, সেই সকলের অপেক্ষা সুখী; যে সকলের চেয়ে কম আহ্লাদ অনুভব করিয়াছে,সেই সকলের অপেক্ষা দুঃখী। আমরা সকলে এক বিষয়ে সমান; আমরা সর্ব্বদা সুখ অপেক্ষা অধিক দুঃখ ভুগিয়া থাকি। এই মর্ত্তভূমিতে দুঃখের অভাবকেই আমরা সুখাবস্থা বলি; আর কষ্টের পরিমাণ অনুসারে আমরা সেই সুখাবস্থার ইতর বিশেষ নির্ণয় করি।"

বর্ত্তমান শিক্ষা বিপ্লবের দিনে, শিক্ষার নামে বালক ও যুবকদিগের বিনাশের দিনে, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত অমূল্য :—

"আমার মতে ছয় সাত বৎসরের বালককে ইংরেজী শিখান অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ। যে জিনিষটার জ্ঞান আমার নিজের ভাষার দ্বারাও পাই নাই, সে জ্ঞান ইংরেজী দ্বারা কি করিয়া পাব? ইহাতে আমরা ভিন্ন কথা শিখি নাই, আসল জিনিষের সম্বন্ধে বেশী জানি না। আবার ইংরেজদের মন আলাদা, বুদ্ধি আলাদা, অতএব এক জিনিষই তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করে। যে জিনিষটা বাঙ্গালায় বুঝিতে এক ঘণ্টা লাগে, সে জিনিষটা ইংরেজিতে শিশুরা প্রথমে আদবে বুঝে কি না সন্দেহ; যদিও বা বুঝে এক ঘণ্টার বদলে তাহাতে প্রায় চার ঘণ্টা লাগে। আমার বক্তব্য এই যে প্রথমে বালকদের বাঙ্গালায় সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, পরে তাহারা একটু বড় হলে, বার তের বৎসরের সময় তাহাদের ইংরেজী আরম্ভ করা উচিত। এইরূপ করিলে বালকেরা ইংরাজী ভাষা শীঘ্র ও কম কষ্টে শিখিবে; আর ষোল সতের বৎসরের সময় সেই এক কাজ হবে, অথচ আমাদের

মতে উহা ভাল করিয়া অল্প আয়াসে হবে।"

শিক্ষকদের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য—"স্কুলের শিক্ষকেরা, ছাত্রেরা কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাহাই ক্রমাগত মনে রাখিয়া শিক্ষকতা করেন। তাঁহারা শিখান্ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষা দেন না। ছাত্রদের কোন বিষয় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হল কি না, সে বিষয় লইয়া বিশেষ কষ্ট স্বীকার করেন না। * * কিসে ছাত্রেরা কেবল পাঠ্য পুস্তকগুলি পরিপাটীরূপে আবৃত্তি করে ও পরীক্ষার সময়ে পরিপাটীরূপে উদ্গার করে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়! বালকদের বুদ্ধি বা যুক্তিশক্তি শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হল কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সংবাদ রাখেন না!"

কোন কোন সমালোচক পুস্তকখানি দেবেন্দ্র বাবুর জীবন চরিত ভাবিয়া এতল্লিখিত পুস্তক চুরির কথা তুলিয়া তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে; পূর্ব্বজন্মে যেরূপ রুচি প্রকৃতি ও স্বভাব ছিল, বর্ত্তমান জন্মে তদনুরূপ হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতাতে বলিয়াছেন :—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।
(১৫শ অঃ ৭ম শ্লোক)

এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ, এই জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
(১৫শ অঃ ৮ম)

যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় ও অন্য দেহে প্রবেশ কালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। অর্থাৎ সেই দেহে প্রবেশ কালে পূর্ব্ব দেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয় এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। (কৃষ্ণানন্দস্বামীর গীতা)

দেবেন্দ্রবাবু সে সংস্কার লইয়া, চিত্তের সে দুর্ব্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; জন্মান্তরের পুণ্যফলে তাঁহার পার্থিব অবস্থাও তদপেক্ষা বহু উচ্চে ছিল। নিজে পুস্তক চুরি করিয়া ভয়ে অন্যের প্রতি দোষারোপ করা, সংসারে দুর্ব্বল চিত্ত নির্ব্বোধের একটী চিত্র; ঘটনাটি নিতান্ত গল্প।

পুস্তকে যমদূত শিক্ষকের চিত্র অতি জীবন্ত, অতি উজ্জ্বল; সে অংশ পড়িতে পড়িতে পাষাণ হৃদয় ও ফাটিয়া যায়। এরূপ পিশাচ প্রকৃতি শিক্ষকের হাতে পড়িয়া কত শত বালক ও যুবকের অমূল্য মানব-জন্ম যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পুত্রাদির জন্য শিক্ষক নিয়োগ যে কি গুরুতর দায়িত্ব, অভিভাবকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। সে দায়িত্বের শেষ– সে পাপ-পুণ্যের পরিনাম ইহলোকেই মীমাংসা হয় না, পরলোক পর্য্যন্ত যায়, জানিবেন।

বাঙ্গলা ভাষায় সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দেবেন্দ্র বাবুর মত সমীচিন।

স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

বড়ই দুঃখের সহিত আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদের সুপরিচিত কবি, নাট্যকার এবং সাহিত্যিক্ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় আর ইহলোকে নাই। তিনি গত শনিবার ১৭ই মে তারিখে মানব লীলা সংবরণ করেন। হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। পঠদ্দশাতেই দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, পরে তাহা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। দ্বিজেন্দ্র বাবু উচ্চ প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং তাঁহার নৈতিক বলও বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সুরবালা দেবী স্বর্গীয় ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়োগ হওয়ার পর তিনি আর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই, এবং তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার বাটীর নাম "সুরধাম" রাখিয়াছিলেন। এই "সুরধামই" evening club নামক সুন্দর এবং সুচারু ক্লাব গৃহটী প্রতিষ্ঠিত। দ্বিজেন বাবুর একমাত্র পুত্র এবং একমাত্র কন্যা—শ্রীমান দিলীপ কুমার রায় বয়স ১৫ বৎসর এবং শ্রীমতী মায়াময়ী দেবী, বয়স ১২ বৎসর। ভগবান ইহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। দ্বিজেন্দ্র বাবু ৫১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যসভায় এক শূন্য সৃজন করিয়া গিয়াছেন—সে শূন্য বোধ হয় আর পূরণ হইবে না। দ্বিজেন বাবুও স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের মত ইংরাজীতে সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে 'Lyrice's of Ind নামক ভাবপূর্ণ কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া বিলাতের সুধী মণ্ডলীরও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখনকার ষ্টেটসম্যান পত্রের সম্পাদক সরলচিত্তে বলিয়াছিলেন যে এই পুস্তকের মলাটের উপর ডি, এল, রায় মুদ্রিত না থাকিত তাহা হইলে ইহা ইংরাজের লেখা বলিয়া ভ্রম হইত সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জনেও দ্বিজেন্দ্র বাবু বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট এম,এ, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইনি কৃষিতত্ব শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন এবং সেখানকার Cirencerter collageএ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়া সরকারী চাকুরী প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দেওয়ান কার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের পুত্র দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার জন্য পরিচিত নহেন। সাহিত্যের সেবার জন্য এবং অকপটতার জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত অমায়িক লোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি বড় স্পষ্টবাদী ছিলেন কিন্তু অহঙ্কারী ছিলেন না। সকলেই তাঁহার সহিত অনায়াসেই দেখা সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। নবীন সাহিত্যিকদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং সাধ্যমত তাহাদের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে আমরা একজন উচ্চ ধরণের দেশ-ভক্ত, এবং দেশ কবিকে হারাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি।

স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ।

মাঙ্গলিক ।

(মহামতি লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মোৎসবে রচিত ।)

সে দিন যখন বিপুল জনতা, বাহি' বহুশ্রমে দীর্ঘপথ
দাঁড়াইল, বহি' স্পন্দিত প্রাণে আজীবন ব্যাপী মনোরথ—
ত্রিংশ কোটীর ভাগ্য-বিধাতা মিলে যদি শুধু একবার,
নর-জনমের সুকৃতিফলে পুণ্য-দরশ বারেক তাঁর—
তখন সূর্য্য প্রভাত-গগণে ময়ুখ-প্রভায় জাগিল ধীরে
প্রবুদ্ধ নব ভারতের, শুভ রশ্মি কিরীট পরায়ে শিরে ।

তখন আলোড়ি' লক্ষ হৃদয় উন্মাদ প্রীতি-কোলাহল
করিল পুলকে মন্ত্রমুগ্ধ অ-সিন্ধু বিরাট হিমাচল ;
বিস্মিত যবে কোটী আঁখিতারা, ছায়াবাজি সম সৈন্যশ্রেণী
কাতারে কাতারে চলিল যখন, রচি' বিচিত্র বর্ণ বেণী,
একতানে যবে বাজিল বক্ষ দ্বিরদ-আসনে হেরিয়া নিধি,
কহিল "ধন্য আজি এ জীবন,এ কি অপূর্ব্ব দেখালে বিধি !

মথিত করি' ভীম কোলাহল উঠিল সহসা হাহাকার,
নৃশংস নর-ঘাতক হায়রে ! হানিল ভীষণ শস্ত্র তার,
পাষাণের প্রায় মানব-সঙ্ঘ হইল অমনি অবিচল,
স্তব্ধ জগৎ শুনিল বার্ত্তা রুদ্ধকণ্ঠ—নেত্রে জল ;
বুদ্বুদ সম, চকিতে মিলাল উদ্‌গ্রীব হৃদে হরষ লেশ,
অযুত স্মৃতির সমাধি দিল্লী আর এক স্মৃতি করিল শেষ !

তার পরে কত কেটেছে দীর্ঘ বিষাদ রজনী, দুঃখ-দিন—
শুষ্ক বক্ষে তীব্র শেলের [illegible] দারুণ আঘাত চিন্,
করিয়াছে কত ভক্ত হৃদয় প্রার্থনা শত জুড়িয়া পাণি,
ভবনে ভবনে প্রেরিয়াছে কত দেবতার পাশে স্বস্তি বাণী
কুণ্ঠিত প্রাণে লুণ্ঠিত শিরঃ করিয়াছে কত নিবেদন
"হউক্ নীরোগ রাজ প্রতিনিধি, রাখ রাখ মুখ ভগবন্ !"

"পুরিবেনা কিগো আমাদের এই অন্তর-ভরা বাসনা প্রভু !
এত হৃদয়ের পূত আবেদন বিফলে শুধুই যাবে কি কভু ?
মাভৈঃ মাভৈঃ হয়নি বিফল ভারতের সেই যুক্ত স্তব
হয়নি ব্যর্থ আমাদের সেই আর্ত্ত কাতর রোদন রব,
হের আজি ওই নীরদ মুক্ত অনিন্দ্য নব-শশধর,
গেছে নিবেদন বিধির চরণে,বিজয়ী না কবে প্রেমের স্বর?

নিঃস্বের তরে বিশ্ব আজিকে খুলিয়া দিয়াছে উদার প্রাণ,
রিক্ত করিয়া ভাণ্ডার আজি, ধনী অকাতরে করিছে দান,
মুছিয়া নয়ন দূর করি দাও আজি ভেদাভেদ, হিংসা দ্বেষ
কর জয়ধ্বনি, যুগে যুগে তার বাজুক ভুবনে অমর রেশ ;
হ'ক্ আয়ুষ্মান সুচির শ্রীমান্, ত্রিংশকোটীর ভাগ্য-বিধি,
মিলায়ে কণ্ঠ, গাহ যশোগান, গৌরবে হ'ক্ ধন্য হৃদি ।

——গিরিজাকুমার——

প্রকৃতির পূজা ।

প্রলয়ের পরিণতি—অনন্ত উদ্দাম অনবচ্ছিন্ন জলরাশি কি এক মোহ-প্রেরণায় অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল । সেই লীলোচ্ছল তরঙ্গায়িত সলিলবক্ষে কোন্ আত্মসম্ভব অদৃশ্যশক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, তাহারই ভ্রূভঙ্গি ইঙ্গিতে এই অনন্তকে মুগ্ধ বিচলিত করিয়া কি এক অপূর্ব্ব সান্তের উৎপত্তি ঘটিল । তাহার উপর বালারুণরাগ জাগরণ ছড়াইয়া দিল, নবস্পৃষ্ট শিশু সমীরণ পুলক স্পর্শ দিয়া গেল, বসন্ত আসিল—তাহার সুরভি স্রক্-চন্দন লইয়া, ইহাকে বরণ করিবার জন্য । মোহাবেশে সৃষ্টি হাসিয়া উঠিল ।

তাহার পর আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য । স্পর্শোন্মাদিনার—জাগরণে মেদিনীর প্রশান্ত,

গম্ভীর বক্ষঃ শ্যামল হইয়া উঠিতেছে। জৈবীশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, উদ্ভিদশিশু নবপ্রাণে, নূতন আবেগ-নীতিতে ধীরে ধীরে মস্তক তুলিতেছে। তাহার পরই এই বিশাল শ্যামল বক্ষোদেশ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সান্ত, অনন্তের কোমল সুখময় নিবিড় আলিঙ্গনে আত্ম সমর্পণ করিল। জগতের নব-জীবন আরম্ভ হইল।

কি এক অদ্ভুত লীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই অদৃশ্য-শক্তি! সৃষ্টি ও লয় ইহারই অপাঙ্গ সঞ্চালনের ক্রীড়াকন্দুকমাত্র, অনন্ত শূন্যে সীমার অস্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে ইহা সিদ্ধহস্ত, জ্যোতির মায়াজালকে এক নিমেষে অন্ধতমসে ডুবাইয়া দেওয়া এবং সান্দ্র অন্ধকাররাশিকে অকস্মাৎ যেন মায়াদণ্ডের স্পর্শেই বিমল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলাই ইহার বিশেষত্ব। কে এ কুহকিনী? একি অপূর্ব্ব হৃদয় ইহার—যেখানে কোমল ও কঠোর অভিন্নভাবে পরস্পরে সম্মিলিত, যেখানে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পরই আলিঙ্গনাবদ্ধ! হৃদয়ের সঞ্চয়-ভাণ্ডারে ঘনীভূত কর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় বিমণ্ডিত—জগৎ সৃষ্টি এই অদ্বিতীয় হৃৎ-ভাণ্ডারেরই একটীমাত্র ক্ষীণ স্পন্দন। বিরাটও ইহার নয়নতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, উত্তেজনাও ইহার ললাট সম্মুখে জমাট বাঁধিয়া যায়। বিশ্ব, অনন্ত মহাবিশ্ব, ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ড সমস্তই এই পরাক্রমশালিনী দেবীর অঙ্গুলি সঞ্চালনে এস্ত—স্ব স্ব কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিবিষ্ট। সৃষ্টির উপাদান অণু, পরমাণু পর্য্যন্ত ইহার গণনার অতীত নহে।

এই অত্যদ্ভুত লীলাশক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য মহাশক্তিকে প্রথম সৃষ্ট মানব হৃদয়ের সমগ্র ভাবরাজির উদ্বোধনের মধ্যে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছিল। সে—ই, কে বলিবে কিসের প্ররোচনায়, "প্রকৃতি" অভিধা দিয়া ইহাকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে তখন যে অনুভূতির প্লাবন আসিয়াছিল, তাহারই অভিব্যক্তি ক্রমে জগৎকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে, আর এই জন্যই মানবও সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে কতকটা পরিচিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানবের অধিকার প্রকৃতই উল্লেখেরও অযোগ্য। সৃষ্টির ক্রমোন্নতিবাদ অনুসারে—মানবই যে মানবকে বিশ্বসৃষ্টির চরমোৎকর্ষ বলিবে, ইহা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। সৃষ্টির ক্রমোন্নত উর্দ্ধমুখ গতিপথে একদা মানবের জন্ম হইয়াছে, আবার কে বলিতে পারে, কোনও কালে মানব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কোন প্রাণীর জন্ম হইবে না! এই বিশ্বসংসারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব যখন দেখিল—সমগ্র সৃষ্ট-পদার্থ একই ধ্রুব, শাশ্বত মহতী নীতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযোজিত, আর যখন এই নীতির মহাবিরাটত্ব কল্পনা করিয়া সে আপনারই ভিতরে তাহার সত্তা অনুভূত করিতে লাগিল, তখনই স্থির হইয়া গেল—তাহার জীবনের লক্ষ্যই হইবে মহাশক্তি প্রকৃতির লীলাচাঞ্চল্য অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করা এবং সম্ভব হইলে তাহারই ইঙ্গিতে, তাহারই উদ্দেশে আপনার ক্ষীণ অস্তিত্ব নিবেদন করিয়া দেওয়া। সেই দিনেই—সৃষ্টির ইতিহাসে মানবভাগ্যের সেই মহাগৌরব

মণ্ডিত দিনেই প্রকৃতির পূজার মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি, পূজার প্রকৃত অধিকারিণী কিনা মানবই এখন আর সে প্রশ্ন লইয়া তর্ক করিতে চাহেনা, এখন তাহার প্রধান কর্ত্তব্য প্রকৃতি পূজার যথার্থ উপকরণ-সন্ধান।

প্রকৃতির পূজা জড়োপাসনা নহে, অন্ততঃ জড়কে জড় জানিয়াও তাহারই পূজা করার সহিত এই প্রকৃতি-পূজার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং nature worship বলিলে যদি জড়োপাসনা বুঝায়, তাহাহইলে nature worship দ্বারা যে প্রকৃতির পূজা বুঝাইবে না, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। আর্য্য আদিগ্রন্থ বেদে—ব্রহ্মে আধিদৈবত্বের আরোপ করা হইয়াছে। সেখানে তথাপি ব্রহ্মের স্বরূপ কল্পনা করা একান্ত দুরূহ; কিন্তু আমার বোধ হয় সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকৃতিতে আধিদৈবত্বের আরোপ করিলে প্রকৃতির স্বরূপ কল্পনায় বিন্দুমাত্রও আয়াস স্বীকারের আবশ্যক হয় না। তাহা গরীয়ান্ ভাস্বর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই কল্পনার সম্মুখে ঘনীভূত হইয়া উঠে। তাহার পর অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু সমক্ষে ব্রহ্মের আধিদৈবত্ব ও প্রকৃতির আধিদৈবত্ব একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অনন্তর, এই বিশ্ব-সৃষ্টির মেরুদণ্ড—প্রকৃতিই যে ব্রহ্মের গুণ-কল্পিত মূর্ত্তি নহে, তাহাও অসঙ্কোচে বলিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই করেন নাই। অধিকন্তু বেদে ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব লইয়া যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ কোন তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

আলোচ্য প্রকৃতিকে কোন প্রকারের একটা বিশেষণে আবদ্ধ করিলে ইহাকে অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইবে। যাহা স্বয়ং-বিরাট্ তাহা নিশ্চয়ই স্বয়ং-শাশ্বত, সুতরাং ইচ্ছাক্রমে তাহাতে কোন প্রকারের আঘাত দেওয়াই সমীচীন নহে। "প্রকৃতির" উপযুক্ত বিশেষণ আজিও শব্দ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং "বিশ্ব-প্রকৃতি" বলিলেও ইহার যথার্থ মূর্ত্তি কল্পনা করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এমনকি ইহাকে স্বরূপ কল্পনার ব্যাঘাতকও বলা যাইতে পারে। একমাত্র 'অনন্ত প্রকৃতি" বলিলেই অবস্থিত শব্দ-ভাণ্ডারের সহায়তায়ই কতকটা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় বটে কিন্তু তাহাতে পরিস্ফুটতার পরিবর্ত্তে বরং কতকটা প্রহেলিকা যেন উদ্দেশ্যের উপর আবরণ টানিয়া দেয়। 'বিহঙ্গমকে' 'দ্বিপক্ষ বিহঙ্গম' বলিলে এই প্রকারেরই একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়। তাহার পর অনন্ত উচ্ছ্বাসময় ভাবতরঙ্গ যেখানে নিত্য প্রবহমান সেখানে অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে অনুভূতিই সর্ব্বস্ব উঠিয়া উঠে। ভাষা ভাবের নিকট, অনুভূতির নিকট চিরকালই খর্ব্ব। এই নিমিত্তই ভাষা কখনও ভাবকে আপনার আয়ত্তের ভিতর লইয়া আসিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং প্রকৃতির সহিত যে ভাব-মন্দাকিনী অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত তাহার কণামাত্রও প্রকাশ করিবার শক্তি ভাষার হইতেই পারে না। আবার অন্যদিক হইতে দেখিলে যাহাকে হৃদয় একান্ত আগ্রহে, অসীম আবেগে আলিঙ্গন করিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে সে যথার্থই একটা আঘাত অনু-

ভব করে। সুতরাং এই আঘাতের বেদনা অনুভব করিয়াই হৃদয়ের চিরপ্রিয় গুপ্তকে প্রকাশ করা ভীতিজনক হইয়া পড়ে। বোধ হয়—এই কারণেই প্রকৃতির স্মৃতি কেবল অনুভূতিরই সামগ্রী হইয়া আছে, অভিব্যক্তির আকর্ষণ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে অনুভূতি বলিয়া যে ক্ষীণা, কষ্টকল্পিতা অবকাশরঞ্জিনী অনুভূতি একথা যদি কেহ মনে করেন, তাহা হইল প্রকৃতই তাহা অবিচারজনক হইবে। এ অনুভূতি সঙ্কীর্ণা নহে—বর্ষার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগাকুল বক্ষঃ, আকাশচুম্বি মহাসমুদ্রের ন্যায়ই অনন্তের ভাবপূর্ণা, কষ্টকল্পিতা নহে—তত্ত্ব পিপাসুর সম্মুখে সাকারা, অবকাশ-রঞ্জিনী নহে—জীবনসঙ্গিনী। ইহার ধারণার যোগ্যা-যোগ্য বিচার নাই, পাত্রাপাত্র ভেদ নাই, উচ্চ নীচ পার্থক্য নাই। প্রতিমুহূর্ত্তের প্রতিপলকে বিশ্বের অভ্যন্তরে আত্মগোপনকারিনী যে মহিমময়ীর সঙ্গে মানবের পরিচয় ঘটিতেছে,বিশ্বের প্রতি পরমাণু হইতেও যে মহাদেবী জীমূতমন্দ্রে বলিতেছেন—"ইয়মহংভোঃ" বৃক্ষপত্রের 'মর্ মর্' ধ্বনি, স্রোতস্বিনীর 'কুলু কুলু,' বায়ু প্রবাহের 'সর্ সর্' আত্মোদ্দেশেই যাঁহার আত্মলীলা প্রকাশ করিতেছে, দিবা ও রাত্রির ন্যায় এমন পরিস্ফুট অংশ দুইটী যে মহীয়সীর আদেশে ক্রমাবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহার সত্বা দিবা ও রাত্রিরই মত পরিস্ফুট—ভাস্বর—সত্য।

মানব, প্রকৃতির সত্তা বিষয়ে কৃত্রিম ঔদাসীন্যও কোন কালে প্রকাশ করে নাই, অতীত যুগের ইতিহাস অলন্ত অক্ষরে তাহার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৌরাণিক যুগে 'প্রকৃতি পূজাকে, অপেক্ষাকৃত সহজায়ত্ব করিবার উদ্দেশ্যেই, 'শক্তি পূজায়' রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অসীমকে ভক্ত, বড় আনন্দেই সীমার বন্ধন পরাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতিও শক্তির অভিন্নতা বুঝাইবার পথে পুরাণ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রাখে নাই। সেই সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণ সলিলে মহাশক্তির আবির্ভাব, সেই তাঁহার সৃষ্টির অভিপ্রায়, সেই সত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণত্রয়ের মূর্ত্তিগ্রহণ, সেই—এক একটী গুণের সহিত আত্মসংযোগ, সেই কর্ম্মে শক্তি সঞ্চার! এগুলি পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃতিই যে শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, যে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এ কল্পনা বড়ই মধুর—বড়ই প্রাণস্পর্শী। "বিরাট্ কি বুঝিতে চাহি না, বুঝিবার আবশ্যকতাও নাই, প্রকৃতি কি—কল্পনা করিতে আমার সামর্থ্য নাই, প্রকৃতির কর্ম্ম—তাহারই প্রদত্ত দৈব ও পুরুষকার, আমার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ করে না। কেবল—হে মহিমময়ী মহাশক্তি, এইমাত্র অবগত আছি এবং অনায়াসে বুঝিতেও পারি যে তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, আমার অস্তিত্ব তোমাতেই পর্য্যবসিত। বিশ্বসংসারের ক্ষুদ্র বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কীট আমি, কিন্তু আমাকে লইয়াই তোমার সত্তা, তাহা অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারি। আমার স্থিতি, আমার স্ফূর্ত্তি তোমারই প্রতিমুহূর্ত্তের লীলাতরঙ্গ মাত্র। এই নিমিত্তই—তোমার এই সত্তা কতকটা কল্পনা করিতে পারি বলিয়াই, গ্রহণ কর হে মহাদেবি আমার [illegible] তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। এখন আমি

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব," এ কথা যে মহাশক্তির উদ্দেশে উচ্চারণ করিতে পারে সে আত্মবঞ্চনা করিতে সচেষ্ট হইলেও জগৎ স্পষ্টই বুঝিবে তাহার লক্ষ্য কি। সে প্রকৃতি ও শক্তিকে অভিন্ন জ্ঞান করে কি না! শক্তিপূজার আবরণে প্রকৃতি পূজার সেই মহাবিরাটত্ব সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত রহিয়াছে অথচ তাহা বিন্দুমাত্রও অপরিস্ফুট নহে। অনন্ত সান্তের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া আপনার অনন্তত্বেরই পরিচয় অসঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছে মাত্র! এ এক অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, অতীব অদ্ভুত কল্পনা। এই কল্পনার ভিতর দিয়া বিস্মিত অথচ ভক্তিনতচিত্ত জগৎ স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রকৃতির উদ্দেশে পূজার অর্ঘ্য—পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে, মানব প্রকৃতির উদ্দেশে আপনাকেই সমর্পণ করিয়া দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে—আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে—ধন্য হইয়াছে।

প্রকৃতিকে শক্তিরূপে কল্পনা করিবার পর তাহারই পৃথক পৃথক গুণের শক্তি কল্পনা করিয়া নানা দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আবার দেখা যায়, সৃষ্টির মূলেই যেমন মহাশক্তির আবির্ভাব নির্ণয় করা হইয়াছে, সেইরূপ কোন শক্তিমানের কল্পনা তখন সম্ভব হয় নাই। তাহার পর এই মহাশক্তি হইতেই গুণত্রয়ের উদ্ভব ঘটিয়াছে—ইহাই ত পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব। সুতরাং প্রকৃতিরই সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত লীলার মূর্ত্তিকে বিষ্ণু, রজোগুণাধিষ্ঠিত লীলার মূর্ত্তিকে ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধিষ্ঠিত লীলার মূর্ত্তিকে মহেশ্বর আখ্যা দিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা বুঝা কঠিন নহে। এদিক হইতেও আমরা দেখিতে পাইব যে যদি পৌরাণিক দেবীগণের অস্তিত্ব মহাশক্তি প্রকৃতির গুণশক্তির কল্পনা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে—ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দেবেরও অস্তিত্ব যে তাহারই গুণকল্পনা হইতে সংঘটিত হইয়াছে—ইহাও অভ্রান্ত সত্য। সুতরাং সমস্তেরই মূল এক এবং তাহাই প্রকৃতি। অতএব সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে এ পর্য্যন্ত মানব পূজার উদ্দেশ্যে যখনই সামান্য মাত্র কিছুও উৎসর্গ করিয়াছে, তখনই তাহা যে গরীয়সী প্রকৃতিরই চরণকমলে উৎসর্গীকৃত হইয়া গিয়াছে —তাহা নিশ্চিত।

ইহার পর মানব এক অপূর্ব্ব উদ্ভাবনকৌশলের পরিচয় দিয়াছে। এই উদ্ভাবনকৌশল প্রকৃতিকে শক্তিদায়িনীরূপে কল্পনা করারই পরিণাম। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি-সঞ্চার হইতেই প্রকৃতি এই মূর্ত্তির সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানব জীবনের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য সৃষ্টিতে নারীর অস্তিত্ব, আবার নারী যখন মানবের নিমিত্ত সম্পূর্ণতা লইয়াই আসিয়াছে, তখন তাহাকে সম্মুখের উন্নতির মহাবিস্তৃত অনন্তপথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই নারীর কর্ত্তব্য। নারীর এই সম্পূর্ণতা প্রদানের শক্তি হইতে স্পষ্টই বোধ হয় মানব-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চারের নিমিত্তই তাহার সৃষ্টি। সেই জন্যই নারী, শক্তির অংশ অথবা প্রকৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানব নারীকে প্রকৃতি বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে বলিয়াই ধর্ম্মজীবনে নারীর আবশ্যকতা পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায় এবং গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র ভিত্তি—নারী।

মানব চিরকালই প্রকৃতির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ। সেই মোহের ফলে প্রকৃতিরই অংশরূপে গৃহীত নারীকে সে প্রকৃতিরই আংশিক প্রাপ্য পূজার উপকরণ উৎসর্গ করিয়া থাকে, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। সমাজের দিক দিয়া দেখিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে নারী কেবল পুরুষের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া অবস্থিত নহে, তাহারও স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে। সুতরাং নারীর নিকট হইতে পুরুষ যে কৃতজ্ঞতার দাবী যথার্থই করিতে পারে তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং পুরুষের মাতৃজাতির নিকট তাহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য। এই কারণে নারী জাতি পুরুষের নিকট হইতে প্রভূত সম্মান প্রাপ্তির যোগ্যা। আর যথার্থই কি নারী প্রাধান্য পাইয়া আসিতেছে না? তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মানব নারীর ভিতর দিয়া তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেয় প্রকৃতিরই অভিমুখে, কারণ নারীর ভিতরেই প্রকৃতির কল্পিত গুণাবলীর অবস্থিতি অনুভব করা যায়। প্রকৃতি আখ্যা দিবার সময় মানব নারীকে সঙ্কীর্ণভাবে দর্শন করে না।

যখন যখন পুরুষ হৃদয়ে এই ভাবের আধিক্য ঘটিয়াছে, তখনই জগতের ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য এক একটী ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছে। এই ভাবাধিক্যের ফলেই এককালে 'নারীপূজা' ও 'নারীপূজকের' উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রকৃতির বিশালত্বকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহারা অপরাধী হইয়া ছিল বটে কিন্তু তজ্জন্য তাহারা ক্ষমার অযোগ্য হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তান্ত্রিক যুগে আর এক প্রকার প্রকৃতির সহিত আমাদিগের পরিচয় ঘটে। ইহা সহজ-সাধনের প্রকৃতি। এখানেও প্রকৃতির সহিত সাধনের সম্বন্ধ; ইহার মূলে নিশ্চয়ই সেই মহা-শক্তি প্রকৃতির অবস্থিতি। সহজিয়ার প্রকৃতি লইয়া বহু সমালোচনা এ পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইয়াছে কিন্তু যতদিন না কোন সহজিয়াই ইহার প্রকাশ ভার গ্রহণ করিবে, ততদিন এ সম্বন্ধে কোন প্রকারের মীমাংসায় উপনীত হওয়া সহজ নহে এবং বোধ হয় সঙ্গতও নহে। এ সাধনার প্রক্রিয়া যাহাই হউক না কেন, যখন তাহা সাধনার অঙ্গ, তখন পরিহাসের সামগ্রী আদৌ নহে। স্থূলতঃ এ সাধনা যাহাই হউক না কেন, সমস্ত সাধনার উদ্দিষ্ট অর্ঘ্য, অঞ্জলি যখন সৃষ্টির মূলীভূত মহাশক্তি প্রকৃতিতেই লীন হইয়া যায়, তখন ইহাকে সেই মহাশক্তির সাধনা রূপেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

পরিশেষে প্রকৃতির আকার কল্পনা সম্বন্ধে দুই একটী কথা মাত্র বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যথার্থতঃ প্রকৃতি অচিন্ত্য-অব্যক্ত। তবে বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র শক্তি বলিয়া ইহার গুণ কল্পনা করা অসম্ভব হয় না, আর এই গুণরাজির সমষ্টি মানবের হৃদয়ে একটা মূর্ত্তি-ছায়া পাতিত করিতেও পারে; এবং প্রকৃতিকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে আবার আকার প্রদান করিয়াই মনুষ্য এতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির পূজা করিয়া আসিতেছে। তথাপি তাহার স্বরূপ অসীম বলিয়াই অনন্ত শক্তিময়ীর উদ্দেশেই তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বলিতে হইবে— "তুমি রূপ বিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ

কল্পনা করিয়াছি, তুমি অনন্ত সৃষ্টির একমাত্র শক্তি ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবাদি দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তুমি সর্ব্বব্যাপিনী কিন্তু আমি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করিয়াছি, অতএব হে মহাদেবি! তুমি আমার এই বিফলজ দোষত্রয় মার্জ্জনা কর।”

যাহার মাহাত্ম্যে বিশ্ব বিমোহিত—বিস্ময়ে নির্ব্বাক, সৃষ্টি স্বতঃই সুশৃঙ্খল, যাহার সত্তা বেদেও অসঙ্কোচে নিরূপিত হয় নাই, পুরাণ যাহাকে স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য নানা আকার প্রদান করিয়াছে, যাহার স্বরূপ লইয়াই জগতে এত ধর্ম্মমতের অস্তিত্ব, এই ক্ষুদ্র লেখক কি বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করিবে—সে ভাষা ও সে জ্ঞান কোথা হইতে পাইবে? নিজের পক্ষ হইতে সে কেবল এইমাত্র বলিতে পারে—

“কর দেবি এ আশীষ, মনানন্দে অহর্নিশ,
এক্ষুদ্র চিরবাঞ্ছিত তোমারি, তোমারি,
পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারী।”

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ।

বৈশালিনী।

বৈশালিনী বৈদিশাধিপতি রাজা বিশালের প্রাণাধিকা দুহিতা এবং প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ করন্ধমের প্রিয়তম পুত্র মহাবীর মহাত্মা অবীক্ষিতের পতিব্রতা বণিতা।

সতী বৈশালিনীর বিবাহ এক হর্ষ-বিষাদ ও বীরত্ব-বিস্ময় পূর্ণ অপূর্ব্ব মধুর ঘটনা। কুমারী বৈশালিনী রূপসী ও বিদুষী এবং চরিত্র মহিমায় ও নারীজনসুলভ বহুবিধ গুণ গরিমায় সর্ব্বত্র গরীয়সী। সদ্য বিকশিত কুসুমটির ন্যায় তরুণী রাজনন্দিনী আপনার রূপ মাধুরীতে পিতৃভবন উজ্জ্বল করিতেছেন। প্রাণাধিকা কন্যাকে পরিণয় যোগ্য বয়সে উত্তীর্ণ প্রায় দেখিয়া অপত্যবৎসল জনক-জননী কন্যার বিবাহের জন্য যত্নবান হইলেন।

যথা সময়ে রাজকুমারীর বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভার অনুষ্ঠান হইল। দিকদিগন্তর হইতে কত রাজা ও রাজকুমারগণ সেই স্বয়ংবর-সভায় উপনীত হইলেন। উৎসবের বিরাট কোলাহলে রাজপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল। সমাগত রাজা ও রাজকুমারগণ রাজকন্যার বর-মাল্য লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুমূল্য মণি-মাণিক্য খচিত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা রাজকুমারী বৈশালিনী আপনার অপ্সরা বিনিন্দিত অনন্ত রূপের ডালি লইয়া বর-মাল্য করে স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইলেন। তরুণী রাজনন্দিনীর রূপ-যৌবন মাধুরী দর্শনে মুহূর্ত্তে সমাগত রাজন্যগণ মুগ্ধ হইলেন। পাণি-প্রার্থী রাজা ও রাজকুমারগণ কাহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়, তৎপ্রতীক্ষায় ভর্জ্জিত মৎস্যের প্রতি লুব্ধ মার্জ্জারের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের ন্যায় কুমারী বৈশালিনীর প্রতি যুগপৎ লালসা ব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এমত সময় মহাপ্রতাপ মহারাজ করন্ধম-পুত্র মহাবীর অবীক্ষিত—বাজ পক্ষীর মৎস্য মাংস অপহরণের ন্যায়—সেই রাজন্য পরি-

পুরিত স্বয়ংবর-সভা হইতে সদর্পে সবলে রাজকুমারীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পাণি-প্রার্থী সমবেত রাজা ও রাজকুমারগণ বীরবর অবীক্ষিতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু মহাবীর মহাতেজস্বী অবীক্ষিতের সহিত রণ নৈপুণ্যে সকলেই পরাজিত হইলেন। পরাজিত নৃপতিগণ লজ্জা-ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেলেন। অনন্তর তাঁহারা পবিত্র বীর-ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সকলে একযোগে অবীক্ষিতকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বন্দী করিলেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে সপ্তরথী পরিবেষ্টিত মহাবীর অভিমন্যুর ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে অসংখ্য রাজন্যগণের আক্রমণে মহাবীর অবীক্ষিতের পরাজয় হইল। বিবাহের শুভ উৎসব পৈশাচিক ব্যসনে পরিণত হইল।

অবিবেকী রাজা বিশাল মহাবলপরাক্রান্ত, পরাজিত সিংহশাবককে কারারুদ্ধ করিয়া ভীরু শৃগালদলের উপাসনায় আপনার ক্ষত্রিয়ত্ব ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিলেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়শীল নৃপতিগণকে লইয়া পুনঃ স্বয়ংবর সভার অনুষ্ঠান হইল। ভীরু মেষপাল সিংহিনীর পাণি প্রত্যাশায় উপবিষ্ট হইল। যথা সময়ে রাজ-পুরোহিত রাজকন্যাকে লইয়া পুনরায় স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজকুমারী বৈশালিনী সমাগত রাজন্যগণের কাহারও গলে বরমালা অর্পণ না করিয়া বন্দীবীর অবীক্ষিতের প্রতীক্ষায় স্থির সৌদামিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহামান্য পিতার আদেশ বা পূজনীয় পুরোহিতের অনুরোধ উপদেশে কিছুতেই রাজবালা সভাস্থ নৃপতিবৃন্দের কাহারও গলে পবিত্র বর-মাল্য অর্পণ করিতে সম্মতা হইলেন না।

রাজকুমার অবীক্ষিতের দেবোপম সুনির্ম্মল চরিত্র প্রভাব, কন্দর্প বিনিন্দিত রূপ যৌবন মাধুরী, অপরিসীম জ্ঞান গৌরব ও রাজকীয় অতুল বিষয় বৈভব যারপরনাই রমণী জনস্পৃহ-নীয় হইলেও রাজনন্দিনী বৈশালিনী রূপ-বৈভব-ভূষাতুরা সাধারণ মহিলাদের ন্যায় শুধু সে সকল গুণেই অবীক্ষিতের প্রেমে মুগ্ধ হন্ নাই। তিনি অসাধারণ বীর্য্যশালিনী ক্ষত্রিয় রাজনন্দিনী। ক্ষত্রিয় কুমারী শুধু রূপ বা ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কাহারও গলে পবিত্র বরমাল্য অর্পণ করেন না। তাঁহারা বীর্য্যবতী বীর কন্যা; প্রকৃত বীরই তাঁহাদের হৃদয়-দেবতা। তাই বীরবালা বৈশালিনী মহাবীর অবীক্ষিতকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনাকে আপনি পরম ভাগ্যবতী ও গৌরবিনী মনে করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, অবীক্ষিত অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্ববিজয়ী মহাবীর। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় পরাজয় দুই তুল্য। ধর্ম্ম-যুদ্ধে পরাজিত রাজন্যবর্গ অধর্ম্ম-যুদ্ধে বিজয়ী হইলেও তাঁহারা চির-পরাজিত ও ক্ষত্রিয়-কুলকলঙ্ক ঘৃণিত কাপুরুষ। আমি ক্ষত্রিয় কন্যা হইয়া কেমন করিয়া সেই অধর্ম্ম যুদ্ধের অনুষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গারদের পূজা করিব? সিংহিনী হইয়া শৃগালের করে আত্মসমর্পণ করিব?—না—না, তাহা কখনই পারিব না। বার বার অবীক্ষিত বন্দী হউন, আর অধর্ম্ম যুদ্ধে পরাজিতই হউন, ধর্ম্ম-যুদ্ধে তিনিই প্রকৃত জয়ী—তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয় বীর। আমি মনে

মনে তাঁহারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার স্বামী। আমি তাঁহারই পদে আজীবন প্রীতিভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে কৃতার্থ হইব।”

স্বয়ংবর সভায় কন্যার এরূপ বিসদৃশ বিপরীত ভাব দর্শনে মহারাজ বিশাল যারপর-নাই দুঃখিত হইলেন। অনন্তর বিশাল-রাজ আর একদিন পুনরায় স্বয়ংবর সভার অনুষ্ঠানের আশ্বাসে আশ্বাসিত করিয়া সভায় নৃপতিবৃন্দকে মধুর বচনে বিদায় করাই তাঁহার সমীচীন বোধ হইল। পাণিপ্রার্থী রাজন্যগণ বিষাদ-ম্লান মুখে স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

অধর্ম্ম যুদ্ধে পুত্রের কারারুদ্ধ হইবার সংবাদ যথাকালে পিতার নিকট পঁহুছিল। অবীক্ষিত জননী বীরাঙ্গনা বীরার উদ্দীপক বাক্যে উত্তেজিত হইয়া মহারাজ করন্ধম পুত্রের উদ্ধারার্থ বিশাল রাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সমাগত রাজন্যগণ ও রাজা বিশাল যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য্য মনে করিয়া মহারাজ করন্ধম সমীপে উপনীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক কুমার অবীক্ষিতের করে কন্যা সম্প্র-দানের সম্মতি জানাইলেন। অচিরে অবীক্ষিতের কারামোচন হইল। কিন্তু তিনি বিশালের অনুগ্রহদত্ত দান বলিয়া বৈশালিনীকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রকৃত বীর কখনও পরানুগ্রহপ্রার্থী হন না।

বৈশালিনীর পাণিগ্রহণে অবীক্ষিতের উপেক্ষা দর্শনে পিতা কন্যাকে অন্য কোনও রাজা বা রাজপুত্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন অনূঢ়া বৈশালিনী অবীক্ষিতকে বলিলেন,—‘বীরবর! আপনি অধর্ম্ম যুদ্ধে বন্দী হইলেও ধর্ম্ম যুদ্ধে বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছেন; অতএব আমাকে আমার পিতার অনুগ্রহদত্ত মনে না করিয়া আপনার বাহুবল লব্ধ বীর-পত্নী জ্ঞানে আপনি অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারেন। বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। আপনি বাহুবলেই প্রথম যুদ্ধে আমার পিতা ও সমাগত নৃপতি সমাজকে পরাজিত করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছেন; তবে এখন গ্রহণ না করিবেন কেন? কোন্ বীর পুরুষ বিজয় লক্ষ্মীর সহিত আপনার গৃহলক্ষ্মী গ্রহণে নিজকে নিজে অবজ্ঞাত মনে করেন?”

অতঃপর তিনি পিতাকে বলিলেন,—“পিতঃ আমি ক্ষীণবুদ্ধি অবলা; আপনাকে অধিক আর কি বলিব? আপনি আমার জন্য মহানু-ভব করন্ধমকে একবার অনুরোধ করুন, তিনি অবশ্যই আপনার এ ন্যায় সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিবেন। আমি শুধুই ইহার রূপে মুগ্ধ হই নাই, ইহার অপরিসীম বল-বিক্রমই আমার মন হরণ করিয়াছে, ইনিই আমার স্বামী—আমি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারিব না।”

পিতা পুত্রকে তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্তা বৈশালিনীর পাণিগ্রহণ জন্য অনুরোধ করি-লেন। কিন্তু বীরবর অবীক্ষিত পুনরায় সেরূপ অনুরোধ না করার জন্য বিনয় নম্র বচনে পিতার চরণে প্রার্থনা করিলেন। বৈশালিনীর প্রার্থনা, বিশাল রাজের কাতর অনুরোধ, বা পিতার আজ্ঞা কিছুতেই তিনি রাজকন্যা

বৈশালিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পুত্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে পিতা দ্বিতীয়বার আর পুত্রকে অনুরোধ করা সমীচীন বোধ করিলেন না। রাজা করন্ধম পুত্র অবীক্ষিতসহ স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। পিতামাতার শত অনুরোধে, পুরোহিতের উপদেশ, এবং আত্মীয় স্বজন ও প্রাণসমা সখীগণের সনির্ব্বন্ধ আব্দার অনুরোধ কিছুতেই বৈশালিনী অন্যকে পতিত্বে বরণ করিলেন না। তিনি মনে মনে অবীক্ষিতকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন. এখন তাঁহারই পদে উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দানে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এবং তপস্যা প্রভাবে এজন্মেই তাঁহাকে স্বামীরূপে লাভ করিবার মানসে নিবিড় বনে ধ্যানস্থা তাপসীর ন্যায় আজীবন তাঁহারই মধুর মূর্ত্তির ধ্যানে সময়পাত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর নিয়ত ঐশ্বর্য্যের সুখময় ক্রোড়ে লালিতাপালিতা, রাজভোগ প্রতিপালিতা, অনন্ত বিলাস সেবিতা, রাজদুহিতা বৈশালিনী মণি-মুক্তা খচিত মহামূল্য বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া তাপসীর দীনবেশে বন্য কুটীর নিবাসে বনজ কটু-কষায় ফল-মূলাদি ভক্ষণে এবং বহুক্লেশে আনীত স্বহস্ত সংগৃহীত বন্য পঙ্কিল সরোবরের জল পানে একরূপ অর্দ্ধ উপবাসে—শিবপ্রেম-মুগ্ধা উমার ন্যায় কঠোর সাধনায় নিরতা হইলেন।

অবীক্ষিত জননী মহারাণী বীরার "কিমিচ্ছিক" ব্রত! এ ব্রতে কল্পতরু হইয়া প্রার্থীর প্রার্থনা—যাচকের বাসনা পূর্ণ করিতে হয়। রাণী ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ, কাঙাল, দীনভিখারী যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, মুক্ত হস্তে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতেছেন। এ মহাব্রত সাধনায় রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বীরপুত্রের শারীরিক বলবীর্য্য রাণীর সহায়তায় জন্য নিয়ত প্রস্তুত। রাণী ব্রতারম্ভের প্রারম্ভে পুত্রের নিকট সহায়তা চাহিলে, বীরপুত্র অবীক্ষিত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"মা! আমি বিষয়-সম্পদ বিহীন, কেন না ঐশ্বর্য্য রাজার; আমার এ শরীরের দ্বারা যতদূর হইতে পারে, আমি আপনার ব্রত সম্পাদনার্থ আপনার আদেশে অবশ্যই তাহা করিব।"

এদিকে মহারাজ করন্ধম রাজসভায়—রাজসিংহাসনে সমাসীন। অমাত্যবর্গ ও প্রকৃতিপুঞ্জ রাজপুত্রকে শীঘ্র পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের রাজবংশ রক্ষার জন্য রাজাকে দৃঢ়রূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অবীক্ষিত চিরকুমার থাকিবার কল্পনায় দৃঢ় সংবদ্ধ। সুতরাং অবীক্ষিতের পর রাজসিংহাসন শূন্য—রাজবংশ নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে, সচিব ও প্রজাবৃন্দের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে রাজা বিষাদ-ক্লিষ্ট ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

এদিকে এই দৃশ্য, অপরদিকে ব্রতধারিণী মহারাণী কল্পতরু হইয়া দান কার্য্যে নিযুক্তা, রাজকুমার অবীক্ষিত সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—"আমার মাতা 'কিমিচ্ছিক' ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমার এ শরীর দ্বারা কাহারও কোনরূপ উপকার সম্ভাবনা থাকিলে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

রাজকুমারের এ উচ্চ-নিনাদ রাজসভার

রাজার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া ভিখারীর দীনবেশে পুত্রের নিকট উপনীত হইয়া গদগদ ভাবে বলিলেন,—"বৎস! আজ আমি একজন ভিখারী, তোমার মাতার ব্রত উপলক্ষে আমি দান গ্রহণ জন্য উপনীত হইয়াছি; আমাকে অভিলষিত বস্তু দান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও তোমার মাতার ব্রত রক্ষা কর।

রাজকুমার অবীক্ষিত বলিলেন,—"আজ্ঞা করুন, মানুষের অসাধ্য না হইলে, অবশ্য আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব।"

রাজা বলিলেন,—"আমি পৌত্র মুখ দর্শনে অভিলাষী; তুমি দার পরিগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।"

অবীক্ষিত মাতার ব্রতরক্ষার্থ পিতার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সহসা পতি প্রার্থিনী সতী বৈশালিনীর করুণ প্রার্থনার বিষাদ-মধুর পবিত্র স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিল। হায়! বৈশালিনী এখন কোথায়?

যথাকালে মাতার ব্রত সম্পন্ন হইল। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, রাজপুত্র বহু অনুসন্ধান করিয়াও আর বৈশালিনীর দর্শন পাইলেন না। অগত্যা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে অন্য কোনও রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু এখনও কে তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন, তাহা স্থির নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই।

একদা রাজপুত্র অবীক্ষিত মৃগয়াভিলাষে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় সহসা রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ ক্রন্দন ধ্বনী তিনি শুনিতে পাইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে "কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর, আমি মহারাজ করন্ধমের পুত্রবধূ—মহাবীর অবীক্ষিতের সহধর্ম্মিণী, মহাত্মা বিশাল রাজনন্দিনী বৈশালিনী; পাপিষ্ঠ দানব দৃঢ়কেশ আমায় বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে,—কে কোথায় আছ, শীঘ্র আমায় রক্ষা কর" এইরূপ বিলাপ সুস্পষ্ট তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

এরূপ অভাবনীয় করুণ আর্ত্তনাদে প্রথমতঃ কুমার যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন—অকৃতদার অবীক্ষিতের আবার পত্নী হইল কেমন করিয়া? হয়ত এ কোনও মায়াবী রাক্ষসের মায়া হইবে। কিন্তু আর্ত্তের ত্রাণ, শরণাগতের আশ্রয় দান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিয়া মহাবীর অবীক্ষিত সেই বামাকণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। অবীক্ষিতের অপরিমিত বল-বিক্রম প্রভাবে দুষ্ট দানবের পতন হইল। আর্ত্তরমণীরও উদ্ধার সাধন হইল।

দানব বধে দেবগণ সুপ্রসন্ন হইয়া কুমারের মস্তকে শুভ আশীর্ব্বাদ পুষ্প বর্ষণান্তর তাঁহাকে অভিলষিত বর গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলে, অবীক্ষিত পুত্রবর চাহিয়া লইলেন। অবীক্ষিত কর্তৃক সুদীর্ঘ কাল উপেক্ষিতা, দুষ্ট দানব লাঞ্ছিতা সতী বৈশালিনীর গর্ভে অবীক্ষিতের এক মহাবলপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র হইবার বর প্রদান করিয়া দেবতারা অন্তর্হিত হইলেন।

দেবাদেশে যথাকালে রাজপুত্র অবীক্ষিত রাজকুমারী সতী সাধ্বী বৈশালিনীর পাণি

গ্রহণ করিলেন। সেতীর কঠোর তপস্যার ফল ফলিল—মনোরথ পূর্ণ হইল। যথা সময়ে তাঁহাদের এক পুত্ররত্ন ভূমিষ্ট হইয়া অবীক্ষিতের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিল। পতিব্রতা সতী বৈশালিনী সুদীর্ঘ কাল কায়মনোবাক্যে পতিপদ সেবা করিয়া অন্তিমে স্বর্গবাসিনী হইলেন। সতীরই জয় হইল।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

পুষ্পাবতী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রায় চাঁদ।

সম্বর হ্রদের সন্নিকটে একটী পল্লীগ্রামে রায়চাঁদ সওদাগরের বাটী। রায় চাঁদ সওদাগর জৈনধর্ম্মাবলম্বী ও ধার্ম্মিক যুবক। রায়চাঁদের বয়ঃক্রম বিংশ বৎসরের অধিক নহে। রায় চাঁদ সুপুরুষ—আমোদ প্রিয় এবং সঙ্গীত প্রিয়। রায় চাঁদ ধনী—গোলায় শস্য, ধনাগারে যথেষ্ট অর্থ—স্বর্ণ রৌপ্যেরও অভাব নাই। বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত, একটি সুন্দর পুষ্করিণী বাহিরের দিকে আছে, তাহার চতুপার্শ্বে পুষ্পোদ্যানপ একটি ফটক, তাহাতে অনেক প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত। বাটীর পশ্চাৎ দিকে বন, ভয়ানক অন্ধকার। এমন কি দিবসেও তেমন আলো হয় না। রায় চাঁদের এক বৃদ্ধা মাতা মাত্র আছেন, আর সংসারে কেহই নাই। সওদাগর ইংরেজ রাজের প্রজা—ঐ গ্রাম খানি ইংরেজ রাজ্যভুক্ত।

বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত, অন্ধকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। ঝড়েরও পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রায়চাঁদ সওদাগরের বাটীর মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, বাতায়ন পথে ঐ রশ্মি বাহির হইয়া কতক স্থানের অন্ধকার দূর করিয়াছে। বাটীর সকলেই নিদ্রিত, কেবল প্রহরী এক পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঢুলিতেছে। এমন সময়ে বাহিরে ভয়ানক শব্দ হইল,প্রহরী দেখিল—অনেকগুলি লোক মশাল হস্তে ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ফটক বন্ধ ছিল, তাহাদের চেষ্টায় দ্বার ভগ্ন হইল, প্রহরী দেখিল বৃথা চেষ্টা, অতএব বিনা লড়াইয়ে আত্ম সমর্পণ করিল। তখন তাহারা "ব্যোম্ ব্যোম্" শব্দ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। যে সব দ্বার বন্ধ ছিল, তাহা ভগ্ন করিল এবং যে কক্ষে রায়চাঁদ সওদাগর শয়ন করিয়াছিলেন—তথায় প্রবেশ করিল।

সওদাগর গোলমাল শুনিয়াই অসি হস্তে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। দস্যুগণ প্রবেশ করিতেই তিনি আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে তিনি একাকী কি করিতে পারেন—অবিলম্বে বন্দী হইলেন। এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল—"সওদাগর! ধন রত্ন যা আছে দাও, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।" সওদাগর বলিলেন—"আমি ইংরেজ রাজ্যের প্রজা, আমার বাটীতে [illegible]

তোমাদের দুষ্টতার এর প্রতিফল শীঘ্রই পাবে। এখনও বল্‌ছি পালাও, নইলে তোমাদের বিপদ হাতে হাতে।” দলপতি হাসিয়া বলিল—“সে উপদেশ তোমায় দিতে হবে না, ধন রত্ন কোথায় রেখেছ বলে' দেও।” সওদাগর কোন কথা বলিলেন না, তাহারা তখন সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল এবং রমণীগণের অলঙ্কার ও নগদ অর্থ যাহা পাইল তাহাই হস্তগত করিল। তার পর দলপতি বলিল—“সওদাগর! তোমার গুপ্ত ধন কোথায় বলে দেও।” সওদাগর বলিলেন—“আমার গুপ্ত ধন নাই, যথা সর্ব্বস্ব ছিল তা ত তোমরা নিয়েছ, এখন পালাও।” দস্যুরা আবার সব খুঁজিতে লাগিল কিন্তু আর মূল্যবান কোন দ্রব্য পাইল না, তখন সওদাগরকে বলিল “তোমাকে ধরে' নিয়ে যাচ্ছি, যদি যথেষ্ট অর্থ দিতে পার তবে মুক্তি পাবে, নতুবা যাবজ্জীবন কারাগারে থাক্‌বে।” এই বলিয়াই সওদাগরের মুখ বাঁধিল, এবং তাহাকে এক জন বলিষ্ঠ দস্যু স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিল। বাড়ীতে বৃদ্ধামাতা এক কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, দস্যুরা চলিয়া গেলে একজন ভৃত্য গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তিনি বাহিরে আসিয়া বহু অনুসন্ধানেও আর পুত্রকে পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপহরণ।

এক দিন অপরাহ্নে পুষ্পবতী ও সুকু পাহাড়ে বেড়াইতেছে। উভয়ের মন উৎফুল্ল। দুটি হরিণ শাবকের ন্যায় দুজনে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। দুজনে পুষ্প চয়ণ করিতেছে, দুজনে মালা গাঁথিতেছে—আবার দুজনে গলাগলি হইয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে মার্ত্তণ্ড দেব পর্ব্বতের আড়ালে অর্দ্ধ নিমগ্ন হইলেন, রক্তবর্ণ কিরণে যেন সমস্ত রাঙ্গা বসনে আবৃত হইল। প্রাণীকুল অবসর লইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। দুই একটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম করিতেছে, আবার কতকগুলি ম্রিয়মান হইতেছে। দুজনে তখন ধীরে ধীরে একটি বনের নিকট উপস্থিত হইল। পুষ্পবতী বলিল—“সই! এই স্থানটি অতি মনোরম, ঐ দেখ একটি প্রস্রবণ কেমন জল বহন করিতেছে, এস এই স্থানে বসি।” উভয়ে তথায় বসিল। সেই স্থানটি অন্ধকারে আবৃত, বড় বড় বৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটি নির্ঝরিণী হইতে তর্‌ তর্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। সুকু বলিল—“দেখ, কি নির্জ্জন স্থান, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, এত দূর আসা ভাল হয় নাই। সেই পাগলিনীর কথা মনে আছে? আর ত পাগলিনীকে দেখ্‌ছি না, তাকে দেখ্‌লেও আমার ভয় হয়।” পুষ্পবতী হাসিয়া বলিল—“তোর এত ভয় কেন? আমার ত ভয় হয় না। আমি মধ্যে মধ্যে একাকিনী এখানে এসে বসি, এতে আর ভয়ের কারণ কি আছে?” সুকু বলিল—“ভীলেরা ভয় জানে না, তবে আমার যে এত ভয় কেন বুঝি না। আমরা ভাই ভূতের ভয় বেশী করি। আমার মনে হয় ঐ পাগলিনী কোন উপদেবতা।” পুষ্পবতী হাসিয়া আকুল হইল। সুকু বলিল—“তুমি যতই ঠাট্টা কর, আমার

ভূতের ভয় যাবে না? আমাদের বাড়ীর বড় তেঁতুল গাছে ভূত আছে, সবাই একথা বলে, কত জনে দেখেছে।” এই সময়ে “হি হি” করিয়া হাস্যস্বর উঠিল, উভয়ে সভয়ে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সেই পাগলিনী গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাগলিনী আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সুকু ভয়ে জড় সড় হইয়া পুষ্পবতীকে জড়াইয়া ধরিল। পাগলিনী বলিল —“আবার এখানে এসেছিস্? এখানে তোদের বড় ভয়, কেহই রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। শিগ্‌গির পালা। আমি সব জানি, তোদের বিপদ নিকটে, এতদূর আসিস্ কেন?” পাগলিনী এই কথা বলিয়াই বনের মধ্যে পলাইল। সুকু বলিল—“সন্ধ্যা হ’ল, চল যাই, আর এখানে বসে’ থাকার দরকার নাই।” পুষ্পবতীর সাহস অধিক, সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—“সুকু! পাগ্‌লীর কথায় ভয় বেশী হ’ল নাকি? আমার অত ভয় হয় না। আয়, দুজনে যাই।” পুষ্পবতী সুকুর হস্ত ধারণ করিয়া উঠিল, এবং উভয়ে বাটী অভিমুখে রওনা হইল। এমন সময়ে বিকট চীৎকার বনমধ্যে হইতে উত্থিত হইল, উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সুকু থর্ থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পুষ্পবতীরও ভয় হইল, দুজনে গলাগলি করিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই কয়েকটি লোক দৌড়াইয়া আসিল. এবং সুকুকে ধরিল। সুকু চীৎকার করিয়া অচেতন হইল। পুষ্পবতী বলিল—তোমরা কি চাও?” তাহারা কোন উত্তর করিল না। পুষ্পবতীকেও ধরিয়া তাহার মুখ বাঁধিল, এবং কক্ষে করিয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে সুকুর চৈতন্য হইল, সে দেখিল কেহই নাই, তাহার মনে তখন বড় ভয় হইল। তথাপি সে উঠিয়া পুষ্পবতীকে অন্বেষণ করিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। তার পর মনে করিল যে, সে হয়ত বাটী গিয়াছে। তখন সে ধীরে ধীরে রওনা হইল। কতক্ষণ পরে গৃহে পৌঁছিয়া তাহার মাতাকে পুষ্পবতীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, সেখানেও পুষ্পবতী আসে নাই। তখন তাহার মাতা ব্যস্ত হইয়া মেয়ের অন্বেষণে বহির্গত হইল, কিন্তু কোন স্থানেই আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুজাওন খাঁ।

শেখাবতীর একজন প্রধান করদ রাজা সুজাওন খাঁ এখন প্রতাপশালী ও দুর্দান্ত। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে বলশালী সৈন্য আনিয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছেন। শেখাবতীর অনেক দুর্দ্ধর্ষ লোক তাঁহার দলভুক্ত, সুজাওন খাঁর নামে সকলেই ভয় করিত। তিনি জয়পুরের অধীন বটে, কিন্তু জয়পুররাজ তাহার উপর আদেশ প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। যদি কখনও কিছু হুকুক প্রচারিত হইত, তাহা প্রতিপালিত হইত না। এবং জয়পুরের অধীশ্বর তাহার প্রতিকার করিতে সাহসী হইতেন না। সুজাওন খাঁ লুণ্ঠন করিয়া [illegible] নিজ কোষাগার পূর্ণ করিতেন, [illegible] পুরের সীমানা অতিক্রম করিয়া [illegible]

মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। কিন্তু সুজাওন খাঁর একটীগুণ ছিল, দরিদ্রদিগের প্রতি তিনি অত্যাচার করিতেন না। সুজাওন খাঁ শেখাবতীর প্রধান সর্দ্দার, তাহাকে দমন না করিলে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে না, ইহা জয়পুর-রাজ বুঝিতেন, কিন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অনেক সৈন্যের দরকার; অতএব জোতারাম আপাততঃ আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। তাহাতে অনেকে মনে করিল যে জয়পুর-রাজ হয় তাঁহাকে দমন করিতে সাহসী হইতেছেন না অথবা ইচ্ছুক নহেন। জোতারাম এ দুর্নামও সহ্য করিলেন। সুজাওন খাঁ স্বয়ং একজন বীর পুরুষ, বয়ঃক্রম চল্লিশ হইবে, এবং কিরূপে অধীনস্থ লোকদিগকে নিজের আয়ত্তা-ধীনে রাখা যায়—তাহা জানিতেন। প্রজাগণ সুজাওন খাঁকে বড় ভয় করিত এবং তাঁহার আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালন করিত। যদি কেহ আদেশ প্রতিপালনে ইতস্ততঃ করিত, সুজাওন খাঁ অবিলম্বে তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন, এবং সময় সময় তাহার ছিন্ন শিরও অন্যান্য লোকদিগের ভীতি উৎপন্ন করিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে সুজাওন খাঁ বিশ্রা-মাগারে বসিয়া কাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি একবার উঠিতেছেন, দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার বসিতেছেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখনও কোন খবর নাই?" অবশেষে ডাকি-লেন—মনসুর খাঁ!" একব্যক্তি দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। সুজাওন খাঁ বলিলেন—খবর কি? এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? মনসুর খাঁ উত্তর করিল—জাহাপনা! সুযোগ মতে ত কায করবে, একটু বিলম্ব হ'তে পারে, আজ রাত্রেই কার্য্যোদ্ধার হবে।" খাঁসাহেব হাসিয়া বলিলেন—আমার আদেশ যে প্রতি-পালিত হবে তা জানি, কার সাধ্য তাহা লঙ্ঘন করে। যা হ'ক, কার্য্যোদ্ধার হলেই আমাকে সংবাদ দিও। মনসুর খাঁ পুনরায় সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, খাঁসাহেব একটি সুন্দর শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ ঘরেই আহারের আদেশ করিলেন। আহারান্তে পুনরায় শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, খাঁসাহেব ঘুমাইলেন। এমন সময়ে কে যেন ডাকিল—জাহাপনা!" সুজাওন খাঁ তাড়াতাড়ি উঠিলেন, দেখিলেন তাঁহার প্রিয় শরীর রক্ষক মনসুর খাঁ দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে?" মনসুর খাঁ জোড়হস্তে বলিল,—হুজুর! কার্য্যোদ্ধার ক'রে তারা ফিরেছে। এখন আওরাৎকে কোথায় রাখ্‌বো? সুজাওন খাঁ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বলি-লেন ধীরাজসিং কোথায়? তাকে এখানে আন।" মনসুর অবিলম্বে চলিয়া গেল এবং ধীরাজ সিংকে সঙ্গে করিয়া ঐ কক্ষে প্রবেশ করিল, ধীরাজ সিং কম্পান্বিত কলেবরে প্রভুর নিকট দাঁড়াইলেন। প্রভু বলিলেন, সেনাপতি! এত বিলম্ব হল কেন? ধীরাজ সিংহ জোড়হস্তে বলিলেন—প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করতে

আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ! আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। বহুকষ্টে এবার শীকার পেয়েছি, হুজুরের এখন যে আদেশ হয়। সুজাওন খাঁ বলিলেন,—বেশ হয়েছে, আমি সন্তুষ্ট হ'লেম। তোমার সেই অকৃত কার্য্যতায় আমি বড় বিরক্ত হ'য়েছিলেম, আজ তোমার এই কার্য্যে সে অপরাধ ক্ষমা করলেম।" ধীরাজসিংহ বলিলেন, হুজুর মা বাপ, এক সময় অপরাধও করবো, এক সময় ভাল কাজও করবো। দণ্ড ও পুরস্কারের কর্ত্তা হুজুর।" ধীরাজসিংহ পূর্ব্বের অকৃত কার্য্যতায় যে রামস্বরূপ সঙ্গচারী ছিলেন, তাহা নিজ প্রভুকে বলেন নাই, স্বীয় স্কন্ধে দোষ লইয়া ছিলেন। অদ্য পুষ্পবতীকে হরণ করিয়া আনিয়া সে অপরাধে ক্ষমা পাইলেন। সুজাওন খাঁ ধীরাজ সিংহের কথায় ঈষৎ হাসিলেন, পরে উত্তর করিলেন তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত, তোমার প্রতি সর্ব্বদাই আমি সন্তুষ্ট। এখন ঐ বালিকাকে আমার বাগানের সঙ্গী-মহালে রাখ, দাস দাসীর যেন অভাব না হয় ও কোন কষ্ট না পায়। আমি আজ আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না। এই লও, তোমার পুরস্কার। এই বলিয়া কতগুলি মোহর তাহাকে দিলেন। ধীরাজ সিংহ ঐ সব গ্রহণ করিয়া অভিবাদন পুরঃসর চলিয়া গেলেন। মনসুব খাঁ বলিল,—হুজুর! আপনার আদেশ কে লঙ্ঘন করবে? তবে অধীনের বেয়াদবি মাপ করবেন। এই রকম জাওয়াৎ জোর ক'রে আনলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হবেন। আজকাল ইংরেজ ভারতের রাজা, তাদের শক্তি কে রোধ করবে? [illegible] কথায় সুজাওন খাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন,—তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ডাকা হয় নাই। সুজাওন খাঁ নির্ব্বোধ নহে।" মনসুব খাঁ বলিল—খোদাবন্দ! রাগ করবেন না। আমরা হুজুরের কাজের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হব না। পাছে কোন অনিষ্ট হয়, সেই ভয়ে এ সব কথা বলছি। ইংরেজদের ক্ষমতা অসীম, ইংরেজদের কামানের নিকট দাঁড়ায় এমন লোক আজকাল ভারতে নাই। আমরা পরস্পর শুনেছি—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। জোতারাম আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবেন না, কিন্তু ব্রিটিশরাজ ইচ্ছা করিলেই আমাদের রাজ্য ধ্বংস করতে পারেন। সুজাওন খাঁ শুনিলেন, ও বুঝিলেন—মনসুব খাঁ সত্য কথা বলিতেছে, কিন্তু সত্য কথায় অনেক সময় লোক অসন্তুষ্ট হয়, সুজাওন খাঁও বিরক্ত হইলেন। তিনি তখন বলিলেন—"সুজাওন খাঁ কাহাকেও ভয় করে না, সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি জানি ব্রিটিশরাজ প্রবল প্রতাপ; তাই আমি ইংরেজদের সঙ্গে যাহাতে যুদ্ধ না বাধে তাহার চেষ্টা করিতেছি। তুমি এখন নিজ কার্য্যে যাও।" মনসুব খাঁ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সুজাওন খাঁ—মনসুবের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি [illegible] ইংরেজ রাজ্যের প্রজাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছেন, অল্প দিন হইল ইংরেজ প্রজা [illegible] বাটী লুণ্ঠন করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন—ব্রিটিশ-রাজ জানিতে পারিলে [illegible] অনিষ্ট হইবে। তবে [illegible] [illegible] বিশ্বাসী, তিনি [illegible]

কেহ দমন করিতে পারিবে না। তিনি ইহাও জানিতেন—জোভারাম তাঁহার অনিষ্ট করিবেন না। কারণ প্রতি বৎসর অনেক ধনরত্ন তাঁহার নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লীলাবতী।

রাজা অভয় সিংহ রাজ-কার্য্যান্তে নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, একজন ভদ্রলোক তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াছেন। রাজা তাঁহাকে আনিতে বলিলে ভৃত্য সঙ্গে করিয়া একজন দীর্ঘকায় লোককে আনিল এবং রাখিয়া চলিয়া গেল। রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলে তিনি উপবেশন করিলেন। রাজা অভয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন?" লোকটী কতক্ষণ পর্য্যন্ত অভয় সিংহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, আমি শেখাবতীর উদয় সিংহ, এখন আশ্রয় শূন্য। শেখাবতীর প্রবল প্রতাপ দস্যু সুজাওন খাঁর অত্যাচারে আমি দেশত্যাগী। এখন স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসহ তোমার আশ্রয়ে এসেছি। যদি স্থান দাও ভাল, না দেও, অন্যত্র যাব।" রাজা অভয়সিংহ তখনই উঠিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—আপনি আমার পিতৃ তুল্য, আপনি অবশ্যই এখানে থাকতে পারেন। আপনার স্ত্রী ও কন্যা এখন কোথায়? তাঁহাদিগকে লইয়া আসুন। আমার বাটীর সংলগ্ন পশ্চাৎ-দিকে যে নির্জ্জন "কমল-বাটীকা" আছে, তাহাতেই আপনারা বাস করুন, সহজে কেহ দেখ্তে পাবে না। আপনারাও নির্ব্বিঘ্নে বাস কর্‌তে পারবেন।" উদয়সিংহ এই কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বলিলেন—উপযুক্ত রাজার মত উত্তর হ'য়েছে, আমিও সুখী হলেম। আশা করি ও আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা তোমার যতদূর সাহায্য হ'তে পারে, তাহা আমি কর্‌ব। ঠাকুর উদয়সিংহ তখন উঠিয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে নিজের স্ত্রী ও কন্যা সহ অভয়-সিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। অভয়সিংহ তখনই উঠিয়া বলিলেন—মা! আপনি নিশ্চিন্তে আমার নিকটে থাকুন। আশা করি আর কখনও কষ্ট পাবেন না।" তারপর কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ভগ্নি! আমাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখো, এখানে তোমা-দের যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহা আমি দেখ্‌ব।" রাজা অভয়সিংহ দেখিলেন যে লীলাবতী—পরমা সুন্দরী। লীলাবতী কোন উত্তর করিল না কিন্তু ঠাকুর উদয়সিংহের সহধর্ম্মিণী বলিলেন—বাবা! তোমার আশ্রয়ে এসেছি, তোমার কোন কষ্ট না হয়, বা আমাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কোন বিপদে না পড়, তাহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা কচ্ছি। রাজা তখন একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন। সে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া "কমল-বটীকায়" লইয়া গেল। সেই স্থানে তাঁহাদের সব বন্দোবস্ত হইল, তাঁহারা গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

লীলাবতী একদিন অপরাহ্নে বাটীর পশ্চাতের উদ্যানমধ্যে বসিয়া আছে, পিতামাতার ও নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছে, আবার এক একবার মথুরা সানের বিষয় স্মরণ হইতেছে। বনমধ্যে দস্যুহস্তে নিগ্রহ—মথুরা সানের বীরত্ব ও অমায়িকতা—সেই সব কথা মনে হইল। আজ উহারা অপরের আশ্রয়ে বাস করিতেছে, পরের কৃপাপ্রার্থী—তাহার বড় কষ্ট হইল। লীলাবতী বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি সঙ্গীত তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"খেলবো খেলা হরির সনে,
আমরা সব গোপনারী।
প্রাণ ভরে হেরবো তারে,
মাখন চোরা বংশীধারী।"

সঙ্গীত ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। লীলাবতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার শুনিতে পাইলঃ—

"বাজ্‌বে বাঁশী রাধা বলি,
সে স্বরেতে পাগলিনী।
ধরবো আমি কালাচাঁদে,
বাঁধবো দিয়া ভক্তি-ডুরি।
আয়রে সবে আয়রে ছুটে,
দেখ্‌বি যদি বনমালী।
প্রাণের ঠাকুর হেসে হেসে
পরাণ মোদের করে চুরি।"

লীলাবতী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিল, স্বর বড়ই মিষ্ট বোধ হইল, দেখিল কে একজন স্ত্রীলোক, তাহার নিকটে দাঁড়াইয়াছে। লীলাবতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল স্ত্রীলোকটীর পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র—আলুথালু কেশ—কোন বিষয়ে যত্ন নাই। স্ত্রীলোকটী বলিল—আমাকে জানিস্ না, আমি তোকে চিনি। আমি এক কথা বল্‌তে এসেছি। রাজাকে গিয়ে বল পুষ্পবতী বন্দী, বিপদে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে। যদি শীঘ্র উপায় না করে, তবে সে মরবে। বল্‌তে ভুলিস্‌নে।" এই কথা বলিয়াই পাগলিনী গাছের আড়ালে কোথায় চলিয়া গেল। লীলাবতী বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিল।

লীলাবতী উঠিল না, মনে মনে ভাবিল—পাগলিনীর সংবাদ তাহার পিতাকে বলিবে। পুষ্পবতী কে? এ প্রশ্ন তাহার হৃদয়ে উদিত হইল। লীলাবতী বুঝিল এ স্ত্রীলোকটি পাগলিনী, ইহার কথায় কোন সত্যতা আছে কি না বুঝিতে পারিল না। এমন সময়ে কে ডাকিল "লীলাবতী" লীলাবতী শিহরিয়া উঠিল, দেখিল—তাহাদের উদ্ধার-কর্ত্তা মথুরাসান দাঁড়াইয়া আছে। লীলাবতী বড় লজ্জিত হইল, সে কোন কথা বলিতে পারিল না, অথচ সেই স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়ারও ইচ্ছা হইল না। মথুরা সান বলিলেন—আমাকে চিন্‌তে পাচ্চ? এবার লীলাবতী কথা কহিল, সে ধীরে ধীরে মধুর স্বরে বলিল—আপনি কি করে এখানে এলেন?" মথুরা সান উত্তর করিলেন—তোমার আকর্ষণে এসেছি, যে দিন তোমাকে বনের মধ্যে দেখেছি, সেইদিন থেকেই আমার মন চুরি গিয়েছে। এখন আর অন্য উপায় নাই।" লীলাবতী লজ্জায় মুখিয়া

পানে তাকাইল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া, বলিল আমার পিতামাতা এখানে আছেন,আমি যাই। মথুরা সান্ বলিলেন—আমি সব জানি। কুটীর ত্যাগ করে যে এখানে এসেছ—ভালই হয়েছে। পাগলিনী বোধ হয় এর পূর্ব্বেই এসেছিল। সে আমাকে তোমার খবর দিয়াছে, তার ইঙ্গিতেই আমি এখানে আশান্বিত হয়ে এসেছি।” লীলাবতী বলিল—আমাদের অধিকক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়, আমি যাই।’ এই বলিয়া সে মরাল গমনে চলিয়া গেল, মথুরা সান্ কতক ক্ষণ সে দিকে দৃষ্টি করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বৃক্ষের পশ্চাতের রাস্তা ধরিয়া সদরের দিকে চলিলেন। মথুরা সানের মন লীলাবতীময়। এমন সুন্দরী, এমন সরলা বালিকা আর নাই—মথুরা সান্ ভাবিলেন, এ রত্ন কাহার অদৃষ্টে আছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত মন্ত্রণা।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ, নিশাচর পাখী শুধু জাগিয়া থাকিয়া এক একবার আনন্দ ধ্বনি করিতেছে। কেহ কেহ রজনীতে আনন্দিত, কেহ বা বিশ্রামের ক্রোড়ে শায়িত। বায়ু সন্ সন্ শব্দ করিতেছে, চন্দ্র খণ্ডখণ্ড মেঘে ঢাকা অথচ অন্ধকার। এমন সময়ে জোতারাম ও রূপা একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। জোতারাম এক একবার উঠিয়া দ্বারের নিকট গিয়া দেখিতেছে, এক একবার আসনে বসিতেছে। সদর দ্বার বন্ধ, গৃহদ্বার রুদ্ধ তথাপি আশঙ্কা কে” পাছে তাহাদের পরামর্শ শুনে। অতএব চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া জোতারাম বলিলেন—রূপা! এভাবে আমাদের আর কত দিন যাবে? রূপা জোতারামের ভাব বুঝিয়াও যেন বুঝিল না, সে বলিল—কেন? বেশ আছি, আমাদের ক্ষমতা ত কম নয়? জোতারাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—এ ভাবে আর কত দিন যাবে? রাজা একটু বয়স্থ হইলেই আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। এখনই দেখ্‌ছি আমার পরামর্শ মত আর চলে না। একটু একটু স্বাধীন হচ্ছে, পরিণাম ভাল নয়। আমাদের মনের মত রাজা চাই, তাকে যা বল্‌বো তাই কর্‌বে। আমাদের হস্তের পুত্তলিকাবৎ থাক্‌বে। জয়পুর রাজ্যের প্রকৃত রাজা ও রাণী আমরা—এরা নাম মাত্র রাজা থাক্‌বে। এখনউপায় কি বল। মহারাণীও আজকাল যেন সন্দেহের চক্ষে আমাদিগকে দেখ্‌ছেন। এর একটা প্রতিকার চাই। তোমার বুদ্ধি লইব বলেই আজ এসেছি। রূপা তখন ধীর ভাবে বলিল—তুমি ঠিক কথা বলেছ, এর একটা উপায় করা দরকার। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে কিছু আস্‌ছেনা। রাজা ও রাণী আমাদের মনের মত হওয়া চাই। যদি তাহা না হয়, তবে আমাদের সে রাজা রাণী পরিবর্ত্তন করা উচিত। যথার্থ বলেছ যে আমরা দুজনে রাজ্য শাসন কর্‌বে, ওরা শুধু উপলক্ষ্য থাক্‌বে। যদি দোষ কিছু হয়, তবে ওদের ঘাড়ে পড়বে।” জোতারাম বুঝিলেন—রূপাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। রূপা বলিল—আজকাল মহারাণীর ভাবও পরিবর্ত্তন হচ্ছে,আর রাজাকে

তেমন বিশ্বাস করেন না, এখন নিজেই সব কর্‌তে চান। পূর্ব্বে সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেন এখন তাহা প্রয়োজন্ বোধ করেন না, এ সব লক্ষণ ভাল নয়, আমাদিগকে যেন আর পূর্ব্বের চক্ষে দেখেন না।" জোতারাম কিয়ৎ-ক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—রূপা! আমরা মহারাণীর নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী কিন্তু মহারাজার নিকট নয়, রাজা শুন্‌ছি আমাদের বিপক্ষের পরামর্শ শুন-ছেন। ইহাও জান্‌তে পেরেছি—শীঘ্রই আমা-দিগকে দূর করিয়া বেহারী সান্‌কে আন্‌-বেন। আমরা এ রাজ্য রক্ষা করেছি, সে জন্য রাজার কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। যে রূপেই হউক, আমাদের সম্মান বজায় রাখ্‌তে হবে। তোমার এতে মত কি।" রূপা উত্তর করিল—হাঁ আমরা নিজ সম্মান ও পদমর্য্যাদা বজায় রাখবো। জোতারাম বলিলেন—তাহলে ন্যায় অন্যায় দেখ্‌তে পারবে না, আমরা রাজ্যের মঙ্গল দেখবো। ইহা জেন যে, বেহারী সান্ এলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে, আমরা দুজনে কেবল রাজ্যের মঙ্গল কচ্চি। ইহার পর রূপার কাণে কাণে তিনি কি কথা বলিলেন, রূপা শিহরিয়া উঠিল। জোতারাম বলিলেন—যদি আত্ম-মঙ্গল ও রাজ্যের মঙ্গল চাও, তবে ইহা কর্‌তেই হবে, নতুবা চল দুজনে বনে সন্ন্যাসী হয়ে যাই"। রূপা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, সে বলিল"—তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু আমার মন অগ্রসর হচ্চে না।" জোতারাম ঈষৎ হাসিয়া বলিল—তবে সব ছেড়ে দেও, চল বিদেশে যাই। তোমার জন্য রাজ্য, সম্পত্তি, সব ত্যাগ কর্‌তে পারি। হয় এ রাজ্যে প্রভু হয়ে থাকবো, নতুবা বনে গিয়া বাস কর্‌বো, দাস হয়ে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল। রূপার মন কতকটা পরিবর্ত্তিত হইল, সে বলিল"—তবে তুমি যাহা বলিবে তাহাই কর্‌বো। তোমার উপ-দেশে এত কাল চলেছি, এখনও চল্‌বো"। জোতারাম মনে মনে হাসিল—বুঝিল, ফল ফলি-য়াছে, তখন রূপার হস্তে ধরিয়া বলিলেন—রূপা! তোমার জন্যই এসব কচ্চি, তাহাত জান? আমি নিজের সুখ সম্পদ চাইনা, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাই আমি দেখবো, রূপা গলিয়া গেল, সে উত্তর করিল—তুমি যাহা বল্‌বে, তাই করবো"। তাহার পর দুই জনে মৃদুস্বরে অনেক পরামর্শ করিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইল, তখন জোতারাম ও রূপা সে বাটী হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া অসিলেন। রূপা অন্তঃপুরে গেল, জোতারাম স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ।

কাঁদো! কাঁদো!! কাঁদো!!!

কাঁদো, কাঁদো, কাঁদো! ক্রন্দন ভিন্ন পরি-ত্রাণের উপায় নাই, ক্রন্দন ভিন্ন আমাদের গতি নাই, কেবল কাঁদো—কাঁদো! অশ্রুর প্রকট্ মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া প্রাণখুলিয়া কেবল কাঁদো; এই অশ্রু সাধকের, প্রেমিকের পরম ধন। অশ্রু না থাকিলে প্রেমিক, প্রকৃত প্রেমিক, সাধকে, সাধকের সাধনা, অশ্রু ভিন্ন পূর্ণ হয় না। [illegible] সাধন, এক মহাসাধন। [illegible] আর পরের [illegible]

অশ্রুই তাহার মূল। নাম সাধনার পরিণতি, প্রেম, প্রেমের বাহ্য বিকাশ এই—অশ্রুজলে।

অশ্রু, এই মরজগতে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেয়। অশ্রু-অতুল-অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, অশ্রুর মাধুর্য্য ব্রজভাবের পরিচায়ক। শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে অশ্রুজলের ন্যায় উপাদেয় উপচার আর দ্বিতীয় নাই। তাই, বলি ভাই, কাঁদো; প্রেমাশ্রু নয়ন বহিয়া বক্ষে নিপতিত হউক; তৎপরে উহার অনাবিল তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, জগৎ প্লাবিত হউক্। কাঁদো, কাঁদো, কাঁদো! কেবল কাঁদো!

যদি শোকে সান্ত্বনা চাও, তবে কাঁদো, যদি অন্ধকারপূর্ণ অশান্তহৃদয়ে শান্তির বিমল প্রভা ছুটাইতে চাও, তবে কাঁদো। ভাল বাসার প্রকৃত অহেতুক ভাবের বিকাশ করিতে হইলে কাঁদো! বিনয়ের মধুরতা, সহানুভূতির পূর্ণ অভিব্যক্তি এই অশ্রুজল ভিন্ন কিছুতে নাই। মর্ত্ত্যধামে গোলকের লীলা দেখিতে বাসনা হইলে, প্রেমপাগল সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষের ভাববিভোর নয়নের প্রতি লক্ষ্য কর। আর উহা দেখিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া—কাঁদো।

কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে, কান্না কোথায় নাই। কান্নার প্রভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়াছেন, শ্রীমতীরও কান্নার বিরাম নাই, গোপিকাগণ কাঁদিয়াছেন। সতী কাঁদিয়াছেন, সীতা কাঁদিয়াছেন, সাবিত্রী কাঁদিয়াছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র কাঁদিয়াছেন, শৈব্যা কাঁদিয়াছেন। শচীমাতা কাঁদিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়াছেন। সীতা-শোকে শ্রীরাম কাঁদিয়াছেন। যিশু কাঁদিয়াছেন, মহম্মদ্ কাঁদিয়াছেন। নানক, কবির কাঁদিয়াছেন। কাঁদাই সকলের কাজ,—কান্নাই সকলের আশ্রয়। কাঁদো কাঁদো। কান্নার মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন। কাঁদা চাইই। বিরহের অশ্রুবর্ষণ ব্যতীত মিলনের মধুরতা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। তাই, বিরহের অস্তিত্ব। অভিসারের অভিনয় অন্ধকারেই হইয়া থাকে। কৃষ্ণকায় জলধরের বক্ষেই সৌদামিনীর খেলা চিত্তহারিণী। কমলে কণ্টক, আঁধারে আলো, যেরূপ অশোভনীয় নহে, মিলনে বিরহও ঠিক্ তদ্রূপ। ইহাই "বিষামৃত গোরা-প্রেম,"—ভাবিয়া কাঁদো।

"স্বরূপে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি; স্বরূপ হারাইয়া আমরা এক্ষণে বিরহীর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাই বলি—ভাই, কাঁদো—কাঁদো—কাঁদিতে কাঁদিতেই প্রেমের দেশে গিয়া, প্রেমের মূল প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। কাঁদো কাঁদো, কাঁদো। যদি প্রকৃতই উদ্ধারের বাসনা থাকে, তবে কাঁদো। যদি প্রকৃতই মঙ্গল চাও, তবে কাঁদো। যদি জগতের মঙ্গল করিবার অভিলাষ থাকে, তবে কাঁদো। দীনহীন কাঙ্গাল আমরা, আমাদের এক্ষণে ক্রন্দনই একমাত্র বল।

হাসিতে চাও ত, একবার গৌর বলিয়া কাঁদো,—নিতাই বলিয়া কাঁদো। বর্ত্তমান যুগে ইহাই সাধন,—ইহাই ভজন। কাঁদো কাঁদো—কাঁদো। ইহাই মুখের কথা নহে, প্রত্যক্ষ সত্য কথা,—খাটী কথা। রোদনই পরম সাধন, উহাই একমাত্র ভরসা। কেবল মুক্তির ফকিকে দিয়া গেলে মুক্তি পাইবে না।

বিশ্বাস করিয়া—সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়া কেবল কাঁদো।

কান্নার কথা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ অনুপম বর্ণচিত্রে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে করিতে প্রাণের আকুল কণ্ঠে কেবল কাঁদো,—কাঁদো। এই কান্নার জলে এক অপরূপ হাসির আলো বিভাসিত হইবে। হাসি কান্নার এই মধুর মিলনে, এক অনুপম কমনীয়মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া—প্রাণজুড়াইবে, অমৃতাধিক মধুর ভাবের অস্বাদন লাভে চরিতার্থ হইবে। ভাই! সে যে কি ভাব তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইবার নয়, উহা কেবল সাধুসঙ্গ লভ্য,—ভাবদেহে অনুভব যোগ্য। ভাবময়ের মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার রাতুল চরণ যুগল স্মরণ করিতে করিতে, কেবলই কাঁদো।—মাভৈঃ কেবলই কাঁদো। কোন এক অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চয় হইবে,—ভাই কাঁদো!

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

চন্দ্রের প্রতি।

১

কে তুমি গগণ মাঝে হয়েছ উদয়।
অকুল সমুদ্রে যেন ফুল ভাসি যায়।
সাদা সাদা মেঘগুলা, ঠিক যেন পেঁজা-তুলা,
উড়ে যায় বায়ুভরে হেথায় সেথায়;
বালক সকল যেন নাচিয়া বেড়ায়।

২

জগত করিছ আলো বিমল কিরণে।
শিশুগণ অনিমিখে চাহে তোমা পানে।
হেরে তব ও মুরতি, চকোর প্রফুল্ল অতি,
করিছে মনের সুখে সুধামৃত পান।
গাহিছে কোকিল সব ভাবি দিনমান।

৩

আধখানি হয়ে যবে উঠহ গগণে।
তখন লাগেনা ভাল আমার পরাণে,
পরিপূর্ণ কলেবরে, উঠিলে গগণ পরে,
দেখিতে তোমারে ভালবাসি শশধর।
পূর্ণ হয়ে উঠ—এই ইচ্ছা নিরন্তর।

৪

কাহারো অপ্রিয় তুমি নহ শশধর।
রজনীর চিরকাল তুমি সহচর।
সরোবরে কুমুদিনী, সুখে তুলি মুখখানি।
রহিয়াছে প্রেম ভরে চাহি তোমা পানে,
খেলিতেছে কত খেলা সাদা মেঘ সনে।

৫

এ ধরণী মাঝে আহা তুমি কি সুন্দর।
শোভার আধার ওহে দেব শশধর।
তোমারে দেখিলে পরে, সব দুখ যায় দূরে
দেখি তোমা সাধ মম নাহি মিটে হায়।
কে এমন শোভা দিল বল হে আমায়।

——— শ্রীপ্রমথ লাল দত্ত।

অদৃষ্ট-বিরহী।

দেখিতে পাইনি, কখনো যাহারে
রহিনি কোথাও কাছে,

তার তরে হেন, আকুল পরাণ
এমনি কেন বা হায়।
শুনিয়াছি নাকি, বাঁশীখানি তার
বড়ই সে সুমধুর।
শুনিনেক কাণে, সে গান কখনো,
তবু মনে আসে সুর!
ধরি ধরি ধরি, ধরিতে না পারি,
যাহারে দিবস রাতি,
তার হাসিখানি, তারই বাঁশিখানি,
আমার নিভৃত সাথী!
কভু আসে পাশে চরণ শবদে
যেন পারি বুঝিবারে,
সে অঙ্গ সৌরভে হয়ে উন্মাদিনী
ধরিবারে যাই তারে,
আঁখি মেলি চাই আর কোথা নাই,
ওই ওই দূর অতি!
আঁখি-সীমা কত? মতি গতি-হত,
তাহার তাড়িৎ-রীতি।
গগণ-নিকষে, যেমন বিকশে
ঈষদ সুবর্ণ রেখা
ঈষদ্ আভাষ, মুহূর্ত বিকাশ,
তেমতি তাহার দেখা।
অদর্শন তার, বিরহ যাহার
এত মধুময় সই?
[illegible] পরশ, কত না সরস
কেমনই মধুর ওই।
তার মধুভাব, কভু উঠে ফুটে
আমার আঁধারে যেন,
[illegible], মধুর মধুর
[illegible]

কোথাও কুৎসিত, কোথা বিসদৃশ,
কিছুই না যায় দেখা,
সবই সে আমার, সুন্দর পিয়ার
সুমধুর প্রেম-মাখা!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

চুপি চুপি।

চুপি চুপি তারে   দেখি সদা সাধ
চুপি চুপি কথা কব,
চুপি চুপি এসে   ডাকিবে সে মোরে
চুপি চুপি সাথী হব।
চুপি চুপি দোঁহে   যাব উপবনে
যেথায় কুসুম ফুটে,
চুপি চুপি ফুল   সুবাস ছড়ায়
মধুকর আসে ছুটে।
চুপি চুপি চাঁদ   উকি ঝুকি মেরে
হাসিছে আকাশ গায়;
চুপি চুপি চুমি   এ ফুলে ও ফুলে
নাচিছে মলয় বায়।
চুপি চুপি এসে   পিয়াসী চকোরী
চাঁদের চাঁদিমা পিয়ে,
চুপি চুপি ভাল—   বেসে ভেসে যায়
নীলিমায় মিশাইয়ে।
চুপি চুপি বসি   পাতার আড়ালে
কোকিল গাহিছে গান,
চুপি চুপি তাহে   বিরহী পরাণে
উঠিছে করুণ তান।
চুপি চুপি মরি   সরোবরে কিবা
কচি ঢেউগুলি চলে,

চুপি চুপি যেন এ উহার গলে
জড়ায়ে কত কি বলে
চুপি চুপি যেন বিরহ সহিয়ে
দেহে বল নাই হায়,
চুপি চুপি তারা ফুটে উঠে তাই
অভিমানে খসে যায়।
চুপি চুপি চুপি কোথা হতে কেবা
দোঁহে দোঁহা বাঁধা আছি,
চুপি চুপি চুপি এ বিশ্ব রচনা
বাঁধা সুতে এক গাছি।
চুপি চুপি যবে প্রেম অভিনয়
হয় এত এ ধরায়,
চুপি চুপি মন বলি কথা শোন
চুপি চুপি ডাক তায়।

দীনা—জগৎতারিণী দাসী।

স্বর্গীয় শিশির কুমার।

জীব মাত্রেই ভগবানের অংশ, বিশেষতঃ মানবে তাঁহার অস্তিত্ব অনেক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য যে মানুষ যত প্রতিভাশালী, যাহাতে ভগবানের বিভূতি যত বেশী তিনিই সাধারণ মানব অপেক্ষা তত বেশী উন্নত। এইজন্য ভগবানের বিভূতিসম্পন্ন প্রতিভার পূজা আমরা করিয়া থাকি, প্রতিভা বলিতে গেল যাহাতে বিদ্যাও বুদ্ধিমত্তা আছে, তিনিই যে কেবল প্রতিভাশালী, তাহা নহে। এমন প্রতিভাশালী লোক অনেক দেখা গিয়াছে এবং এখনও আমাদের চক্ষের সম্মুখে কত বর্ত্তমান যিনি বিদ্যাও বুদ্ধিতে একজন অদ্বিতীয় কিন্তু কর্ম্মে তিনি এত হেয় যে তাহার মুখ দর্শন করিলেও পাপভাগী হইতে হয়। এমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান অপেক্ষা একজন ধর্ম্মজ্ঞ মূর্খের আসনও বহু উচ্চে, পরস্পরের প্রতি যাহাদের সহানুভূতি নাই, তিনি কিসের পণ্ডিত, কিসের বিদ্বান। অধুনা সাহিত্য সেবার মধ্যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে সহানুভূতিহীনতা দোষই বিশেষ ভাবে সংক্রামিত হইয়াছে; আজ কাল কোন সাহিত্য-সেবীই কোন সাহিত্য-সেবীর ভাল দেখিতে পারেন না, পরস্পর পরস্পরকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করেন, এইরূপ শিক্ষিত সাহিত্য-সেবীকে আমরা প্রতিভাশালী বলিতে বাধ্য নহি এবং সে প্রতিভার পূজা, সে প্রতিভার স্মৃতি সংস্থাপন যেন কখন সংসারে সংস্থাপিত হইতে না পারে কিন্তু আজ কাল আর পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, বৎসর বৎসর কত যে স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা করা দুসাধ্য। আজ আমরা যে মহাত্মার নাম উল্লেখ করিতেছি, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-গগণের একটী ধ্রুব নক্ষত্র; মহাত্মা শিশির কুমার বাঙ্গালী বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী, যদিও তিনি অজস্র গ্রন্থ লিখিয়া, নানা প্রকারে বক্তৃতা প্রদান করিয়া আপনার নামের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া যান নাই; তথাপি তাঁহার নাম বাঙ্গালী বৈষ্ণব-সমাজে চির-দেদীপ্যমান থাকিবে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যখন বড় দুঃসময়, যখন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লোপ হইবার সম্ভাবনা হইতে লাগিল, সেই সময় মহাত্মা শিশির কুমার "অমিয়-নিমাই-চরিত"ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার প্রচার করিয়া সমাজের বহুই উপকার করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু প্রাচীন

ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র "অমৃত বাজার" তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এককালে তাঁহার পরিচালনা গুণে এই সংবাদপত্র আমাদের রাজ রাজ্যেশ্বরের বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল। দেশের অভাব অভিযোগ, ইষ্টানিষ্ট রাজার কর্ণ গোচর করিয়া তাহার প্রতিকারের প্রার্থনা করা শিশির কুমারের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; এই জন্য শিশির কুমার রাজনীতি ক্ষেত্রেও একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানী গুণী ও কর্ম্মী ছিলেন। বাজে আড়ম্বরে তিনি ধর্ম্মের গ্লানি করিতে প্রয়াস পাইতেন না। আর্য্যশাস্ত্রে তিন প্রকার অবতারের কথা লিপিবদ্ধ আছে—স্বরূপাবতার, অংশাবতার ও কলাবতার। যিনি সদাই ভগবানের নাম লইয়া মত্ত থাকেন, নামে যাহার অশ্রুপাত হয়; যে ভক্ত ভগবানের নামে আত্মহারা হইতে পারেন—তিনিই যথার্থ প্রতিভাশালী, ভগবানের বিভূতি ভূষিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার ইঙ্গিতে, তাহারই উপদেশে সমাজ স্বতঃই উন্নতিমার্গে উন্নীত হইতে পারে—তাই আজ চৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার এত প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারই প্রদর্শীত সুপন্থা অনুসরণ করিয়া তদীয় ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রগণ অধুনা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। শিশিরকুমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও নির্ভীক-চিত্ত ছিলেন—ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ এখন সেই পবিত্র গুণানুসরণে ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ছোটকে বড় করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন; কেবল নিজে বড় হইয়া থাকিব, ছোটকে দেখিব না—কাহারও উপকার করিব না; শিশির কুমারের সেরূপ অভ্যাস ছিল না। ছোট যাহাতে বড় হয়—যাহাতে ছোট সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, শিশির কুমারের সেই ইচ্ছাই প্রবল ছিল এবং সেই সদিচ্ছাই তিনি আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার যশো সৌরভে এখন বঙ্গদেশ বিমোহিত, এখন তাঁহার নামে লোকের স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠে। নতুবা বৃথা স্মৃতি রক্ষা করিয়া কোন লাভ নাই। তাঁহার রচিত "অমিয় নিমাই-চরিত" যিনি পড়িবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন। আমরা সেই অমিয়-মধুর-গ্রন্থ পাঠে ধন্য হইয়াছি। য, না, চ।

গ্রহের-ফের।

(১)

পুণ্যধাম পুরুষোত্তমে রথ-যাত্রা উপলক্ষে মহাধুম। কত লোক কলির দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে রথে দর্শন করিয়া মুক্তি লাভের আশায় ছুটিয়াছে; মোহান্ধ লোক বুঝে না যে, এ রথ সে রথ নহে, দেহ-রথে পরমাত্মার দর্শন যে মুক্তির কারণ, তাহা না বুঝিয়া ক্ষুদ্র-বুদ্ধি কলির জীব, এই সামান্য আয়াসেই সেই জন্ম-জন্মান্তরীণ তপস্যার ফল, মুক্তির আশা করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয়। যাহা হউক, কলিকাতা হইতে জনৈক বর্ষীয়সী, তাঁহার একটী দ্বাদশ-বর্ষীয়া পৌত্রীকে সঙ্গে করিয়া রথ দেখিতে গিয়াছিলেন।

বালিকার নাম রাণী, বাল্যকাল হইতেই

পিতামাতা তাহাকে আদর করিয়া ঐ নামেই ডাকিত, কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ সে এখন ভিখারিণী অপেক্ষাও দুঃখিনী। অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, রাণী বড় মানুষের মেয়ে—বড় মানুষের পুত্রবধূ কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় এখন সে অতি দীন-হীন-দরিদ্রা, সংসারে এক পিতামহী ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় অভিভাবক কেহ ছিল না।

রাণীর পিতা এক জন ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু রাণী ব্যতীত তাঁহার এ সংসারে আর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। রাণী অতি শৈশবাবস্থাতেই মাতৃহীনা হয়, রাণীর পিতা পুত্রার্থে দ্বিতীয়বার আর দার-পরিগ্রহ না করিয়া, রাণীকেই পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রাণী পরমারাধ্যা পিতামহীর যত্নে একদিনও স্নেহময়ী মাতার অভাব অনুভব করে নাই। কন্যাটী অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিলে, পিতা জনৈক ধনবানের একমাত্র পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। দুঃখের বিষয়, সম্বন্ধের পরই তাহার পিতা তাহাদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, সর্ব্বনিয়ন্তার নির্দ্দিষ্ট দিনে কাল-কবলে পতিত হইলেন। এদিকে সম্বন্ধ পাকাপাকি হইয়াছিল বলিয়া বিবাহ রহিত হইল না, শুভ দিনে শুভলগ্নে সেই ধনবান পুত্রের সহিতই রাণীর বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু যে গ্রহের ফেরে পড়ে, তাহার সুখ কোথায়? বিবাহের কয়েক দিবস পরেই অভাগিনী রাণীকে শ্বশুরের মর্ম্মভেদী অনন্তনিদ্রা স্বচক্ষে দর্শন করিতে হইল। রাণীর শ্বশুরের মৃত্যু হওয়ায়, সকলেই তাহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিল; এমন কি, "দুর্ভাগিনী—রাক্ষসী" ইত্যাদি দুর্ব্বাক্যই তাহার আদরের নাম হইল। শ্বশুর-বাটীর কেহ তাহাকে দেখিতে পারিল না, কাজেই বিবাহের পর রাণী পিতৃগৃহে আসিলে শ্বশুরালয়ের আর কেহই তাহার কোন সংবাদ লইল না, অথচ তাঁহারা পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প স্থির করিল। রাণীর পিত্রালয় কলিকাতায়, তাহার শ্বশুর একজন পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট জমিদার। কলিকাতায়ও তাঁহার একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল। জমিদার মহাশয় অধিকাংশ সময়েই কলিকাতায় বাস করিতেন। বিবাহ সম্বন্ধ ও বিবাহাদি কলিকাতাতেই সমাহিত হইয়াছিল। রাণীর শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, রাণীর শাশুড়ী ও স্বামী অন্যান্য পরিজন সহ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। পুত্রবধূ রাণীকে তিনি খোঁজ করিলেন না, সে নিরাশ্রয়া হইয়া পিত্রালয়ে পিতামহীর নিকটই অবস্থান করিতে লাগিল।

ভগবান বিরূপ হইলে বিপদের উপর বিপদ, তখন সর্ব্বপ্রকার বিপদ রাশিই মূর্ত্তিমান হইয়া মানবকে আক্রমণ করে। রাণীর পিতার এক জ্ঞাতি সুযোগ বুঝিয়া সেই অসহায়াদিগের উপর মোকদ্দমার ফাঁদ পাতিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। এই মকর্দ্দমায় উকীলের পরামর্শে তাহাদের জীবন এবং বসতবাটীখানি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল। এখন তাঁহারা পথের ভিখারী, অন্নের সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। অগত্যা এখন তাহাদিগকে শহর ছাড়িয়া সহরতলিতে একখানি গোলপাতার ঘরে বাহিরা আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হইল। এইভাবে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। রাণীর পিতামহী যৌবন-বিকশিতা রাণীর জন্য বড়ই চিন্তিতা হইয়া

উঠিলেন। তাঁহার শশুরালয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, তাহার শাশুড়ীর নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া চিঠিপত্র লিখিলেন কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তিনি পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। নানা চিন্তায় বৃদ্ধার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। ভিক্ষায় আর অন্ন জুটে না, কি উপায় হবে, কিরূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বদাই তিনি আকুলা থাকিতেন।

এদিকে প্রতিবেশীবৃন্দেরা পুরুষোত্তমে রথ দেখিতে যাইতেছেন। তন্মধ্যে জনৈক মহদাশয় ব্যক্তি সদয় হইয়া, ইহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন, যথা সময়ে ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পুরীধাম যাত্রা করিলেন।

(২)

ঠিক মনে পড়ে না—সে বৎসর রথের সময় আরও কি একটা যোগ পড়িয়াছিল, কাজেই পুরীতে সে বৎসর বহু-লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই সময় ভীষণ মূর্ত্তিতে তথায় ওলাদেবীও আবির্ভূতা হইলেন, কলেরায় বহুলোক মরিতে আরম্ভ করিল, পুলিস লোক তাড়াইতে ব্যস্ত, যাত্রীগণও পলাইবার জন্য ব্যস্ত। রাণী ও তাহার পিতামহী যাহাদের সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—"আজই আমাদের যাইতে হইবে, তোমরা শীঘ্র গঙ্গার ধারে জাহাজ ঘাটে চল"। এই কথা বলিতে বলিতে সকলে গঙ্গার ধারে চলিল, কিন্তু রাণী নড়ে না, সঙ্গীরা বলিল—"তুমি বসিয়া রহিলে যে, তুমি যাবে না?" রাণী বলিল—"ঠাকুরমা গঙ্গা নাইতে গিয়াছেন, তিনি না আসিলে আমি কেমন করিয়া যাইব?"

রাণীর এই কথা শুনিয়া সঙ্গীরা রাগিয়া বলিল,—"তোমাদের জন্য কি জাহাজ বসিয়া থাকিবে? যে'তে হয় তো শীঘ্র চল, নতুবা তোমাদের যাওয়া হবে না। অপর একজন রাণীকে বলিল—তুমিই চল না কেন, বুড়িকে না হয় গঙ্গার ধার হ'তে খুঁজে নেব।" এই কথা বলিয়া সঙ্গীরা অগ্রগামী হইল, রাণী আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। জাহাজ ছাড়িবার উপক্রম-সূচক বংশীধ্বনি হইতেছে দেখিয়া, রাণীদের সঙ্গীগণ কোন্‌দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া জাহাজে উঠিল; কিন্তু বালিকা তাহাদের সহিত দৌড়িতে পারিল না, অনেক পিছনে পড়িয়া রহিল। এদিকে রাণীর ঠাকুরমাকে সঙ্গীরা পূর্ব্বেই জাহাজে উঠাইয়াছে! বৃদ্ধা রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করায়, সকলেই বলিল—সে অগ্রে উঠিয়াছে। রাণীর ঠাকুরমা জাহাজে উঠিয়া রাণীকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনেক লোকের ভিড়, অনুসন্ধান করাও সহজ নয়। অনেকে বলিল, ইহার পর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে; কিন্তু বৃদ্ধার মন বুঝিল না, সে ষ্টিমারের কিনারায় যাইয়া তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে লাগিল। যখন ষ্টিমারের সিঁড়ি তুলিয়াছে, ষ্টিমার ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় রাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টিমারের নিকট আসিয়া 'ঠাকুরমা ঠাকুরমা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু ষ্টিমারে উঠিতে পারিল না; ষ্টিমার ছাড়িয়া দিল। এদিকে ষ্টিমার হইতে

ঠাকুরমা "রাণী রাণী" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কান্না কে শুনে, ষ্টিমারের সারেঙ্গ বেগে ষ্টিমার চালাইয়া দিল; ষ্টেশনে বালিকা রাণী উলট্ পালট্ খাইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ষ্টিমারে বৃদ্ধা পিতামহী প্রাণপণে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সকলকে বলিতে লাগিল, "তোমরা আমার রাণীকে উঠাইয়া লও, নতুবা আমায় গঙ্গায় ফেলিয়া দাও।" বৃদ্ধার দুঃখ দেখিয়া দুই এক জন লোক সারেঙ্গকে অনুরোধ করিল বটে, কিন্তু সারেঙ্গ সে কথা গ্রাহ্য করিল না; কাজেই বালিকা রাণী আত্মীয়-স্বজন সঙ্গী এবং ঠাকুরমা প্রভৃতিকে হারাইয়া, অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকজনের নিকট থাকিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল।

(৩)

রাণী মনের আবেগে—প্রাণের দুঃখে—প্রাণপণে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনের রোল শুনিয়া অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অপরূপ রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না যুবতী রাণীকে দেখিয়া, কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল। কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ কেহবা উপহাস করিতে লাগিল। এমন সময় একটি সুপুরুষ যুবক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যুবকের প্রাণ সর্ব্বদাই পরদুঃখে কাতর হইত, সুতরাং ক্রন্দনের রোল শুনিয়া তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বালিকাকে তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলিয়া, আমার ঠাকুরমাকে লইয়া দেশে চলিয়া গেল, জাহাজ ছাড়িয়া গেল, আমি আর কিছুতেই জাহাজে উঠিতে পারিলাম না, এখন আমার কি উপায় হবে বাবু! আমায় রক্ষা কর বাবু!"

যুবক। তোমার নিবাস কোথায়?

বালিকা। কলিকাতায়।

যুবক। এখানে কেন আসিয়াছিলে? তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?

বালিকা। এখানে আমি ও আমার ঠাকুরমা, পাড়ার লোকের সহিত রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমরা নিতান্ত দীনদরিদ্র। পাড়ার একটী লোক দয়া করিয়া, খরচ দিয়া, আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

যুবক। তোমরা কি লোক?

বালিকা। ব্রাহ্মণ।

যুবক। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

বালিকা নিরুত্তর, কিন্তু যুবক বালিকার সীমান্তে সিন্দুর দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, বালিকা বিবাহিতা, এইজন্য আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও; আমি তোমাকে তোমার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিব।"

বালিকা বলিল,—"আমার ঠাকুরমা যে আমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইবেন।"

যুবক। সেজন্য তোমার ভয় নাই, আমি আজই টেলিগ্রাফ করিয়া তাঁহাকে তোমার সংবাদ জানাইব। এখন তুমি নির্ভয়ে আমার সহিত চল।

বালিকা রাণী নিরুপায়, সুতরাং যুবকের

ভদ্রলোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা শুনিয়া; এবং সজ্জনের ন্যায় চেহারা দর্শন করিয়া, অগত্যা সাহসে ভর করিয়া তাঁহার সহিত যাইতে স্বীকৃতা হইল। উহারা উভয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করিলে, অনেক লোকে অনেক রকম কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"যে কলিকাতার লম্পট জুয়াচোরে ধরিয়াছে।" কেহ বা বলিল,—"ছুঁড়িটার সর্ব্বনাশ করিবে।" আবার অনেকে বলিল, "ছুঁড়িটার চেহারা ভাল, ছোঁড়াটাও মন্দ নয়,বড়মানুষের ছেলে।" ইত্যাদি নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

(৪)

রাণীর পিতামহী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। শোকে-দুঃখে অধীরা হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া আবার চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় টেলিগ্রাফ পাইলেন, যে রাণীর জন্য চিন্তা নাই কল্যই রাণী বাটীতে পৌছিবে। এই সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধা কতক সুস্থিরা হইলেন বটে; কিন্তু চিন্তা দূর হইল না, সমস্ত রাত্রি দারুণ ভাবনায়, অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে একটী যুবকের সহিত একখানি শিবিকারোহণে রাণী বাটী আসিয়া পৌছিল। রাণীর বৃদ্ধা পিতামহী আনন্দে অধীরা হইয়া পড়িলেন, যিনি রাণীকে রক্ষা করিয়া লইয়া আসিলেন, তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাত নাই; তিনি রাণীকে লইয়াই ব্যস্ত। যুবক আর কালক্ষেপ না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। যুবক চলিয়া গেলে রাণী অধীরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হা ঠাকুরমা, যিনি আমাকে এত যত্নে রক্ষা করিয়া লইয়া আসিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?" তখন ঠাকুরমার হুস্ হইল, তাইতো তিনি কোথায় গেলেন, রাণী ছুটিয়া রাস্তায় তাঁহাকে খুজিতে গেল, কিন্তু কৈ তাঁহাকে পাওয়া গেল না। ঠিক এক ঘণ্টা পরে এক জন লোক কয়েকজন মুটিয়া দ্বারা অনেকগুলি জিনিষপত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, একটী বাবু এই জিনিষপত্র তোমাদের জন্য পাঠাইয়াছেন, আর এই পত্র দিয়াছেন।" রাণী সামান্য লেখাপড়া জানে, পত্র খুলিয়া পড়িল,—

"তোমাদের দুঃখে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইয়াছে। এইজন্য এই জিনিষগুলি যত্নের সহিত তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিলাম, গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না; আমি সময়ান্তরে যাইয়া তোমার ঠাকুরমার পদধূলি লইব। ইতি,—তোমার সেই পুরুষোত্তমের পরিচিত ভদ্রলোক।"

পত্র পাইয়া এবং ঐ জিনিষগুলি দেখিয়া রাণী ও তাহার ঠাকুরমা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, জিনিষগুলি তুলিয়া রাখিলেন বটে কিন্তু কিছুই খরচ করিলেন না।

যুবককে দর্শনাবধি বালিকা রাণীর মন যেন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সে মনে করিতেছিল, কবে কোথায় যেন একবার এই মুখখানি দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় যে দেখিয়াছি তাহা ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সদাই ঐ মুখ মনে পড়িতেছে, আর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। লোকটিকে কেন আপনার লোক

করিয়াই বোধ হয়। কেন হয়! আমি অভাগিনী আমি বিবাহিতা; কিন্তু স্বামীর নিকট বঞ্চিতা তবু সেই স্বামী ভিন্ন আর আমার গতি নাই। আমি হিন্দুরমণী; সতীত্বই আমার পরম গতি, এজীবনে এক দিনও কি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পারিব না? ভগবান্ কি আমার সাধ পূর্ণ করিবেন না?"

অভাগিনী বালিকা রাণী এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এদিকে পাড়ায় নানারূপ কথা উঠিল, সকলেই বালিকা রাণীর নামে কলঙ্ক রটনা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ ঐ জিনিষ পত্রগুলি আসাতে লোকের আরও হিংসা হইয়াছে। কাজেই কুৎসা করিতে আর কেহ ত্রুটি করিতেছে না। যখন এই সকল কথা রাণীর ও রাণীর বৃদ্ধা পিতামহীর কর্ণগোচর হইল, তখন আর তাহাদের দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহারা মরমে মরিয়া গেলেন।

(৫)

এইরূপে শোকে দুঃখে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিন বৈকাল-বেলা সেই যুবক আসিয়া বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা যুবককে দর্শন করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের নামে যে কলঙ্কারোপ হইয়াছে, এই জন্য দুঃখে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। যুবককে সমাদর করিয়া বসিতে বলিয়া বৃদ্ধা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু বালিকা রাণী তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করিল না, তাহার হৃদয়ে যেন আপনা হইতেই কিরূপ লজ্জা ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা বলিল—'বাপু তুমিই আমার রাণীকে রক্ষা করিয়াছ। আমি বৃদ্ধা, তোমাকে কি আর আশীর্ব্বাদ করিব—তুমি রাজা হও, সুখে থাক। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

যুবক। কেন, আপনাদের এত কষ্টের কারণ কি? আমি যে সকল জিনিষ পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা যদি ফুরাইয়া যাইয়া থাকে, আমায় বলুন।

যুবকের এই কথায় বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল। বৃদ্ধা বলিল,—'না বাপু, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহার সমস্তই আছে অধিকন্তু আরও বিপদে পড়িয়াছি—সমাজে আমরা বদ্ধ হইয়াছি।" যুবকের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। বালিকাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন বলিয়াই সমাজ উহাদের নামে কলঙ্কারোপ করিতেছে, যাহা হউক, তিনি বলিলেন—"প্রাণপণে তোমাদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিব।" বৃদ্ধা বলিল,—"বাপু তোমার যেরূপ চরিত্র, তুমি নিশ্চয়ই সদ্বংশজাত। যাহা হউক, তোমার নামটী কি এবং নিবাস কোথায়, জানিতে পারি কি?"

যুবক। আমার নিবাস বঙ্গদেশ, তবে কলিকাতায় আমাদের বাড়ী আছে, সেই স্থানেই অনেক সময় অবস্থান করিয়া থাকি, আমার নাম রমাকান্ত মুখোপাধ্যায়। বৃদ্ধা যুবকের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং যুবকের মুখপানে চাহিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—"বাপু তুমি কি সেই কৃষ্ণকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র?"

যুবক। আজ্ঞা হাঁ।—

বৃদ্ধা। ভাল, সব বুঝিলাম। তুমি কি করুণাময় গাঙ্গুলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে?

যুবক। আজ্ঞা হাঁ;—

বৃদ্ধা। ভাল, কি দোষে বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে?

যুবক। আমি ত্যাগ করি নাই, মা দুঃখিতা হইয়া অভাগিনী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু আমি সেই স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিব। সেই জন্য আমি আর বিবাহ করি নাই।

বৃদ্ধা। যদি সাক্ষাৎ পাও, গ্রহণ করিবে কি?

যুবক। নিশ্চয়ই!

বৃদ্ধা গৃহপ্রবেশ করিয়া রাণীর হস্তধারণপূর্ব্বক যুবকের পার্শ্বে আনিয়া বলিলেন,—"এই লও, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমায় মুক্তি দেও। প্রতিবাসীদের কলঙ্কের কথা আর শুনিতে পারি না।"

যুবক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, উঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা সমস্ত বিবরণ যুবকের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। রমাকান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে সেই দিনই উঁহাদিগকে কলিকাতার নিজ বাটীতে আনিয়া রাখিলেন এবং পুনরায় মোকর্দ্দমা করিয়া শ্বশুরের সমস্ত বিষয় উদ্ধার করিলেন। দম্পতী উভয়ে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। দুঃখিনী রাণীর গ্রহের ফের কাটিল। অপরূপ রূপ-মাধুরী পাইয়া রাণী এতদিনের জন্যও গর্ব্ব করে নাই, ঠাকুরমার আশ্রয়ে থাকিয়া সে অনেক দিন অনাহারে কাটাইয়াছে তথাপি সে রূপযৌবনের প্রলোভনে দিশাহারা হইয়া বিপথগামী হয় নাই। ঠিক ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়াই যে আজ তাহার এই সৌভাগ্যোদয় হইল—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে।

———

য, না, চ।

জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা।

আমাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম—কাজে-কাজেই আমরা ভিন্ন প্রকারের মানুষ। আমাদের হাব, ভাব, ঠাট ঠমক, চাল চলন, আচার ব্যবহার একেবারে—আলাহিদা রকম না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্যের চোখে আমরা অদ্ভুত হইলেও, আমরা কিন্তু সত্যসত্যই অত্যন্ত সহজ। আমাদের সত্যকার জগৎ আমাদের জীবনকে এক বিচিত্র ভাবেই গঠন করিয়া থাকে। আমাদের জননী আমাদিগকে বিভিন্নভাবেই স্তন্য দিয়া থাকেন। আমরা ধূলামাটি মাখিয়াই মানুষ হই, তালপাতায় লিখিয়াই হাত পাকাই, কুঠিরে বসিয়া বেদান্ত আলোচনা করি, পর্ণাচ্ছাদিত মণ্ডপে বসিয়া সভাসমিতি করি। আমাদের সুখ দুঃখ—আমোদ আহ্লাদ সমস্তই—বিভিন্ন প্রকারের। বিদেশীয়েরা আমাদিগকে দেখিয়া হাসে কিন্তু আমাদের জীবনও কঠিন নিয়মে গড়া, তাহাতে হাসিবার কিছুই নাই।

আমাদের জগৎটাও একটু বদলাইয়াছে, আমরাও একটু বদলাইয়াছি। আমাদের বাগানে এখন হাস্না-হানাও কখন কখন গন্ধ ছাড়ে। আমরা এখন আর তালপাতায় লিখি না,

কলাপাতে খাই না জলাশয়ে স্নান করি না। প্রিয়জন বিরহে এখন কেহ ভুঁয়ে লুটাইয়া কাঁদে না, সোফায় শায়িত হইয়া চক্ষে রুমাল দিয়া থাকে। উৎসবের সময় আর দ্বারে দ্বারে গিয়া বিনীত ভাবে নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা নাই, স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত পত্রদূত পাঠাইবার রীতি প্রবর্তিত হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি যে প্রকার হু হু করিয়া আরম্ভ হইতেছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে ক্রেনে করিয়া মৃতব্যক্তিকে শ্মশানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব নহে। এই সকল পরিবর্তনানিবন্ধন আমাদের জীবনও বড় জটীল হইয়া পড়িতেছে এবং গ্রাম্য সরলতা আমাদিগকে পরিহার করিতে বসিয়াছে এবং নাগরিক কুটিলতা তাহার স্থান অধিকার করিয়া জীবনকে বিষময়, জ্বালাময় করিয়া তুলিতেছে।

হাব, ভাব চিন্তা কর্ম্মের সমতার দ্বারা জাতীয় জীবন নির্ণিত হয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে আমরা আজ আমাদের জাতীয় জীবন হারাইতে বসিয়াছি। কোনও ব্যক্তির সহিত কোনও ব্যক্তির মিল নাই, কেহই এক হাবভাবে অনুস্যূত নহে। অতীতের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি এবং আপনার আদর্শ রক্ষা না করিয়া পরের আদর্শ অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িতেছি। ফলে একটা জাতি না হইয়া জাতীয় নকল হইয়া পড়িতেছি, সোনা না হইয়া গিল্টি হইয়া পড়িতেছি, হীরা না হইয়া পাথর হইয়া পড়িতেছি, শিব সাজিতে গিয়া বাঁদর সাজিতেছি। ইহা অপেক্ষা আর অধিক আক্ষেপের বিষয় কি আছে।

যাহাদের আদর্শ ছিল সংযম, তাহাদের আদর্শ হইয়াছে বিলাসিতা। যাহাদের আদর্শ ছিল ত্যাগ, তাহাদের আদর্শ হইয়াছে ভোগ। যাহাদের আদর্শ ছিল জ্ঞান, তাহাদের আদর্শ হইয়াছে মোহ। হিংসা দ্বেষ, ঘৃণা এবং লোভে লোক একেবারেই পশু অপেক্ষাও অধম হইতে বসিয়াছে। ভাল খাইব, আরামে ঘুমাইব বিপদকে বাঘের মত ভয় করিব, কর্ত্তব্য হইতে দূরে থাকিব এবং ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিব—ইহাই জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবাসী আর ভারতবর্ষকে ভালবাসে না। বুঝিতে হইবে ভারতবাসীও মরিতে বসিয়াছে। মা কন্থা পরিধান করেন বলিয়া যে পুত্র তাঁহাকে অবমাননা করে সে কৃতঘ্ন এবং ঘৃণ্য নারকী, কুক্কুর অপেক্ষাও নীচ। ভারতমাতা কাঙ্গালিনী বলিয়া যে জন্মভূমিতে অবজ্ঞা করে সে পাষণ্ড, নিরয়ের জীব, বিষ্ঠার কীট।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সংসার-চিত্র। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, একখানি ছোট গল্পের বই। মূল্য ১৷৹ আনা, সুন্দর বিলাতীবৎ বাঁধাই, কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়। রামপদ বাবুর উপন্যাস বা গল্প রচনায় বেশ কৃতীত্ব আছে—এ কৃতীত্ব আর কিছুই নহে, তিনি আজগুবী গল্পের অবতারণা করিয়া পুস্তকের অঙ্গ পরিপুষ্টি করেন না; সত্য ঘটনা মূলক গল্পই তাঁহার অবলম্বন, তাহাতে আবার ধর্ম্মের রসান দিয়া তিনি গল্প গুলিকে এত মধুময় করিয়া তুলেন যে, পাঠ করিয়ে হিন্দু পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ হইবেন, হিন্দুর সংসারের নিখুঁৎ ছবি আঁকিতে গ্রন্থকার বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সংসার চিত্রের চিত্র, এই জন্য এত পরিস্ফুট ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা পুস্তক পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এইরূপ সদ্গ্রন্থের আদর একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচনা—

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বঙ্গ তোমার, জননী তোমার, ধাত্রী তোমার, তোমার দেশ।
কিসের দৈন্য কিসের দুঃখ? নাহিক মোদের শোকের লেশ
অভাবে তোমার নশ্বর দেহের। মৃত্যু কখনো আছে কি তাঁর
বিশ্ব-পরাণে সম-লয় তানে বাজিয়াছে যার বীণার তার?
গড়েছি আমরা তোমার মূরতি সবাই আপন মনের মত;
পূজিতেছি সবে তোমারে, হে কবি, সপ্তকোটী শীর্ষ করিয়া নত!

আশুতোষ

দৃষ্টি-হারা।

[মিল্‌টনের "On my blindness" শীর্ষক সনেট্‌ হইতে অনূদিত।]

নিখিল আলোক মম না হ'তে অতীত
জীবনের মধ্য-দিন,—এবে এ সংসার
একের অভাবে ঘোর অকূল আঁধার!
যদিও হৃদয় মোর অস্থির সতত
সেবিতে তা'দিয়ে মোর পরম পিতারে,—
পাছে তিনি রুঢ় মোরে করেন দণ্ডিত,
ভাবি যবে—প্রশ্ন হৃদি করে আলোড়িত,
প্রভু কি খাটায় দাসে অন্ধকার ক'রে?
সহিষ্ণুতা বলে করি' সন্দেহ-নিরাস—
অনন্ত মহিমা তাঁর,—লভি' বিন্দু নর
সাধে যাহা, তাহে তাঁর কি কার্য্য সংসারে?
যে সহে বিধান তাঁর—সে-ই শ্রেষ্ঠ দাস;
আজ্ঞা তাঁর জলে স্থলে ধায় নিরন্তর
অপেক্ষায় রহে যেবা—সেও সেবে তাঁরে!

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্‌-এ।

2 SEP. 1913

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

(দীনেশ বাবুর ভূমিকা।)

শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত একখানি "ছেলেদের চণ্ডী" আমরা উপহার পাইয়াছি। অতুল বাবু একজন ধার্ম্মিক, ভক্ত, সাধু ও সদাশয়, তাহার পরিচয় ও প্রমাণ নিম্ন-লিখিত অমৃতময় উপদেশে পাইয়াছি:— "দেশের বালক-বালিকাগণ! তোমরা দশ-ভূজা শ্রীদুর্গার চিন্ময়ী-মূর্ত্তি প্রাণের ভিতর উপ-লব্ধি ক'রে, পরমানন্দ উপভোগ কর, তা হলে

তোমাদের পুণ্যময় জীবনে পাপ তাপ কিছুমাত্র আস্‌তে পারবে না। তোমরা জীবনের আরম্ভ হ'তে চণ্ডী ও চণ্ডীমণ্ডপকে পূজা-ভক্তি ক'রে ধন্য ও পুণ্যময় হও। সংসারে মানুষ হ'তে হ'লে সনাতন-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র হৃদয় মধ্যে জপ করে ধর্ম্ম-সাধন কর্‌তে হয়। জগজ্জননী দুর্গতি-নাশিনী চণ্ডী তোমাদের ধর্ম্ম-জীবন লাভে সহায় হউন" ইত্যাদি। যিনি চণ্ডীর সহিত চণ্ডী-মণ্ডপকে পূজা করিতে উপদেশ দেন, তিনি কত বড় বিশ্বাসী, কতদূর আস্তিক তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহার চিত্ত এতাদৃশ পুতভাবে পরিপূর্ণ, যিনি নিজ মাতার নামে পুস্তক উৎসর্গ করিতে গিয়া মাতাকে সেই জগজ্জননীর অংশ ভাবিয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তবের মহামন্ত্র ঃ—

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

অগ্রে আবৃত্তি করিয়া তবে মাতাকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছেন, জানি না তিনি কোন্ বিড়ম্বনাবশে দীনেশবাবুকে পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে দিয়া গ্রন্থের পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াছেন, গ্রন্থখানি কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাহেবদের দেখাদেখি যাঁহারা প্রাচীন-ভারতের ধর্ম্ম,সাহিত্য ও সভ্যতাকে সেদিনকার ইউরোপের মত আধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিতে সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ব্যয় করেন, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন রায় সাহেব মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। ছেলেদের চণ্ডীর ভূমিকা লিখিতে গিয়া তিনি সাহেব প্রীতির চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অবিরত সত্যানুসন্ধিৎসু সাহেবরা, যাঁহারা সত্যের আবিষ্কারের জন্য সর্ব্বদা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অমানুষিক কষ্ট সহিষ্ণুতা, অপরিসীম অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, সত্যাবিষ্কারের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দেন, তাঁহারা দীনেশবাবুর এই হটকারিতায়, এই সত্যের অপলাপে প্রীত হইবেন কি না জানি না। দীনেশ বাবুর হটকারিতার ও প্রগল্‌ভতার নানা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু যে গ্রন্থ হিন্দুর গৃহে গৃহে আরাধ্য দেবতার ন্যায় পূজিত হয়, যে গ্রন্থ পঠিত হইবার পূর্ব্বে দেবতার ন্যায় পুষ্প-চন্দন নৈবেদ্য দ্বারা সম্পূজিত হইয়া পঠিত হয়, তাহা বালক-ক্রীড়নকের মত ব্যবহার প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই অসহ্য। দীনেশ-বাবু ভাবিয়াছেন, ইদানীং তিনি যাহা লিখিবেন, তাহাই লোকে অকাট্য সত্য ভাবিবে, যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিবে; তাঁহার প্রলাপও সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইবে। অন্যান্য পুস্তক বা প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা ভাবেন ভাবুন, লোকে সে সব পুস্তক বা প্রবন্ধ যে ভাবে গ্রহণ করেন করুন, আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্বন্ধে তাঁহার হটকারিতা ও প্রগল্‌ভতা সহ্য করিয়া থাকিব না। তাঁহার ভূমিকা নিতান্ত হাস্যাস্পদ অসার ও অপদার্থ হইয়াছে; আমরা এক্ষণে তাহাই প্রমাণ করিব।

কোন্ ঐতিহাসিক প্রতিভাবলে দীনেশ-বাবু মেধসাশ্রমকে বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জানিতে আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। সপ্তশতী চণ্ডীর মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে তাহার উল্লেখ নাই। গ্রন্থের

মধুকৈটভ বধ অধ্যায়ে এই মাত্র লেখা আছে ঃ—

"ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।॥ ৮॥
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণমুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥৯॥
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরং স্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১০॥
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্ট চেতনঃ॥ ১১॥

"অনন্তর রাজার রাজ্যও অপহৃত হইল, তখন তিনি মৃগয়া করিবার ছলে একাকী অশ্ব আরোহণ করিয়া নিবিড় অরণ্যে গমন করিলেন।" ৮।

"রাজা দেখিলেন, অরণ্য মধ্যে দ্বিজবর মেধস মুনির আশ্রম, তথায় হিংস্র জন্তুগণও শান্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, মুনি ও শিষ্যবৃন্দ আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন ॥৯॥

"মেধসমুনি রাজার আতিথ্য-সৎকার করিলে রাজা সেই মুনিমণ্ডল মণ্ডিত আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিলেন। তথায় তিনি মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত,
অনূদিত বঙ্গবাসীর শ্রীশ্রীচণ্ডী।

পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার মধ্যে বিন্ধ্যাচলের নাম গন্ধও পাইলেন কি? তারপর সমগ্র চণ্ডী তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া দেখুন মেধসাশ্রম যে বিন্ধ্যাচলের নিকট, তাহার আভাসও সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নাই। কেনই বা থাকিবে? মেধস ঋষি, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের নিকট মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছিলেন মাত্র, আখ্যায়িকা কিংবা ইতিহাস লেখকের নিবাস ঘটনা স্থলের নিকট হইবে দীনেশ বাবুর এ আব্দার কেন হইল? [illegible]কত সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই অপরাধে কি তাঁহাদের নিবাস ভারতবর্ষেই হইতে হইবে। অথবা এদেশী কেহ যদি ইংলণ্ড বা গ্রীস দেশের ইতিহাস লিখেন, তবে তাঁহার বাসভূমি বাঙ্গালায় না হইয়া ইংলণ্ডে কি গ্রীসদেশে হইবে? দীনেশ বাবুর এই উদ্ভট ধারণা যে উহা বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল; কি করিয়া এই বিষম ধারণা হইল, ধারণা স্বপ্নলব্ধ কিনা দীনেশবাবু তাহার কিছুই বলেন নাই। বরাবর তাঁহার যেমন সকল কথা জবরদস্তী করিয়া লেখা, গায়ের জোরে সকল মত বদলাইতে চাহেন, ইহাও তাহার একটি নিদর্শন। নহিলে "শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ প্রভৃতি দেবীলীলা-ঘটিত ব্যাপার বিন্ধ্যাচলে ঘটিয়াছিল বলিয়া চিরকাল জনশ্রুতি আছে।" যথেচ্ছাভাবে এরূপ লিখিবেন কেন! পাঠক-পাঠিকাগণ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠে বুঝিতে পারিবেন, কোথায় শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ আর কোথায় বিন্ধ্যাচল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীদূত সংবাদে পঞ্চমোধ্যায়ে আছে ঃ—"পরাজিত রাজ্যভ্রষ্ট ও অধিকারচ্যুত সকল দেবগণকে অবশেষে শুম্ভনিশুম্ভ অপমানিত করিয়া নিষ্কাশিত করিয়া দিলে তাঁহারা সেই (পূর্ব্বোপকারিণী) অপরাজিতা দেবীকে অসুর জয়েচ্ছায় স্মরণ করিলেন, ভাবিলেন "তিনি আমাদিগকে বর দিয়াছিলেন "যে

আপৎকালে তোমরা আমাকে স্মরণ করিলে তোমাদিগের সকল আপদ তৎক্ষণাৎ দূর করিব।" (তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ ২৭০ পৃঃ)

"ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ"॥৬

"দেবগণ এই চিন্তা করিয়া গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন, অনন্তর তথায় সেই বিষ্ণুমায়া দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।" ৬

সে স্তব চণ্ডীর অতুলনীয় স্তব কয়টীর অন্যতম; *সে স্তব জ্ঞানবিজ্ঞান ভক্তির পরাকাষ্ঠা*, সে স্তবে ভগবদ্ভক্তি মায়ার সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত। স্তব করিবার পর ঃ—

"এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥৩৭॥"

"হে রাজনন্দন! দেবগণ এইরূপ স্তবাদি করিতে থাকিলে পার্ব্বতী তাঁহাদের সমক্ষেই তথায় জাহ্নবী নাম্নী নদীর জলে স্নান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন।"

"ভাষা ব্যাখ্যা। গঙ্গাজলে স্নান করিবার নিমিত্ত এই অনুবাদ সহজ লভ্য, পরন্তু তৎকালে হিমালয়ে গঙ্গার আবির্ভাব না হওয়ায় জাহ্নবী নাম্নী নদী বলিতে হইয়াছে, অথবা জাহ্নবী শব্দের অর্থ "গঙ্গাসদৃশ নদী।" শ্লোকের অপর অর্থ যথা—"পার্ব্বতী ব্রহ্মলোকস্থ গঙ্গাজলে স্নান পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে কোন সাধারণ জলে স্নান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন।" ৩৭

(তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ)

উল্লিখিত শ্লোকে স্থানটী হিমালয় বলিয়া লিখিত; *বিন্ধ্যাচল ত নহে। যে নদীতে দেবী* স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সে নদীর ও আবির্ভাব হিমালয়ে। ভারতবর্ষের কোথায় হিমালয় আর কোথায় বিন্ধ্যাচল। দীনেশ বাবুর ভূগোল জ্ঞান ও ত বেশ পরিপাটী। শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ ব্যাপার যে বিন্ধ্যাচলে ঘটিয়াছিল, কোন্ জন দীনেশবাবুর শ্রুতিমূলে এ কথা চিরকাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন? "চিরকাল জনশ্রুতি" জোর করিয়া এত বড় কথা বলা দীনেশ বাবুর মত সারাজীবন প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য *চর্চ্চাকারী ব্যক্তির কি বিবেক সঙ্গত কার্য্য* হইয়াছে? এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি, দীনেশ বাবু ভূমিকাতে বলিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মিবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডী বিরচিত হইয়াছিল। চণ্ডী প্রণয়ন কালের প্রমাণ আমরা যথাস্থলে দিব; এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখি, হিমালয়ে গঙ্গার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ-ঘটনা। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ দিলীপ-তনয় মহারাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিৎ, ভূগোলবেত্তা দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় গণনা করিয়া বলিয়া দিবেন কি, খৃষ্টের কত শতাব্দি পরে ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন? কারণ তাঁহার গণনা মতে খৃষ্টের দুই শতাব্দি মাত্র পূর্ব্বে যখন চণ্ডী বিরচিত হইয়াছে, তখন হিমালয়ে গঙ্গার আবির্ভাব হয় নাই; অতএব খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দি পরে ভগীরথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিহারি দীনেশ বাবুর পাণ্ডিত্য! বলিহারি দীনেশ বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি! এক্ষণে পাঠক পাঠিকা-গণ বুঝুন, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ

ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। ত্রেতা-যুগের পর দ্বাপর যুগ; দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ সেই দ্বাপর যুগের শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ঐতিহাসিকগণের মতে সে মহাযুদ্ধ খৃষ্ট জন্মিবার কয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। দীনেশ বাবু কি এসব কথা জানেন না? তিনি জানিয়া শুনিয়া হয় একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের বাহাদুরী লইবার জন্য অথবা প্রতীচ্য জাতিদের মনস্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় নিঃসঙ্কোচে, অম্লান বদনে, প্রখর দিবালোকে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন: ছেলেদের চণ্ডীতে ভুল লিখিয়া, তাহাদিগকে ভুল শিখাইতে গিয়া পাপভাগী হইয়াছেন। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ যে কখনই বিন্ধ্যাচলে হয় নাই, তাহার আরও পরিষ্কার, জ্বলন্ত প্রমাণ শ্রীশ্রীচণ্ডীর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটিতে পাওয়া যাইবে ঃ—

"তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৪১
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ" ॥৪২।

"দেহ হইতে কৌষিকী আবির্ভূতা হইলে পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণ হইলেন এবং হিমাচলবাসিনী কালিকা নামে বিখ্যাতা হইলেন ॥" ৪১

"অনন্তর শুম্ভ নিশুম্ভ-ভৃত্য চণ্ড-মুণ্ড-সুমনোহর পরম রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতা কৌষিকী অম্বিকাকে অবলোকন করিলেন।" ॥৪২

(তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ)

তারপর দীনেশবাবু লিখিতেছেন,—বিন্ধ্যাচলবাসিনীর মন্দির এখনও তথায় দৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা কি প্রমাণ হইল, শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে হইয়াছিল? বিন্ধ্যবাসিনী দেবী ত পার্ব্বতীও নহেন, কৌষিকীও নহেন। দীনেশবাবু কি শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১১শ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকদুটি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ ব্যাপার বিন্ধ্যাচলে ঘটিয়াছিল?

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভ শ্চৈবান্যা বুৎপৎস্যোতে
মহাসুরৌ ॥" ৩৭॥
"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৩৮॥

"দেবী বলিলেন,—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগে আবার শুম্ভনিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে ॥" ৩৭॥

"আমি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে উৎপন্না হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে বিনাশ করিব।"

(তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ)

এইবার পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখুন, শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধকাহিনী স্বারোচিষ মন্বন্তরের অথবা তৎপূর্ব্বের ঘটনা। তৎপূর্ব্বের ঘটনা বলিলাম, এই জন্য যে, সুরথ রাজা স্বারোচিষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন:—

"স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥৩

"(বর্ত্তমান মন্বন্তরের) পূর্ব্বে স্বারোচিষ নামক (দ্বিতীয়) মনুর সময়ে সমস্ত ভূমণ্ডলে সুরথ নামে চৈত্র রাজবংশ-সম্ভূত (এক) রাজা ছিলেন॥৩।". (তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ)

মেধস ঋষি সেই সুরথ রাজাকে বলিলেন ঃ—

"পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥১॥"

"ঋষি বলিলেন,—পূর্ব্বকালে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয় গর্ব্ব ও বলের প্রভাবে ত্রৈলোক্য এবং যজ্ঞীয় অংশ ইন্দ্রের নিকট কাড়িয়া লইল।

(তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ)

স্বরোচিষ মন্বন্তরে জাত সুরথ রাজাকে মেধস ঋষি বলিলেন—"পূর্ব্বকালে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়" ইত্যাদি; সুতরাং যুদ্ধব্যাপার স্বারোচিষ মন্বন্তরেরও পূর্ব্ব ঘটনা, স্বারোচিষ মন্বন্তরের মধ্যেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকিলেও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে লিখিত যুদ্ধ দ্বিতীয়মন্বন্তরের ঘটনা; আর বিন্ধ্যাচলবাসিনী কর্তৃক যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, তাহা বর্ত্তমান মন্বন্তর বা সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগের ঘটনা। এক্ষণে দেখা যাউক প্রত্যেক মন্বন্তর কত বৎসর।

অমরকোষ,লিঙ্গপুরাণ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, অগ্নিপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতির মতে প্রত্যেক মন্বন্তর ৩০ কোটী ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। স্বারোচিষ মন্বন্তরের পর ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারি মন্বন্তর গত হইয়াছে। চারি গুণ ৩০ কোটী ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর অতীত হইবার পর বর্ত্তমান ৭ম মনুরও ২৭ যুগ অতিবাহিত। পাঠক পাঠিকাগণ, ২৭ যুগ অর্থে ২৭টি মহাযুগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে এক মহাযুগ। এইরূপ ২৭টি যুগ অতিবাহিত হইয়া অষ্টবিংশতি যুগ চলিতেছে। প্রত্যেক মহাযুগ ৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসর। উক্ত গণনা শাস্ত্রীয় গণনা, উল্লিখিত অমরকোষ অভিধান, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও পুরাণগুলির অভিমত। এক্ষণে ভাবুন কত কোটি বৎসর পূর্ব্বে, কত মহাযুগ পূর্ব্বে শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত। এই সুদীর্ঘকালের কথা ভাবিতে গেলে, বিভোর হইতে হয়, মানুষ দিশাহারা হয়, কল্পনা করিতে গেলেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়; বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়। এত বড় বিরাট ব্যাপার লইয়া দীনেশবাবু ছেলে খেলা করিতে গিয়াছেন; "অমৃতং বালভাষিতং" রূপে খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডী লিখিত হইয়াছে, বলিয়াছেন। দীনেশ বাবুর মতানুযায়ী বিন্ধ্যাচলবাসিনী কর্তৃক চণ্ডী গ্রন্থে লিখিত শুম্ভ নিশুম্ভ ধরিয়া হইলেও যশোদা গর্ভজাত দেবী কি খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন? যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ কি খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বের অবতার?

সন্দেহ হইতে পারে, ২য় মন্বন্তরের গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডী ৭ম মন্বন্তরে অর্থাৎ বহুকোটি বৎসর পরে কিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন, "বেদশাস্ত্র নিশ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মের সকাশ হইতে অপ্রযত্নে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা, তাঁহা কর্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক বা প্রবৃত্তি বশতঃ সৃষ্টি হয় নাই। এইজন্য তাহা অপৌরুষেয়। তাহা প্রতিকল্পে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সমানভাবে ও সমান দেবতা, ছন্দ ও ঋষির সহিত প্রকটিত ও উচ্চারিত হয়, সুতরাং তাহা প্রবাহরূপে নিত্য। * ইত্যাদি।

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু কৃত—বেদান্ত দর্শন ১ম খণ্ড ব্যাখ্যা। ৬১ পৃষ্ঠা।

২য়ঃ ঋষীনাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ ।
সর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যে বৈভ্যোঃদদাত্যজঃ ॥
(শাঙ্কর ভাষ্য ধৃত)

"পূর্ব্বকল্পের ঋষিদের নাম এবং ঋষিদের বৈদিক জ্ঞান যাহা ছিল, প্রলয়াবসানে অর্থাৎ পরকল্পে নূতন সৃষ্টিতে বিধাতা তাহাদিগকে সে সমস্ত প্রদান করেন।"

"যথর্ত্তু ঋতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব এবং ভাবাযুগাদিষু।"
(শাঙ্কর ভাষ্যধৃত)

"যেমন ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পর্য্যায়ক্রমে সেই সেই ঋতু চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হয়, যুগের প্রারম্ভে সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু সেইরূপ আবির্ভূত হয়।"

চৌদ্দ মন্বন্তরে এক কল্প ; যখন পূর্ব্বকল্পের মত পরকল্পে বেদ সমানভাবে, সমান দেবতা, সমান ঋষি ও ছন্দ পর্য্যন্ত প্রকটিত ও উচ্চারিত হয় ; যখন পূর্ব্বকল্পের সেই নামীয় ঋষিগণ পূর্ব্বকল্পের জ্ঞান পর্য্যন্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তখন এক মন্বন্তরের গ্রন্থ চণ্ডী কয়েক মন্বন্তর পরে উৎপন্ন হইবে না কেন ? কেবল তাহা নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাযুগের ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরাদি প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন ; বর্ত্তমান মহাযুগের ত্রেতাযুগে সেই শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে সেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃষ্টির যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি ও বস্তু প্রতিযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়। সুতরাং দ্বিতীয় মন্বন্তরের শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ যে সপ্তম মন্বন্তরে থাকিবে, তাহা অদৌ অসম্ভব নহে ; তাহা প্রকৃত ঘটনা।

সুবিখ্যাত দার্শনিক, মনীষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম, এ, বি, এল মহাশয় "নব্য-ভারত" পত্রিকার ২২শ খণ্ডে ২৭৯ পৃষ্ঠায় "মেধসাশ্রম আবিষ্কার" প্রবন্ধে যে লিখিয়াছেন "বেদানন্দ স্বামী দৈববশে গৌরী তন্ত্রের শ্লোক প্রাপ্ত হইয়া মেধসাশ্রম আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই শ্লোকে যে লিখিত আছে কলিতে এই আশ্রমের আবিষ্কার হইবে, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত, সে আশ্রম চট্টগ্রামে অবস্থিত। দীনেশ বাবুর মতে বিন্ধ্যাচলের নিকট মেধসাশ্রম, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

দীনেশবাবু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবেন কি, চণ্ডীতে কোলগণের কোন উল্লেখ নাই, কোলাবিধ্বংসীর কথা রহিয়াছে ; এবং কোলাদের বাসস্থান বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী ভূভাগের সংশ্রবে নহে ; কাশ্মীর প্রান্তদেশে ; সংশ্রবটা হিমালয়ের সঙ্গেই হইতেছে, বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে নহে ঃ—

"তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা
(১ম অঃ ৪ শ্লোঃ)

বাহুল্য ভয়ে আমরা সমস্ত দেবীভাষ্য না দিয়া প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"কোলান্ শূকরান্ অবীন্ মেষাংশ্চ পৌনঃ পুণ্যেন নৈসর্গিকপ্রবৃত্ত্যাচ ধ্বংসয়ন্তো নাম কোলাবিধ্বংসিনঃ ভূপাঃ কাশ্মীরপ্রান্তদেশপতয়ো কল্যাদ ভেদাঃ সুরথস্য শত্রবো বভূবুঃ।"

নাগোজী ভট্টীর টীকার অংশ ঃ—

যে কোলাবিধ্বংসিনঃ কোলানাম তদীয় রাজ-

ধানী তৎ প্রমথনশীলঃ***যথা কোলান্ শূকরান্ বিধ্বংসিতুং খাদিতুং শীলং যেষাং স্তে যবনা ইত্যর্থঃ।”

শ্লোকের অনুবাদ ঃ—

“যখন তিনি ঔরস পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে যথাশাস্ত্র পালন করিতেছিলেন, তখন শূকর ও মেষঘাতী (কাশ্মীর প্রান্তদেশবাসী ম্লেচ্ছ) ভূপতিগণ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল।”

(তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ ৭৯৩ ৮০ পৃষ্ঠা)

দীনেশবাবু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিবশে কোলাবিধ্বংসিগণকে কোলগণ করিয়াছেন, আর বর্ত্তমান কোলাপুর কোলাগণের বাসভূমি ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, কোলাপুরের অধিবাসীগণ কোল নহে, অধিবাসীরা অধিকাশ মরাট্টা, রামোশী ও ভীল। (বিশ্বকোষ অভিধান) আমরাও এইবার বর্ত্তমান মধুপুরকে মধুদৈত্যের বাসস্থান বলিব। দীনেশ বাবুর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান বড় টন্‌টনে, বড়ই হাস্যজনক। হায়! ইঁহারাই আমাদের বঙ্গসাহিত্যের মুরুব্বী (authority)! অহো, বঙ্গসাহিত্যের কি শোচনীয় অবস্থা!

তারপর রায়সাহেব দীনেশবাবু লিখিয়াছেন —“হিন্দুদের বিশ্বাস দেবীযুদ্ধ সত্যযুগের আদি ঘটনা; অথচ বেদে ইহার উল্লেখ নাই। এতদ্বারা ইহাই অনুমিত হয়, যে আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে এদেশের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে চণ্ডীপূজা প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ প্রথমে এই পূজা স্বীকার করেন নাই, এজন্য বেদে ইহার উল্লেখ নাই।”

দীনেশবাবু নিশ্চয় জানেন, বেদে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানের কোন উল্লেখ নাই; রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় চণ্ডী ও আখ্যায়িকা। কেবল আখ্যায়িকা নহে, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য, কাব্যের ও দর্শনের সুমাবেশ; শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও কাব্য ও দর্শনের সমাবেশ,তা ছাড়া চণ্ডী একখানি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদে উল্লেখ নাই বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারত কি আধুনিক—খৃষ্টের দুই শতাব্দি পূর্ব্বের বা পরের ঘটনা? রামায়ণ যদি ত্রেতাযুগের ঘটনা হইতে পারে, মহাভারত দ্বাপরের ঘটনা হইতে পারে, চণ্ডী সত্য যুগের ঘটনা কেন না হইবে? তা ছাড়া ঋগ্বেদে দেবী আরাধনার কথা আছে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য যে দেবীসুক্ত জপ করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের দেবী-স্তোত্র। অতুল বাবু কি ভূমিকা লিখিয়া দিবার আর যোগ্য লোক পান নাই? যাঁহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, বিচার-শক্তি নাই, তাঁহাদের প্রতি এই গুরুভার অর্পণ কি জন্য? বলুন দেখি, কোন্ আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে চণ্ডীপূজা প্রচলিত? কোন্ আদিম জাতি শ্রীশ্রীচণ্ডীপূজা করিতে জানিত বা জানে? শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ যাহাতে সকল দর্শনের জটিল তত্ত্ব নিহিত, যাহা হিন্দুর একটী প্রধান আধ্যাত্ম গ্রন্থ; যাহা দেবভাষা সংস্কৃতে রচিত, যে ভাষা আদিম জাতিরা (আদিম নহে, ভারতের চির অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা; আর্য্যগণই আদিম জাতি) উচ্চারণও করিতে পারে না—সেই মহাগ্রন্থ পাঠ করিতে সক্ষম? এ কি ছেলেখেলা না আব্দার? দেশের বালকবালিকাগণও জানে, ত্রেতাযুগে

রাবণ বধ কালে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশ্রীচণ্ডীর পূজা করিয়াছিলেন। এক ত বেদে, পুরাণে রামা-য়ণে, মহাভারতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে উপ-নিবেশ স্থাপনের কথামাত্রও প্রমাণ নাই; আর্য্যগণ ভারতের চিরন্তন অধিবাসী; কল্পের পর কল্প, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, আর্য্যগণ ভারত-বর্ষে উদয় হইতেছেন, আবার বিলয় হইতেছেন। আর্য্যগণের সহিত এক বংশে উৎপন্ন এই আভিজাত্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ইউরোপীয়গণ বা সাহেবরা লিখিয়াছেন মধ্য এসিয়া হইতে প্রাচীন আর্য্যগণের এক শাখা ইউরোপে গিয়া বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন, আর এক শাখা ভারতবর্ষে গিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। তাঁহারা হইলেন ককেশাস জাতি। বহুকাল পরে আবার মোঙ্গোলিয়ান জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার। আমাদের বাবুরা সেই ধুয়াতেই ধুয়া ধরিলেন—এরূপ অদ্বিতীয় অনুকরণকারী ত জগতে আর কোথাও মিলিবেনা। সেদিন আবার শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় লিখিলেন, মধ্যএসিয়া আর্য্যদের আদিম বাস-স্থান নহে; উত্তর কুরুই আদিম বাসস্থান। শুনিতেছি, তাঁহার মতও নাকি খণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহার যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, ধারণা, এবং নূতন আবিষ্কার—কণ্ডুয়ন প্রবৃত্তি তিনি তাহাই লিখিতে থাকুন, আমাদের প্রমাণ, আমাদের অমূল্য বেদ, পুরাণাদি, আমাদের শ্রুতি ও স্মৃতি প্রাচীন ঋষিকুল। সত্য চিরস্থির— চিরস্থায়ী, মিথ্যার নিত্য পরিবর্ত্তন; তাই কয় শতাব্দির মধ্যে এসিয়া-মধ্যস্থান উত্তর কুরুতে পরিণত; তথা হইতে আবার কোথায় গিয়া পড়ে দেখুন। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত; দীনেশ বাবু বলিতে পারেন কি মার্কণ্ডেয় পুরাণখানি কতদিনের এবং চণ্ডী-আখ্যায়িকার কথক মেধস ঋষি কতদিন পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন? কোন্ লজ্জায় তিনি বলিলেন—চণ্ডী খ্রীষ্টের দুই শতাব্দি পূর্ব্বে লিখিত। তাঁহার বেহায়াপনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, যেখানে তিনি লিখিয়াছেন— "চৈত্র বংশোদ্ভব সুরথ মহারাজা আরবেলের সঙ্গে শুধু জাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না, ইঁহার প্রায় সমস ময়ক ছিলেন।" "কেবল বেহায়া-পনা হয় নাই, অজ্ঞতাও চূড়ান্ত হইয়াছে, যে সুরথ রাজাকে স্বয়ং মা জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা বর দিয়াছিলেন:—

"মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥"
(১৩শ অঃ ১৪শ শ্লো)

"এবং এই দেহান্তে সূর্য্যদেব হইতে জন্ম-লাভ করিয়া তুমি পৃথিবীতে সাবর্ণি নামক মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।"

সেই মহাপুরুষকে সেই দেবসদৃশ মহাত্মাকে তুচ্ছ আরবেল রাজার জ্ঞাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দীনেশ বাবু হিন্দু-দ্রোহিতার বিশিষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। দেশে হিন্দুরাজা থাকিলে, হিন্দুর গৃহে গৃহে সম্পূজিত চণ্ডী গ্রন্থের এরূপ অবমাননাকারীর কি শাস্তি হইত বলা যায় না।

সাতপৃষ্ঠা ভূমিকার সমালোচনা আর বাড়া-ইতে প্রবৃত্তি নাই; বাকি যুক্তির খণ্ডন করিতে গেলে আরও একগুলি পৃষ্ঠা লিখিতে হইবে; কিন্তু আমাদের আর ধৈর্য্য নাই, পাঠকপাঠিকা-

গণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। উপসংহারে অতুল বাবুকে অনুরোধ, তিনি যেন ২য় সংস্করণে এরূপ অসার, অপদার্থ ভূমিকাটি বাদ দিয়া পুস্তক মুদ্রিত করেন; তাঁহার পুস্তকের দুরপনেয় কলঙ্ক-প্রক্ষালন করেন। আমরা ভূমিকার সমালোচনা করিয়াছি; পুস্তকের কোন সমালোচনা করি নাই। কেবল একটী কথা বলা প্রয়োজন; মধুকৈটভ যুদ্ধ ৫০ হাজার বৎসর ধরিয়া নহে, পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া হইয়াছিল।

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত বর্ম্মা।

মিবার কলঙ্ক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এত দিন ভাবি' তব পরম হিতৈষী,
'বিষ কুম্ভ পয়োমুখ' যে সুহৃদ গণে,
সংশয়-গরল-শূন্য সরল হৃদয়ে
করিয়াছ ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন সদা,
পাইলে সুযোগ এবে বিন্দুমাত্র কোন,
তাহারাই বক্ষ তব, দলি দৃঢ় পদে,
বিদারিতে কৃতঘ্নতা তীক্ষ্ণ-ইষুঘাতে
করিবে না অনুমাত্র দ্বিধা হৃদি মাঝে;
মরুভূমে আমন্ত্রিত পান্থ অভ্যাগতে
যেমতি মৃগ-তৃষ্ণিকা নির্ম্মম হৃদয়ে
নাশয়ে জীবনে, আনি' আনায়ে আপন।
সুবিশাল, বৎস, তব পূত হৃদি খানি
মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, দয়া, সুদূর-দর্শিতা,
বংশ পরম্পরা-গত সুমহান যত
বিভূষিত রাজোচিত গুণাবলী; যথা
স্বর্গীয় সৌরভ পূর্ণ, নন্দন কানন
শোভিত মন্দার আদি পবিত্র কুসুমে।
সঙ্কীর্ণতা কণ্টকীতে, কুটিলতা কীটে,
নিষ্ঠুরতা দাবানলে, অদূর দর্শিতা
বনজ নিচয়ে কভু নারয়ে নাশিতে
নন্দন-নিন্দিত তা'র সৌন্দর্য্য অতুল।
খলের কাপট্য তাই—গরল, অধরে
সরল মধুর হাসি, মাধুর্য্য লহরী,
অমিয় বচন—আত্ম অভীষ্ট-সাধক,
ধরম-বরমাবৃত পাপ কলেবর,—
পারনি করিতে ভেদ। কিন্তু একবার
দেখ চাহি' চতুর্দ্দিকে মানস নয়নে,
সুগন্ধ কুসুমে কীট, পীযূষ-বরষী
জলদে বিদ্যুৎ বহ্নি, শ্যামল-দর্শণ
আগ্নেয়-অতল গর্ভে বহ্নি প্রস্রবণ,
কাননে দাবাগ্নি, ভীম বাড়বাগ্নি-শিখা
সুস্নিগ্ধ-সলিল শান্ত জলধি-হৃদয়ে,
প্রকৃতির পটব্যাপি' আপনি বিধাতা
খলের আপাত-মধু কাপট্যের ধারা
লিখি,' নিরন্তর তরে সরল-হৃদয়
সতর্কি'ছে বিশ্ববাসী জীব কুলে যত।
কি কব অধিক তোমা, সুশাস্ত্রজ্ঞ তুমি,
আপনিই কাল দেব অলুপ্ত মসীতে
আঁকিয়া, তাপস বেশী নিকষা সুতের
বিভূতি মুরতি খানি আপন বক্ষেতে,
দিতেছে সতত সাক্ষ্য কাপট্যে খলের।
অজ্ঞাত চরিত্র তব নহে যশকের;
বিনোদি' অরাতি-চিত্ত সুনাদি', ঝঙ্কারি',
কভু লুটি' পদতলে, কভু গাহি' তা'র
অলীক অসার-গর্ভ যশোরাশি, পরে,

বিন্দুমাত্র কোন মতে পাইলে সুযোগ,
দংশে তা'রে মর্ম্মান্তিক সুতীক্ষ হুলেতে।
তেমতি জানিও, তব কপট-হিতৈষী,
বিশ্বাস-ঘাতক বৃদ্ধ আজমীঢ় পতি,
সহ যত দুর্ব্বিনীত, শার্দ্দুল-হৃদয়,
জিঘাংসা-পীড়িত দুষ্ট সামন্ত মণ্ডলী,
করি'ছে প্রচ্ছন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র ঘোর;
রাজ সিংহাসন-চ্যুত করিতে তোমায়
হয়েছে সকলে তা'রা বদ্ধ পরিকর।
বৎস বিক্রম,
সময় থাকিতে এবে হও সাবধান;
না হইতে পূর্ণায়ত এ কাল ভুজগ,
আশু তীক্ষ্ণ ইষুঘাতে বিষদন্ত এর
উৎপাটিত করহ সমূলে। নতুবা এ
ভুজঙ্গম-উদ্গীরিত গরল-প্লাবনে,
অচিরে এ রাজ্য, রাজ-সিংহাসন তব
চিরতরে হ'বে নিমজ্জিত। অবিলম্বে
না হইতে ভস্মমুক্ত এ পাবক শিখা,
প্রতিকার নীর সিঞ্চি কর নির্ব্বাপিত।
অন্যথায়, রাজ্য রাজ-সিংহাসন সনে
এ ভীষণ হুতাশনে হ'বে ভস্মীভূত।"
নীরাবিলা বর্ষীয়সী; বরষি ক্ষণেক
পাবক-প্রসূন ধারা তুবড়ী যেমতি
নিবিলা নীরবে ধীরে। "আর না, আর না
যথেষ্ট হয়েছে; আর চাইনা শুনিতে!"
গর্জ্জিলা বিক্রমজিত, বহ্নি সংযোগিত
নরকুর-চ্যুত ঘোর আতসী গর্জ্জনে
সহসা তেয়াগি' দ্রুত ইরম্মদ বেগে
শয্যাতল, রোধি শ্রুতিরন্ধ্র করযুগে;—
"শ্রবণ বধির হও; ওহো এতাধিক
হেন রৌরবের পাপ বীভৎস কল্লোল
শুনিতে, বাসনা কিরে রয়েছে এখনো?
বসুন্ধরে দ্বিধা হও; পশি তমোময়
উত্তপ্ত উদরে তব, করি প্রশমিত
দাহ্যমান এ হৃদয়! হে নৈশ অম্বর,
আবরিয়া কালাম্বুদে কাল বপু তব,
হান' বেগে ভীমবজ্র-বজ্রচূড় শিরে।
বিষের ঔষধ বিষ—প্রলয় আসারে
এ হেন পিশাচ-ধাত্রী পাপ কলঙ্কিতা,
করি চির নিমজ্জিত চিতোর ভূমিরে,
অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র মুছে ফেল তা'র
ধারিত্রীর পৃষ্ঠ হ'তে; বলিতে বলিতে
হানি ভালে করাঘাত, উন্মত্তের মত
পড়িলা পালঙ্কোপরি বসিয়া অভাগা।
হেনকালে আসি বৃদ্ধা তীব্র উল্কা বেগে
ধরিলা বিক্রমে করে, কহিলা সত্রাসে;—
"বিক্রম, বিক্রম ক্ষান্ত হও, ধৈর্য্য ধর;
হারাওনা সহিষ্ণুতা অবোধের মত;
ক'রোনা বিবেকে লুপ্ত হ'ও না অধীর।
বিপদে অধৈর্য্য বৎস, সর্ব্বনাশোপায়।
প্রলয় অম্বুদ নভঃ—চন্দ্রতাপ হেন
অকূল বারিধি বক্ষে, ধীরতাই এবে
একমাত্র জেনো তব প্রকৃষ্ট আশ্রয়।
হেন সমুত্থিত শির ফণীন্দ্র কবলে
ধীরতাই জেনো শ্রেষ্ঠ রক্ষোপায় তব।"
"ধাইমা" সজল নেত্রে কহিলা বিক্রম;—
জানি না পূর্ব্বের কোন্ দুষ্কৃতির ফলে,
এখনো এ অভাগারে রয়েছে পাসরি
শমন; নতুবা হেন মন্ত্রী কর্ম্মচাঁদ
কুচক্রী, বিশ্বাস হন্তা, সিংহাসন লোভী,

এ হেন দারুণ বজ্র হেন আকস্মিক
পড়িত কি অভাগার শিরোপরি আজি ?
আশৈশব যাঁর ক্রোড়ে হইনু পালিত
পুত্র স্নেহে, হৃদয়ের অন্তস্থল হ'তে
অর্পিলাম প্রতিদানে চরণ উপরি
পিতৃ ভক্তি, অকপটে হৃদয় কপাট
উন্মিলি, ধাইমা, কভু স্বপনেও হায়,
একটি দিনের তরে হৃদয়ের কোণে
করিনি কল্পনা, হেন অকস্মাৎ আজি
বাৎসল্য নিলয় সেই পূত হৃদি মাঝে
হেন পৈশাচিক স্রোত হ'য়ে আবির্ভূত,
বহিবে দুর্ব্বার বেগে প্লাবি' উভকূল ;
হইবে দাবাগ্নিদগ্ধ নন্দন কানন।
মন্ত্রিবর,
এত যদি জীবনের চির অভীপ্সিত
ছিল তব মিবারের রাজ সিংহাসন,
কেন তবে গত সেই যবন-বিপ্লবে,
দৈচার' সমর ক্ষেত্রে, বক্ষের আশ্রয়ে
রাখি' অভাগারে ভীম ভুজেতে বেষ্টিয়া
অভেদ্য প্রাকার হেন দাড়া'য়ে নীরবে,
সহিলে বিক্ষত হৃদে অম্লান বদনে
অজস্র আয়ুধ ধারা বিপক্ষের করে ?
রক্ষিতে অরাতি গ্রাসে হায় অবশেষে
এ তুচ্ছ জীবন মম, ভূ-বিশ্রুত তব
বীর নামে সমর্পিলে কলঙ্ক কালিমা,
তেয়াগি সমরাঙ্গণ পৃষ্ঠ দিয়া রণে ?
তবে ত এ অভাগারে ভারত-কীর্ত্তিত,
অকলঙ্ক শুভ্র তব সুযশ-মণ্ডিত
সুপবিত্র নামে আজি শার্দ্দুল সুলভ
এ হেন দুরপনেয় কলঙ্ক মসীতে
হ'ত না হেরিতে লিপ্ত। কিংবা যদি দেব,
অবসরে, অনুগ্রহে পদাতি পুঙ্গবে,
নিদারুণ দুর্ব্বিসহ ঘোর অপমান
করিয়াছ উপলব্ধি হৃদয়ের মাঝে,
শান্তি গ্রাসী মিবারের, বিশ্বাস ঘাতক।
উৎসাহি বিরুদ্ধে তব সামন্ত নিচয়ে,
চিরশান্তি সুশোভিত মিবার নিকুঞ্জে
জ্বালিতে অশান্তি বহ্নি হয়েছে উদ্যত।
হেন দুষ্ট বিদ্রোহীর সুশান্তি বিধান
নাহি করি, কহ বৎস, উচিত কি তব
প্রদানিতে পুন এবে ঘৃতাহুতি সেই
প্রধূমিত বহ্নিমাঝে ? জ্বলিতে আপনি
করিতে মিবারে দগ্ধ পৈশাচিকানলে ?
একি, নিরুত্তরে কেন বসিয়া নীরবে ?

শ্রীনরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যথার্থ দারিদ্র্য।

অভাবই প্রকৃত দারিদ্র্য। যাহার অভাব নাই সেই যথার্থতঃ ধনী। যাহার অনেক কামনা, অনেক আকাঙ্ক্ষা—সেইত কাঙ্গাল। সংসারে কাঙ্গালের অভাব নাই ; যেদিকে চাই সেদিকেই কাঙ্গাল হাত পাতিয়া রহিয়াছে—অতৃপ্ত মানব সর্ব্বত্রই "দাও, দাও" রব ছাড়িতেছে। "কেবল দাও, কেবল দাও" এই এক ভাব। এই বিশ্বব্যাপী দৈন্য কোথা হইতে আসিল ? এই দৈন্য ঘুচে না কেন ? অপূর্ণ-বাসনায় প্রায় সকল মানবাত্মাই পীড়িত। বিবিধ তাপে সকলেই জর্জ্জরিত, এই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইতে চাহে না, তাই প্রাণে

পিপাসাতুরের তীব্র পানেচ্ছা, প্রাণের মধ্যে, সমস্ত চেতনার মধ্যে, প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। সংসারে কেবল ক্রন্দনের উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল দুঃখের প্রকরণ পুঞ্জিত রহিয়াছে, কেবল নৈরাশ্য স্তুপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। শরীরে যেমন কণ্ডুয়ণ আরম্ভ হইলে আমরা যখন যাহা হাতে পাই, তাহার দ্বারাই সেই স্থানে ঘর্ষণ করি; কিন্তু তাহাতে কেবল ক্ষণিক আরাম লাভ হয়, কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি হয় না। আমরাও সেই প্রকার প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য বস্তু সকলকে তাহার আহুতিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রবৃত্তির জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাই কিন্তু সফল মনোরথ হইতে পারি না। কিন্তু যে প্রকার কণ্ডুয়ন যে কারণে অনুভূত হয়, সেই কারণ নিরাকৃত হইলে কণ্ডুয়ন আর থাকে না, সেই প্রকার যে কারণে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়—তাহারই রোধ করিলে পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় কেন? যে প্রবৃত্তি হইতে বন্ধ হয়, যে বন্ধ হইতে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেই বন্ধের কারণে প্রবৃত্তির প্রকাশ হয় কেন?

মোহ হইতে প্রবৃত্তির জন্ম। যেমন অজ্ঞতাবশতঃ মূঢ়বালক রক্তবর্ণ লোভনীয় বিষ ফলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আমরাও তেমনই বিষয়াদিতে সুখ নাই, তাহা যে কিছুই নহে। ইহা জানি না বলিয়া, কেবল তাহাদের সুখের প্রতীতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি ধাবিত হই এবং বার বার বঞ্চিত হইয়াও বিষয় রসে উন্মত্ত হওয়া হেতু তাহাদের পানেই বার বার অনিবার ছুটিয়া থাকি। অসহায় কাঙ্গাল মন কেবল সংসার রূপ বিষ ফলেরই আকাঙ্খা করিতেছে, তাহাকে আস্বাদন করিবার জন্য অধীর হইতেছে এবং আস্বাদন করিয়া পাগল হইয়া নানারূপ অশান্তিতে পুড়িয়া মরিতেছে। যতদিন আমরা এই প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইতেছি, ততদিন আমাদের দরিদ্রতা, আমাদের প্রকৃত অভাব মোচন হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

পুষ্পবতী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সঙ্গী-মহল।

জ্যোৎস্না হাসিতেছে—নক্ষত্রগুলি মিট্ মিট্ করিয়া চাঁদের অনুকরণ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। আকাশ সুনির্ম্মল, বায়ু ও সুনির্ম্মল, প্রকৃতির এমন মনোহর ছবি বহুকাল দেখা যায় নাই। সুজাওন খাঁর উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, তাহাতে কমল ফুটিয়া থাকে, কুমুদ কহ্লার ও মনের আনন্দে হাসে। পুষ্করিণীর তীরেই সুন্দর দ্বিতল সবুজ বর্ণের বাটী সেই বাটীর নাম "সঙ্গী মহল"। সঙ্গী মহল সুজাওন খাঁ" অনেক স্থানের লুণ্ঠিত দ্রব্য দ্বারা সাজাইয়াছেন, এই স্থানেই এক প্রকোষ্ঠে পুষ্পবতী অবরুদ্ধা। পুষ্পবতীর নিকটে কেহ নাই, সে একাকিনী বাতায়নে বসিয়া নিজ অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছে। কে তাহাকে বিনাপ-

রাখে হরণ করিয়া এখানে অবরুদ্ধ রাখিয়াছে? তাহার পরিণাম কি হইবে? এই সব বিষয় যুগপৎ তাহার হৃদয়ে উদয় হইল। কিন্তু এসব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইল না। সরলা বালিকা বুঝিল না যে বনের নিরপরাধিনী হরিণীকে ব্যাধ শীকার করে কেন? পুষ্পবতী আজ ভয়ানক ম্রিয়মান, তাহার কি দুঃখের শেষ হইবে না? দুই এক বিন্দু অশ্রু তাহার নয়ন কোণ হইতে গড়াইয়া পড়িল। তাহার দুঃখিনী মাতার কথা মনে হইল, সরল ভীলবাল সুকুর কথা মনে পড়িল, সেই পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ, পুষ্পচয়ন, মাল্য গ্রন্থন, কত কথাই মনে হইল। পুষ্পবতী কাঁদিল। বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল" ভগবান তুমি অনন্ত, তোমার মহিমা কে জানে, কি দোষে এ দাসী এত কষ্ট পাচ্ছে? তুমি দয়াল, একবার কি দেখ্‌বে না? তুমি পাষণ্ডের শাসনকর্ত্তা, তুমি নিরপরাধের রক্ষা কর্ত্তা, তুমি হৃদয়ের ঈশ্বর, তুমি জগতের প্রাণ, একবার এ অধিনীর প্রতি লক্ষ্য কর। আমি যেন শুধু তোমার চরণ যুগল ধ্যান করে সব বিপদ হ'তে উদ্ধার হই। এই সময়ে তাহার কর্ণকুহরে কাহার সঙ্গীত ধ্বনি প্রবেশ করিল—গলা বড় মিষ্ট, পুষ্পবতী তখন সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল।

"মধুর বাঁশী বাজলো বনে, ঐ বুঝি সই
আস্‌ছে কালা।
হেরবে মোরে ঘরের কোণে, ঘুচ্‌বে আমার
এসব জ্বালা॥
জানি না সই কৃষ্ণ বই, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী
উদ্ধারিবে এসে মোরে, পরাবে সে বনমালা।
আর ভেবো না আস্‌ছে হে হরি, ডাক
তারে হৃদয় ভরি,
উঠবে শশী ঘুচ্‌বে আঁধার, হৃদয়খানি করি
আলা॥"

সঙ্গীত পুষ্পবতীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। 'এ সঙ্গীত কি তাহারই জন্য রচিত? এ গানের অর্থ কি? কে এ গান কচ্ছে? তাহাকে কি ইঙ্গিত ক'রে জানান হচ্ছেনা যে উদ্ধার শীঘ্র হবে? পুষ্পবতীর হৃদয়ে এই প্রশ্ন উদিত হইল। এ সঙ্গীতের 'কালা' কে? পুষ্পবতীর একবার বসন্তোৎসবের সেই যুবকের কথা মনে হইল। সে যুবক কে? দেখিতে বড় সুন্দর, তাহার কি আর এ দরিদ্র বালিকার কথা স্মরণ আছে? যুবকের যোদ্ধ বেশ ছিল, তবে কি তিনি রাজপুত্র? পুষ্পবতীর ঐ সব চিন্তা ভাল লাগিল। সে চেষ্টা করিল যাহাতে ঐ সব কথা মনে হয়, কিন্তু মন তাহা বুঝিল না। এই সব বিষয় ভাবিতে মনের যেন আনন্দ হইল। পুষ্পবতী এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে একজন দাসী পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রবেশ করিল ও পুষ্পবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল"—ধীরাজ সিংহ এই পাগলিনীকে আপনার সঙ্গিনী ক'রে পাঠায়েছেন, আপনার সঙ্গে এই প্রকোষ্ঠে থাকবে। কোন ভয়ের কারণ নাই। সুন্দর গান করে, কাহার কোন অনিষ্ট করে না।" দাসী বিদ্রূপের স্বরে এই সব কথা বলিল, পুষ্পবতী পাগলিনীকে দেখিয়াই চিনিল, পাগলিনী মুখে অঙ্গুলী প্রদানে কোন কথা বলিতে নিষেধ

করিল, পুষ্পবতী বুঝিল। সে তখন বলিল—"আমি বন্দিনী, যাহাকে ইচ্ছা দিতে পার, কিন্তু এ পাগলিনীকে আমি চাই না। একে নিয়ে যাও"। দাসী পুনরায় বিদ্রূপ স্বরে বলিল 'ওমা' এমন মোহিনী চাই না কেন? সুন্দর সুন্দর গান করবে, সুন্দর সুন্দর গল্প বলবে। আমরা এই মাত্র একটা গল্প শুনলেম। বিশেষতঃ ধীরাজ সিংহের হুকুম, কার সাধ্য রদ করে। এবার বিরক্তির ভাণ করিয়া পুষ্পবতী বলিল,—তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? রেখে গেলেই পার? আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? দাসী আর কোন কথা না বলিয়া পাগলিনীকে ঐ ঘরে রাখিয়া সতর্কতার সহিত দ্বার রুদ্ধ করিল, পাগলিনী একটি বাতায়নের নিকট গিয়া বসিল। পুষ্পবতী কহিল—"পাগলিনী!" পাগলিনী কি ইঙ্গিত করিল, পুষ্পবতী আর তাহার সহিত কথা বলিল না, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—এমন এক পাগল আমার ঘরে দিয়েছে, কি করা যায়; আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই ত উদ্দেশ্য"। পাগলিনী বলিল" তুই কৃষ্ণ দেখ্‌বি? আমার সঙ্গে গেলেই দেখতে পাবি।" তখন দ্বারের বাহিরে হাসির রব উঠিল, পুষ্পবতী বুঝিল—দাসীরা সব কথা শুনিতেছে। তখন পাগলিনীর ইশারার অর্থ বুঝিল, পাগলিনী বাতায়নে বসিয়া গান ধরিল—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছেগো
বদনে ছাড়িতে নাহি পারি।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিলো গো
কেমনে পাইব সখী তারে।

পুষ্পবতী বলিল—পাগলিনি! তুমি সুন্দর গান কর, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হল। পাগলিনী বলিল—এইরূপ গান আমি অনেক জানি, তুমি যদি আমাকে না তাড়াও তবে রোজ নূতন নূতন গান শুনাবো। ঈষৎ হাসিয়া পুষ্পবতী বলিল—তুমি যদি গান কর ও আমাকে বিরক্ত না কর, তবে আর তাড়াব না। বিশেষ আমি তোমাকে তাড়াবার কে। পাগলিনী বলিল—"ও সব আমি বুঝি না। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই ও গান করে ভিক্ষা করি। এক স্থানে থাক্‌বো কেমন করে? তুমি যদি ভালবাস ও খেতে দাও, তোমাকে গান শুনাবো; আর যদি না খেতে দেও, তবে চ'লে যাবো।" পুষ্পবতী হাসিয়া বলিল—"কেমন ক'রে যাবে? তুমিও যে আমার ন্যায় বন্দিনী"। এইবার পাগলিনী "হি হি" করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—তার পর পুষ্পবতীকে বলিল—"আমি কি তোর মত? আমাকে ধরে রাখে কার সাধ্য? আমি যখন ইচ্ছা তখনই চ'লে যেতে পারি।" পুষ্পবতী তখন আর কিছু বলিল না, নিস্তব্ধ হইয়া শয্যায় শয়ন করিল, পাগলিনী বসিয়াই থাকিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, পুষ্পবতী নিদ্রিত হইল। কিন্তু তাহার বোধ হইল, কে তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছে। পুষ্পবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দৃষ্টি করিয়া দেখিল—পাগলিনী তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া হস্ত বুলাইতেছে। তাহাকে জাগরিত দেখিয়া পাগলিনী উঠিল। একবার

দ্বারের নিকট গেল, তার পর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শয্যায় উপবেশন করিল। অতি মৃদুস্বরে বলিল—কোন চিন্তা করো না, শীঘ্রই মুক্ত হবে। সুজাওন খাঁ তোমাকে বন্দী করেছে, সে কয়েক দিন পরে তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে, এসে দেখ্‌বে পিঞ্জরখালি বিহঙ্গনী পালায়েছে। সেই বসন্তোৎসবের কথা মনে আছে? একজন সুন্দর যুবক সে সময় উপস্থিত হ'য়েছিল, তার কথা মনে আছে?" এই শেষ কথা বলিয়াই পাগলিনী তীব্র দৃষ্টিতে পুষ্পবতীর প্রতি লক্ষ্য করিল, বোধ হইল অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পরিষ্কার রূপে দেখিতেছে। পুষ্পবতী লজ্জায় মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি করিল। পাগলিনী বলিল—"বুঝেছি তাহার কথা বেশ মনে আছে। তিনি কে তা জান? বোধ হয় জাননা, আমি জানি। আমি তাঁকে তোমার এই দুর্দ্দশার কথা বলে এসেছি, তিনি এসে তাঁহার রাধাকে উদ্ধার করবেন।" পুষ্পবতী আরও লজ্জিত হইল। পাগলিনী যে তাহার মনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে ইহা সে বুঝিল, কোন উত্তর করিল না। পাগলিনী আরও বলিতে লাগিল—"আমিও তোমাকে উদ্ধার ক'র্‌তে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু তিনি এসে মুক্ত কর্‌লেই যেন ভাল হয়, কেমন? তোমার মত কি?" পুষ্পবতী কোন উত্তরই করিল না। পাগলিনী আরও মৃদুস্বরে বলিল—"পুষ্পবতি! তুমি কি জাননা, আমি জানি, এখন সে পরিচয়ের সময় নয়। এখন তোমাকে এই ব্যাধের পাশ হইতে মুক্ত কর্‌তে হবে। সুজাওন খাঁকে চিন ত? আমাকে অবিশ্বাস করোনা, আমি তোমাকে উদ্ধার কর্‌বো। সেই জন্যই তোমার সঙ্গে আজ এখানে আছি। আমি ধরা না দিলে আমাকে ধরে কে?" পাগলিনীর কথায় পুষ্পবতীর চক্ষুতে জল আসিল, সে বলিল—"পাগলিনি! তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার মা ছিলে। তোমাকে আমি পূর্ব্বে ভয় কর্‌তাম, এখন আর ভয় নাই, এখন তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি, যাহা ইচ্ছা কর। যদি অপমানিত হই, তবে জান্‌বে এ প্রাণ রাখ্‌বো না। সে জন্য আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই জন্যই আমার মনে কোন আশঙ্কা নাই। আমার পরিচয় যদি জান, তবে বলে দেও। আমার বৃদ্ধা মাতাকে শুধু চিনি, বাপকে জানিনা, বাড়ী কোথায় জানি না। পাগলিনি! তুমি ব'লে দেও, তোমার দুটি পা ধরি।" পাগলিনী হাসিয়া বলিল—"জান্‌তে পারবে, এখনও সময় হয় নাই। তুমি ক্ষত্রিয়ের কন্যা, বৃদ্ধা তোমার মাতা নয়, বৃদ্ধা তোমাকে প্রতিপালন করেছে।" পুষ্পবতী মনে করিল—পাগলিনীর উক্তির মূল্য নাই। আবার ভাবিল—পাগলিনি যখন সব জানে বলিতেছে তবে বোধ হয় তাহার সব কথাই সত্য। পাগলিনী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"এখন এ সব বিষয় জেনে দরকার নাই, এখন জান্‌তে চেয়ো না। যখন সময় হবে, তখন সব শুন্‌তে পাবে। মন খারাপ করো না।"

পুষ্পবতী বলিল—আমি তবে এখন কিছু জান্‌তে উৎসুক হবো না। কিন্তু আমাকে রক্ষার উপায় কর্‌তে হবে। সুজাওন খাঁ ভয়ানক লোক, তাহার নাম শুনে সকলেই ভয়ে অস্থির। আমি সামান্য বালিকা, আমি

ভয় পাবো না কেন?" পাগলিনী বলিল—"ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, তিনি উদ্ধার কর্‌বেন। ভক্তিভরে তাঁকে ডাক, তিনি ভক্তের ক্রন্দন শুনে, না এসে থাক্‌তে পারবেন না।" পাগলিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া পুষ্পবতী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তবে কি এ স্ত্রীলোকটি পাগলিনী নয়? সকলেই পাগলিনীকে ভয় করে, পুষ্পবতীর হৃদয়ে তখন যেন ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিল, সে সেই স্থানে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইভাবে অতীত হইল। তখন পাগলিনী বলিল—"পুষ্পবতি! তোমার প্রার্থনা ঈশ্বর অবশ্যই শুনেছেন, তুমি ব্যস্ত হইও না। এখন আর রাত্রি নাই, নিদ্রা যাও, আগামী কল্য রাত্রে তোমার উদ্ধারের উপায় কর্‌বো। আমি যখন এসেছি, তখন যত সত্বর হয়—ব্যাঘ্রের গহ্বর থেকে তোমাকে মুক্ত কর্‌বো। তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও, আমি দ্বারের নিকট পাহারা দিব।" পুষ্পবতী পাগলিনীর কথামত শয্যায় শয়ন করিল ও শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

রাজা অভয়-সিংহ লীলাবতীর নিকট পাগলিনীর কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি সব বুঝিলেন। বসন্তোৎসবের সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকার কথা মনে হইল, আজ পুষ্পবতী বিপদে, কি বিপদ বুঝিলেন না। তবে সে বন্দিনী—হয়ত কাহারও হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে—কত কষ্ট পাইতেছে—রাজা অভয়সিংহ এই সব কথা মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। যে দিন বসন্তোৎসবে সেই সরলা সুন্দরী বালিকাকে দেখিলেন, সেই দিনই তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন ভাব প্রবেশ করিল। তিনি তখন সে ভাব বুঝিলেন না—ক্রমে সময়ের আবর্ত্তনে তাহা কতকটা ভুলিয়া গেলেন। তাহার কথা যখনই মনে হইত, তখনই হৃদয় উৎফুল্ল হইত, তিনি যত ভুলিতে চেষ্টা করিতেন, ততই সে চিন্তা হৃদয় অধিকার করিত, ততই সে ভাবনা ভাবিতে তাহার ভাল লাগিত। পুষ্পবতী কাহার কন্যা? কি জাতি? এক এক বার এই চিন্তা তাহার মনে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা দূরে ফেলিয়া দিতেন। আজ পুষ্পবতীর বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই লুপ্ত ভাব পুনরায় মনোমধ্যে উদিত হইল, তিনি যেন বালিকার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কিরূপে তাহার উদ্ধার হইবে, কিরূপে তিনি স্বয়ং তাহাকে বিপদের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, কিরূপে আবার বালিকাকে দেখিবেন, এখন সে কোথায়? এই সব ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু এক্ষণে পুষ্পবতী কোথায়? কিরূপে সন্ধান পাইবেন? তিনি একাকী বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, তুমি কি ভাব্‌ছ? বালিকা সুজাওন খাঁর নিকট বন্দিনী, শীঘ্র উদ্ধার

কর, নইলে বড় বিপদ।" রাজা বলিলেন "আপনি কে? কি ভাবে এখানে এলেন?" ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন "আমি রাম স্বরূপ ব্রহ্মচারী।" রাজা অভয় সিংহ তখনই ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আজ আমার পুরি পবিত্র হ'ল, আপনি পরোপকারের জন্যই জন্ম-গ্রহণ করেছেন, আপনি দেবতা কি মানুষ তাহাও চিনিতে পারিলাম না। আপনার আদেশে, আমি এখনই সৈন্যসহ সুজাওন খাঁকে আক্রমণ ক'রে পুষ্পবতীকে উদ্ধার করবো।" ব্রহ্মচারী বলিলেন "না, সৈন্যের প্রয়োজন নাই। কৌশলে উদ্ধার করবে, যুদ্ধ এখন করবে না, পাপী তাহার ফল ভোগ শীঘ্র করবে, সেজন্য তোমার কোন উদ্যোগ দরকার নাই। তুমি একাকী চলে যাও, সেস্থানে তোমার সাহায্যের লোক আছে, কোন চিন্তা করো না। ভগবান তোমার সহায় হউন।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রাজা অভয় সিংহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহার আর সময় পাইলেন না। তিনি কতক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন; একাকী অশ্বশালায় গিয়া একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব চাহিয়া লইলেন এবং নিজ ভৃত্যের নিকট বলিয়া তিনি অশ্বারোহণে রওনা হইলেন।

রজনী সমাগতা—অদ্য চাঁদ মেঘে ঢাকিয়াছে, আবার মধ্যে মধ্যে চাঁদ মেঘের কোণ হইতে উঁকি মারিতেছে। সঙ্গী-মহল উদ্যান মধ্যে অবস্থিত, উদ্যানের চারিপার্শ্বে বড় বড় গাছ, সেইজন্য বাগানের কতক কতক স্থান অন্ধকারে আবৃত। পুষ্পবতী ও পাগলিনী পাশাপাশি বসিয়া আছে, কেহই কোন কথা কহিতেছে না। উভয়ে স্ব স্ব চিন্তায় আবিষ্ট। অবশেষে পাগলিনী বলিল—"তুই চুপ ক'রে আছিস্ কেন? আমি এখানে থাকতে তোর আবার ভাবনা কি? কার সাধ্য তোর অনিষ্ট করে? আমি শুনেছি আজ সুজাওন খাঁ তোকে দেখতে আসবে। ভয় পেলে চলবে না, সাবধান হও।" পুষ্পবতী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, নিজের অদৃষ্টের কথা মনে করিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"পাগলিনি! তুমিই পৃথিবীতে সুখী, তোমার কোন বিষয়ে কোন চিন্তা নাই। তোমার কোন বিষয়ে ভয় নাই, তুমি কেন এ অভাগিনীর সঙ্গে কষ্ট করতে এলে? আমি নিজেই মরতে বসেছি, আবার তোমাকে সঙ্গিনী ক'রে দরকার কি? আমার ভরসা ঈশ্বর, আমি ভয় করি না, তিনি যাহা করবেন তাহাই হবে। পাগলিনী তুমি পালাও, আর এই হতভাগিনীর জন্য কষ্ট করো না।" পাগলিনী "হি হি" করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল, তারপর পুষ্পবতীকে বলিল—"তোর কথামত, তোর বুদ্ধি মত আমি চলবো না। আমি যাহা ভাল বুঝি, তাই করবো। তুই ভাবিস্ না, আমি তোর উদ্ধার করবো।" পাগলিনীর কথায় পুষ্পবতীর প্রত্যয় হইল না—প্রলাপের উক্তি মনে করিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, পাগলিনী বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতে লাগিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, অতএব

বাগানের সমস্ত স্থানই ভীষণ অন্ধকারে ঢাকিল। পাগলিনী কতকক্ষণ পরে দেখিল একটি ক্ষুদ্র আলো বাগানের বাহিরে জ্বলিতেছে, পাগলিনী এক দৃষ্টে সেই আলো দেখিল। তারপর বাতায়ন বন্ধ করিয়া আসিয়া চুপে চুপে পুষ্পবতীকে বলিল—"প্রস্তত হও, তোমার মুক্তি সন্নিকট।" তাহার পর পুষ্পবতীকে বাতায়নের নিকট লইয়া গেল, বাতায়ন খুলিয়া ঐ আলো দেখাইল, আলোর নিকটে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। পাগলিনী বলিল—"ঐ দেখ কে এসেছে, আর চিন্তা করো না।" একটি শক্ত রশি নিজের বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে খুলিল, তাহা গবাক্ষে বাঁধিল, তারপর পুষ্পবতীকে বলিল—"এই দড়ি ধ'রে নাম্‌তে হবে; সাহস আছে ত?" পুষ্পবতী বলিল "হাঁ, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।" এই বলিয়া পুষ্পবতী দড়ি ধরিয়া ঝুলিল, পাগলিনী তাহাকে নামাইয়া দিল। যখন দেখিল যে পুষ্পবতী একটি লোকের নিকট পৌঁছিয়াছে, তখন পাগলিনী নিজে ঐ দড়ি ধরিয়া নামিল। অশ্বারোহী উভয়কে অশ্বে আরোহণ করাইয়া অশ্বের লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিল। অশ্বের পাগুলি মোটা বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ থাকাতে কোন শব্দ হইল না। দ্বারের নিকট পৌঁছিয়া পুষ্পবতী দেখিল একজন প্রহরী হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় ভূমিতে পতিত আছে। অনায়াসে ফটক পার হইয়া সকলে বাহির হইল। পাগলিনী তখন অতি নিম্নস্বরে বলিল—"পুষ্পবতি! আর আমার থাকার প্রয়োজন নাই, তুমি উদ্ধার হ'য়েছ, এবং উপযুক্ত লোকের হস্তে পড়িয়াছ। আর কোন ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া পাগলিনী অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িল ও অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল। পুষ্পবতী পাগলিনীকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিল, এখন সহায়হীনা হইয়া সঙ্গীয় লোকটীকে বলিল—"আপনি কে? আমরা কোথায় যাবো?" লোকটী উত্তর করিলেন—"কোন চিন্তার কারণ নাই, আমাকে ধরিয়া থাক, আমি অনায়াসে তোমাকে নিয়ে যাবো। আমি তোমার সেই বসন্তোৎসবের সঙ্গী।" পুষ্পবতী কি যেন কিসের জন্য বড় লজ্জিত হইল, কিন্তু তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে দেখিল এস্থলে এই অশ্বারোহীর সঙ্গে যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। পুনরপি সুজাওন খাঁর হস্তে পড়িলে বড় বিপদ, অতএব অনায়াসে অশ্বারোহীর পশ্চাতে বসিল, অশ্বারোহী বেগে অশ্ব চালাইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজা ও রাণী।

শেখর রাজা একজন বুদ্ধিমান ঠাকুর, সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলে। রাজা অভয় সিংহকে পরামর্শ দিয়া উদ্ধার করিলেন। ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়া জয়পুরসৈন্যের অভিযান বন্ধ করিলেন। মথুরা সান ও পিতার আদেশে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া যান। শেখর রাজা অভিজ্ঞ, তিনি প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন,

তিনি জানিতেন সোতারাম ভয়ানক দুর্দ্দান্ত, সামান্য দোষ পাইলে বিপদ ঘটাইবে। শেখর রাজার সম্পত্তি যথেষ্ট,কিন্তু একটি দুঃখ তাঁহাকে চিরদিন বহন করিতে হইতেছে, তাঁহার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মে, বাল্যকালে সে কন্যা চুরি যায়, বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় না। অবশেষে স্থির হইল যে শৃগালে বালিকাকে নিকটস্থ বনমধ্যে লইয়া গিয়া নষ্ট করিয়াছে। সেই অবধি রাজার স্ত্রীর মনঃকষ্ট কিছুতেই নিবারিত হইতেছে না, যখনই মনে হইত, তখনই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। বালিকা সকলেরই আদরের ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের চক্রে শীঘ্রই তাহাকে সকলে হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ধাত্রী ও অন্তর্দ্ধান করিল, সকলে মনে করিল—কন্যার শোকে বৃদ্ধা সংসার ত্যাগ করিল। বৃদ্ধা কন্যাকে লালন পালন করিত, তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিত, অতএব কন্যার শোকে যে ধাত্রী পাগলিনী হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শেখর রাজাও কন্যার শোকে ম্রিয়মান। বালিকার সেই হাসি হাসি মুখ, সুন্দর রক্তোষ্ঠ সবই মনে পড়ে। যাহা হউক, শেখর রাজা মনে মনে কষ্ট পাইলেও মুখে প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিনী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার পর রাজা ও রাণী একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া গল্প করিতেছেন, দুটি দাসী ব্যজন করিতেছে। বহুসংখ্যক নক্ষত্র নীল আকাশের গায় হাসিতেছে। মৃদু মৃদু বায়ু বাতায়ন পথে আসিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। অদূরের পুষ্পোদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভি নাসিকা পথে প্রবেশ করিয়া মন উৎফুল্ল করিতেছে। দুই একটি পোকা "ঝিঁ ঝিঁ" রব করিয়া এক অপূর্ব্ব শব্দের অবতারণা করিতেছে। শেখর রাজা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—"রাণি! আজ এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? গল্প করিতে করিতে আবার এ ভাব কেন? রাণী অশ্রু ফেলিয়া বলিলেন—"এ জীবনে আমার দুঃখ যাবে না। আর সে কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো কেন? যে দিন থেকে মেয়েটা হারিয়েছে, সে দিন থেকে আমার মন ভেঙ্গে পড়েছে। আমার আর সুখ নাই, এ জন্মে আমি কখনও সুখী হ'তে পারবোনা"। রাজা বলিলেন—"আর ভাব্‌লে কি হবে? কোন ফল আছে কি? বৃথা চিন্তা ক'রে শরীর নষ্ট করোনা।" রাণী বলিলেন—"চিন্তা আপনা হ'তেই আসে, আমি কি করবো। কতদিন ভাবি—আর ও বিষয় মনে করবো না, কিন্তু মন আর চুপেনা।" রাজা বলিলেন—"সে অনেক কাল নষ্ট হ'য়েছে, বৃথা আর কষ্ট করোনা।" রাণী বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"আমার মনে হচ্ছে সে মরে নাই, এখনও জীবিত আছে।" রাজা বলিলেন—"এ আশা পোষণ করা বাতুলতা মাত্র। যদি বেঁচে থাকতো, তবে এতদিন নিশ্চয়ই সংবাদ পেতেম।" এই সময়ে একটি সঙ্গীত লহরী তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, উভয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় শুনিতে লাগিলেন :—

"আশার আশায় জগৎ হাসে।
আশার কোলে খেল্‌ছে সবে, নূতন আশায়
যায় গো ভেসে।

তুলিয়ে পর্ব্বত শিরে, কভু বা ফেলায় দূরে
কভু বা অতল তলে, সবাই নাচে আশার—
আশে।
আপন মনে ডাক্‌রে তারে, যদি তুই—
পার হবিরে
ভবকর্ণধার হরি, আশা রাখ তাঁর চরণ—
পাশে।"

সঙ্গীত উভয়ের মনের মত হইল, উভয়ে ভাবিলেন—কে যেন তাঁহাদের মনের ভাব কাড়িয়া লইয়া এ সঙ্গীত রচনা করিয়াছে। রাজা একজন দাসীকে বলিলেন'—'স্ত্রীলোকের সঙ্গীত শুন্‌ছি, তাকে সঙ্গে করে এখানে আন।" দাসী চলিয়া গেল, এবং একটু পরেই পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাজা পাগলিনীকে দেখিয়া বলিলেন—"তুমি কে? এখানে কেন?" রাণী পাগলিনীকে এক দৃষ্টে দেখিতেছিলেন, তাহাকে যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেন—"তুমি কে?" পাগলিনী এই প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিল "আমি পাগলিনী, সকলেই আমাকে পাগলিনী বলে। আমার বাসস্থানের ঠিক নাই, যেখানে যাই সেই স্থানেই আমার বাড়ী। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাই, আমার অভাব কিসের?" রাণী মধুরস্বরে বলিলেন—"পাগলিনি! তোমার মুখ খানি পরিচিত বোধ হচ্চে, তুমি কি এ দেশে কখনও ছিলে?" পাগলিনী হাসিয়া বলিল—"একদিন চিন্‌তে পারবে, আজ নয়।', রাজা বলিলেন—"তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ?" পাগলিনী উত্তর করিল "একটি মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে এলেম। সে খবরে এখন তোমাদের দরকার নাই। শেষে সব জান্‌তে পারবে। তোমরা দুজনে কি ভাব্‌ছিলে, আমি বল্‌তে পারি।" রাজা বিস্মিত হ'য়ে বলিলেন—"বল দেখি।" পাগলিনী প্রথমতঃ হাসিয়া উঠিল, তার পর বলিল—"সেই হারান মেয়েটার কথা ভাব্‌ছিলে, কেমন? উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাগলিনীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন—পাগলিনী মৃদু মৃদু হাসিতেছে। রাণী বলিলেন—"পাগলিনী কে? সে কি সব জানে? রাজা বলিলেন—"তুমি কি কিছু জান?" পাগলিনী বলিল—'তোমাদের দুঃখের দিন ফুরায়েছে এখন সুখের দিন আস্‌তেছে। রাজা অভয় সিংহের বাটী যাও, আমি চল্লেম।" পাগলিনী বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

রাজা অভয় সিংহ পুষ্পবতীকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী পৌঁছিলেন। পুষ্পবতীকে লীলাবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন এবং লীলাবতীকে বলিলেন—"ভগ্নি! যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।" লীলাবতী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"আমি যদি যত্ন না করি তা হ'লে কি তোমার কষ্ট হ'বে?" অভয় সিংহ কিছু উত্তর না দিয়া সলজ্জভাবে লীলাবতীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। পুষ্পবতী একবার সেই উপকারী বন্ধুর দিকে তাকাইল,

তার পর মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। লীলাবতী বলিল—"ভগ্নি! আর ও ভাবে দৃষ্টি করতে হবে না, নিকট রাজা তোমার নিকট পরাজিত হ'য়ে প্রাণটি দিয়েছে, আর কি চাই।" পুষ্পবতী লীলাবতীর মুখ চাপিয়া ধরিল। ইহার পরে উভয়ে আর এক প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

রাজা অভয়-সিংহ পুষ্পবতীকে যেদিন বসন্তোৎসবে দেখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সে সব ভুলিয়াছিলেন। আবার পুষ্পবতীকে আনিয়া তিনি নূতন ভাবে বিভোর হইলেন। তবে পুষ্পবতী ক্ষত্রিয়-কন্যা কিনা এই প্রশ্ন হৃদয়ে উঠিতে লাগিল। তিনি এক দিন একাকী বসিয়া আছেন, তখন প্রায় বেলা অবসান হইয়াছে। উদ্যানের চারিদিকে প্রাচীর সেই উদ্যানের একটি আসনে রাজা বসিয়া পুষ্পবতীর বিষয় ভাবিতেছেন। এমন সময়ে কে গাইল,—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদনে ছাড়িতে নাহি পারি।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখী তারে।"

রাজা এ সঙ্গীতে চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক গান করিতে করিতে উদ্যানে প্রবেশ করিতেছে। তিনি লীলাবতীর নিকট পাগলিনীর কথা শুনিয়াছিলেন এবং পুষ্পবতীকে উদ্ধারের সময় পাগলিনীকে দেখিয়াছিলেন, অতএব সহজেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি মধুর বাক্যে বলিলেন—"পাগলিনি! তোমার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ, তুমিই পুষ্পবতীকে উদ্ধার করেছ।" পাগলিনী তাহার স্বাভাবিক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, তারপর উত্তর করিল—"তুমি তোমার রাধাকে উদ্ধার করে এনেছ, আমি কে? এখন ত সব গোল মিটেছে?" অভয়সিংহ বলিলেন—"পাগলিনি! কেন তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও, তুমি আমার কাছে থাক, কোন বিষয়ে তোমার কষ্ট হবে না।" পাগলিনীর মুখ এবার গম্ভীর হইল, সে বলিল—"আমি ত বন্দী নই যে একস্থানে থাকিব, আমি বনের পাখী—নানাস্থানে উড়ে উড়ে বেড়াব।" অভয়সিংহ বলিলেন—"তুমি আমার কাছেও স্বাধীনা থাকবে, যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে।" পাগলিনী শুধু মাথা নাড়িল, সে কিছুতেই পিঞ্জরাবদ্ধ হবে না। রাজা তখন সে কথা ফেলিয়া অন্য কথা বলিলেন—"তুমি ত পুষ্পবতীকে ভালবাস, তার কাছে সদাসর্ব্বদা থাকবে, পুষ্পবতী তোমাকে কত আদর করবে, কত সুন্দর সুন্দর খাদ্য দ্রব্য তোমাকে দিবে, তাহা কি তোমার মনোমত নয়?" এবারও পাগলিনী অস্বীকৃতা হইল, সে উত্তর করিল—"আমাকে রাখতে বৃথা চেষ্টা করিও না, আমি একস্থানে থাকবো না। তবে পুষ্পকে আমি ভালবাসি, মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাবো।" ইহার পর আর এ বিষয়ে কিছুই বলিলেন না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাগলিনি! পুষ্পবতীর পরিচয় কি জান?" পাগলিনী আবার

"হিঃ হিঃ" করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিল—"তুমি বুঝি দিন রাত্রি ঐ কথা ভাব্‌ছো। পুষ্প তোমার হবে কি না তাই বুঝি এতক্ষণ চিন্তা কচ্ছিলে? কোন চিন্তা নাই, পুষ্প তোমারই হবে। পুষ্প দেবসেবায় লাগে, অন্যের সেবায় লাগে না। পুষ্পবতী ক্ষত্রিয়-কন্যা, সে জন্য ভেবো না, সময়ান্তরে সব জান্‌তে পারবে, তবে পুষ্প বড় দুর্ভাগ্যবতী, চিরজীবন তার কষ্টে গেল। তুমি তাকে সুখী করো। যদি তাকে আদর কর্ত্তে পার, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন; আর যদি অনাদর কর, তবে তোমার মঙ্গল হবে না। তুমি দেবতা, আমি তোমাকে স্বর্গের লোক মনে করি—তাই তোমাকে পুষ্পবতীকে দিচ্ছি, নতুবা কার সাধ্য তার নিকটে যায়? আমি চল্লেম, আবার দেখা হবে।" এই বলিয়া বিদ্যুৎগতিতে পাগলিনী বাগানের বাহির হইয়া গেল, রাজা অভয়সিংহ বিস্মিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"পাগলিনীই সুখী, তাহার কোন চিন্তা নাই। তাহাকে খেতে পর্‌তে দিব বল্লেম, তাহাতেও সে রাজী নয়। পাগলিনীর কথায় কি বিশ্বাস করা যায়? পাগলিনী বলেন—পুষ্পবতী ক্ষত্রিয়-কন্যা, যদি যথার্থ তাহাই হয়, তবে আর আমার সুখের অন্তরায় কে হবে? পুষ্পবতী যথার্থ সুন্দরী—পুষ্পবতী সুশীলা—গুণবতী—সরলা, পুষ্পের ন্যায় স্ত্রীলোক আজকাল দুর্লভ; পুষ্প যথার্থ পুষ্প, যথার্থ দেবভোগ্য; আমার ন্যায় সামান্য নরকের কীটের জন্য এ পুষ্প সৃষ্টি হয় নাই। ঈশ্বরের কি দয়া জানি না, তাঁহার অসীম কৃপা কটাক্ষের জন্য তাকাইয়া আছি। লীলাবতী, পুষ্পবতীর মনের ভাব জানে, লীলার নিকট শুন্‌বো পুষ্প আমাকে ভালবাসে কি না। যদি ভাল না বাসে, তবে আর আমি তাকে কষ্ট দিব না। পুষ্পবতী যাহাতে সুখী হয়, তাহাই কর্‌বো, পুষ্পবতীর সুখের অন্তরায় হবো না। তাহাই যথার্থ ভালবাসা—যাহাতে স্বার্থ মিশ্রিত নাই, আমি সেই পথ অবলম্বন করতে চেষ্টা করবো।" রাজা বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। *

কতদিন হইতে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বাঙ্গালা ভাষার কথা বলিতে হইলে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার কথা কিছু বলা উচিত, কারণ সংস্কৃতই আদি ভাষা, ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভাষাই ছিল না। দেবতাগণ এই ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেন। পৃথিবীস্থ সকল ভাষাই এই দেব-বাঞ্ছিত আদি ভাষা সংস্কৃত হইতে কিছু না কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে; সংস্কৃত ভাষা কিন্তু শাশ্বত—সনাতন, ইহা কাহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া আপন অঙ্গ পরি-

* বিগত ৩১শে জুলাই কর্ম্মযোগ প্রেসে মণিমন্দির উৎসবে সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, উদ্বোক্তা ছিলেন, মণি-মন্দির প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

পুষ্ট করে নাই। "ইহাই ভাষা-বিজ্ঞান" শাস্ত্রের কথা। জাতি মাত্রেরই এক একটা ভাষা আছে, তদ্দ্বারা তাহারা আপন মনোভাব ব্যক্ত করে।

আর্য্যজাতি দেবজানিত জাতি—ভারতবর্ষ তাহাদের চির-বাসস্থান। সংস্কৃতই দেবভাষা বলিয়া দেবতার বংশধর আর্য্যজাতিগণের ভাষাও সংস্কৃত; আমরা তাহাদের বংশধর বলিয়া এককালে সংস্কৃত ভাষা আমাদেরই মাতৃভাষা ছিল। কিন্তু হায়! অদৃষ্টদোষে এবং কালমাহাত্মে সেই মাতৃভাষাই এখন আমাদের নিকট একটী অজানিত ভাষারূপে পরিণত হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতের বৈদিক যুগে এ দেশে সংস্কৃত ভাষাই এখনকার বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় প্রচলিত ছিল। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষায় মতিমান হইয়া জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে জাতির ভাষা যত উন্নত, পরিপুষ্ট এবং বহুপ্রচলিত, জাতীয় জীবন তাহাদের তত উন্নত এবং সেই জাতির দ্বারাই জগতের হিত-সাধন হইতে পারে—তাই একদিন আর্য্যজাতির যশোগৌরব হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাঁহাদের জ্ঞান-গৌরবের প্রদীপ্ত তেজ পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার নাশ করিয়া আপনার বিজয়-কেতন চারিদিকে প্রজ্জ্বীয়মান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে জাতির ভাষার উন্নতি নাই, সে জাতির জাতীয় উন্নতি অসম্ভব বলিয়াই আর্য্যের বংশধর হইয়াও আজ আমাদের এত অধঃপতন।

দ্বাপরের শেষভাগে, কলির আগমন সময়ে যখন পাণ্ডব-কুল-ধুরন্ধর মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির দমন করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃত ভাষা এ দেশের মাতৃভাষারূপে সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। তাহার পর যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তদীয় পুত্র অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষ সম্রাট মহারাজ জনমেজয়ের সময় হইতেই সংস্কৃত ভাষার অবনতির সূত্রপাত, অর্থাৎ কলির প্রাদুর্ভাবে লোক সকল বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু দেশে রাজা থাকিলে প্রজাবর্গ ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না। পিতৃ-পথানুবর্ত্তী মহারাজ জনমেজয় আপন রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মভাব ও ভাষার একাধিপত্য সমভাবে প্রচলিত রাখিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রভুত্বও তখন বজায় ছিল, অধিবাসিগণ কলির প্রভাবে বিচলিত হইলেও রাজার জন্য কেহ কিছু করিতে পারে নাই। তারপর তাঁহার ইহলোক ত্যাগের সময় হইতেই বৈদিক-যুগের অবসান হইল; কলিও আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। হিন্দু-রাজত্বের লোপ হইল। যাহা লইয়া আর্য্যজাতির আর্য্যত্ব; যাহা লইয়া আমরা সকল দেশের এবং সকল জাতির আদর্শ হইতে যাই—এইখানেই তাহার যবনিকা পতন হইল। তবে তখন যে আর্য্যজাতি বা আর্য্যভাষা ছিল না—তাহা নহে; দেশে যে রাজা ছিল না—তাহাও নহে; তবে কলির প্রভাবে ভিন্ন প্রকারের হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর অনার্য্যজাতি সকলের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া উঠিল। ক্রমশঃ মুসলমানগণ দেশের

রাজা হইয়া একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এই সময় হইতে মূল সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আর লোকের তত ইচ্ছা রহিল না; তাই মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় পুরাণাদি প্রচলিত হইতে লাগিল। রাজা অশোক ও বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির সময়ও কতটা সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। কালীদাস বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রচলন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর কিন্তু একেবারেই সংস্কৃত ভাষা মিশ্র ভাষা রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মিশ্র সংস্কৃত পয়ারাদিচ্ছন্দে পুরাণ সমস্ত লিখিত হইয়া প্রচলিত হইল। এই মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষাই—বাঙ্গালা ভাষা। ভাষার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের এবং জাতীয় অধঃপতন সঙ্ঘটিত হইল! তখন রাজা হইল বিজাতীয় যবন, তাঁহাদের ভাষা শিক্ষা করিতে অনেকের মন নত হইল কারণ তাহা না হইলে উন্নতি বা রাজার নিকট সম্মান লাভ হয় না; উর্দ্দুর ও পারসিক ভাষা শিক্ষার প্রাত তখন লোকের মন ধাবিত হইল। ভাল ভাল লোক ঐ সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া রাজসরকারে উচ্চাসন লাভ করিতে লাগিলেন। অধঃপতিত মিশ্র সংস্কৃত ভাষাই তখন বাঙ্গালা ভাষা, ইতর লোক ও স্ত্রী লোকের মধ্যে পড়িয়া মাতৃভাষারূপে পরিণত হইল। তখন বাঙ্গালা ভাষার কিছুই ছিল না, সে সময় বাঙ্গালা ভাষার বড়ই দুরবস্থা। ক্রমে ক্রমে ঐ মিশ্রিত ভাষায় কথকতা, পাঁচালি, প্রভৃতি রচিত হইয়া সকলের চিত্ত-রঞ্জন করিতে লাগিল। ব্যাকরণের প্রচলন এক প্রকার উঠিয়া গেল বলিলেই হয়। যে যাহা মনে করিত ভাষার সেইরূপ অপব্যবহার করিয়া আপনার প্রভুত্ব বজায় করিত। যখন ভাষার এইরূপ অবস্থা, তখন উর্দ্দু ও পারসিক ভাষার অনেক শব্দ এই ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিতে লাগিল, কারণ তখন দেশে উহাই রাজভাষা, উহার আদর কে না করিবে। এই সময় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিকঙ্কনের চণ্ডী প্রভৃতি রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মুখোজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। তখন শব্দের বানান বা শব্দ যোজনার ধারার কিছু বাঁধাবাধি ছিল না। বাঙ্গালা ভাষা এইরূপ ভাবে বহুদিন জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তার পর ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতে যখন তাঁহারা আপন ভাষা এদেশে পরিচালিত করিলেন, তখন ইংরাজী ভাষা হইতেও অনেক সম্পদ বাঙ্গালা ভাষার পদ-গৌরব বৃদ্ধি করিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সঙ্গত বাঁধাবাধি ভাব তখনও প্রচলিত হইল না, ভাষা যেন শিথিল ভাবাপন্ন। কিয়দ্দিন পরে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের ধ্রুবতারা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, বহুদিন হইতেই মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা—পার্শী, উর্দ্দু, ইংরাজী ভাষা প্রভৃতি হইতে সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিল; কেবল সাজান অভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ব্যাকরণ সঙ্গত করিয়া ঐ সকল বেশ ভূষা পরিপাটীরূপে সংগ্রহিত করিয়া বঙ্গ ভাষার অঙ্গ সুসজ্জিত করিলেন। এক্ষণে বহু মনীষী ইহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়া মাতৃ ভাষাকে দিন দিন উন্নতি

সোপানে আরোহণ করাইতেছেন। এখন বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ পরিপুষ্ট, অবস্থা উন্নত—এখন আমাদের মাতৃভাষা "বাঙ্গালা ভাষা," দীনহীনা কাঙ্গালিনী নহেন, এখন তিনি অতুল সম্পদশালিনী ; এখন বাঙ্গালা ভাষা যে অনেক ভাষার সমকক্ষ হইবার যোগ্য হইয়াছে, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই।

এখন প্রতিদিনই রাশি রাশি অমূল্য গ্রন্থ সকল প্রথিতযশা লেখকগণের দ্বারা লিখিত হইয়া জননীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখন সে মেঘ-মলিনতা কাটিয়া গগনে ভানূদয় হইয়াছে। এইজন্য জাতীয়জীবনও যে ক্রমশঃ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কথক।

কথকেরা বাঙ্গলার প্রভূত উপকার করিতে পারেন ; আবার কথকেরাই যথেষ্ট অপকারও করিতে পারেন। এই কারণেই সুপণ্ডিত, ধার্ম্মিক এবং আদর্শ কথকের প্রয়োজন। যাহাতে সাধারণের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কথকতার প্রতি লোকসাধারণের যে প্রকার অনুরাগ লক্ষিত হয়, তাহাতে কথকতার দ্বারায় লোকশিক্ষা বিধানের চেষ্টা করা কখনই দুশ্চেষ্টা হইবে না। বক্তৃতা সকলের প্রিয় হয় না, কিন্তু কথকতা প্রায় অধিকাংশ লোকেরই চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। কথকতাকে এই জন্যই লোকশিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ করিয়া লইতে পারিলে বড় ভাল হয়।

সমাজের সকল স্তরের লোককে সৎকর্ম্মে এবং সৎভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে এবং সমাজের বন্ধন অক্ষুন্ন রাখিবার সদিচ্ছা সর্ব্বসাধারণের মনের মধ্যে জাগ্রত রাখিতে হইলে, তাহাদের মন যে বিষয়ের প্রতি স্বতঃই প্রধাবিত হয়—সেই বিষয়ের মধ্য দিয়া লোককে সামাজিক শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিলেই বিশেষ ফললাভ হইতে পারে—এইরূপ আশা করা যায়।

মানুষের মন একটা মস্ত বড় জিনিষ। এই মনই সংসারকে স্বর্গ তৈয়ারি করে এবং এই মনই সংসারকে নরকে পরিণত করে। এই মনের উপর সৎকথার দ্বারায় যে একটা পলি পড়ে, তাহার উর্ব্বরতা এতই অধিক যে তাহাতে জ্ঞানের, এবং ধর্ম্মের বীজ পতিত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ধর্ম্মের এক একটা উল্লেখ যোগ্য প্রেম-ভক্তি-জ্ঞানের-আশ্রয়-স্বরূপ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। কুকথার পলিও অনুর্ব্বর নহে, পাপের বীজ পতিত হইলে ইহা হইতে সর্ব্বসংহারিনী, প্রলয়ঙ্করী পাপ-লতিকা প্রসারিত হইয়া সমগ্র সমাজকে বেষ্টন করিয়া হীনতেজ এবং নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। এই জন্যই সাধারণের মনকে মাঝে মাঝে উচ্চ কথা, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাবনার দ্বারায় ধুইয়া লইতে হয় ; প্রেমের কথায়, ত্যাগের মহিমায়, পবিত্রতার রসে মাঝে মাঝে মনকে মাতাইয়া তুলিতে হয়, নহিলে সংসারের পাপ তাপের, দুঃখ বিষাদের প্রলেপ সকল ঘনীভূত হইয়া সমাজ-জীবনকে, জাতীয় সমষ্টিকে একে-

বারে অধঃপতিত, দয়ামায়াহীন, ধর্ম্মকর্ম্ম বিহীন করিয়া ফেলে।

কথকতার দ্বারা মানবের মঙ্গল, ভাবের বিকাশ, সাহিত্যের উন্নতি, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, সমাজের হিত সকলই হইতে পারে। এই জন্যই যাহাতে কথকতা প্রশ্রয় পায়—তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেমন তেমন কথার দ্বারা ইহা হয় না; যে কথকথায় ধর্ম্মের কথাই বিবৃত করা হয়, তাহা হইতেই উক্ত প্রকার ফললাভ হইতে পারে, অন্যথা লোকরুচির অনুগত হইয়া যে সে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা কেবল পাপের স্রোতকেই অব্যাহত করা হয়।

কথকতা এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্ব্বার প্রচার হওয়া আবশ্যক। কথকতার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকেও পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, এইজন্য কথকতা আরও অধিক প্রয়োজনীয়, দেশে যে প্রকার শাস্ত্রচর্চ্চা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যাহারা পড়িতে পারে তাহাদিগকে শাস্ত্রপাঠে রত হইবার জন্য উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। সুপণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক কথকই তাহা করিতে পারেন, এইজন্যই কথকতার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রধান দেশ। বেদের প্রভাবেই ভারত পবিত্র। ভারতবর্ষেই উপনিষদ গীত এবং দর্শন আলোচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অতীতই উজ্জ্বল এবং প্রভাময়; বর্ত্তমান ম্লান এবং জ্যোতিহীন। এই জন্যই ভারতবর্ষের অতীতকে খুঁজিয়া আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

ভারতের সমাজ মানুষকে কেবল মানুষ করিয়াই তৃপ্ত নহে। মানুষকে দেবতা করিতে পারিলেই সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ধর্ম্মই এই মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের বিধাতা। এই জন্যই ভারতীয় সমাজের ধর্ম্মই মূল ভিত্তি। ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। ধর্ম্মের অত্যল্পতাহেতুই বর্ত্তমান সমাজ এত টলমল; রোগে, শোকে, দুঃখে, অপমানে ম্রীয়মান।

এখন যে অবস্থায়—সমাজ পতিত হইয়াছে, সে অবস্থা হইতে সমাজকে তুলিতে হইলে অতি সন্তর্পনে কার্য্য করিতে হইবে। একটানে সমাজকে তুলিয়া লইবার চেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না। ইহাকে অল্পে অল্পে ধর্ম্মে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে। একেবারে দেশময় টোল স্থাপন করিলে হইবে না। লোকের মনের মতন করিয়া—ধর্ম্মের নিগূঢ় কথার অমৃত প্রথমে দেশীয় লোককে দেশীয় ভাষার মৃণ্ময় পাত্রেই পান করাইতে হইবে। দরিদ্র ভারতবাসী পাত্রাভাবে মাটীর পাত্রেই তৃষ্ণা নিবারণ করুক। পরে যেমনই ধর্ম্ম বৈভবে—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখন সে দেব-ভাষার স্বর্ণপাত্রেই জ্ঞানের, ধর্ম্মের সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া প্রাণের আকুলতা, ধর্ম্মের ব্যাকুলতা নিবৃত্তি করিবে।

কথকতা যাহাতে সুলভ হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কথকতা উৎকৃষ্টও হইবে এবং অল্পব্যয়সাধ্যও হইবে। এখন দেখিতে পাওয়া যায়—যে, কথা দিতে হইলে অনেক স্থানে প্রায় ২০০৲। ৩০০৲ টাকার—কমে হয় না। এই প্রকার কখনই বাঞ্ছিত

নহে। কেবল ব্যবসায়ী কথকদের দ্বারা সমাজের সম্যক মঙ্গল আশা করা যায় না। সমাজে এক দল স্বেচ্ছাসেবক কথকেরও প্রয়োজন এবং এক দল সুলভ কথকেরও প্রয়োজন। যাহাতে ১৫। ১৬ টাকাব্যয়েও যথারীতি সুন্দর কথা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করাও উচিত।

কথা অবশ্যই শাস্ত্রাবলম্বনেই হইয়া থাকে। এই সকল কথার জন্য—গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতের প্রয়োজন। কিন্তু কেবল পণ্ডিত হইলেই হইবে না, লোকের মন হরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে—তাহা না হইলে তাঁহার কথকতা নিষ্ফল হইবে।

কথকতা বলিলে ঠিক শাস্ত্র ব্যাখ্যা বুঝায় না। কথকতা—ধর্ম্ম কথা গল্পচ্ছলে নানা প্রকার তান-লয়-সহকারে বলা। আমাদের আর্য্য-শাস্ত্র সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে। শাস্ত্রের কেবল বঙ্গানুবাদও লোকের প্রিয় হয় না, কেননা অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্যত নষ্ট হইয়াই থাকে, উপরন্তু মূলানুযায়ী হওয়ায় ব্যাখ্যা পঠনে বিধিমত আগ্রহ জন্মায় না। কিন্তু সেই সকল কথা লোকের নিত্য ঘটিত ঘরের—কথা মিলাইয়া বলিলে লোকের সেগুলিতে বেশ চিত্তাকৃষ্ট হয়, এই জন্যই আমরা কথকতার এতাদৃশ পক্ষপাতী।

আমরা আশা করি আমাদের—পাঠকবর্গ এই বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিবেন এবং যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয়--সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

আমাদের মেলাগুলিতেত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচার কল্পে এ দেশীয় ধর্ম্মগুলির প্রতি বিদ্রূপাত্মক বচনাবলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এই সকল মেলায় আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের মহামূল্য কথা সকল প্রচার করি না। এই সকল মেলার প্রয়োজনানুযায়ী যদি আমরা দুই চারিজন করিয়া—কথক নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহা হইলে বোধ হয়—যে এই সকল মেলাগুলির অনেক সার্থকতা বাড়িয়া যায়।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্ব্বাসিতের খেদ।

ধরণী যে শান্তিময় মম মনে নাহি লয়
সদাই মনের দুখে দহিতেছি মরমে।
আত্মীয় স্বজনগণে অনুক্ষণ ভাবি মনে,
তাঁদের স্নেহের কথা ভুলিব না জনমে॥
কোথায় রয়েছে তারা ভেবে হই আত্মহারা
ফিরে যাব নিজ দেশে হেন আশা আছে কি ?
দুস্তর জলধি পারে যাইব কিরূপ করে
হে বিধাত! মোর ভালে আরো কিছু আছে কি ?
কেমনে যাইব দেশে, দিবানিশি ভাবি বসে,
কিন্তু হায়! আশালতা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।
কত আশা ছিল মনে ফুরাইল এইক্ষণে
আমার মনের ইচ্ছা মনেতেই মিলেছে।

শ্রীপ্রবলাল দত্ত বর্ম্মা।

সঙ্গীত চতুষ্টয়।

(স্বামী যোগানন্দ ভারতী (স্বরস্বতী) মহারাজ কে,সি,আই,ই লিখিত)

বাউল।

তাই বলি মন্‌ দিন থাকিতে আবাদ্‌ ভুলোনা।
এমন মানব জমী রহিল পতিত, চেয়ে দেখ্‌লে না।
আগাছাতে পূর্ণ জমী, দেখ্‌তে পাওনা মন তুমি।
দিনে দিনে জমীর হানি, হ'চ্ছে তাকি জান না।
চৌদ্দ পোয়া জমী ঘেরা, তায় ঠিকে জমা খাজনা করা।
কোন্‌ দিনেতে পিট্‌বে ঢেঁড়া, ফসল খাওয়া হবে না॥
ফসল যদি আশা কর, আগাছার শিকড় মার।
তার পরে বীজ রোপণ কর, কষ্ট পেতে হবে না॥
চাষ যদি না করিবে, কি উপায়ে খাজনা দিবে।
জমী তোমার কেড়ে নেবে, পালাতে পথ পাবে না॥
অধম বলে ফসল হ'লে, খাজনা তুমি দেবে ফেলে।
তখন আপ্‌নি জমী ছেড়ে দিলে, কেহ কিছু ব'লবে না॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

নাম সুধা পান কর রসনা।
এমন সুধা কোথাও পাবে না॥
হরি ভবের কাণ্ডারী, যে ভাবে, হন তারি;
হরি ত্রিলোক তারণ মধুসূদন গোলক বিহারী।
নামে অরি নাশে, অবশেষে, শমন ভয় আর থাকে না॥
(হরি নামের গুণেরে)
হরি বিশ্ব বিধাতা, হরি জগতের মাতা;
হরি ভয়ত্রাতা, বিশ্বপাতা, বিশ্ব সংহর্ত্তা।
অন্তরে তাঁয় ভাব্‌লে পরে, ভবের ভাবনা রহেনা॥
(হরি নামের জোরেরে)
ত্যজ বিষয় বাসনা, কেন অনিত্য ভাবনা;
যাবে জীবন যখন, কিছুই তখন সঙ্গে যাবে না।
কেবল পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, এরা সঙ্গ ছা'ড়বে না॥
(হরি নাম কররে)
হরি নামটি ভাবময়, ভাবেতে, ভাব হয় উদয়;
ভাবের ভাবে, ভা'বলে পরে, ভাবে দেখা হয়।
কেবল যুক্তি, তর্কে, হয় না কিছু, প্রেম্‌ ভক্তি, ভাববিনা।
(কেবল হরি বলরে)
নামের মহিমা অপার, বর্ণিবার সাধ্য কার;
নামে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে, পাপী হয় উদ্ধার।
নামে শিলা ভাসে, সাগর শোষে, ঘুচে যায় আনাগোণা।
(রাম নামের বলেরে)
দীন যোগানন্দ বলে মন, হেলা করোনা এখন;
দিবানিশি, ভাব বসি, সে রাঙ্গা চরণ।
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে ক'সে, কোন কথা খাট্‌বেনা।
(বোল হরিবোল বলরে)

প্রসাদীসুর—একতালা।

ডাক্‌ দেখি মন কালী ব'লে।
যেন ভুলিস্‌ নাকো, কোন কালে॥
কালী নামের নাই তুলনা, কররে মন, তার সাধনা।
রবেনা তোর, কোন ভাবনা, তরবিরে মন অবহেলে।
অভেদ ভাবে ভা'বলে তাঁরে, বাস করেন, হৃদি মন্দিরে।
ভাব্‌না কি তোর পারের তরে, উত্তরিবি, ভবের কূলে।
বিষয় আশয়, রত্ন মণি, ভাবরে মন তুমি যখনি।
তখনি মা হন্‌ পাষাণী দয়া হয়না, কোন কালে॥
বিষয় বাসনা, থাক্‌লে হৃদে, মত্তে হবে কেঁদে কেঁদে।
পড়্‌তে হবে, মোহের ফাঁদে, জন্ম জন্ম কর্ম্মফলে॥
জ্ঞানাগ্নি তাই, দাওরে জ্বেলে, বাসনা সব ভস্ম হ'লে।
আস্‌বে না আর ভূমণ্ডলে, জন্মের মত যাবে চ'লে॥
যোগানন্দ তাই, সকল ভুলে, পড়ে মায়ের পদতলে।
কি দিবা কি রাত্রিকালে, সকল সময় কালী বলে॥

প্রসাদী সুর একতালা।

মন্‌ কেন তোর ভাব্‌না এত।
মুখে কালী কালী বল্‌রে মন, হ'য়েরে তুই সংযত।
মোহ মদে মন্‌ মজোনা, তাই'লে তোর ভয় রবে না।
ঘুচ্‌বে রে তোর, আনাগোণা, ফল পাবি তুই মনের মত।
যম দূতের সাধ্য কিরে, তোরে লয়ে যায় যম পুরে।
কালী নামের, ধ্বনি শুনে, পালাবে সব যমদূত॥
কৃতান্ত বেটা, আসে যদি, দেখাব তায় আমার হৃদি।
মাকে রেখে, নিরবধি, পূজি হ'য়ে ভক্তিযুত।
তাই বলি,যমের সাধ্য কিরে ল'য়ে যায়, মোরে যমপুরে।
বাড়াবাড়ি ক'র্লে পরে, ল'ড়বো আমি, সাধ্যমত॥
যমের বাপের কি ধার ধারি, আমার বাপ যে ত্রিপুরারি।
আমি যমের মাথা ভাঙ্গ্‌তে পারি, দিয়ে দণ্ড রীতিমত।
যোগানন্দ তাই ব'সে আছে, কালী নামের বেড়া দিয়েছে।
আর কি কারো সাধ্য আছে, পালায়েছে সব যমদূত।

সতী মা।

পণ্ডিত নান্নুরাম চণ্ডভানু বোম্বাই নগরের এলফিনষ্টোন কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ইনি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামের মলসিসার সম্প্রদায় ভুক্ত। সতী মা বীরত্বের রঙ্গভূমি, সতীত্বের পুণ্য তীর্থ এই সুপ্রসিদ্ধ জয়পুর গ্রামে পণ্ডিত নান্নুরাম চণ্ডভানুর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ড ভানু নন্দিনী আদর্শ সতী রূপিনী সতীমার পিতৃমাতৃ দত্ত প্রকৃত নাম কি জানি না। তবে তাঁহার অলৌকিক তিরোধানের পর লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল সতীমা। আমরাও এ প্রসঙ্গে তাঁহাকে সতীমা নামেই অভিহিত করিব।

সতীমা বালিকা বয়সে আদর্শ দম্পতী রাম-সীতার পুণ্য কাহিনী, সাবিত্রী-সত্যবানের পবিত্র চরিত্র এবং পতি নিন্দা শ্রবণে সতীর আত্ম বিসর্জ্জন প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী পাঠ ও পৌরাণিক পুণ্যশীল নর-নারীগণের বিচিত্র মধুর অপূর্ব্ব গল্প-গাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তিন করিতে বড় ভালবাসিতেন। শিক্ষিত পিতা অবসর ক্রমে স্নেহবতী তনয়ার সুশিক্ষার সহায় হইতেন। সতী মা বয়স্থা হইলে জনৈক অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক সুশিক্ষিত সুন্দর যুবকের করে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া রূপসী বালিকা সতীমাকে অর্পণ করা হইল। অনুরূপ সমাগমে দম্পতি পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পতি-ভক্তির জন্য সে অঞ্চলে সতীমার বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। আত্মা-প্রশংসা শ্রবণে সতীমা বিশেষ লজ্জিতা হইলেও লজ্জা-ভয়ে তিনি পতির প্রতি সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। সতীমা নিয়ত কায়মোবাক্যে স্বামীর প্রতি প্রীতি-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া নারীজন্ম সার্থক জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরম সুখে সতীমার বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ বৎসরে তাঁহার একটী পুত্র-রত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রমুখ দর্শনে দম্পতীর এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় সুখ স্রোত প্রবাহিত হইল। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহাদের এ সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরেই সতীর পতি সংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। পতির কঠোর ব্যাধি দর্শনে ভয়ভাবনায় সতীর প্রাণ শুকাইয়া গেল। তিনি প্রাণপণে স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় লিপ্ত হইলেন। সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাঁহার সুচিৎকার বিধান করিলেন। এবং স্বামীর মঙ্গল কামনায় তাঁহার রোগ মুক্তির অভিপ্রায়ে সতী কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নিয়ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কঠোর পীড়া সুযোগ্য চিকিৎসকের বাধা মানিল না—পতিব্রতা সতীর করুণ প্রার্থনা বিধাতার দরবারে পৌছিল না। রোগ আরও বৃদ্ধি পাইল। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও চিকিৎসকগণ রোগীর জীবনে নিরাশ হইয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় বিষাদ ম্লান বদনে বসিয়া থাকিলেন। সতী তখনও সেই মুমূর্ষ পতির পদতলে বসিয়া ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় আকুল প্রাণে তাঁহার প্রাণারাধ্য ধনের মঙ্গল প্রার্থনায় নিরত।

তথাপি দেবতার কর্ণে পতিব্রতা সতীর আকুল প্রার্থনা পঁহুছিল না। অথবা কালপূর্ণ হইলে বুঝিবা পরম কারুণিক বিধাতাও কাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। তাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধান চির অখণ্ডনীয়। মাতার ক্রন্দন, ভগিনীর বিলাপ বা সতী-পত্নীর উষ্ণ অশ্রু কিছুতেই সেই অলঙ্ঘ্য দুর্জ্জয় বিধানের খণ্ডন অসম্ভব। বিগত ১৩১৯ সালের ২১শে আষাঢ় শুক্রবার সতীর হৃদয়-দেবতা পার্থিব আধি-ব্যাধিও মায়া-মমতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন। সতীর শেষ আশাটুকু ফুরাইল।

পতির মৃত্যু দর্শনে সতী এক ফোঁটা অশ্রু-পাত বা কুররী-কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে চীৎকার-ক্রন্দনে গগণ নিনাদিত না করিয়া শেষ একবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শবদেহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রম পূর্ব্বক স্বামীর চরণতলে উপবেশন করিলেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সতীকে বলপূর্ব্বক স্থানা-ন্তরিত করিয়া শবদেহ শ্মশানে নীত হইল। তাঁহার আত্মীয়েরা গাত্রালঙ্কার উন্মোচন জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সতী তাঁহা-দের যে অনুরোধ-উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পতিসহ সহমৃতা হইবার জন্য সাগ্রহে শ্মশান ভূমে উপনীত হইলেন। আত্মীয়েরা তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না। তাঁহারা বলপূর্ব্বক পতির নিকট হইতে সতীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় গৃহ প্রকোষ্ঠ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পতি-প্রাণা সতী নিগড়াবদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া পতির সহমৃতা হইবার জন্য উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘোর উন্মাদিনীবৎ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগি-লেন,—"তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ, আমাকে সতী হইতে হইবে—আমি নিশ্চয় পতির সহিত সহমৃতা হইব। সতীর পাষাণ-ভেদী করুণ চীৎকার-বিলাপেও তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা সমীচীন বোধ করিলেন না। অপূর্ব্ব বাসনার তীব্র জ্বালায় সতী অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তথাপি রুদ্ধ গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল না।

তখন সতী ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় যোগা-সনে বসিয়া বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইয়া তন্ময় চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের মধুর নাম জপ করিতে লাগিলেন। রামনাম জপ করিতে করিতে সহসা সতীর পবিত্র দেহ ভূতলে পতিত হইল। যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন সকলে দেখিল, সতীর প্রাণশূন্য পবিত্র দেহ-পিঞ্জর ভূতলে পড়িয়া আছে; পতিপ্রাণা সতী তাঁহার প্রাণারাধ্য দেবতার সহিত চির বিচ্ছেদ শূন্য নত্য নিরা-ময় স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন। জীবনের মধুময় বসন্ত-প্রভাতে সপ্তদশ বর্ষীয়া সুবর্ণ-লতিকা আশ্রয়-তরুসহ অকালে তিরোহিত হইল।

বিস্ময়-বিষাদ পূর্ণ হাহাকার ধ্বনীর সহিত "জয় সতীমাই কি জয়" শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরি-পূর্ণ হইল। অনন্তর পতিসহ একই চিতায় সুরভি চন্দন কাষ্ঠের অগ্নিতে মহাসমারোহে সতীদেহ ভস্মীভূত করা হইল। সেই দেব-দম্পতির চিতা-ভস্ম মস্তকে লইয়া শত সহস্র

নর-নারী শত তীর্থ স্নানের পুণ্য সঞ্চয়ে কৃতার্থ হইল। সতীর পবিত্র শ্মশান মহাতীর্থে পরিণত হইল। সে দিন হইতে সমবেত জনসাধারণ তাঁহারই নাম রাখিল "সতীমা।"

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

ঝাঁটা।

মূঢ় সে, যে নিন্দে তোমা অয়ি সম্মার্জ্জনি !
গৃহস্থের তুমি নিত্য আদরের ধন ;
প্রাসাদে কুটীরে তব, কণ্টক-আননি !
সযত্নে সুনির্দ্দিষ্ট সম্মান-আসন।

জড়াইয়া কটিতটে আকুল অঞ্চল
সুন্দরী শ্রীকরে যবে করে সঞ্চালন,
কোন্ প্রেমিকের মন না হয় চঞ্চল,
হেরি নৃত্যময় তব উত্থান পতন।

শত আন্দোলনে তুমি রহ নির্ব্বিকার,
শত প্রহরণে তুমি রহ অকাতর ;
তোমারি সে সুধাস্নিগ্ধ সুফলের সার
করে তৃপ্ত শুষ্ককণ্ঠ, শীতল অন্তর।

জন্ম তব উচ্চবংশে, মঙ্গল-উৎসবে,
মন্ত্রপূত পুণ্য-ঘটে, চির কীর্ত্তিমান—
প্রতিষ্ঠিত সর্ব্ব অগ্রে সূচিয়া কল্যাণ।
তব শ্রেষ্ঠ বংশধর, সূচিয়া কল্যাণ।

আপনি হইয়া তুমি মলিন সতত,
করিতেছ সুনির্ম্মল সকল ভুবন ;
হইলে তোমার মত উদার, উন্নত
সারা বিশ্ব, ধন্য হ'ত মানব-জীবন।

বিশুদ্ধ ব্যায়াম তুমি বঙ্গ-ললনায়,
ক্রোধে মারাত্মক অস্ত্র, প্রেমে অলঙ্কার।

——গিরিজাকুমা…

সাহিত্য সমালোচনা।

রাঙা পা দুখানি। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে প্রণীত, একখানি কবিতা পুস্তক, মূল্য ৷৹ আনা, সোণামুখী গরীব ভাণ্ডার, জেলা বাঁকুড়া এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। রসিক বাবু ভক্ত—ভাবুক কবি। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সম্বন্ধে নানা ভাবের কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভগবানের রাতুল চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভক্ত-হৃদয় যখন যেভাবে উচ্ছসিত হইয়াছে ; তাহাই কবিতাকারে গ্রথিত হইয়া এই পবিত্র পুস্তকে স্থান পাইয়াছে ; পদ্যগুলির ভাব অতি প্রাণারাম, কারণ ইহা প্রাণের জিনিস, ভক্তি-সাগর মথিত করিয়া ইহার উৎপত্তি, তাই এত মধুর—ভক্ত না হইলে এরূপ উচ্ছ্বাস অসম্ভব। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া এরূপ পবিত্র ভক্তি-সুধা সাধারণে বিতরণ করুন।

সমালোচনা।

হামিক।—একখানি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র, হাকিম শ্রীযুক্ত মসিহর রহমান সম্পাদিত মূল্য ১৲ টাকা। মসলেম চিকিৎসায় মাসিক পত্র দেশে আদৌ নাই ইহাতে দেশের একটী ঘোর অভাব দূর হইল বটে কিন্তু ঔষধ বা রোগের নাম গুলি মুসলমানী ভাষায় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা বা ইংরাজী অনুবাদ দিলে ভাল হয়—ইহাতে সম্পাদকের কৃতীত্ব পরিস্ফুট হইবে আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

SEP. 1910

13 SEP 1913

আলোচনা, ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২০।

হিরণ্যগর্ভ-দেবতা।

(ব্রহ্মা)।

১। শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মাই মূল। তিনিই ব্রহ্ম। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, অক্ষর, দেশকালে অপরিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় রূপনাম বিহীন, অপরিণামী, সর্ব্বব্যাপী সুসূক্ষ্ম, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ, নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিরাময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বসাক্ষী, ভূতযোনি, আনন্দ-স্বরূপ, শান্ত, মঙ্গল অদ্বিতীয়। তিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি উপাধি-রহিত অথচ নামরূপ ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক। সূর্য্য, শশাঙ্ক, পাবক, বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি সকলকে প্রকাশ করেন। শাস্ত্র তাঁহাকে এইরূপে কীর্ত্তন করেন।

২। কিন্তু দেশান্তরীয় ধর্ম্মপুস্তকে বা স্বাভাবিক-ধর্ম্মমত-গঠনকারী নিরাকারবাদীগণ তাঁহাকে ঐরূপ নিরাকারভাবে গ্রহণ ও বর্ণন করেন না। তাঁহারা তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও বৃত্তি দ্বারা রচনা করেন এবং দেশকালে পরিচ্ছিন্ন এবং স্বর্গাদি লোকে মহা-সিংহাসনে আসীনরূপে প্রতিপাদন করেন। সুতরাং ভারতীয় পণ্ডিত-গণের বিচারে তাঁহাদের ধর্ম্মমতে বিশুদ্ধ-নিরাকার ব্রহ্ম নাই। তাঁহারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামে যাঁহাকে গ্রহণ করেন তিনি একপ্রকার মনো-কল্পিত সাকার-দেবতা। তাহাদের নিরাকার-বাদ অসঙ্গত।

৩। এখন একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। হিন্দু-শাস্ত্রে পরমাত্মা-ব্রহ্মকে প্রাগুক্তপ্রকারে নিরাকারাদি ভাবে কীর্ত্তন করিয়াও আবার কিরূপে, একপক্ষে তাঁহাকে সাকার হিরণ্যগর্ভাদি রূপে; জীবের স্থূল-সূক্ষ্মাদি কলেবরে প্রবিষ্ট নানা সংজ্ঞায় পরিচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ চৈতন্য-আকারে; অব্যক্ত প্রকৃতি-সম্ভূত নবোদিত অণ্ডগোলকস্থ ব্রহ্মমূর্ত্তিরূপে; সূর্য্যের জন্মদাতা-রূপে; এবং নরলোকে বেদের প্রকাশরূপে এবং কিরূপেই বা পক্ষান্তরে সাকার-মূর্ত্তিতে মানবের জন্মদাতা আদি-পুরুষরূপে; মনু ও মরীচি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণের; ও চন্দ্রসূর্য্য বংশের; এবং দৈত্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্বগণের; আর অধম পশ্বাদির বীজপুরুষরূপে বর্ণন করেন, ইহা অনেকের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এই মহাতত্ত্ব যুক্তি-সঙ্গতরূপে না বুঝিতে পারিলে সর্ব্বশাস্ত্রের এবং শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের একবাক্যতা রক্ষিত হয় না।

৪। শাস্ত্রে জীব, জীবের কর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ অদৃষ্ট; দিক্, কাল, আকাশাদি ভূতপঞ্চ; ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তি—এই

সমস্তের সহ প্রকৃতিতত্ত্ব, রূপ নাম-বিহীন অব্যক্ত অবস্থায় নিত্যকাল হইতে সদ্রূপ বিভূ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে স্থিতি করেন বলিয়া উক্ত হয়। সবই নিত্যকাল হইতে আছে। কেবল রূপ ও নামের সৃষ্টি হয় মাত্র। প্রত্যেক মহাপ্রলয়-রজনীর অবসানে নব নব কল্পারম্ভ সময়ে তাহা পরব্রহ্মের নিয়োগে হইয়া থাকে।

৫। এক এক কল্পকাল যাবৎ তৎসমস্ত, জন্ম বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি পরিণামের সহিত, জীবগণের সেবা করিয়া প্রত্যেক অন্তিম-কল্পে আবার রূপ নাম ত্যাগ পূর্ব্বক মহা-প্রলয়ে লীন হয় এবং ব্রহ্মশক্তির মধ্যে গিয়া স্থিতি করে।

৬। কেবল জীবের কর্ম্মজন্য এই সমস্ত তত্ত্বের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। অনাদি কাম-কর্ম্মই জীবের পুরুষার্থের সম্পূরক সৃষ্টির হেতু। পরমাত্মা তাহার বিধাতা ও অধ্যক্ষ। ফলে সেই সমস্ত বিশ্বসৃজনাদি কার্য্যে তিনি নির্লিপ্ত, অনাসক্ত ও উদাসীন। কেবল জীবের কর্ম্মানুসারেই তিনি-সৃষ্টি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি, ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি বশতঃ বলপূর্ব্বক কোন জীবের কর্ম্মফল বিধান করেন না। কেননা তাহা স্বভাবতঃ জীবের অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম বশতঃ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব তিনি সঙ্গত-রূপেই নিষ্ক্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

৭। মহাপ্রলয়ের অবসানে যখন জীবের জাগরণোন্মুখ অদৃষ্টের ও পুরুষার্থের প্রবর্ত্তনা জন্য সামান্য রজনীর অবসানে সূর্য্যের উদয়কালের ন্যায়, সৃষ্টির উদয়কাল দেখা দেয়, তখন পরব্রহ্ম তাহা দৃষ্টি করেন। ঐ দৃষ্টিটী, শাস্ত্রে, ঈক্ষণ, তপস্যা, আলোচনা, কামনা, ইচ্ছা প্রভৃতি শব্দে উক্ত হয়। সেই দৃষ্টি বা ইচ্ছামাত্রে জগৎ বহিঃ প্রসারিত হয়।

৮। তথাচ মন্ত্রবর্ণে। "অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।" "ততোমহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভসময়ে তপসোঽদৃষ্টবলাৎ সমুদ্রোঽজায়ত।" "কীদৃশাৎতপসঃ"? "অভীদ্ধাৎ"। "অভি" সর্ব্বতোভাবেন "ইদ্ধাৎ"। "লব্ধবৃত্তেঃ প্রলয় সময়েহি নিরুদ্ধবৃত্ত্যাদৃষ্টং ভবতি।" মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তাঁহার তপস্যা-প্রভাবে—তমোময়ী রাত্রি অর্থাৎ প্রকৃতি ভেদ করিয়া মহতত্ত্বাদিক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত জন্মিল। সেই তপস্যা কি প্রকার? তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রলয় সময়ে জীবসমস্তের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তি নিরোধাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্ত থাকে। তাহাই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপী অদৃষ্ট। তাহা জীবের দৃষ্টির বহির্ভূত, কিন্তু পরব্রহ্মের সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর। প্রলয়াবসানকালে ঐ সকল বৃত্তির সহিত জীব সমস্ত জাগরণোন্মুখ হইল। তখন পরব্রহ্ম তাহা অনায়াস-লক্ষণ জ্ঞানদ্বারা ঈক্ষণ করিলেন। তাহারই নাম তপস্যা। নামান্তর কামনা বা আলোচনা। সে কামনা তাঁহার স্বার্থজন্য নহে; কিন্তু পরার্থ; অর্থাৎ জীবসমস্তের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ক্রম-পরম্পরা সম্পূরণার্থ এই মহান্ শিক্ষাক্ষেত্ররূপ সৃষ্টিরাজ্যে প্রেরণা। সে আলোচনাও সামান্য যত্ন নহে। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে দর্শন। কি দর্শন? না, অনন্তকোটী জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপী, পুরুষার্থরূপী অনাদি কর্ম্মতত্ত্ব দর্শন। সে দর্শনের ফল কি? না, তদনুরূপ সৃষ্টির প্রকাশ। "সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি

বিশ্বধধিশ্বস্যমিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ।” সেই সমুদ্রার্ণব হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী বিধাতা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি সূর্য্যচন্দ্র সৃষ্টি করিয়া সম্বৎসর কল্পনা করিলেন। অনন্তর মহঃ প্রভৃতি ব্রহ্মভুবন, ভূঃ ভুব ও স্বর্গলোক সকল সৃষ্টি করিলেন। ঠিক সেইপ্রকার যেমন পূর্ব্ব কল্পে ছিল।

৯। পরব্রহ্মের তপস্যা এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি সূচক অনেক শ্রুতি উপনিষদেও আছে। নিম্নে তাহার কতক দর্শাইতেছি এবং পরেও আবশ্যক মত দুই একটী দেখাইব।

“যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্যতিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত।
এতদ্বৈতৎ” (কঠ ৪।৬)

পরব্রহ্মের তপস্যাতে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জন্মিয়াছেন অর্থাৎ “হিরণ্যগর্ভং”। এবং “অদ্ভ্যঃ” “পঞ্চভূতেভ্যঃ” যিনি পঞ্চভূতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং যিনি সকল প্রাণীর শরীর গুহাতে প্রবেশ করিয়া আছেন। তাঁহাকে যিনি দেখেন তিনি সেই ব্রহ্মকেই দেখেন। এই বচনে, সমুদ্রার্ণব হইতে তাঁহার উৎপত্তির পূর্ব্বেও অর্থাৎ পঞ্চভূতেরও অগ্রে তাহার আবির্ভাব হওয়ার কথা কহিলেন। †

“ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্যগোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায জ্যেষ্ঠ পুত্রায প্রাহ।” (মুণ্ডক ১।১।১)

ব্রহ্মা সকল দেবতার অগ্রে উৎপন্ন হইলেন। তিনি বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালক। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। ‡

“হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং (শ্বেত ৩।৪)

পরব্রহ্ম, জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

“যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।”
(শ্বেত ৬।১৮)

যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং যিনি ব্রহ্মার অন্তঃকরণে সমগ্রবেদ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি মুক্তি ইচ্ছা করিয়া সেই আত্মবুদ্ধির প্রকাশক পরমাত্মার শরণাপন্ন হই।

এই বচনে পরব্রহ্মকর্তৃক ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদশাস্ত্র নিহিত হওযার উক্তি আছে। সে কথা পশ্চাৎ প্রসারিত হইবে।

পরব্রহ্ম কর্তৃক প্রভু হিরণ্যগর্ভ ও বেদের সহিত এইরূপে সৃষ্টি উৎপন্ন হইলে পর তাঁহার

* পরব্রহ্মের তপস্যা হইতে সৃষ্টি হয়। ঐ তপস্যার নামান্তর আলোচনা, ঈক্ষণ, ও কামনা। এই সকল শব্দ ভ্রম উৎপাদক। কেহ মনে করেন যেমন ঋষিগণ তপস্যা করেন তিনি বুঝি সেই প্রকার ক্লেশজনক অনুষ্ঠান করিয়া সৃষ্টি প্রকটন করিলেন। “আলোচনা” শব্দের কেহ অর্থ করেন “আন্দোলন” agitation, কেহবা মনে করেন পুনঃ পুনঃ ভাবনা। এই বৈদিক শব্দগুলির শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য বুঝাইবার নিমিত্তে প্রোক্ত বেদবাণীটি এইস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। সৃষ্টি-পরিণতির ক্রম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নহে, তদ্বিষয়ে যাহা বক্তব্য প্রয়োজন মতে পশ্চাতে বলিব।

† এই তাৎপর্য্যে তাঁহার সংজ্ঞা ঈশ্বর।
‡ এখানে তিনি পিতা।
* এই উভয় বাণী ঈশ্বর প্রতিপাদক।

মহান্ নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ সদ্রূপ একমেবা-দ্বিতীয়ং অদ্বৈত সত্তার সম্মুখে জীব ও প্রকৃতি-তত্ত্বের সহিত দ্বৈতরূপ জগৎ দেখা দেয়। তখন যেমন নবসৃষ্ট ঘটে মহাকাশ অবিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ তাহার ব্যাপকধর্ম্মী সত্তা জীবে জীবে প্রত্যেক জৈবিক উপাধিতে এবং বাহ্য জগতের রূপে রূপে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু আকাশের ঘটে প্রবেশের ন্যায় অন্ধজড়নিয়মে নহে। পরন্তু জ্ঞানস্বরূপে, সত্যস্বরূপে ও মঙ্গলস্বরূপে প্রবেশ করেন। কেননা তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বমঙ্গলালয় এবং সৃষ্টিরূপে উপাধি-রাজ্যের মঙ্গল বিধাতা।

এই মহাপ্রবেশ দ্বারা জীবের হিতকর কয়েকটী কার্য্য সংসাধিত হয়। জীব সকল রূপনামে প্রকাশ পান; তাঁহাদের দেহাদি উপাধি সমস্তও রূপ নাম লাভ করে; তাঁহাদের অনাদি অবিদ্যাবেষ্টিত ঘোরতমসাবৃত প্রাকৃতিক পুরী আলোময় হয়,—এবং সেই আলোকে তাঁহারা স্বাত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব দেখিতে পান।

১২। বেদান্তদর্শন ঐ প্রবেশটীকে নানা-দৃষ্টিতে দর্শন করেন। কোথাও উহাকে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব, কোথাও জলে বা দর্পণে সূর্য্যচন্দ্রের বিম্বপাতের ন্যায় প্রতিবিম্ব মাত্র, কোথাও জীবের মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ-আবির্ভাব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই শেষোক্ত ভাবের ভাবুক হইয়া গীতা প্রভৃতি পরমার্থ শাস্ত্রে আচার্য্যেরা ইহাই প্রতিপাদন করেন যে, ভগবানের এই সকল ঔপাধিকী মূর্ত্তিগ্রহণ কেবল লোকানুগ্রহার্থ কিন্তু কর্ম্মনিবন্ধন লোক-বৎ নহে। কেননা তিনি জীবের ন্যায় অবিদ্যা-কামকর্ম্মরূপ প্রকৃতি-তত্ত্বের বশীভূত নহেন, যে তাহার বশীকৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।

১৩। এই সমস্ত পরিগৃহিত মূর্ত্তির কতকগুলি অদৃশ্য। যেমন জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরোপহিত "বৈশ্বানর," "তৈজস" "প্রাজ্ঞ" ইত্যাদি (মণ্ডুকোপনিষৎ ৩—৫)। এ সমস্তই ব্রহ্ম-চৈতন্য। কেবল দেহরূপ উপাধি-বশাৎ রূপ-নামের বিভেদ উক্ত হইয়াছে। আর কতকগুলি মূর্ত্তি ব্যক্তিধর্ম্মী। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁহাদের শক্তি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী।

১৪। জড়ভৌতিক-বৈজ্ঞানিক নিয়মানুগত আক[illegible]র অচেতন-ঘটে অবিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় পরব্রহ্মের প্রয়োজন বিজ্ঞবান বিভুত্বধর্ম্মী সর্ব্বজ্ঞত্ব-তত্ত্বের, সচেতন-জৈবিক-উপাধিতে প্রবিষ্ট মূর্ত্তিগুলি অচেতনধর্ম্মী হইতে পারেনা। তৎসমূহকে প্রতিবিম্ব বল, বা মিথ্যা বল, বা মায়িক বল, বা অনিত্য বল, কিন্তু সেগুলি জীবের কল্যাণকর। ঐ সকল অব্যক্তধর্ম্মী রূপব্যতীত, তাঁহার প্রাগুক্ত ব্যক্তিধর্ম্মী মূর্ত্তি-সমূহও জাগ্রত, সচেতন, করুণাময় এবং মানবের প্রার্থনার উত্তর-সাধক। তাঁহারাই মানব-সমাজে উপাসনা-মণ্ডপের রত্নবেদী অধিকার করিয়া আছেন। ঐ উভয়বিধ রূপগ্রহণই তাঁহার জ্ঞানকৃত ও অনুগ্রহ নিমিত্ত। আচার্য্যেরা তাহা সঙ্গতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মশক্তিরূপিণী পরমা-প্রকৃতির গর্ভ হইতে অবিভূর্ত হইয়া তাঁহারা জীবরাজ্যের অবিদ্যা-প্রকৃতিরূপ মায়িকোপাধির মধ্যে প্রাগুক্ত প্রকার অব্যক্ত ও ব্যক্তিভাবপূর্ণ রূপসকল গ্রহণ করিয়াছেন।

১৫। মুণ্ডকোপনিষদে চারিটী শ্রুতি আছে।

যথা 'উর্ণনাভি শ্রুতি" "তপসাচীয়তে শ্রুতি", যঃ সর্ব্বজ্ঞ" শ্রুতি এবং "যত্তদ্রেশ্য" শ্রুতি। এই চারিটী বচন শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের সহিত পাঠ করিয়া জানা যায় যে, পরমাত্মা অদৃশ্য অগ্রাহ্য নিত্য সর্ব্বগত ভূতযোনি অব্যয় এবং বিভু। সেই অক্ষর-পুরুষ হইতে উর্ণনাভির উদর-নিসৃত তন্তুময় জালবৎ এই বিশ্ব বহিঃ প্রসারিত হয়।

১৬। সেই ভূতযোনি অক্ষর-ব্রহ্মের জ্ঞানরূপ অনায়াস-লক্ষণ তপস্যা দ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ তাঁহার মধ্য হইতে সংসারিগণের সাধারণ কারণ অন্নরূপিণী অব্যাকৃত প্রকৃতি সমুদিত হন। সেই মহাশক্তিরূপিণী প্রকৃতির গর্ভ হইতে পরব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিত হিরণ্যগর্ভরূপী জগদাত্মা-প্রাণ অভিজাত হন।* তাঁহা হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধজনক মনঃ অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব আবির্ভূত হন। তাঁহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। সেই পঞ্চতত্ত্ব হইতে ভূরাদি লোকমণ্ডল সমূহ সৃষ্ট হইয়া অসীম শূন্যক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। পরে সেই সকল লোকমণ্ডলে মনুষ্যাদি প্রাণীর বসতি হয় এবং তাহাদের বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সকল ব্যবস্থিত হয়। সেই সকল কর্ম্ম হইতে স্বর্গাদি লোকের ভোগ্য অমৃতফল উৎপন্ন হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

* এই প্রাণ মহত্তত্ত্ব বোধক।

বন্যা*।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। ইহার গতিরোধ কেহই করিতে পারে না, এক একটি ঘটনায় জগতের অবস্থা অনেক পরিমাণে বদলাইয়া দেয়। নিয়তই এই ব্যাপার চলিয়াছে; ইহার গতি অপ্রতিহত। কত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ভূমিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আবার কত ঘোর দুর্গম অটবী শোভাময়ী, কোলাহলময়ী নগরীতে পরিণত হইয়াছে। কত সুন্দর নগর অগ্ন্যুদ্গারে ভস্মস্তূপের মধ্যে চির সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছে, আবার কত দুর্ভেদ্য গিরিশিখরে লোকালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের কে ইয়ত্তা করিবে? বিশ্বনিয়ন্তা ভাঙ্গিয়াই গড়িয়া থাকেন, বাদ দিয়াই রক্ষা করেন, যখন যেখানে যে পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতেছে, তখনই তিনি সেখানে সেই পরিবর্ত্তন করিতেছেন। আমাদের দোষ দিবার কিছুই নাই। কপালে করাঘাত করাও অকর্ত্তব্য। জীবনে দুঃখও আছে সুখও আছে, দুইয়ের মধ্যে দিয়াই জীবন যাপন করিতে হইবে, দুইটাকেই উপেক্ষা করিতে হইবে, ইহাদের কাহারও দ্বারা অভিভূত হইলে চলিবে না। প্রকৃতিই এই শিক্ষাদি আমাদিগকে দিতেছে, অতি শীত, অতি তাপ, অতি বৃষ্টি—এই সকলের অভিজ্ঞতা কাহার নাই? এই সকল হইতে ত স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, সুখ দুঃখ উভয়ের জন্যই আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা সংসারে থাকা যায় না, ঠিক থাকার মতন থাকা অসম্ভব!

মনুষ্যত্বের পরীক্ষা ত নিত্য হইয়াই থাকে।

উপযুক্ত যিনি, তিনিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই থাকেন, কিন্তু সারা জীবনের মধ্যে পরীক্ষার শেষ হয় না, কেননা পরীক্ষার কোনও শেষ সীমা নাই; জীবনের মধ্যে অগ্রসর হওয়া থামে না। যেমন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে, তেমনই জাতীরও পরীক্ষা আছে। পরীক্ষকের নিক্তি বড়ই সঠিক—একটি কেশাগ্রেরও ব্যতিক্রম হইবার যো নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিশ্বকর্ম্মা ভাঙ্গিয়াই গড়িয়া থাকেন নতুবা সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকে না। ভাস্কর যেমন কাটিয়া ছাঁটিয়া মূর্ত্তি গঠন করে, ভগবানও তেমনই ভাঙ্গচুর করিয়াই সৃষ্টি করিতেছেন—কিছুই নষ্ট করিতেছেন না। ভাল করিয়া দেখিলে সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্যের কোথাও একটু মাত্রও ক্ষতি হয় নাই।

দামোদরের প্লাবনে বাঙ্গালার প্রায় অর্দ্ধেক ভাসিয়া গিয়াছে। একদিকে দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার বিকটভাবে ফুটিয়া উটিয়াছে এবং আর এক দিকে জাতীয় চরিত্র কি সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। এই ভীষণ উৎপাতে সহস্র সহস্র জীবন নষ্ট হইয়াছে কিন্তু আবার ইহাই লক্ষ লক্ষ জীবনের প্রাণশক্তি স্ফুরিত করিয়া দিয়াছে। অনুপাতে আমাদের জীবন হানি কিছু মাত্র হয় নাই, বরং জীবনলাভ অনেক গুণ অধিক হইয়াছে। এই প্লাবন যেন বাঙ্গালীর স্বার্থপরতার এবং ভীরুতার অপবাদ ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গেল। এই প্লাবন না হইলে যে এতগুলি লোক বাঁচিয়া আছে, তাহা কি করিয়া জানিতাম? এই পরীক্ষা না হইলে যে দেশে কর্ম্মী আছে, তাহা কি করিয়া বুঝিতাম? কুৎসিজীবীরা মনে করিত যে তাহাদের সহিত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোনও যোগ নাই কিন্তু বোধ হয় এই প্লাবন সেই ভ্রান্ত ধারণাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া থাকিবে। আজ অন্নের জন্য বুভুক্ষা গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত নৃত্য করিতেছে—সে কি ভয়ঙ্কর নৃত্য! আজ বুঝি দেবী অন্নপূর্ণা দিক্‌বসনা শ্যামা সাজিয়া আমাদিগকে অট্টহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া গললগ্ন নৃমুণ্ডমালা আন্দোলন করিয়া বলিতেছেন—"তোরাইত আমার বসন কাড়িয়া লইয়াছিস। আমি হৃতসর্ব্বস্বা হইয়া পাগল হইয়াছি। এখন, তোরা দেখ্ আমার ভৈরব নাচ্। আমাকে যদি ফিরিয়া পাইতে চাস্ প্রাণপণে আমার পূজা কর এবং স্বার্থ বলি দিয়া যাহাতে ত্রিংশ কোটি তোদের ভাই আমার প্রসাদ পায়, তাহার ব্যবস্থা কর—স্বার্থান্ধ হইয়া আমার প্রসাদ বিক্রয় করিস্ না।"

আজ তাই মায়ের নৃত্য বাঙ্গালার অর্দ্ধাংশ ব্যাপী শ্মশানে। মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়া আমাদের ক্ষণিক বৈরাগ্যলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আজ আমরা কি বিরাট শ্মশানেই অবস্থিত—আজ কি বিশাল বৈরাগ্য অনুভব করিবার দিন। যাহা গিয়াছে তাহার চিহ্ন মাত্রকেও ভস্ম করিয়া ফেলিবার দিন। আজই প্রাণের সকল আবেগ মিটাইয়া পবিত্র অন্তঃকরণে "তুমিই ধন্য" বলিবার দিন। এই বিশালতা লাভ না হইলে ভারতের উন্নতির আশা নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

সততাই উন্নতির মূল।

পৃথিবীর যাবতীয় প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটগণের ও সুবিখ্যাত সংবাদপত্র সম্পাদকগণের নিকট সুপরিচিত স্বামী যোগানন্দ ভারতী (সরস্বতী) মহারাজ কে,সি, এস, আই লিখিত।

এ জগতে উন্নতির জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছে। এই উন্নতির আশায় অহোরাত্র সকলেই নানাবিধ প্রকারে অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কত পরিশ্রম করিতেছে। কেহ ধনের উন্নতি, কেহ মানের উন্নতি, কেহ জ্ঞানের উন্নতি, কেহ বৈষয়িক উন্নতি ইত্যাদি নানাবিধ উন্নতির জন্য এ সংসারে লোক সততই ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। অতএব কেহই যে উন্নতির চেষ্টা ব্যতীত একদণ্ড স্থির নহেন, তাহা অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল বিষয়ের উন্নতির মূল সূত্রটী আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারে না বরং লাভে মূলে সমস্তই নষ্ট করিয়া, শেষে একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া, পথে বসিয়া আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিয়া, রোদন করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা একেবারে উন্মাদগ্রস্থ হইয়া, আপন দেহ পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হওয়ায় আর তাহার হিতাহিত বিবেচনা করিবারও সামর্থ্য থাকে না। সে পুরুষকার বা চেষ্টাশূন্য হওয়ায় তাহার অদৃষ্ট বা দৈবও আর তাহার অনুকুল না হইয়া প্রতিকুলাচরণ করিয়া থাকে।

একটী পাখীর দুইটী ডানা থাকিলে তবে সে শূন্যে উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহার একটী ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কখনই উড়িতে সমর্থ হইবে না। সেইরূপ যদি মানব পুরুষকার ও দৈব উভয়কে আশ্রয় না করে; তবে কখনই তাহার কার্য্যে সাফল্য লাভ ঘটে না। শাস্ত্র বাক্যানুসারে—

"ন চ দৈবাৎ পরমং বলং।"

এই মহাবাক্যটী যেমন সত্য ও সর্ব্বত্র সমাদৃত, সেইরূপ—

"উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীমুপৈতি।"

এই মহাবাক্যও সকলকে হেটমুণ্ডে ধ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব দৈব ও পুরুষকার উভয়ই যে আমাদিগের একান্ত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ, তাহা বোধ হয় আর কেহ অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু এই পুরুষকার অবলম্বন করিলেই যে, তাহা দৈববলে সফল হইবে তাহা নহে। চেষ্টা করিলেই যে দৈব তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিবে ইহাও ঠিক নহে। অর্থাৎ পাখীর দুইটী পাখা থাকিলেই যে, সে অনায়াসে উড়িতে পারিবে, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? যদি সেই পক্ষীর পক্ষ ব্যাধিগ্রস্থ বা বেদনাযুক্ত না হয়; তবেই সে সুখে উড্ডীয়মান হইতে পারিবে। সেইরূপ মানবের চেষ্টা যদি সৎ হয় আর দৈব যদি অনুকুল হন; তবেই কার্য্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী.সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। একজন হয়ত দৈবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ দৈব কর্ম্মের

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ভিতরেও চেষ্টা বা পুরুষকার বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল বটে; কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গিয়া জানিতে পারা গেল যে, প্রকৃত বিধি পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। আর তাঁহার চেষ্টাও সৎচেষ্টা নহে। সৎ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য তিনি সততার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, অসদুপায়ে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাই দৈবও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে উদাসীন রহিলেন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারা যায়। ধর একজন একটী দোকান খুলিয়া. তাহার উপসত্ত্ব হইতে আপনার অভাব মিটাইয়া, ক্রমে ধনী হইতে অভিলাষী; কিন্তু সে ক্রেতাগণকে ঠকাইয়া, অধিক লাভের আশায় বাজার দর অপেক্ষা কিছু চড়াইয়া, বিক্রয় করিতে আরম্ভ করায় ক্রমেই তাহার খরিদ্দার কমিয়া যাইতে লাগিল। অথবা ঠিক দরে বিক্রয় করিলেও ওজনে হয় ত কম দিতে বা খারাপ দ্রব্যাদি চালাইতে চেষ্টা করায় কিছুদিন পরে তাহার জুয়াচুরি ধরা পড়ায় সকলেরই তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। অগত্যা তাহারা সে দোকান পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কোন সদাত্মার দোকান হইতে সওদা লইতে আরম্ভ করিল। এ স্থানে কি বুঝিতে পারিলাম না যে, ঐ ব্যক্তির অসততাই কারবারের অবনতি ঘটাইল?

ধর্ম্মজগতেও আজ কাল এইরূপ ছল, চাতুরী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা জাল, জালিয়াতী, প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। তাই ধর্ম্মের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক; দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ একজন প্রকৃত সাধু হয়ত তাঁহার সাধুতা, সততা, ন্যায় নিষ্ঠতা, নির্ভীকতা, সদাশয়তা, উদারতা, সরলতা ও মহত্বাদির পরিচয় প্রদান করিয়া, প্রাসাদবাসী সম্রাট হইতে আর কুটীরবাসী দীন-দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট সমাদর প্রাপ্ত হওয়ায় কেহ কেহ তাঁহার বেশ ভূষাদির অনুকরণ করিয়া, এমন কি স্থান বিশেষে তাঁহার আশ্রমোচিত নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করত খোদ সেই সাধু সাজিয়া, ভণ্ডামীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে চারিদিকে তাহাদিগের অসৎ কার্য্যের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় জনগণ তাহাদিগকে চিনিয়া লইল এবং হয়ত জাল সাধু সাজায় অচিরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইল।

এখানে কি এখন বলিতে পারি না যে, উহারা অসৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ায় দৈব উহাদিগের সহায় না হইয়া, বিপক্ষ হইয়া পড়িল। অতএব ইহারা সকলেই যে, সতের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আর বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যেখানে সততা সেইখানেই সাধুতা, সরলতা প্রভৃতি পূর্ণরূপে বিরাজ করিয়া থাকে। সতের নিকট থাকিতে কাহারও লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ হয় না। সকলেই অবাধে তাঁহার নিকট বাস করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তির, অন্তর সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, খলতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি তাঁহার নিকটে আর কখনই

তিষ্ঠিতে পারে না। তাহারা অচিরকাল মধ্যেই দূর দূরান্তরে পলায়ন করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তির সহবাসে থাকিলে, অনেক অসাধু সাধু হইয়া যায়। এরূপ সাধুর বাতাস গাঁয়ে লাগিলে বহু বহু পাপী, তাপী, নারকীও তাহাদিগের সেই সকল পাপ, তাপাদি হইতে মুক্ত হইয়া, শেষে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিতে পারক হইয়া থাকে।

তাই বলি বন্ধুগণ। আর ধর্ম্মের নামে ভবের বাজারে অধর্ম্মের ডালি সাজাইয়া, সাধারণকে যেন কেহ প্রতারণা করিতে না পারে, সে বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটু আন্তরিক যত্ন কর। এইরূপে সকলেই স্ব স্ব সততার বলে অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, সৎ হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। দেখ সাধু শ্রীকৃষ্ণের সহবাসে থাকিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবং চরাচর আত্মীয় স্বজনবর্গ সাধু হইয়াছিলেন ও অধর্ম্মের অবতার স্বরূপ পাপী দুর্য্যোধন সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় যে সুনিশ্চিৎ তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যাঁহারা রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণেতিহাসাদি পাঠ করিয়াছেন; তাঁহারা অবশ্যই আমার এই সকল যুক্তির পক্ষপাতী হইবেন সন্দেহ নাই। এই সকল ধর্ম্ম পুস্তকে ধর্ম্মের মহিমা ও অধর্ম্মের লাঞ্ছনা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সদ্‌গুরু অভাবে তাহার গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকেই অপারক হওয়ায়, সেই সকল মহা বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারায় সকলদিক নষ্ট করিয়া থাকে।

সৎগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াও সৎশিক্ষকের অভাবে সততা বা সাধুতার আদর্শ হইতেও অনেকে অক্ষম হইয়া থাকেন। জগতে আদর্শ পুরুষই উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। আদর্শ পুরুষ হইতে হইলে, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও সততার আশ্রয় গ্রহণ করাই একান্ত বিধেয়। উক্ত গুণত্রয় অবলম্বন করিলে, তাহার কার্য্যের ফল সেই সাধুর মুখ কমলে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সততার দিব্য জ্যোতি আর তিনি লুকাইয়া রাখিতে পারেন না। ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায় সততা বহ্নি তাঁহার দিব্য কান্তি রূপে ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন; তাহাই সুসিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি তখন উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। তাই বলিতেছিলাম যে "সততাই উন্নতির মূল"।

যোগানন্দ।

৪৩৭ নং সাকুলাররোড শিবপুর, হাওড়া।

সে কি ধন?

জগতে এমন কি ধন আছে, যাহা পাইলে আর কোন ধন পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যে ধন পাইলে জীবন প্রীতির পবিত্র নিলয় হইতে পারে? যে ধনের অধিকারী হইলে মানুষ, আর মানুষ থাকে না, দেবদুর্লভ সুধা পান করিয়া চরিতার্থ হয়। কি সে ধন? বুঝিতে চেষ্টা করিলে যাহাকে সহজে বুঝিতে

পারা যায় না,—জানিতে চাহিলে যাহার এক অঙ্গ জানিলেও হৃদয়, মন ও প্রাণ প্রেমে গদ গদ হইয়া উঠে, সে ধন কি, ভাই, বলিতে পার ?

যে অপার্থিব ধন প্রাপ্ত হইলে স্পর্শমণিকেও ঠেলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়,—পৃথিবীর রাশি রাশি রত্ন, মাণিক্য, হীরক, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ-মুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা যে ধনের সহিত তুলনায় অতি তুচ্ছ তৃণবৎ বলিয়া বোধ হয়, সে ধন কি ? যে মহাত্মা এই ধনের অধিকারী, তিনিই বলিতে পারেন—বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন, এ ধন—এ অতুল ধন—ত্রিদিব হইতে আনীত এ মহারত্ন কি ?

বল ভাই, সে ধন কি ? যাহা পাইবার লালসা হইলে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী পুত্র পরি-ত্যাগ করিয়া বন গমনেও সঙ্কোচ ও আতঙ্ক থাকে না ! বল সেই ধন কি ? যাহার অংশ মাত্র লাভ করিলেও—ভক্তিপ্রিয় মাধব, বাঁধা পড়িয়া থাকেন। যাহার কণিকা মাত্র হস্তগত করিতে পারিলে ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের দ্বারে দ্বারী হইয়া থাকেন।

যাহার অধিকারী হইলে, দারিদ্র্যভঞ্জন হরি, দরিদ্রের ঘরে তণ্ডুলকণা সাদরে গ্রহণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যাহার অধি-কারী হইলে শত দিবস গম্য পথ অতিক্রম করিয়া দয়াময় হরি বিপ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অগ্রসর হন। সে ধন কি ? যাহা বা যাহার এক অঙ্গ লাভ করিলে চণ্ডাল হইলেও ভগবান তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া চরিতার্থ করেন।

সে ধন কি ? যে ধনের অধিকারী হওয়ায় প্রহ্লাদের দেহ হুতাশনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই-লেও দগ্ধ হয় না,—পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পতিত এবং হস্তী কর্ত্তৃক পদদলিত হইলেও কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় না, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলেও দেহ নষ্ট হইয়া যায় না।

সে ধন কি ? যে ধনের অধিকারী হইলে মৃত সঞ্জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যে ধনাধিকারীর চরণরেণু স্পর্শে মহাব্যাধি দূর হইয়া যায়। সে ধন কি ? যে ধনের অধিকারী হইয়া পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ডাকিলেই হরি স্থির থাকিতে না পারিয়া, বিশ্ববাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

সে ধন কি ? সে ধন আর কিছুই নহে,—সে ধন ভক্তিরূপ পরম ধন,—ঈশ্বরে ভক্তি,—হরিভক্তি বা কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ। এই ভক্তি-ধনের কথা জানিতে হইলে বৈষ্ণবের ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে,—সাধুসঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবৎ কৃপা ও ঐকা-ন্তিক লালসা না হইলে এ ধনের এক অংশও লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত সুখ, পবিত্র আনন্দ, ও শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা একান্ত প্রয়ো-জন। যে হৃদয়ে এই ভক্তিদেবী বিরাজমানা—সেই হৃদয়ই মাধুর্য্যময় শ্রীহরির নিত্য লীলা-নিকেতন, ভগবান্ স্বয়ং ভক্ত নারদকে কি বলিতেছেন, শুনুন—

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ;
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥'

এ হেন দুর্লভ রত্নের অধিকারী [illegible]

তাঁহারা চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রেষ্ঠ মানব অথবা মানব দেহে দেবতা। তাঁহাদের সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভগবতোত্তমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবৎ-ভক্তেরা শূদ্র নহেন। তাঁহারা ভগবতোত্তম বলিয়া গণনীয়।

"সুরাণাং আরাধনাং মধ্যে বিষ্ণোরারাধনং পরম্
তস্মাৎ তদীয়ানাং সমর্চ্চনং পূজনং পরতরং স্যাৎ॥"

বিষ্ণুর আরাধনাই নিখিলদেবগণের আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তদপেক্ষা আবার ভক্তবর্গের পূজা শ্রেষ্ঠ জানিবে। স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্ত শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যয়ং॥"

অভক্ত ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় পাত্র নহে, ভক্ত চণ্ডালও আমার অতি প্রিয়; সুতরাং নীচকুল-জাত হইলেও সেই দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তাঁহার দানই আমার একান্ত গ্রাহ্য। অতএব আমারই ন্যায় আমার ভক্তের পূজা প্রশস্ত জানিবেন।

"মদ্ভক্তঃ পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু সম্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গ চেষ্টা চ বচসা মদ্গুণৈরনং॥"

অর্থাৎ "হে উদ্ধব! মদীয় সেবায় আস্থা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, মদ্বিষয়ে মনের ও বাক্যের চেষ্টা, আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ, যাবতীয় বাসনা ত্যাগ সকলই বৃথা। মদীয় ভক্তগণের পূজাই সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উহাই আমার অনুমোদিত।

ভগবান ভক্তের ভক্ত, ভক্তের সম্মান রক্ষার জন্য তিনই ব্যতিব্যস্ত নহেন। তাঁহার জীবন্ত উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রের প্রতিপত্রে, প্রতি ছত্রে রহিয়াছে। আমাদের ন্যায় বিষয়-বিমূঢ় লোকের সে সকলের সম্যক আলোচনা অসাধ্য ও অধিকার বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। তবে ভগবানের নিকট ভক্তই একমাত্র প্রিয়তম এবং ভক্তি ভিন্ন সার ধন জগতে আর কিছুই নাই, ইহা দেখাইবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি মাত্র।

ভক্তিরসাশ্রয়ীর সুখ কিরূপ? নারদ বলিয়াছেন—"মূকাস্বাদন বৎ" যিনি এ মধুপান করিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। উত্তর দিবেন কি, তিনি দেবের মূল ভক্তুধাপানে বিভোর হইয়া আত্মভোলা হইয়া নীরব হই-য়াছেন। তাঁহার নিকট উত্তর কি পাইব? বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা করার ন্যায় আমাদেরও এ আশা দুরাশা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন সাধক ঋষিগণ ভক্তি শব্দের কি পরিচয় দিতেছেন, সংক্ষেপে তাহার বিষয় বলিতেছি। ভক্তির স্থান কত উচ্চে, তৎসম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

হে উদ্ধব! যোগ বল, স্বাধ্যায় বল, ত্যাগ বল, জ্ঞান বল, ধর্ম্মবল আর তপস্যাই বল, কিছু-তেই আমাকে সহজে লাভ করিতে পারা যায় না, ভক্তগণ ভক্তিদ্বারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবি চূড়ামণি কৃষ্ণদাস বলেন,—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥

অন্যাগল তৃণ স্থায় অষ্ট সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ॥"

আবার স্থানান্তরে—

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্ম লয় ॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥"

সাধক কবি নাভাজী ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—ভক্তি মহারাণীর সেবা করিতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে অতি যত্নে হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া দাও। শ্রদ্ধারূপ সুগন্ধি তৈলে তাঁহার শ্রী-অঙ্গ মর্দ্দন কর, শ্রবণ উদ্বর্ত্তনে কর্ম্ম ও জ্ঞানের মলা ছুটাইয়া এবং মনন নীরে স্নান করাইয়া দয়ারূপ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দাও। তৎপরে নিষ্ঠা সুবস্ত্র পরিধান করাইয়া হরিসেবা রূপ আভরণ-সাধুসেবার কর্ণফুল ও স্মরণ-সুনথ দিয়া ভূষিত কর। অতঃপর সৎসঙ্গের অঞ্জন লাগাইয়া অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রীতি সাধন কর।

ভক্তির অঙ্গ নয়টী। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, এবং আত্ম-নিবেদন। এই নব অঙ্গের এক অঙ্গ প্রাপ্ত হইলেও মায়াবন্ধন ত্যাগ করিয়া পরম ধাম লাভ করিতে পারা যায়। শ্রবণ যোগে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণ সেবা দ্বারা কমলা, অর্চ্চন দ্বারা পৃথুরাজা, বন্দনে অক্রূর, ভক্ত দাস্যরূপে কপীশ্বর, সখ্যদ্বারা অর্জ্জুন এবং আত্ম-নিবেদন দ্বারা বলি, শ্রীহরির রাতুল চরণ প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন।

সে ধন কি? পাঠক, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বুঝিলেন কি? ঐ দেখুন এই মহারত্নের ভিখারী হইয়া স্বয়ং মহাপ্রভু কি কামনা করিতেছেন,—

"ন জনং ন ধনং সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ
ন কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনি জন্মনি ভবতু ভক্তির
হেতুকী ত্বয়ি ॥"

আবার সাধক কবি প্রেমিক গোবিন্দদাস গোবিন্দ চরণ প্রয়াসী হইয়া প্রাণের মহা আবেগে কোকিলকণ্ঠে মধুর তানে ভক্তিরস পরিপূরিত কি সুন্দর গীতি গান করিতেছেন শুনুন, শ্রবণ করিয়াও কর্ণ পরিতৃপ্ত হউক।

"ভজহুঁরে মন নন্দনন্দন অভয়চরণারবিন্দরে।
দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভব
সিন্ধুরে ॥
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী
জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব
লাগি ॥
এরূপ যৌবন ধন জন ইথে কি আছে পরতীত।
কমল জল দল জীবন টলমল সেবহ হরিপদ
নিত ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদ সেবন,
দাস্যরে।
পূজন, সখিগণ, আত্ম-নিবেদন গোবিন্দদাস
অভিলাষরে ॥

দাস গোবিন্দের যে মহদভিলাষ, আমাদের

ও সংসার বাসনা ঘুচিয়া সেই অভিলাষ হইবে কি ?

বিশাল সমুদ্রগর্ভ হইতে অঞ্জলি পরিমিত বারি সংগ্রহের ন্যায় ভক্তির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল, এ ক্ষুদ্র আলোচনায় কাহারও বিশেষ তৃপ্তি হইবে, বোধ হয় না। পিপাসার্ত্ত যাঁহারা, তাঁহারা ভক্তি শাস্ত্ররূপ বিশাল বারিধির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পিপাসা দূর করুন।

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

সতী-ধর্ম্ম।

(৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

শ্রীকৃষ্ণোক্ত পতিব্রতা-ধর্ম্ম।

প্রাচীন-কালের আর্য্য-মহিলারা কিরূপে পতির পরিচর্য্যা করিতেন—কিরূপে স্বামী-শুশ্রূষা করিতেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বর নন্দকে বলিয়াছেন,—

"ব্রজেশ্বর! পতিব্রতা রমণীর ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। পতিব্রতা রমণী পতিতে সর্ব্বদা শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া, ভক্তিভাবে প্রত্যহ পতি-চরণামৃত পান করিবে, ব্রত, তপস্যা ও দেবপূজা ত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পতির চরণসেবা ও পতির সন্তোষ-জনক স্তব করিবে। সাধ্বী স্ত্রী শত্রুভাবে কখন পতির আজ্ঞা-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবে না; নারায়ণ অপেক্ষা ও নিজ কান্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধ্যান করিবে। কখন অপরের বাটী যাইবে না বা যাত্রা, মহোৎসব, নর্ত্তক ও গায়ককে দর্শন করিবে না। অথবা অপরের ক্রীড়া (হাস্য পরিহাসাদি) দর্শন করিবে না। যাহা স্বামীর ভক্ষ্য তাহাই পতিব্রতার ও ভক্ষ্য; পতিব্রতা ক্ষণ-কালের জন্য ও পতির সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। যদি স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে তাড়না করেন, তবুও পতিব্রতা রমণী স্বামীর উপর কুপিতা হইবে না। পত্নী স্বামীকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে খাইতে দিবে, তৃষ্ণার্ত্ত দেখিলে জল দিয়া সন্তুষ্ট করিবে। স্বামী নিদ্রিত থাকিলে, তাঁহাকে জাগরিত করিবে না, বা নিজের কোন কর্ম্মের জন্য স্বামীকে নিযুক্ত করিবে না। পুত্রের প্রতি মাতার যতটা স্নেহ হয়, পতিব্রতা নারী পতির প্রতি তাহা অপেক্ষা শত গুণ স্নেহ করিবে। কুল-বধূর পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই ভরণ কর্ত্তা এবং পতিই দেবতা। পতিব্রতা রমণী সাহাস্য বদনে ভক্তিভাবে শুভ দৃষ্টিতে অমৃতময় কান্তকে দর্শন করিবে। অর্থাৎ কখন স্বামীর প্রতি বিরূপ নয়নে, ক্রুদ্ধ নয়নে বা বিরক্তির সহিত দৃষ্টি করিবে না। পতির কোন দোষ থাকিলে পতিব্রতা কখন পতিকে নিষ্ঠুর কথা বলিবে না। যদি পতির কার্য্য অসত্য হয়, * * * তবু স্বামীর উপর নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। রমণীর পতি-সেবাই ব্রত, পরম তপস্যা, পরম ধর্ম্ম; পতি সেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা-পূজা, পরম সত্য স্বরূপ, সকল প্রকার দান স্বরূপ এবং তীর্থস্নান স্বরূপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিই

সর্ব্বদেবময় ; যত পবিত্র বস্তু আছে তাহা হইতেও স্বামী স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর পবিত্র বস্তু এবং সমস্ত পুণ্য স্বরূপ, তাঁহাদের পক্ষে পতিই নারায়ণ স্বরূপ। যে রমণী প্রতি দিন স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণামৃত পান করে,দেবতারাও সেই নারীকে দেখিতে ও স্পর্শ করিতে কামনা করিয়া থাকেন। যে যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষে সমতা নাই' সেই সেই সংসারে অলক্ষী বাস করে ও সেই সেই দম্পতীর জীবনও বৃথা। পতি-পরায়ণা রমণীর পতি-বিচ্ছেদই পরম দুঃখ ও শোক-সন্তাপের মূল। পতি-বিচ্ছেদ ঘটিলে পতিপরায়ণার পক্ষে পতির জীবদ্দশাতেও বৈধব্য-যন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়া থাকে। স্বপ্নে ও জাগরণে পতিই রমণী-দিগের প্রাণ স্বরূপ। এবং ইহকালে ও পর-কালে একমাত্র গতি।" (১)

পতিব্রতা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যমের উক্তি।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যমকে পতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় যম বলিতেছেন,—

হে বিপ্র! হে মহামতে! পাতিব্রত্য নারীর নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, দান ও দম নাই। (অর্থাৎ স্বামী-সেবাই তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ের ফল দিয়া থাকে)। হে বিপ্র! পতি-ব্রতা নারী যেরূপ ব্যবহার যুক্তা হইয়া থাকেন, তাহা শুন।—পতিব্রতা স্বামী নিদ্রা গেলে নিজে নিদ্রা যান, স্বামী জাগিলেই জাগরিতা হন, স্বামীকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে ভোজন করেন; কাজেই তিনি যমকে জয় করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার যম-যাতনা হয় না। পতি নিকট থাকিলে পতিব্রতা নিজে কথা কহেন না; স্বামী থাকিলে তিনি থাকেন; হে বিপ্র! কাজেই তিনি যম জয় করিয়া থাকেন। নারীগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যম-যাতনা এড়াইবার সহজ উপায় আর কিছু দেখিতেছি না। পতিব্রতা রমণী (পুরুষের মধ্যে) পতিকেই দর্শন করেন, পতিতেই তাঁহার মন নিযুক্ত থাকে, হে তপোধন! আমরা এই-রূপ পতিব্রতাকে ভয় করিয়া থাকি, অন্য সকলেও ভয় করে; এরূপ পরমশোভনা সাধ্বী দেবগণের পূজ্যা। পতি যদি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে পতিব্রতা কামিনী প্রণতি পূর্ব্বক (নম্রভাবে) তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। হে বিপ্রেন্দ্র! পতিব্রতা রমণী যদি পতির নিকটে থাকিয়া ও তৎ কর্তৃক পরিত্যক্তা হন তথাপি তিনি পতিকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন; কখনও অন্যকে আশ্রয় করেন না। পতিব্রতা রমণী একান্ত ভক্তিতে স্বামীর অনুগতা থাকেন,কাজেই হে ব্রহ্মানন্দ! তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। এইরূপে যে রমণী পতিশুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে জয় করিয়া থাকেন; আর তাঁহার নিকট আমাকেও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে হয়। যে রমণী স্বামীকে ধ্যান করেন, তাঁহার অনুগতা থাকেন, এবং তাঁহার বিষয়ই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা (পতি কথা বা পতিরূপ ব্যতীত) গীত, বাদ্য ও অন্যান্য বর্ণনীয় বস্তু শুনেন না বা দেখেন না। সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা রমণী [illegible] কেশ সংস্কার করেন, [illegible]

থাকেন, তখনও মনে মনে অন্যের কথা চিন্তা করিবেন না। দেবতা অর্চনা কালে বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সময়েও পতিব্রতা রমণী পতিকে চিত্ত বহির্ভূত করেন না; সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে তপোধন! যে নারী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহমার্জ্জনা করেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে রমণীর চক্ষু দেহ ও স্বভাব সংযত হয়, অর্থাৎ যাঁহার চক্ষু পতি ভিন্ন অন্যকে দেখিতে পায় না ও যাঁহার স্বভাব পতি ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না, সেই সদাচারিণী-রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে নারী পতির মুখই দেখিয়া থাকেন, (অপরের দেখেন না) পতির মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে বিপ্র পতিব্রতার এই সকল কার্য্য কলাপ ও নিয়মাদি আমি পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই গোপনীয় পতিব্রতাচরিত তোমাকে কহিলাম। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পতিব্রতাকে দেখিলেই পূজা করি।

স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ।

"এক সময় কয়েকটি স্ত্রীলোক রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলে, মহাপুরুষ কোনও মহিলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—আহা! আহা! এমন বিদ্যারূপিণী খুব কম দেখিয়াছি।" ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া [illegible] একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন—তাহা কি করিয়া স্বীকার করি? সধবাকে আপনি লক্ষ্মীই বলুন আর যাই বলুন, সব শোভা পায়। কিন্তু বিধবার আবার সুলক্ষণ কি? আপনি জানেন না যাহাকে বলিতেছেন, ইনি বিধবা।" আর একজন স্ত্রীলোক বলিলেন,—"তা ওঁর আর দোষ কি? সধবার মত পোষাক-গহনা দেখিয়া ইনি বলিয়াছেন। বিধবা হইলে সোণার বালা, লালপেড়ে ধুতি পরে, ইহা ইনি কেমন করিয়া জানিবেন? মহাপুরুষ তখন খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন,—আমি সব জানি; তবু বলিতেছি ইনি সাক্ষাৎ বিদ্যা-রূপিনী। তোমরা পতিকে লইয়া যেরূপভাবে দিন যাপন কর এবং তাঁহার পরলোক গমনে যেরূপ পরিণাম মনে কর, বাস্তবিক পতিভাবে ভগবানের সে উদ্দেশ্য নহে। পতির সহিত কয়েক দিনের অস্থি-মাংসের সম্বন্ধ নহে। এ সম্বন্ধ চির জীবনের," বলিয়াই প্রভু একটি গল্প বলিলেন;—

"কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে সকলেই পতিপ্রাণা বলিয়া জানিতেন। সেই জন্য রাজাও রাণীর খুব বাধ্য ছিলেন। রাজা রাণীকে কত ভাল ভাল অলঙ্কার দেন, রাণী সব সিন্দুকে রাখেন,—রুলি ভিন্ন আর কিছুই পরেন না! ইহাতে অনেকে মনে ভাবিত তবে বুঝি রাণীর মনে সুখ নাই। কত সাধনা করিলে রাজার রাণী হওয়া যায়! ওমা এ কি প্রকার মেয়ে?—স্ত্রীলোকের যা আসল সুখ "গহনা পরা"—তাতে আদৌ মন নাই!—এ নিশ্চয় পাগল।

রাণী রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করি-

তেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই রাজাকে প্রণাম করিয়া চরণ ধূলী মাথায় লইতেন; সে সময় রাণীর দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িত। তারপর নিজে স্নান করিয়া রাজাকে স্নান করাইতেন। এবং রাজার অভিরুচি অনুযায়ী পোষাক তাঁহাকে পরাইতেন। রাজা রাজ-দরবারে যাইতেন। রাণী আপনি রাজার জন্য পাক করিতেন। অপরের সংস্পর্শিত দ্রব্য স্বামীকে খাইতে দিতেন না। এইটি সতী স্ত্রীর বিশেষ লক্ষণ। যে স্ত্রী সতী, সে মহারাণী হইলেও আপনি দেখিয়া, আপনি রাঁধিয়া স্বামীকে আহার করান। দাস-দাসীর হস্তে স্বামীর ভোজনাদির ভার দেওয়া সতীর ধর্ম্ম নহে। ভোজনান্তে যে পর্য্যন্ত না স্বামী নিদ্রা যাইতেন, সে পর্য্যন্ত আপনি স্বামীর চরণ সেবা করিতেন। কখনও কোন দাস-দাসীকে স্বামীর অঙ্গসেবা করিতে দিতেন না। রাজা ঘুমাইলে নিজে গৃহ কাজ করিয়া নীরবে রাজার পাতের প্রসাদ মাত্র খাইয়া ত্বরায় আবার রাজার কাছে আসিয়া চরণ সেবা করিতেন। রাণী রাজা ব্যতীত আর কোন দেবতা-অর্চ্চনা করিবার অবসর পাইতেন না। একদা গুরুঠাকুর আসিয়া রাণীর দীক্ষা সম্বন্ধে রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজা রাণীর কাছে সে কথা বলিয়া পাঠাইলে, রাণী হাসিয়া বলিলেন,—"আমি একাকিনী দুই পতির সেবা করিব কিপ্রকারে? আপাততঃ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহারই সম্পূর্ণ সাধনা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই কত অপরাধিনী হইতেছি। যাহাতে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া পতি সেবা করিতে পারি, গুরুদেব যেন আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করেন। রাজা রাণীকে পূর্ব্ব হইতেই পাগলিনী বলিয়া জানিতেন; এই উত্তরে পূর্ব্ব সংস্কার বদ্ধমূল হইল।

কিছুকাল পরে রাজার মৃত্যু হইল। রাজবাটী শোক-শব্দে পূর্ণ হইল। রাণী কিন্তু একটুকুও কাঁদিলেন না। রাণী গম্ভীর ভাবে অতি শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত রাজাকে সুন্দর বেশ-ভূষা দ্বারা শোভিত করিয়া শ্মশানে বিদায় দিলেন। রাণী স্নানাদি করিয়া হাতের রুলিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রুলির বদলে সোণারূপা পরিলেন। রাণীর এই ব্যবহার দর্শনে সকলে অবাক হইল।

একদা কয়েকটি বৃদ্ধা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার এরূপ বেশ দেখিতেছি কেন? রাজা মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন আপনি সোণা পরিতেন না, আমরা আপনাকে কত জেদ করিয়াছি, তথাপি সোণা পরেন নাই, মহারাজ কত বলিয়াছেন, তবু সোণা পরেন নাই!" এইরূপে স্ত্রীলোকেরা অনেক কথা বলিলে রাণী বলিলেন,—বাছা, আমার প্রাণের কথা যদি শুনিতে চাওত বলি। বাল্যকালে শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছিলাম, রাধিকা আয়ানের স্ত্রী হইয়া কৃষ্ণের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিবা মাত্র আমার রাধিকার প্রতি বড়ই ঘৃণার উদয় হয়। পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত আমার ঘৃণার জিনিস হইল। আমি রাত্রদিন ভাবিতাম; মানুষের যাহে যাহা পাপ, দেবতারা সে কার্য্য করেন কি প্রকারে? পরে রাজাকে এই কথাটি বলিলাম। রাজা বলিলেন,—

রাধিকা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। তিনি জীব-শিক্ষার আদর্শ। সংসারে যে কয়টি হৃদয়ের বিশেষ ভাব আছে, সে ভাবগুলি ভগবানে ন্যস্ত করিতে পারিলেই জীবের ভব-বন্ধন মোচন হয়। দাস্য, সখ্যাদি পঞ্চ ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবেই সকল ভাবের জমাট। মধুর ভাব পতি ভাবেই বিকশিত হয়। এই পতি ভাব যে রমণীতে ফুটিয়াছে—সেই রমণীতে বরাবর থাকিবে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী পতিকে ধরিয়া এই ভাব প্রস্ফুটিত হয়। তার পর জগৎপতিতে সেই ভাব যায়। তখন নারী ধর্ম্ম সার্থক হয়। রাধিকা সেই পতিভাব আয়ান হইতে যখন ভগবানে সমর্পণ করিলেন, তখন পতিভাব অনন্ত বিকাশের আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল। পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া আমার নূতন জ্ঞান হইল। তখন বুঝিলাম, ভগবান সংসারে স্বামী মূর্ত্তিতে আসিয়া সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান। আমার সেই স্বামী এই সংসারে ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া যতদিন ছিলেন, আমিও ক্ষণভঙ্গুর রুলি পরিয়াছিলাম। এখন তিনি ভগবানে মিশিয়া অক্ষয়, অমর, অজর হইয়াছেন; আমিও অক্ষয় স্বর্ণ বলয় পরিয়াছি।" এই স্ত্রীলোকটিরও সেইরূপ ভাব দেখিতেছি।"

স্বর্গীয় কবিবর নবীন বাবু পরম পূত রাস-লীলা-বর্ণন উদ্ঘাটনচ্ছলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কেহ দাসীভাবে মম সেবিল চরণ;
কেহ মাতৃস্নেহে মম চুম্বিল বদন;
কেহ সখী ভাবে স্কন্ধ করিল ধারণ;
কেহবা বিবশ প্রেমে দিল আলিঙ্গন।
পতি-পুত্র-পিতা-মাতা ভুলেছে আলয়,
আমি পতি, আমি পুত্র, সখা প্রেমময়।"
"সেই ভক্তি, সেই প্রেম,—ভক্তির চরম,
পতিভাবে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ,
নাহি জ্ঞান, নাহি ইচ্ছা, হৃদয় তন্ময়;—
পবিত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্র রমণী-হৃদয়।

স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ।

"একদা বুদ্ধদেব নিমন্ত্রিত হইয়া অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠীর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য উপযুক্ত আসনাদি প্রস্তুত ছিল। উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে, শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে বড় গোলমাল হইতেছিল, অনেক লোক উচ্চ শব্দে কথা কহিতেছিল। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রেষ্ঠী, ঘরে এত গোলমাল ও উচ্চ শব্দ কেন? বোধ হইতেছে যেন কৈবর্ত্তেরা মাছ ভাগ করিতেছে।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন,—হাঁ ভগবান, বড় গোলমাল হইতেছে। আমার পুত্রবধূ সুজাতা ধনাঢ্য লোকের দুহিতা। সে শ্বশুর শাশুড়ীকে মান্য করে না, স্বামীকে গ্রাহ্য করে না, এমন কি ভগবানকেও সৎকার করে না, মানে না, পূজা করে না, বা ভক্তি করে না। তাঁহার আচরণে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুর-বাসীরা গোলমাল করিতেছে।" অনন্তর ...

* স্বামী সত্য চরণ মিত্র প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনী ও উপদেশ।"

ভির লোক স্বভাবতঃই দুর্ব্বুদ্ধি। অনাথ পিণ্ডদকে ভগবানের নিকট যাইতে দেখিয়া সুজাতা মনে করিল, আমার শ্বশুর বুঝি আমার নিন্দা গাইতে যাইতেছেন। এই ভাবিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া বুদ্ধের সহিত তাহার শ্বশুরের কথোপকথন শুনিতেছিল। ভগবান টের পাইয়া তাহাকে বলিলেন, "সুজাতা, এখানে এস।" "হাঁ প্রভু! এই যাচ্ছি" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সে ভগবানকে অভিবাদনান্তর একান্তে গিয়া উপবেশন করিলে ভগবান বলিলেন, "সুজাতা, পুরুষের সাত প্রকার ভার্য্যা। যথাঃ—(১) বধকাসমা (বধকারিণী), (২) চোরিসমা, (৩) আর্য্যাসমা, (৪) মাতৃসমা, (৫) ভগিনী সমা, (৬) সখীসমা, (৭) দাসীসমা। তুমি এই সাত প্রকারের কোন প্রকার ভার্য্যা?

"প্রভু! আমি আপনার সংক্ষিপ্ত উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সরল ও বিশদভাবে বলুন। আমি বুঝিয়া উত্তর করিব।

"তবে মনোযোগ দিয়া শুন, বলিতেছি।"

"হাঁ প্রভু শুনিতেছি, বলুন।"

ভগবান বলিলেনঃ—

(১) বধকা সমা।

"পদুঠ চিত্তা অহিতানুকম্পিনী;
অঞ্ঞেসু রত্তা অতিমঞ্ঞতে পতিং,
ধনেন কীতস্স বধায় উস্সুকা;
যা এবরূপা পুরিসস্স ভরিয়া
বধকা চ ভরিয়াতি সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রী সতত কোপনস্বভাবা, স্বামীর অহিতকামিনী, যে অন্যে আসক্তা হইয়া নিজ পতির অবমাননা করে, ধনের দ্বারা ক্রীত হইয়াও যে ক্রয়কারীকে বধ করিবার জন্য উৎসুকা হয়, পুরুষের সে স্ত্রী বধকা-ভার্য্যা নামে কথিতা হয়।

(২) চোরীসমা।

যং ইত্থিয়া বিন্দতি সামিকো ধনং
সিপ্পং বণিজ্জঞ্চ কসিং অধিট্ঠহং
অপ্পং পি তস্স অপহাতুং ইচ্ছতি;
যা এবরূপা পুরিসস্স ভরিয়া
চোরী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম্ম দ্বারা স্বামী যে ধন লাভ করে, তাহা হইতে অল্প হইলেও চুরি করিতে যে স্ত্রী ইচ্ছা করে এবং সুযোগ পাইলে চুরি করে, এমন কি উননের উপর চড়ান দাল, চাউল হইতেও কিছু কিছু চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সে স্ত্রীকে চোরীসমা বলে।

(৩) আর্য্যাসমা।

অকামকামা অলসা মহগ্ঘসা,
ফরুসা চ চণ্ডী দুরুত্তবাদিনী
উট্ঠায়কানং অভিভুয্য বত্ততি;
যা এবরূপা পুরিসস্স ভরিয়া
আর্য্যা চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রী কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, অলসস্বভাবা অথচ ভাল খাওয়া—পরা হইলে যার চলে না, যাহার ব্যবহার কর্কশ, প্রকৃতি চণ্ডা, যে অপ্রিয় ও [illegible] ব্যবহার করে ও স্বামীর উপর [illegible] সে স্ত্রী পুরুষের আর্য্যাসমা [illegible] কথিত হয়।

(৪) মাতা সমা।

যা সর্ব্বদা হোতি হিতানুকম্পিনী
মাতাবপুত্তং অনুরক্খতে পতিং
ততো ধনং সম্ভতং আযরক যতি,
যা এবরূপা পুরিস্ স ভরিয়া
মাতা চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রী সর্ব্বদা পতির হিতাভিলাষিণী, মাতা যেমন প্রাণপণে পুত্রকে রক্ষা করে, সেরূপ যে স্ত্রী নিজ পতির রক্ষাকল্পে সতত সচেষ্ট থাকে, পতির উপার্জ্জিত ধন যে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে, সে স্ত্রী মাতৃসমা ভার্য্যা নামে কীর্ত্তিতা।

(৫) ভগিনী সমা।

যথাপি জেট্ঠা ভগিনী কাণিট্ঠকা
সগারবা হোতি শকম্হি সামিকে
হিরীমানা তত্ বসানু বত্তিনী
যা এবরূপা পুরিসস্ ভরিয়া
ভগিনী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রী ভগিনীর ন্যায় স্বামীর প্রতি স্নেহ-পরায়ণা বা ভক্তিমতী, আর যে সলজ্জভাবে স্বামীর বশবর্ত্তিনী সে স্ত্রী ভগিনী সমা ভার্য্যা বলিয়া কথিতা।

(৬) সখী সমা।

যা চিধ দিস্বান পতিং পমোদতি,
সখী সখারং বচিরস্সং আগতং,
কোলেয্যকা শীলবতী পতিব্রতা,
যা এবরূপা পুরিস্ স ভরিয়া
সখী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

দীর্ঘকাল পরে আগত সখাকে দেখিয়া সখী যেমন আনন্দ অনুভব করেন, সেরূপ যে স্ত্রী পতিকে দেখিয়া প্রমোদিতা হয়, আর যে কুলগৌরব রক্ষাকারিণী, শীলবতী ও পতিব্রতা—সে স্ত্রী সখীসমা ভার্য্যা নামে অভিহিতা।

(৭) দাসী সমা।

অক্কুদ্ধসন্তা বধদণ্ড তজ্জিতা,
অদুট্ঠচিত্তা পতিনো তিতিকখতি,
অক্কোধনা ভত্তু বসানুবত্তিনী
যা এবরূপা পুরিসস্ স ভরিয়া
দাসী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চ।

স্বামী বধ করিতে উদ্যত হইলেও যে স্ত্রী প্রসন্ন চিত্তে ভক্তির সহিত স্বামীর ব্যবহার সহ্য করে, স্বামীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রোধ প্রকাশ করে না, যে স্বভাবতঃ ক্রোধহীনা ও স্বামীর বশবর্ত্তিনী সে স্ত্রী দাসীসমা বলিয়া কীর্ত্তিতা।

যা চিধ ভরিয়া বধকাতি বুচ্চতি
চোরী চ অয্যাতি চ সা পবুচ্চতি
দুস্সীলরূপা ফরুসা অনাদরা
কায়স্ সভেদা নিরয়ং বজন্তিতা।

বধকা, চোরী ও আর্য্যাসমা স্ত্রী দুঃশীলা, কর্কশস্বভাবা ও স্নেহ-দয়া-হীনা। মৃত্যুর পর তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে।

যা চিধ মাতা ভগিনী সখীতি চ
দাসী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি
সীলে ঠিতত্তা চিররত্ত সংবুতা
কায়স্স ভেদা সুগতিং বজন্তিতাতি।

আর মাতা, ভগিনী, সখী ও দাসীসমা, শীলবতী, চিরসুব্রতা ও সংযতা বলিয়া মৃত্যুর পর তাহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।

হে সুজাতা, পুরুষের এই সাত প্রকার ভার্য্যা। তুমি ইহাদের কোন শ্রেণীর ?"

"হে প্রভু, আজ হইতে আমাকে দাসী-সমা বলিয়া গ্রহণ করুন।

সুজাতা সেই হইতে শ্বশুর, শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইল। স্বামীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-প্রেমপরায়ণা ও ছায়ার ন্যায় স্বামীর একান্ত বশবর্ত্তিনী এবং দাস দাসীর প্রতি বাৎসল্যপরায়ণা হইয়া পরিবারের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। এমন কি প্রতিবেশীগণও সুজাতার অমায়িক ব্যবহার ও কোমল স্বভাব দর্শনে মুগ্ধ হইতে লাগিল।"

উপসংহারে—প্রাণ কথা।

স্বামী—স্ত্রীর চির-ভক্তিভাজন মূর্ত্তিমান দেবতা। একমাত্র পতিকে অর্চ্চনা করিলেই সর্ব্বদেবতার পূজা করা হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পতিরূপে বিরাজিত। যে গৃহে পুণ্য-শীলা পতিব্রতা রমণী বিরাজমানা, ভগবান শ্রীহরি তথায় নিত্য অবস্থান করেন। অতএব পতিই অবলার একমাত্র প্রাণারাধ্য ধন—পূজা ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ। যথা—

"যয়া প্রিয়ঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া।
পতিব্রতা ব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী শ্রীহরিঃ স্বয়ং॥"

অর্থাৎ,—শ্রীহরি স্বয়ং পতিরূপে বিরাজিত; মহিলাগণ স্বামীপদপূজা করিলে ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মপূজার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র, গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥
আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥"

অর্থাৎ যে গৃহে পুণ্যশীলা, পতিব্রতা গৃহিণী, পিতৃভক্ত সন্তান, সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, গুরু-ভক্তি, সত্য, শৌচ, সরলতা ও ক্ষমা প্রভৃতি বিরাজমান, ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদা তথায় বিহার করেন।

রমণী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সনাতন আর্য্য শাস্ত্রে এরূপ ভূরি ভূরি অমূল্য উপদেশ রত্ন সন্নিবেশিত আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত পাতিব্রত্য-ধর্ম্মরক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রমণীদিগের পক্ষে—পুরুষোচিত গুণ-গ্রামে ভূষিতা হইবার চেষ্টা পাওয়া,—অর্থাৎ বক্তৃতা দেওয়া, স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করা এবং সভাসমিতিতে যোগদান করা অতীব অন্যায়। ইহাতে শুধু যে অধর্ম্ম হয় এমত নহে; গর্ভধারণ, সন্তানপালন এবং গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধেও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আমরা একবার ভ্রমেও সেই অখিল জ্ঞানসম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের পবিত্র উপদেশাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। হা ভগবান্! কবে আমাদের মতিগতি ফিরিবে—কবে আমরা স্ব স্ব-ভগিনী, সুতা ও দয়িতা প্রভৃতিকে দেশীয় প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে যত্ন পাইব? ভগবন্! সে দিন কি হইবে না? আর কি ভারতে সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আবির্ভাব ঘটিবে না?

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা [illegible]।

প্রেম-ভক্তি-যোগ।

যোগ বিয়োগ লইয়াই সংসার। এই বিরাট বিশ্বদেহে ক্ষণে ক্ষণে কত যোগ ও কত বিয়োগ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? সেইরূপ মনুষ্যদেহেও যোগবিয়োগের তারতম্যানুসারে গুরুত্ব ও লঘুত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। মানবদেহে ধর্ম্মের যোগ হইলেই তাহা গুরুত্ব প্রাপ্ত হয় আর অধর্ম্মের যোগ হইলেই তাহা লঘুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিয়োগ-জনিত লঘুত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন—যোগ শব্দে বিদ্যা আর বিয়োগ শব্দে অবিদ্যা, এই জন্য বলিতে পারি যোগ শব্দে ঈশ্বরপ্রাপ্তি আর বিয়োগ শব্দে সংসৃতি। সংসারে আসিয়া, এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মলাভ করিয়া যাহাতে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারা যায়; যাহাতে ইহার গুরুত্ব সম্যকরূপে বজায় করিতে পারা যায়, তাহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপে যোগাযোগ-উদ্দেশ্য না হইয়া যদি কেবল বিয়োগের পথে, কেবল ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে আর এ অমরবাঞ্ছিত মনুষ্যকুলে জন্মলাভের ফল কি? মানুষইত দেবতার সমকক্ষ জাতি, এই জাতিইত দেবতা হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া সংসারে আসিয়াছে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মের পালা শেষ করিয়াইত ইহারা নিষ্কামনায় দেবত্ব লাভ করিবে, দেবত্বইত ইহাদের শেষ পরিণতি। কিন্তু হায়! কয়জন তাহা জানে আর জানিয়াই বা কয়জন তাহা লাভের জন্য চেষ্টিত হয়!

এই দেবত্ব লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, ভগবানে মিলিত হইবার ইচ্ছা থাকিলে তোমাকে যোগ করিতে হইবে। কিন্তু যোগ কি? ইহার প্রকৃত অর্থ—যাহার দ্বারা ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়। প্রেমলক্ষণা ভক্তিই এই যোগের প্রধান অঙ্গ, ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন। পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সহজসাধ্য উপায়েই এই প্রেম-ভক্তি-যোগ। পূরককুম্ভকাদি কতিপয় ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ঈশ্বরে মিলিত হইবার চেষ্টা করা আর শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ করা উভয়ই সমান। ঈশ্বরের কল্পিত উপায় বিহিত থাকিতে, তদীয় সৃষ্ট বস্তুর কল্পিত উপায় অবলম্বন করা বিড়ম্বনা মাত্র! জগৎ প্রকাশক সূর্য্যের আলো থাকিতে কে কোথায় প্রদীপের আলো গ্রাহ্য করে! ভগবান—প্রেমেরই দাস। হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলে দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম ও ভক্তির পথ অতি সহজ, সকলেই এই পথের পান্থ হইতে অনায়াসে সক্ষম হয়। পূরক, কুম্ভক, রেচকাদি বহু আয়াসে বহু দিনে সাধ্য হইয়া থাকে। প্রেম-ভক্তি-সাধনার কোনও আয়াস নাই, ইহার জন্য কোন কষ্ট করিতে হয় না। পূরক, রেচকাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনায় যাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারক হইবে না, বাস্তবিক কি তাহাদের কোন গতি হইবে না, ইহাই কি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে?

যিনি প্রেম ও ভক্তি হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া ভগবানে যুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, তাহারই সিদ্ধি লাভ অচিরে সংসাধিত হইয়া থাকে—ইহাই বিচার-সঙ্গত সত্য। একান্ত মনে ঈশ্বরের

আনুগত্য করাই প্রেমের লক্ষণ। মনেপ্রাণে তাঁহার কার্য্য করা, তাঁহার প্রীতি সাধন করা, তাহাতে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার। ক্ষীর, সর, নবনী যেমন দুগ্ধের নামান্তর মাত্র, আকার ভেদে উহাদিগকে যেমন দুগ্ধ বলিলেও চলে। প্রেম ভক্তির পক্ষে পূরক ও রেচকাদি সেইরূপ, পূরক শব্দে পূর্ণ করা। প্রেমভক্তি অপেক্ষা মনোরথ পূর্ণ করিতে বা শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে আর কে অধিক ক্ষমতাবান। রেচক শব্দে রেচন করা অর্থাৎ মনের মলাদি ক্ষালন করা—প্রেম ভক্তি অপেক্ষা এ কার্য্য করিতে আর কাহার ক্ষমতা বেশী আছে কি? তাহা হইলেই সহজে বুঝা যায় যে প্রেমও ভক্তি থাকিলে বিনা যোগে, বিনা তপস্যায় ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায়। এইজন্য বলি জাগতিক সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত প্রেম, সমস্ত ভক্তি একত্র করিয়া ঈশ্বরে ন্যস্ত কর, তোমার সদ্যোমুক্তি সম্ভাবিত হইবে। আত্মজ-পুত্রকে স্পর্শ করিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি লাভ হয়, উপাদেয় আহার করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও শরীর পুষ্টি হয় কিন্তু যিনি এই সকলের স্রষ্টা, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে কি সকল নিবৃত্তি ও সকল পুষ্টি একাধারে সাধিত হয় না? যাহারা একেবারে এ ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারেন। তাহারা প্রথমে পুত্ররূপে, পিতা মাতা, সখা, পত্নীরূপে সেই ভগবানে প্রেমভক্তি স্থাপন করিতে পারেন, পরে পুনঃপুনঃ এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে লৌকিক জ্ঞান দূরীভূত হইয়া ঈশ্বর-বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই এই কৃত্রিম ভাব তিরোহিত হইয়া প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। মানবকে সহজে আপনার দিকে টানিয়া লইবার জন্যইত ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি বা তাহার লৌকিক ভাবাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা যোগযাগ জানে না বা করিবার ক্ষমতা নাই—তাহারা এইরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অজামিল পুত্ররূপেই ভগবানকে পাইয়া ছিলেন। শাস্ত্রেও আছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে হয়। শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তগণ এই পাঁচটী ভাবের সাধনা করিয়া সকলেই শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

যাহারা প্রকৃত প্রেমভক্তির সাধক, এই পথের পথিক হইতে যাহারা সদা ইচ্ছুক, তাহারা অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধির পক্ষপাতী নহেন। তাহারা মনে করেন—যখন ঈশ্বরে লীন হইতে পারিলেই সকল অভীষ্ট লাভ হইবে, পার্থিব সকল আপদ মিটিয়া যাইবে তখন ঐ সমস্ত বৃথা প্রয়াস পাইবার আবশ্যক কি? শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া শরীর, বায়ু পূর্ণ করিলে ত সহজেই শূন্যে উত্থিত হইতে পারা যায়, ইহাতে আর পুরুষত্ব কি? যদি ঐ প্রকার বায়ু নিরোধ করিয়া শূন্যে উঠিতে পারিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বায়ুভরে শূন্যে উড্ডীয়মান ভূপত ভগবানের সামীপ্য লাভ করিতে পারিবে? এইজন্য বলি—অল্লায়ু কলির জীব, আমাদের ঐ সকল কষ্টকর বৃথা কাজে সময় নষ্ট না করিয়া প্রেম ও ভক্তির সাধনায় চিত্ত স্থির করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হইবে। ... প্রেম-ভক্তির নিকট সকল যোগের ... পর্য্যবসান আছে। [illegible]

বা প্রণালীবিশেষে ভিন্ন রুচির সাধক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু পুত্রের প্রতি বাৎসল্য, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, পত্নীতে প্রেম, সখার সখ্য ইহাতে আর কাহার মতভেদ থাকিতে পারে না, এইজন্য প্রেম-ভক্তি বা ঐরূপ ভালবাসা ইহা যে সর্ব্বসিদ্ধিযোগ তাহা আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাতে পতন নাই, অবসাদ নাই, ক্ষয় নাই খেদ নাই, ইহার গতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে। যোগাদিতে পতন, ক্ষয় ও অবসাদাদি সম্ভব—শাস্ত্রেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এবং লোকের নিকটেও অনেক শুনা যায়। কিন্তু প্রেম-ভক্তিতে যদি কোন প্রকার পতন থাকে—তবে সে অশ্রুর পতন, যদি ক্ষয় থাকে তবে সে পাপের ক্ষয় আর যদি অবসাদ থাকে, তবে তাহা নরকের।

কার্য্য থাকিলে ক্ষয় বিনাশাদি বিকার-বিশিষ্ট জাগতিক ব্যাপার সকল থাকিতে পারে। প্রেম-ভক্তি বলে ভগবানে তন্ময় হইলে, তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারিলে ক্ষয় কার্য্যের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। কেন না, কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। ঘট ভাঙ্গিলে তাহার মধ্যস্থ আকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয় এবং ঘট রূপী ভূত যেমন ভূতত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন আর তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না। প্রেম ও ভক্তিবলে ভগবানে লয় হইলেও আর তাহার কিছু থাকে না, ইহাই প্রেম-ভক্তি যোগ।

[illegible] বলিয়াছেন—শ্রবণং কীর্ত্তণং বিষ্ণোঃ [illegible] পাদসেবনম্ অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য-[illegible] ভক্তি যোগের এই নবধা [illegible] করিয়া এই যোগের অধিকারী হইতে হয়। প্রেম-ভক্তির দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া কাচাদির ন্যায় নির্ম্মল হয়, হৃদয়ের কপটতা নাশ প্রাপ্ত হইয়া সরলতার আধার হয় ও তাহার বিকাশ হয়। প্রেম ভক্তের হৃদয়-নিহিত অকপট অনুরাগ ভাব, এই ভাব-স্রোত হইতে উচ্ছলিত অংশই ভক্তি নামে অভিহিত, প্রেমই জগতের আদি কারণ, প্রেম হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেম হইতে এই সংসারে জ্যোতিঃ, কান্তি, দিপ্তি, প্রদীপ্তি, অগ্নি, জল, উন্নতি, নতি, প্রতিভা, আলোক, প্রকাশ বিকাশ সকলেই আসিয়াছে। প্রেমে ভজনানন্দ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে যে সুধা ক্ষরণ হয়—তাহাই ভক্তি এই প্রেমভক্তি একত্র করিয়া ভগবানের প্রতি ধাবিত হইলে আর সাধকের কোন ভাবনাই থাকে না। যিনি যথার্থ প্রেম-ভক্তির অধিকারী, যিনি যথার্থ এই সাধানায় সিদ্ধ, তিনি মহাপুরুষ। বিষয়ে দোষ-দর্শন ও তাহার পরিহার প্রেমের প্রথম শিক্ষা, বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ দ্বিতীয়, মনের মালিন্য ও আকাঙ্ক্ষার বিসর্জ্জন তাহার তৃতীয় শিক্ষা এবং আত্মায় আত্মায় সংযোজন পূর্ব্বক বৈকারিক কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা—তাহার চতুর্থ শিক্ষা। নবদ্বীপে প্রেমাবতার মহাপ্রভুই ইহার চরমাদর্শ। কলিযুগে তিনিই প্রেমভক্তি-যোগ শিক্ষার পথপ্রদর্শক। প্রেম ভক্তির বলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। প্রেম ইন্দ্র-জালের ন্যায় অঘটন ঘটাইতে পারে। অন্ধকারকে আলোক, অগ্নিকে জল, প্রস্তরকে কর্দ্দম, উষরকে উর্ব্বর, পতিতকে উন্নত, অধমকে উত্তম করিতে প্রেমের ক্ষমতাই অত্যধিক।

এই প্রেম-ভক্তির বলেই পিতামহ ভীষ্ম ভগবানের বিচিত্র রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ স্তম্ভমধ্যে হরির দর্শন পাইয়াছিলেন। শিশু ধ্রুব কানন-মধ্যে তাঁহাকে লাভ করিয়া ছিলেন। এই প্রেম-ভক্তির বলেই পাণ্ডব-গৃহিণী দ্রৌপদী তাঁহাকে ক্রীতবৎ বশীকৃত করিয়া কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসার ভীষণ বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অম্বরীষ তদীয় তেজে আবিষ্ট হইয়া ঋষি-তেজকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। বৃন্দারণ্যে গোপ-গোপিনী প্রভৃতি তাঁহাকে আপনাদের আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে কত ভক্ত যে কতরূপে কৃতকার্য্য হইয়া জগতীতলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অতএব এই কলিকালে সাধনায় সুসিদ্ধ হইতে হইলে অপর সমস্ত আয়াসলব্ধ ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়া এই সহজসাধ্য পন্থা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়।

মূঢ় আমরা, অজ্ঞ আমরা তাই বৃথা আড়ম্বর করিয়া সময় নষ্ট করি, আসল কার্য্যের প্রতি কিছুতেই ধাবিত হইতে চেষ্টা করি না। ভাই সাধক! আর অন্য সাধনার প্রয়োজন নাই, এস, আমরা শ্রীভগবানের প্রদর্শিত সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়া এই মানবজন্ম সফল করি। ভাই! অশ্রুর ক্ষমতা বিশ্ববিজয়ী, কাঁদিতে পারিলে সকল কার্য্যই সহজসাধ্য হইয়া যায়। ভাই এস, আমরা প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহার নামে অশ্রু বিসর্জ্জন করি, আমাদের এ অমোঘ অশ্রুর ক্ষমতা কখন ব্যর্থ হইবে না। আমরা অনায়াসেই এই প্রেমাশ্রুর বলে সেই প্রেমময়কে লাভ করিয়া ধন্য হইব। সম্পাদক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নূতন গিন্নি। - একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা ৬৩ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, বাণী প্রেস হইতে মুদ্রিত। পুস্তক খান সাংসারিক একটী সামান্য ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহার রচনায় বেশ নৈপুণ্য প্রদর্শণ করিয়াছেন। প্রধান চরিত্রগুলি এরূপ পরিপুষ্ট ও সহজবোধ্য হইয়াছে যে, সকলে ইহা পাঠে আনন্দানুভব করিবেন। হিন্দুর সংসার নারীর চরিত্র-দোষে কিরূপে নষ্ট হয়, ইহাতে গ্রন্থকার তাহা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন, আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। ভাষারও বেশ পারিপাট্য আছে। এইরূপ পুস্তকের আদর একান্ত বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই পরিপাটী।

এলবাম। কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী মহাশয়ের ঔষধালয় হইতে প্রকাশিত একখানি সুন্দর ছবির বই। ইহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ছবিগুলি তাঁহাদের ঔষধালয়ের চিত্র হইলেও দেখিবার ও দেখাইবার জিনিস বটে।

বিনামূল্যে ও বিনামাসুলে!

লাবন্যময়ী রমণী সংসারের শান্তিস্থল। ললনাগণের সেই রূপ লাবণ্য বর্দ্ধন ও স্থায়ী ভাবে সংরক্ষণের উপায় এবং গার্হস্থ্য চিকিৎসা সম্বলিত অবশ্য পাঠ্য পুস্তক পাইবার জন্য শীঘ্র লিখুন। কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী, আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয় ২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

আগমনী।

(১)

হাসিল শরত, অই
    বিপিনে ডাকিল পাখী ;
গগনে গরজে ঘন
    গভীর, শুধুই ফাঁকি !

(২)

ফুটিল কুসুম-চয়,
    উপবন আলো করি ;
পবন মৃদুল বয়
    ফুলের সুবাস হরি।

(৩)

সাজিল মোহিনী বেশে
    রূপসী প্রকৃতি অই ;
মধুর শরত এল
    শারদা আসিল কৈ ?

(৪)

শিশিরের ছলে ঝরে
    মেনকার অশ্রু-জল ;
গিরিরাজে বলে রাণী
    "গিরিজা কোথায় বল"।

(৫)

একটি বছর গত
    এনে দাও উমা ধনে
তনয়া বিহনে নাথ
    প্রবোধ না মানে মনে।

(৬)

স্বপনে দেখিলা রাণী
    কোলে এল উমা ধন ;
মেয়ের মোহিনী রূপে
    উজলিল এ ভুবন।

(৭)

শর্ব্বরীর সনে অরু
    সুষুপ্তি চলিয়া যায় ;
মেনকা কাঁদিয়া বলে,
    "কোথা মোর উমা হায়"!

(৮)

কত যে প্রবোধে গিরি
    ধৈরয না ধরে রাণী ;
লুটিয়ে নাথের পায়
    বলয়ে করুণ বাণী।

(৯)

নিশীথে দেখিলা রাণী
    ভীষণ স্বপন আর ;
শ্মশানে তাপসী-বেশে
    প্রাণধন উমা তাঁর।

(১০)

কাঁদিয়া আকুল রাণী
    অশ্রুজলে ভাসে ধরা ;
গিরিরাজে বলে, "নাথ !
    উমাধনে আন ত্বরা"।

লাবণ্যময়ী রমণী !—সংসারের শান্তিস্বরূপ ললনাগণের রূপ-লাবণ্য বর্দ্ধন ও স্থায়ী ভাবে সংরক্ষণের উপায় এবং গার্হস্থ্য চিকিৎসা সম্বলিত অবশ্য পাঠ্য পুস্তক বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে, শীঘ্র পত্র লিখুন। কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী, আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১১)

কান্তার বিলাপে কান্ত

থাকিতে নারিল ঘরে ;

শিরীশ পুষ্পেতে গোর

চালনা তনয়া তরে।

(১২)

তথাপি না প্রবোধিল

মায়ের অবোধ প্রাণ ;

নিষ্ঠাবান বিপ্রে ডাকি,

বলে, কর "স্বস্ত্যয়ন।"

(১৩)

অশুভ নাশিনী যিনি

মঙ্গল কারণ তাঁর,

শুভ শান্তি স্বস্ত্যয়নে

কি বল করিবে আর ?

(১৪)

হেন মত ভাবি দ্বিজ

মানসেতে আপনার ;

যেমকায় প্রবোধিতে

সুযুক্তি করিলা সার।

(১৫)

প্রতি পদে কল্লারম্ভ

হ'ল স্বস্ত্যয়ন ছলে :

ভক্তিভরে ডাকে বিপ্র

গিরিজায় কুতূহলে।

(১৬)

ভকতবৎসলা তারা

আসিলা ভকত বাসে ;

আনন্দে পুরিল বিশ্ব

ডুবিল ভকতি-রসে।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন।

চির নূতন কথা।

যে অবধি বিভিন্ন দেশীয় শিক্ষা ও সভ্যতা *বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে*, সেই অবধি বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, জাতি-ভেদ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সাকার ও নিরাকার-বাদ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সভা-সমিতিতে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও পুস্তকে আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ক্ষোভের বিষয়, বহস্যের কথা, জাতীয় ইতিহাসানভিজ্ঞ, সমাজ-তত্ত্বে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন, হিন্দু-দর্শন বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের একখানি পৃষ্ঠাও যাঁহারা কখন খুলিয়া দেখেন নাই, সেই সকল বিদ্যাদিগ্‌গজ, সেই সকল গাঁয়ে-মানেনা আপনি-মোড়ল সমাজ সংস্কারক উক্ত বিষয়গুলি লইয়া তরুণ-মতি যুবকগণকে নিয়ত উত্তেজিত, বিপথগামী ও স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছেন। কত সংস্কারক দল যে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্গ-রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেদিন বেশান্ত বিবিও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণ, সুধীবৃন্দ, চিন্তাশীল সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ, মনীষিগণ বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, পুস্তকে ইহার যথোচিত প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দি এই সব কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। অন্য বিষয় হইলে পুরাতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইত ; কিন্তু এসব কথা চির নূতন ; কারণ এসব আমাদের ঘরের কথা সুখ-শান্তির কথা ; জীবন-মরণের কথা, হিন্দু-সমাজ-ভিত্তির কথা। আমাদের অকস্মৎ সংস্কারক সুরেন্দ্রবাবুও কতকগুলি গোঁড়া

ছাত্রকে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লই-লেন, ২৫ বৎসরের কমে বিবাহ করিবে না। বেশান্ত বিবি আরও একটু উচ্চে উঠিলেন; সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজের যে সকল ছাত্র বিবাহিত তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করিতে লাগিলেন, এবং বিবাহিত নূতন ছাত্রগণকে কলেজে ভর্ত্তি হইতে দিলেন না। সৌভাগ্যের বিষয়, এতটা অত্যাচার, এতটা উৎপীড়ন ধর্ম্মে সহিল না! সম্প্রতি বিবি কলেজের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিভিন্ন দেশীয় সমাজ-প্রথার মোহে বিজ্ঞ সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না; বাঙ্গালী ২৫ বৎসরে কেন, ৩০ বৎসর বয়সে ২০ বৎসরের যুবতীকে বিবাহ করিলেও তাহাদের সন্তান কখনই নীরোগ, সবল, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হইবে না। গত ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়া যে দেশ উজাড় করিয়া ফেলিতেছে; যাহাদের ঘরে খাদ্য-শস্যের ঘোর অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; কঠোর জীবন-সংগ্রামে অরুণোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যাহাদের দেহের বাকি সারটুকুও ক্ষয় হইতেছে, তাহারা যে বয়সে বিবাহ করুক-না-কেন, তাহাদের সন্তান-সন্ততি কখনই বলবান ও নীরোগ হইতে পারে না দুঃখে, দারিদ্র্যে, রোগে এবং হাড়ভাঙ্গা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অর্দ্ধমৃত বাঙ্গালীর অবনতি এবং শেষে বিলোপ অনি-বার্য্য। সংস্কারকগণ বৃথা ঋষি নির্দ্দিষ্ট সুখশান্তির আকর, সুন্দর সামাজিক প্রথা উচ্ছেদ করিয়া, সমাজ ভাঙ্গিয়াচুরিয়া একাকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন; বৃথা বালকগণকে অভিভাবক-গণের অবাধ্য হইতে শিক্ষা দিয়া, পিতামাতা গুরুজনের অকারণ মর্ম্মবেদনা দিয়া সংসারে অশান্তি আনয়ন করিতেছেন।

আমরা অদ্য আলোচনা-পত্রিকায় আবার সেই চির নূতন কথার আলোচনা করিব। সংস্কারকগণ বলেন প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না; মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের অধোগতির সময়ে এই প্রথা প্রবেশ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাঁহারা ইহাও বলেন, ইংলণ্ডে এই প্রথা প্রচলিত নাই বলিয়া ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রকারে সুখে আছেন। আমরা একে একে এই প্রকার মত খণ্ডন করিয়া বাল্য-বিবাহ হইতে কত শুভফলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই দেখাইব।

সকলেই স্বীকার করিবেন, আর্য্যদিগের যে অবস্থা রামায়ণে বর্ণিত, সেই অবস্থাই তাঁহাদের অতিশয় গৌরবের সময়। সে সময়ে তাঁহাদিগকে যেরূপ বলবিক্রম প্রকাশ করিতে হইয়াছিল, এরূপ আর কখনও হয় নাই। সেই কালের প্রধান বীর—রামায়ণের নায়ক সূর্য্য-বংশে অতুলনীয়—শ্রীরামচন্দ্র। রামায়ণে লিখিত আছে রামচন্দ্রের ষোড়শবর্ষ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং সীতাও অনুরূপ বালিকা বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। সেই সীতার গর্ভে রামবিজয়ী কুশ ও লবের জন্ম হইয়াছিল। বাল্য-বিবাহের ফল মন্দ কই, ইহাতে ত দেখি-লাম না। কেবল তাহাই নহে, বাল্য-বিবাহে শারীরিক অথবা মানসিক উন্নতির যে ব্যাঘাত হইত না, সীতা ও রামচরিত্র তাহার জলন্ত প্রমাণ। সাবিত্রী সত্যবান এবং নল-দময়ন্তী কত বয়সে বিবাহিত হইয়াছিলেন, তাহা মহা-

ভারতে লিখিত নাই। তবে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে, সাবিত্রী ও দময়ন্তী যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়া স্বয়ম্বরা হইয়াছিলেন। শকুন্তলা কিছু বয়স্থা হইয়া বিবাহিতা হইয়াছিলেন বটে কিন্তু কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে অনূঢ়া থাকিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন।

মুসলমান-রাজত্ব-কাল হইতে নহে, মনুর সময়াবধি আজও পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহ হইতেছে। কিন্তু ইদানীং প্রসূতি ও সন্তান যেরূপ দুর্ব্বল হয়, অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। যে সকল কারণে বঙ্গের রমণী ও সন্তানগণের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, এই অনর্থপাত হইতেছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

প্রথম, পুরুষদিগের মধ্যে ব্যায়াম এবং *স্ত্রীলোকদের শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।* পূর্ব্বে প্রত্যূষে উঠিয়া ব্যায়াম করা নিত্য-কার্য্য ছিল ; ইহাতে প্রত্যূষে উঠা ও শারীরিক পরিচালনায় বিজ্ঞান-সম্মত সুফল ফলিত। তখন সকলেই ১০।১২ ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিতে পারিত ; এইরূপে পুরুষেরা অমিত বল সঞ্চয় করিত। স্ত্রীলোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে গঙ্গায় বা অন্য কোন নদীতে অথবা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সমস্ত দিন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন ; এখনকার মত আহার, শয়ন নভেল নাটকপাঠ ও উল-বুনা গৃহকর্ম্ম ছিল না ; নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল আনা, সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধন করা, রন্ধনের আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করা, সমস্ত পরিবারকে খাওয়ান, সন্তানগণের তত্ত্বাবধান, এইরূপ নানাপ্রকার সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইত। এগুলি স্ত্রীলোকদের পক্ষে যথেষ্ট ব্যায়াম ছিল। ইহার অমৃতময় ফল নীরোগ ও সুস্থ শরীর লাভ করা। এই জন্য সেই সকল বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় ব্যক্তিদের সন্তানও তদ্রূপ হইত। প্রসবান্তে এখনকার মত নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইতে হইত না। বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় পিতামাতার সন্তান কখনও রুগ্ন বা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে না। দুইটি চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দিতেছি :—একজন এক্ষণে ৭৫ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি যখন তাঁহার গর্ভধারিণীর বয়স ১৩ বৎসর ছিল সেই সময়ের সন্তান। আর একজন ৮৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন ; জন্ম-সময়ে তাঁহার মাতার ১২ বৎসর মাত্র বয়স। এইরূপ অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাঠক-পাঠিকাগণ স্মরণ রাখিবেন, মহাবীর কর্ণ কুন্তীর বালিকা অবস্থার সন্তান। তাই বলিতেছি, উত্তম বীজে উত্তম বৃক্ষ জন্মে—ইহা অকাট্য প্রমাণ।

এখন আমাদের সমস্তই বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যূষে ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে সমস্ত দিন বিদ্যালয়ে মানসিক পরিশ্রমের পর পরিশ্রান্ত কলেবরে সামান্য জলযোগ করিয়া গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুটবল এবং শীতকালে ক্রিকেট খেলা হয় ; কেহ বৃষ্টি মানে না, দারুণ রৌদ্রকে দৃক্‌পাত করে না। আমরা শারীরতত্ত্ববিৎপণ্ডিত, দেশী ও বিলাতী প্রবীণ, বহুদর্শী চিকিৎসকগণকে জিজ্ঞাসা করি, ব্যায়ামের

যোগ্যকাল প্রাতঃকাল অথবা মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন-কাল? প্রকৃতি যে সময় স্নিগ্ধ থাকে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও প্রাতঃকাল ব্যায়ামের উপযোগ্য,১ না যে সময় স্বভাবতঃ সূর্য্যতেজে শরীর ক্লান্ত হয়, অধিক পরিশ্রম অস্বাভাবিক, সেই মধ্যাহ্ন ও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অপরাহ্ণ-কাল কি ব্যায়ামের উপযোগী? ফুটবল ও হকি যে দেশ হইতে আমদানী, সেদেশ আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশও নহে; সেদেশে বৎসরের মধ্যে ৭।৮ মাস বর্ষা থাকে না; সেখানে ফুটবল স্বাভাবিক, আমাদের অস্বাভাবিক। রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া ও বৃষ্টিতে অনবরত ভিজিয়া বাঙ্গালী বালক ও যুবকদের দিন দিন স্বাস্থ্য ভগ্নই হইতেছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, ফুটবল ও হকিখেলা প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি শতকরা কতজনের এক শিরার (Hydrocele) পীড়া ও অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia) রোগ জন্মিতেছে, কত লোকের সর্দ্দি কাশী ও শিরঃপীড়া নিত্যসহচর হইয়াছে। এখন জ্বর হইলে কথায় কথায় ব্রন্‌কাইটিশ ও নিউমোনিয়া হইতেছে। তখন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের বাত ধরিত, এখন বালকেরাও বাতে পঙ্গু হইতেছে। এই কলিকাতা সহরে যেখানে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা অতি অল্প, সেখানে এত জ্বর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বর্ষা ও রৌদ্রে ফুটবল খেলা এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির সেই সব খেলা দেখিতে যাওয়া। আমাদের একথা মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য কি না প্রবীন শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। তাঁহারা যেন ইহাও বিচার করেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পর আমাদের প্রাচীন কুস্তি, ডন্, বৈটক মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি ব্যায়ামের দ্বারা শরীর যেরূপ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় হইত, শরীর যেরূপ পূর্ণায়তন ও সুগঠিত হইত, দেহ যেরূপ নীরোগ হইত, এখন তাহার শতাংশের এক অংশ হয় কি? তখনকার মল্লগণ এবং এখনকার ফুটবল ও ক্রীকেটর মল্লগণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন কি?

ব্যায়ামেরত এই দুর্দ্দশা। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীও শরীর ভগ্ন করিবার একটী বৃহৎ যন্ত্র হইয়াছে। ছাত্রগণের স্কন্ধে রাশি রাশি পুস্তক চাপাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। জগতের কোন সভ্যদেশের শিক্ষা বিভাগ ছাত্র ধ্বংসের এমন সরল ও ধ্রুব উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অজীর্ণ রোগ (যাহা হইতে এমন রোগ নাই যাহা জন্মিতে পারে না) নানা শিরোরোগ, দৃষ্টিহীনতা, দুর্ব্বল ফুস্‌ফুসি—এগুলি ত সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ছাত্রগণের মধ্যে আরও কত নূতন রোগ জন্মিতেছে এবং সে সকলের কারণ কি সংস্কারক সম্প্রদায় তাহার ইয়ত্তা করিয়াছেন কি? বিবাহ না দিয়া যে দেহ সুস্থ সবল রাখিবে ভাবিয়াছিলে কিন্তু নির্ম্মম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্য্যাতনে সে দেহ অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, প্রতিজ্ঞাপত্রে ২৫, ৩০ বা ৪০ যে বয়সেই বিবাহ করিবার জন্য স্বাক্ষর করাইয়া যতই বাহাদুরী দেখান, বড় দেশহিতৈষী বলিয়া আপনাকে জাহির করুন, নানা রোগের আধার নিস্তেজ যুবক বৃন্দের পুত্র কন্যাগণ নিশ্চয় অকালে জীবলীলা সংবরণ করিবে অথবা চিররুগ্ন হইবে।

এইবার মহিলাদের কথা। অনেকে বলি-

যেন কলিকাতার ধনীদের গৃহে মহিলারা নভেল নাটক পড়েন, উল বুনেন, তাস খেলেন আর গল্প ও পরনিন্দায় সময় কাটান বটে কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহে তাহা হয় না। তাহাদিগকে সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম করিতে হয়, পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা না হইলেও কলিকাতাত সমস্ত বঙ্গদেশ নহে ; পল্লীগ্রামে মহিলাগণকে সেকালের মত আজও দুরস্থ পুষ্করিণী বা নদী হইতে জল আনিতে হয়, রন্ধন করিতে হয়, সমস্ত গৃহ কার্য্য করিতে হয় সন্তান পালন করিতে হয় ; তথাপি তাঁহারা এত দুর্ব্বল কেন ? ইহার উত্তর আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে কতক দিয়াছি। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ইহার মূল কারণ। দ্বিতীয় কারণ, ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি যাহা প্রধান খাদ্য, দেহরক্ষা ও দেহ পুষ্টির যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান স্বরূপ, সেই দুগ্ধাভাব। ভগবৎসৃষ্ট অমৃতস্বরূপ সেই গোদুগ্ধের শতাংস ও মেলিন্স ফুড, নেসলস্ ফুড প্রভৃতির দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তৃতীয় কারণ, সেকালের মত পুষ্টিকর, অকৃত্রিম পরিপূর্ণ খাদ্যাভাব। ভাবিবেন না, কেবল দীন দরিদ্রগণ অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে। যে দেশে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ—যে দেশে প্রতি বৎসর অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি, নানা প্রকার প্রকৃতি বিপর্য্যয় যে দেশে অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, সে দেশের মধ্যবিত্তগণ সপরিবারে ভরপুর খাইতে পায় না। যে দেশের প্রতিবাসীগণ ধর্ম্মহীন হইতেছে, পরকালে ভয় হারাইতেছে, বিলাসে মগ্ন হইয়া নিত্য নূতন অভাব সৃজন করিতেছে ; লোভে পড়িয়া মুখের অন্ন, লক্ষ লক্ষ মণ কোটি কোটি মণ চাল অম্লানবদনে বিক্রয় করিতেছে, যে কারণে দেশের প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য প্রতি বৎসরই অপ্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, যে বৃদ্ধির যথেচ্ছাচারে কেহ বাধা দেয় না। যে দেশ নানা কারণে দিন দিন গাভীশূন্য হইতেছে, দুগ্ধাভাবে জলমিশ্রিত দুগ্ধ ও অন্যান্য জন্তুর মিশ্রিত দুগ্ধপান করিয়া যকৃত ও প্লীহা রোগে অধিকাংশ বালক বালিকা অকালে জীবলীলা সম্বরণ করিতেছে, যাহারা বাঁচিতেছে, তাহাদের দেহের পূর্ণতায়, দেহের বলাধানে নিরতিশয় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। গোড়ায় যাহা সুগঠিত হইল না, সারাজীবনে তাহা হওয়া অসম্ভব। বঙ্গের স্ত্রী পুরুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগে আবশ্যকীয় ও অকৃত্রিম দুগ্ধভাবে এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে জীবনেও পূর্ণতালাভ করিতে পায় না, দেহে যথোচিত বলাধান হইতে পায় না। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী কারণ আছে। সাহেবদিগের খাদ্যদ্রব্য, প্রায় চর্ব্বিতে প্রস্তুত হয়, ঘৃত ব্যবহার হয় কি না সন্দেহ। তাই পিশাচ ব্যবসায়ীগণ নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে বাঙ্গালীর আর দুই প্রধান খাদ্য দ্রব্য ঘৃত ও তৈলে অবাধে ভেজাল মিশাইয়া সমগ্র দেশকে বিষ খাওয়াইতেছে, এখন আর মুঙ্গের, বিষ্ণপুর চন্দ্রকোণার ঘৃত পাইবেন না ; রেলগাড়ী ভর্ত্তি করিয়া সহস্র সহস্র ক্যানেস্তরা পরিপূর্ণ বঙ্গবাসীর বিষ আসিতেছে। সরিষা তৈল ও রেড়ির তৈলের কলে রাজধানী ও অন্যান্য স্থান ছাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু খাঁটি তৈল দুর্লভ হইয়া নানা দূষিত দ্রব্যে প্রস্তুত ঘৃত ও তৈল খাইয়া বহুবিধ রোগ জন্মিতেছে, [illegible]

আয়ুক্ষীণ হইতেছে, ইংরাজিতে যাহাকে slow poisoning (মৃদু বিষপ্রয়োগ) বলে—তাহাই ঘটিতেছে; মায়া মমতাহীন, নৃশংস, ধর্ম্মজ্ঞান হীন, অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীগণকে রাজধানীর কয়েকজন মাত্র খাদ্য ইনেস্‌পেক্টর দ্বারা শাসন করিবার চেষ্টা, রহস্য বা তামাসা করা ব্যতীত আর কিছু নহে। বঙ্গের নিরুপায় নর-নারীর প্রাণ-হত্যাকারী ব্যবসায়ীগণকে কঠিন দণ্ড দিবার আইন না হইলে উক্ত slow poisoning বা মৃদু বিষপ্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গালা নির্ম্মূল হইবে। এ সত্ত্বেও চাউল, ডাইল, তরি-তরকারী, ফলমূল যদি সস্তা থাকিত, তবে কিয়ৎপরিমাণে সে ক্ষতি পূরণ হইত। দ্রব্য সকল দিন দিন অগ্নি-মূল্য হইতেছে, একে উপকারিতার হ্রাস, তাহার উপর মহার্ঘতা, বঙ্গের নর-নারী খাইতে না পাইয়া অসুস্থ ও রুগ্ন হইতেছে। বাল্য-বিবাহে নহে, বয়স বাড়াইলেও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইলে বা বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে অর্থদণ্ড করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত অনিষ্টগুলির—বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ-গুলির প্রতিকার হইবে না।

তারপর খাদ্য আহরণের চিন্তা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বাধীন জীবিকা ও দাসত্বের পথ বিলক্ষণ প্রশস্ত ছিল। কিন্তু বিবিধ উপায়ে একে একে স্বাধীন জীবিকার পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইতেছে; নীচ দাসত্ব মিলাও ভার হইয়া উঠিয়াছে। রোগে অর্দ্ধমৃত, খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতায় বিব্রত, পরিবার পোষণের চিন্তায় জর্জ্জর-অন্তর বাঙ্গালী কিরূপে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় হইবে? (ক্রমশঃ) শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

সুধী।

ভোগ-ভূমি ধরণীর নিভৃত কন্দরে
আনন্দ-সলিল-পূর্ণ নীরব নিথর
হেরিনু অপূর্ব্ব হ্রদ সুধীর অন্তরে
নিস্তরঙ্গ! ধ্যান-মগ্ন সে হ্রদ ভিতর
নিশ্চল চিন্তায় বায়ু; মুক্ত চিদাকাশ
নিম্মল নির্মেঘ স্বচ্ছ মুরতি তাহার
বিম্বিত করেছে বুকে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশ
আত্মবোধ রূপে মরি রয়েছে বিহার
সর্ব্বত্র.; বিচিত্র মহাভাব রূপ ধর
তট-শৈল আঁকিয়াছে আপনার ছায়া
সে হৃদয়ে; নিরুচ্ছাস সে অন্তর ভরি'
সুষুপ্তির গুপ্ত স্রোত নির্ম্মম নির্মায়া
মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবাহিত। বড় সাধ যায়—
নিরবধ ডুবে রই সুধীর হিয়ায়!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

গীত।

না মিটিল আশা কেবলি নিরাশা
ভবে আসা আমার সার হল।
(আমার) গেল দিন বয়ে খেলা ধূলা লয়ে
আমার উপায় কি হবে বল।'
(আমি) যত মনে করি মায়া মোহ ছাড়ি
ডাকি প্রাণ ভরি—"ওমা শঙ্করী',
(তত) কি মায়ার টানে কোথায় কে জানে
নিয়ে যায় টেনে বুঝিতে নারি।
(ওমা) বড় সাধ মনে বসি নিরজনে
পূজিতে যতনে রাজীব পদ।
(সে) সাধে বাদ ওমা সেধোনা মা শ্যামা
দিয়ে পদ রাঙা ঘুচা বিপদ।

শ্রীধ্রুবলাল দত্ত বর্ম্মা।

নারী অধিকার।

১

অবলা তুমি যে নারী,
কি তোমার অধিকার।
জগৎ জুড়িয়া ব্যাপ্ত
আবদিত নহে কার।

২

তুমি কর্ম্মে নিমিলিতা,
প্রেমের সলিলে সিক্তা
ভগবান পদে তুমি রত অনিবার।
পাছে জীব কষ্ট পায,
পাছে কেহ অসহায,
একান্ত তাদের তরে প্রার্থনা তোমার।

৩

নিশীথে নিদ্রিত সবে,
যেথা রোগী পড়ে রবে,
তুমি সেথা সে বিচারে থাক জাগরিত।
ক্ষুধায় আহার দিতে
স্বর্গীয় বাসনা চিতে
এই অধিকারে তব জগৎ মোহিত।

৪

যাহারা নয়ন জলে
গলিত আপনা ভুলে
তুমি সেই বারিধারা মুছাইয়া দাও।
যারা পেয়ে ভয়-ভীতি,
কম্পিত আকুল অতি
তাহারে সাহস দিতে বুক পেতে দাও।

৫

যেবা চিন্তা প্রপীড়িত,
পড়ি নিরাশায় শত
তাহারে আশ্বাস দিতে তব অধিকার।
মুমূর্ষু শয্যায় যার,
জীবনের রুদ্ধ দ্বার,
নয়ন ভরিয়া জলে তব দেখিবার।

৬

মৃতের আত্মীয় জনে,
কাতরতা প্রাণপনে
বুক দিয়া শান্তি দিতে তব অধিকার।
তুমি নারী তার চোখে,
কৃপাময় স্মৃতি দিতে
পার্থিব আশায় মর্ম্ম নিপীড়িত যার।

৭

যেবা সত্য-পথ ছাড়ি,
রহে লজ্জায় আবরি,
তুমি এবে সত্য-পথে কর আগুসার।
সান্ত্বনিতে বিধবায়,
পিতৃহীন অসহায়,
দেখি কার নহে, শুধু তব অধিকার।

৮

শিশুরে লইয়া কোলে,
ভক্তি-পথে দাও ফেলে,
তোমার সরল প্রথা ধর্ম্ম শিখাবার।
ভালবাসা ছড়াইয়া,
সুখ্যাতির ছায়া দিয়া,
নারী-শিক্ষা কত বালক ও বালিকার।

৯

মানবের মনুষ্যত্ব,
অবলা তোমার শিক্ষা।
আত্মার উন্নতিতত্ত্ব,
জগতের নারী দীক্ষা।
পবিত্রতার [illegible]

শীতলিতে কর তার সেবা অনুক্ষণ।
পৃথিবীর কঠোরতা,
তরল করিয়া দেয় রমণীর মন।

(১০)

যাহাদের ভাল বাস,
তাদের একান্ত হয়ে,
রহিবার সাধ নারী তব অধিকার।
সেই ভালবাসা নিয়ে,
মরিয়াও পিছু হয়ে,
নাহি যেতে চাও দৃশ্য একি চমৎকার!

(১১)

গৃহীর এ গৃহস্থলী,
পার্থিব জনম জনমভূমি'
উজ্জলিত হয় নারী তব বিচরণে।
তোমার মিনতিমাখা,
অধরের হাসি রেখা,
সকলের আশা কত হেরিলে নয়নে।

(১২)

এতগুলি বাসনার,
যার বক্ষে অধিকার,
মানব চাহিয়া দেখ কিবা নাহি তার।
এ স্বর্গীয় অনুভব,
নাহি যার, তার মন—
মরুময় জলহীন দুঃখের আগার।

(১৩)

নারী তুমি ইহা নিয়ে,
জড় জীবে প্রাণ দিয়ে
পালিবে সাম্রাজ্য এই তব অধিকার।
এই যে কিরণ মালা,
তোমার ফুলের বালা,
দেত ময় পৃথিবীর, স্বর্গীয় আধার।

(১৪)

উজ্জলিত কর স্মৃতি,
ধর মা অক্ষয় নীতি,
তোমাতে উন্মুক্ত হউক স্বরগের দ্বার।
আশীর্ব্বাদ ভোগ কর
জনমের স্তরে স্তর
পার্থিব সংসারে এই শ্রেষ্ঠ অধিকার।

রায় বাহাদুর শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ।

গোরক্ষা।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃতের অভাব ও শস্যের মহার্ঘতা দিন দিন উত্তরোত্তর অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শিশুর মৃত্যু সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সম্প্রতি একজন বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার বলিয়াছেন যে শতকরা নব্বুইটি শিশু-কেবলমাত্র ফুকা দুগ্ধ (Faulty milk) খাইয়া মরিতেছে। এই সকল অসুবিধা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি বঙ্গবাসী সর্ব্বসাধারণকেই ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব, ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের অতি শীঘ্র বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। একমাত্র গোবংশধ্বংসই যে ইহার বিশেষ কারণ, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই এবং গোচারণ ভূমির অভাবই যে গোবংশধ্বংশের কারণ তাহারও কোন সন্দেহ নাই। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের লোক গো-খাদক, কিন্তু তথায় লোকসংখ্যা অপেক্ষা গো-মহিষাদির সংখ্যা আটাইশ গুণ অধিক এবং তথায় ৪।৫ সের দুগ্ধের গাভী হত্যা করিবার নিয়ম নাই। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, এক্ষণে

ভারতে গো মহিষাদির সংখ্যা লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক মাত্র। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘৃত ৭।৮ টাকা মণ এবং গম টাকায় ৩০।৩৫ সের ও চাউল টাকায় ২০।২৫ সের পাওয়া যাইত। কৃষকদিগের বাটীতেই ঘৃত দুগ্ধ ও শস্য পাওয়া যাইত এবং রাজা মহারাজা ও জমিদারগণ প্রতি গ্রামে ও নগরে গোচারণ ভূমি ছাড়িয়া রাখিতেন, এক্ষণে, তাহা না থাকায় কৃষকগণ অতি অল্প মূল্যে গোমহিষাদি কসাইগণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে এবং উচ্চ মূল্যে বলদ খরিদ করিতে হওয়ায় অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া ঋণ গ্রহণ করিতেছে এবং ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। উহাদের মধ্যে যাহারা ইংরাজী শিক্ষা অর্থাৎ 'কেরাণী বিদ্যা' শিখে তাহারা বাধ্য হইয়া চাকুরীর চেষ্টায় নির্গত হয়। তন্মধ্যে কাহারও ১৫।২০ টাকা বেতনের চাকুরী মিলে, কাহারও চাকুরী মিলাও আজকাল, সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে তাহাদিগকে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে জীবনযাত্রা চালাইতে হইতেছে এবং এই কারণে ভিখারির দল ও চোর ডাকাইতের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কেহ কেহ বা সংসার জ্বালায় এবং লজ্জায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতি চাকুরীর চেষ্টা করিলে কোন কোন অতি বিজ্ঞ লোক তাহাদের মুখের উপর বলেন্ "চাষ করগে যাওনা বাপু" কিন্তু চাষে, যে বাধা ও বিপত্তি দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করেন না; কেবল মুখে বলিয়াই বাহাদুরী লয়েন মাত্র। এক্ষণে এই ইংরাজাধিকারে কৃষিকার্য্য উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছে কিন্তু গোমূত্র ও গোবররূপ উত্তম সারের অভাবে পূর্ব্বে যে স্থলে ৫০/০ মণ উৎপন্ন হইত, এক্ষণে তাহার স্থলে কেবল মাত্র ১০।১২ মণ উৎপন্ন হইতেছে, ফলে যাহা হয় তাহাতে জমির খাজনা ও মহাজনের সুদ দিতেও অনাটন হয়।

কেবল চর্ম্মের নিমিত্তই গোহত্যা বেশী হইতেছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দুই শত সাত কোটি টাকা মূল্যের চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল এবং নিজ ভারতেও অনেক টাকার চামড়া ব্যবহৃত হইয়াছিল; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে কিরূপ দ্রুতবেগে গো-মহিষাদি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে আর কিছুদিন এইরূপ চলিলে চাষের নিমিত্ত গো মহিষাদি ভিন্ন দেশ হইতে আনিতে হইবে এবং দুগ্ধ টিনের কৌটায় করিয়া ট্রেডমার্ক দিয়া জাহাজে আমদানী হইবে। গো মহিষাদির সংখ্যা ক্রমশঃ যত অল্প হইতেছে, ততই শস্যের মহার্ঘতা এবং দুগ্ধের ও ঘৃতের অভাব হইতেছে। তাহার ফলে ঘৃতে ভেজালও বৃদ্ধি পাইতেছে, দুগ্ধে বাতাসা ও জল মিশ্রিত করণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কুকা গোদুগ্ধের ও গোরক্তের গুণ প্রায় একই প্রকার। একারণ দুগ্ধপায়ী শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদিগের দুর্ব্বলতা ও মানসিক নিস্তেজতা বাড়িতেছে। রাজধানী কলিকাতায় নীতিজ্ঞ, ধনাঢ্য জমিদার, রাজা, মহারাজা, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান অনেক ব্যক্তিই রহিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক চর্চ্চায় আত্মহারা হইয়া তাঁহারা এই গো সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলো-

যোগী রহিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই আসে পাশে যে মূর্ত্তিমান নিষ্ঠুরতার ছবি, বাঙ্গালী দুগ্ধব্যবসায়ীর গোশালরূপ দ্বিতীয় কসাইখানা স্থাপিত রহিয়াছে—তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বাঙ্গালী দুগ্ধ ব্যবসায়ীর গৃহে কখনও গাভী গর্ভিণী হয় না; তাহারা সবৎসা গাভী কলিকাতার হাটে খরিদ করিয়া গৃহে আনিয়াই বৎসটি কসাইকে বিক্রয় করে এবং ফুকা দিয়া দুগ্ধ বাহির করিতে থাকে, পরে দুগ্ধ ক্রমশঃ অল্প হইলে যখন দুগ্ধের মূল্য গাভীর খোরাকি অপেক্ষা কম হয় সেই দণ্ডেই তাহারা উক্ত গাভী কসাইকে বিক্রয় করে। হিন্দুরাই গোমাতার নিকট হইতে গোবৎস হরণ করে, কসাই করে না। বাঙ্গালার ঐ সকল দুগ্ধব্যবসায়ী হিন্দুরাই নিষ্ঠুরতায় জগৎকে হারাইয়াছে বলিতে হইবে। হিন্দু নিজে গোবধ করে না, হিন্দু নিজে গোমাংস খায় না কিন্তু তাহাদের স্বার্থের নিমিত্ত ছলনা করিয়া অপরের দ্বারা তাহা বধ করাইতেছে এবং অন্যকে খাওয়াইতেছে। যে কারণে গোজাতি কসাই হস্তে পতিত হয়, সেই কারণের যাহারা মূল এবং উক্ত কার্য্যনিবারণে যাঁহারা অমনোযোগী, তাঁহারাই যথার্থ কসাই অর্থাৎ (১) যে সকল হিন্দু কসাইগণের দালালি করে (২) যে ব্যক্তি ঐ সকল হিন্দু দালালগণকে গরু বিক্রয় করে (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহপালিত গাভী দুগ্ধহীনা হইলে কিছু টাকা দিয়া অন্য দুগ্ধবতী গাভী কসাইএর কিংবা দালালের নিকট হইতে বিনিময়ে লইয়া থাকে (৪) যে ব্যক্তি গোবৎস সকল কসাইকে বিক্রয় করিয়া গাভীকে দুগ্ধের কল মনে করিয়া ফুকা দিয়া দুগ্ধ বাহির করে (৫) যে সকল সমাজপতি ঐ সকল জাতির নেতা হইয়া ঐ সকল দুগ্ধব্যবসায়ীকে সমাজদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অল্প বিস্তর 'গোরস' পান করতঃ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেন (৬) যে সকল ভূস্বামী ঐরূপ ফুকা দেওয়া দুগ্ধ-ব্যবসায়ী প্রজাকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াও তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া প্রকারান্তরে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন (৭) যে সকল জমিদার ভাগাড় ও গোচারণ ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রজা বিলি করেন (৮) যে সকল প্রজা উক্ত ভাগাড় ও গোচর-ভূমি জমা করিয়া লইয়া কর্ষণ করে (৯) যে সকল ব্রাহ্মণ উপরোক্ত আট প্রকার কসাইগণের পৌরহিত্য করেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাদিগকেই কসাই বলা যায়।

যে সকল মুসলমান, গৃহস্থ ভুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় গরু বদল করে ও খরিদ করে এবং গোঁপ দাড়ি কামাইয়া হিন্দু সাজিয়া বাহির হয়, তাহাদিগকে কোরাঙ্গা কহে। ইহারা গৃহস্থকে বলে "আমরা গাভী দেশে লইয়া গিয়া গর্ভিণী করিয়া পুনরায় বেশী দরে বিক্রয় করি; আমাদের এইরূপই ব্যবসায়, আমরা কখনও কসাইকে গরু বিক্রয় করি না"। স্থল বিশেষে ইহাদের হিন্দু দালাল আছে, তাহারা উহাদের সাপক্ষে সাক্ষি দিয়া সাধারণ লোককে প্রতারিত করে। উদাহরণ স্বরূপ হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বে 'সদি গোয়ালিনী' একজন দালালনী আছে এবং তারকেশ্বরের অন্তর্গত দশঘরা গ্রামের

সন্নিকটে ছানা ব্যবসায়ী ভুলো গোয়লা একজন দালাল, এই দুটি স্থানীয় লোকের বিশেষ পরিচিত, এক্ষণে গোয়লা ভিন্ন অপরাপর বহু জাতির এই প্রকার ব্যবসায় আছে; কিন্তু সকলেই গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। জানিতে চেষ্টা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এইরূপ দালাল সর্ব্বব্যাপী। বিলাতে যে গাভী প্রসব হইলে ৪।৫ সের দুগ্ধ দেয় এবং যে ষণ্ড উপযুক্ত এবং বলবান তাহাদিগকে কসাইকে বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই। বিলাতেও কেহ ঐরূপ গাভী কসাইকে বিক্রয় করিলে কিংবা হত্যা করিলে, তাহার প্রতিবাসী কিংবা আত্মীয় স্বজন ঐ বিক্রয়কারী এবং হত্যাকারীকে এরূপ ভাবে পীড়ন করে যে সে ঐরূপ কার্য্য কখনও করিতে সাহস করে না। আর এই কৃষী প্রধান ভারতে যাহাদের শাস্ত্রে গোহত্যা সর্ব্বোচ্চ পাতক বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে লেখা, তাহাদের গোরক্ষার কিছুমাত্র যত্ন নাই। হায়! দেশের সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ও কৃতবিদ্য সম্প্রদায়গণ সকলেই স্বার্থান্ধ অথচ মুখে বলেন—আমরা কেবল দেশের হিতের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেছি; তাহা না হইলে দেশের এই ভয়ানক সর্ব্বনাশ স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াও কেন তাহারা মূকের স্থায় অবস্থান করিতেছেন?

যাহা হউক এক্ষণে যাহাতে গোবংশের বৃদ্ধি হয় ও আর ধ্বংস হইতে না পায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের শীঘ্রই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণ যাহাতে কসাইগণকে গরু বিক্রয় না করে, তজ্জন্য তাহাদের প্রতিবাসী, রাজা, মহাজন স্বজাতি কুটুম্ব, মণ্ডল গুরু এবং পুরোহিত প্রভৃতি সকলের স্ব, স্ব, ক্ষমতা অনুযায়ী বাধা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা, না করিলে তাহাদিগকে অবশ্যই মাতৃহত্যা ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে গোচারণ ভূমির প্রতিষ্ঠা ও গোপ্রতিপালনে সক্ষম হয় তজ্জন্য সভাসমিতির দ্বারা শীঘ্রই গভর্ণমেণ্টকে জানান উচিত। ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক সংবাদ পত্র সম্পাদক এ বিষয়ের জন্য প্রতি সংখ্যায় তীব্র আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাজনদিগের প্রতি চালানে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদিতে গোবৃত্তি আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়া স্ব স্ব গ্রামে গোচারণ ভূমিখরিদের নিমিত্ত নানা উপায়ে শীঘ্রই অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করা উচিত। যাঁহারা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ ক্ষেত্র যান কিংবা অন্যান্য তীর্থ দর্শনে যান, তাঁহাদের নিজ গ্রামে গোচারণ ভূমি প্রদান করা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

আশা করি দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহার আরও প্রকৃষ্ট উপায় শীঘ্র নির্দ্ধারণ করিবেন।

মনুসংহিতায় মহামুনি মনু গোচারণের নিমিত্ত ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা :—

ধনুঃ শতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যা পাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু॥

মনু ৮ম অঃ ২৩৭ শ্লোক।

অর্থাৎ গ্রামের চতুর্দ্দিকে অন্যূনপক্ষে চারি শত হস্ত পরিমাণ ভূমি গবাদি চারণার্থ রাখিবে, অথবা যষ্টিত্রয় একটি যষ্টি অতি বেগে নিক্ষেপ

কড়িতেযতদূর যায়. তাহার ত্রিগুণ পরিমিত স্থান চতুর্দ্দিকে রাখিবে। বহু জন সমাকীর্ণ নগরে ইহার তিনগুণ স্থান রাখিবে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামে ও প্রতি নগরে এইরূপ পরীহার ভূমি ছাড়া ছিল, এক্ষণে এই ইংরাজ শাসনাধিকারে জমিদারি প্রথার পর হইতে জমিদারগণ ভবিষ্যতের বিষয় কিছুই না ভাবিয়া কেবল উপস্থিত লাভের আশায় ক্রমশঃ ঐ সকল পরীহার ভূমি প্রজা বিলি দ্বারা বাজেয়াপ্তা করিয়াছেন। অতএব যে পর্য্যন্ত না মনু প্রোক্ত যথেষ্ট পরিমাণ পরীহার ভূমি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পুনঃ সংস্থাপিত হয়, সে পর্য্যন্ত সকলেরই উদ্‌যোগী হওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহার নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র প্রতিকার হইতে পারে, সংবাদপত্রাদিতে সকলেরই তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কেবল দুগ্ধব্যবসায়ীগণের উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ইহার কোন প্রতিকার হইবে না। তাহাদের উপর কেবল এই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে গোবৎস সকল তাহারা কসাইকে বিক্রয় না করে এবং মাতৃদুগ্ধ পান করিতে না দিয়া গোবৎস সকলকে মারিয়া না ফেলে; গাভী সকলকে ফুকা দিয়া দুগ্ধ বাহির না করে. গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ নিষ্ঠুরতাময় ঘৃণিত প্রথার নিবারণ করা প্রায় দুষ্কর হইয়াছে, পশু-ক্লেশ-নিবারিণী সভা, যাহা গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছেন—তাহা কেবল একদেশদর্শী, কেননা দুগ্ধ ব্যবসায়িগণ অনুদিন, প্রসূত গোবৎসগণকে কসাইকে বিক্রয় করে এবং কেহ কেহ সমাজ দণ্ডের ভয়ে বিক্রয় করিতে না পারিয়া দুগ্ধ পান করিতে না দিয়া অনাহারে রাখিয়া যে মারিয়া ফেলে এই নিষ্ঠুর এবং ফুকা দিবার নির্ম্মম ব্যবহার প্রচলিত আছে সেগুলি উক্ত সভা পশুর ক্লেশের মধ্যে গণ্য করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত নিষ্ঠুরতা দমন করা তাঁহারা আদৌ সর্ব্বজাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনেও করেন না। ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জেরই এ বিষয়ে শীঘ্রই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ঘৃত দুগ্ধাদির কৃত্রিমতা, মহার্ঘতা ও অভাবের নিমিত্ত সকল শ্রেণীর সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যগণকেই—যে সমভাবে কষ্টভোগ করিতে হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

চন্দ্রের নামে পুরাতত্ত্ব।

সেদিন রবিবর্ম্মা প্রেসে অঙ্কিত চন্দ্রের একটী চিত্র আমার একটী পুত্র আমাকে আনিয়া দেখাইল। চিত্রটীর কল্পনাতে একটী গভীর ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই যেন উহা আমার নিকট বিশেষ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। চিত্রটীর কল্পনা এই—নীলাভ আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিকট তারকা সকল ফুটিয়াছে, আর মেঘ রাজ্যের উপর দিয়া মনোহর কিরীটভূষণ-কণ্ঠ বিলম্বিত উজ্জ্বল মুক্তাহার, দীপ্ত কুণ্ডলকর্ণ, শোভন পরিচ্ছদ, মোহন মূর্ত্তি, চন্দ্রদেব রশ্মি ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসার মৃগ বাহিত শকট চালনা করতঃ সেই অর্দ্ধ চন্দ্রেরই উপর আসিয়া উঠিয়াছেন।

এই চিত্র দেখিয়া উত্তর কুরুবাসী আর্য্যদিগের ষন্মাসব্যাপি শীতকাল রূপ রাত্রিতে, চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হিম রাশির উপর মৃগ বাহিত শকট যোগে পরিভ্রমণের দৃশ্যই যেন আমার মনশ্চক্ষুতে প্রতিভাসিত হইল। বর্ত্তমানের মেরু প্রদেশ বাসিদিগের শ্লেজ (Sledge) শকটে বরফ রাশির উপরে বল্‌গা হরিণ (Rein Deer) বাহিত হইয়া ভ্রমণে কি পূর্ব্বোক্ত দৃশ্যেরই স্পষ্ট আভাস প্রদান করে না।

কেবল যে পূর্ব্বোক্ত চন্দ্র চিত্রের কল্পনা হইতেই আমরা আর্য্যাদিগের উত্তর কুরুবাসের অনুমান করিতে পারি—তাহা নহে, কিন্তু চন্দ্রের নামেও আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের যথেষ্ট অবলম্বন প্রাপ্ত হই। চন্দ্রের "মৃগধর" "মৃগাঙ্ক" নামে বর্ত্তমান উত্তর মেরুবাসিদিগের মৃগ সম্বন্ধেরই ন্যায় উত্তর কুরুবাসী আর্য্যদিগের ও মৃগ সম্বন্ধেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। হিমপ্রধান উত্তর কুরু প্রদেশ বাসের সময় মৃগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ দ্বারা 'মৃগধর' 'মৃগাঙ্ক' নামের যেরূপ সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ আর অন্য কোন রূপেই পাওয়া যাইতে পারে না।

চন্দ্রের সহিত হিম প্রদেশে মৃগ সম্বন্ধের ন্যায় হিমের সহিত সম্বন্ধেরও যথেষ্ট নিদর্শন ইহার অপর দুইটী নামেও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী নাম "হিমাংশু।" নামের অর্থ যাহার কিরণ হিমগুণযুক্ত। যেখানে বিশেষ রূপে হিমের প্রাদুর্ভাব সেখানেই হিমগুণের অভিজ্ঞতা হইতে হিমাংশু নামের কল্পনা সম্ভবপর হয়। সুতরাং হিম প্রধান দেশের হিমের সহিত চন্দ্র কিরণের তুলনা হইতেই যে "হিমাংশু" নামের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। "হিমাংশু" নামের অনুরূপ চন্দ্রের যে আর একটী নাম আছে তাহার সহিত ইহার তুলনা করিলেও আমরা ইহার উৎপত্তি তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত অনুমান যে মূলহীন নহে—তাহা বুঝিতে পারি। চন্দ্রের সেই নামটী "শীতগু"। গো শব্দের অর্থ কিরণ। সুতরাং "শীতগু" শব্দের অর্থ, শৈত্যগুণ বিশিষ্ট কিরণ যাহার'। এস্থলে আমরা 'হিমও' 'শীত' শব্দের মধ্যে অর্থ ভেদই বিশেষ রূপে লক্ষণীয় বলিয়া মনে করি। হিম শব্দের দ্বারা যতটা শৈত্যের ভাব প্রকাশ পায় "শীত" শব্দের দ্বারা তদপেক্ষা অনেক কম প্রকাশ পায়। শৈত্যের যে মাত্রা দ্বারা জল জমিয়া বরফ হয়, বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুষার পাত হয়, উন্মুক্ত দেহে থাকিলে শরীরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়, তাহাই হিমের অবস্থা তাহাতেই তুষারের নাম হিম ও বরফের নাম হিমানী "হিমসংহতি" হইয়াছে। শরীর সম্বন্ধে 'হিম' শব্দের প্রয়োগ করিলে আমরা যেরূপ তাপের একান্ত অভাব বুঝি, শীতল শব্দের প্রয়োগে তেমন বুঝি না। মৃত্যুর সময়ে শরীরের উত্তাপ একেবারে চলিয়া গেলে, আমরা বলিয়া থাকি "শরীর হিম" হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জ্বরের উত্তাপ ছাড়িয়া গেলে আমরা বলিয়া থাকি "শরীর এখন শীতল" হইয়াছে, ইহা হইতেই হিম ও শীত (শীতল) শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের হিমালয়

পর্ব্বতের নামে আমরা হিম শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থই যোগ দেখিতে পাই। আমরা জানি যে হিমালয়ের শিখর দেশ চিরতুষারাচ্ছন্ন থাকে, তাহাতেই এই তুষারের হিম নাম হইতেই ইহার "হিমালয়" নাম হইয়াছে।

বেদে আমরা শীত ঋতুর নাম প্রাপ্ত হই না, ইহার 'হিম' নামই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাতে তৎকালে যে শীতে জল বরফে পরিণত হয়, শিশির তুষারে পরিণত হয়—সেইরূপ তীব্র শীত অর্থাৎ হিমরূপ শীত বর্ত্তমান ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। উত্তর কুরু প্রদেশেই শীতের এরূপ অবস্থা সম্ভবপর বলিয়া তথারই যে শীতের প্রথম "হিম" নাম উৎপন্ন ও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। উত্তর কুরু প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকের উষ্ণপ্রদেশে উপস্থিত হইলে তথায় শীতের মৃদুতা অনুভব করিয়াই হিমের মৃদুতাবাচক 'শীত' ঋতু নাম প্রদান করেন। এইরূপেই 'শীত ঋতু' বা 'শীতকাল' শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান 'হেমন্ত' ঋতুর নামে আমরা আর্য্যদিগের পূর্ব্বের হিম ঋতুর নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাই।

এক্ষণে চন্দ্রের হিম সম্বন্ধ-বাচী অপর নামটীর আলোচনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব। সেই নামটী 'হিম'। উত্তর কুরুতে ছয় মাস ব্যাপী শীতকালে যখন সূর্য্যদেব সম্পূর্ণ রূপে অদৃশ্য থাকিতেন, তখন কেবল চন্দ্রই বিরাজমান থাকিত। এই প্রকারে চন্দ্রের সহিত শীতকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতেই শীতের হিম নামে ইহার "হিম" নাম হইয়াছে। উত্তর কুরু-প্রদেশের শীত ঋতু যে "হিম" নামে বেদে অভিহিত হইয়াছে—তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই হিমের সহিত অভিন্ন করিয়া যে চন্দ্রের হিম নাম কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই হিম ঋতুর সহিত চন্দ্রের এক সময়ে সবিশেষ সংযোগের যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনই উত্তর-কুরু প্রদেশের সহিত ইহার বিশিষ্ট যোগেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বনাম খ্যাত প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ও লেখক এডিসন (Addision) একস্থলে প্রতিরাত্রে চন্দ্র পৃথিবীকে তাহার জন্ম কথা শুনাইয়া থাকেন বলিয়া লিখিয়াছেন যথা ;—

"Soon as the evening shades prevail,
The moon takes up the wondrous tale,
And nightly to the listening earth,
Repeats the story of her birth."

বস্তুতঃ ইংরেজি moon শব্দ ও ইহার অনুরূপ চন্দ্রবাচক মাস (চন্দ্রমা) শব্দদ্বয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে এবং ইহার সহিত কালবাচক month মাস শব্দের যোগের কথা বিবেচনা করিলে, পৃথিবীর সময় বা ইতিহাসের সহিত চন্দ্রের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। চন্দ্রমাস্ বা মাস্ শব্দে যেমন চন্দ্রের সহিত সময়ের যোগের ইতিহাস পাওয়া যায়,তেমনই চন্দ্রের 'হিম' নামে হিম বা শীত ঋতুর সহিত ইহার বিশেষ যোগের ইতিহাস পাওয়া যায়, লাটীন ও ইংরেজি শীত ঋতুবাচক Hiemo শব্দে যে 'হিম' শব্দের অবিকল রূপই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই শীত ঋতুর নাম যখন "হিম" হয় এবং

তদ্যোগে চন্দ্রেরও "হিম" নাম হয়—তখন যে আর্য্যগণ একত্র বাস করিতেন এবং উত্তর কুরুরই ন্যায় শীত প্রধান দেশে বাস করিতেন, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং চন্দ্র যেমন পৃথিবীর জন্মের পুরাতত্ত্বজ্ঞ, তেমনই আর্য্যদিগের আদি সময়ের ও উত্তর কুরুবাসেরও যে সাক্ষী—তাহাই উপরি উক্ত আলোচনা হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীশীতল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি এম,এ।

দারিদ্র্য ও প্রতিভা।

'নির্ধনত্ব মহারোগ মদনুগ্রহলক্ষণঃ।'

আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন—দারিদ্র্যই প্রতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। কত প্রতিভাকুসুম দারিদ্র্যের তপ্ত বায়ু স্পর্শে কোরকেই বিশুস্ক হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। দারিদ্র্যের পীড়ন না থাকিলে সেই সকল কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধ বিস্তারে দেশ মাতাইয়া তুলিত। অতএব দারিদ্র্যই প্রতিভা বিকাশের চিরশত্রু। সর্ব্বাগ্রে দারিদ্রের শিরে লগুড়াঘাত করিতে না পারিলে প্রতিভার আর নিস্তার নাই। ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদিগের ধারণা ঠিক অন্যরূপ। আমরা জানি ও শুনিয়াছি 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশি" কিন্তু গুণ কখন প্রতিভা হইতে পারে না। গুণ নীতি ও রীতির কথা, প্রতিভার কথা নহে। গুণ ও প্রতিভায় প্রভেদ আকাশ পাতাল। রাশি রাশি গুণ পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিলে, জমাট বাধিয়া গেলে তবে প্রতিভার স্তর পড়িতে সুচনা হয়। প্রতিভা একবার সঞ্জাত হইলে উহার আর বিলোপ সাধন হয় না। উহা ঘণীভূত হইয়া ধর্ম্মমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে এবং জীবকে শিবে যুক্ত করে। জীবের শক্তি অন্তর্মুখী হইতে সুচনা না হইলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। প্রতিভা ভগবৎ-কৃপা। সমস্তই ভগবানের কৃপা হইলেও, ইহা একটী অসাধারণ কৃপা। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ বলিলে আমরা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত জীবকে বুঝি। এবং সে অনুগ্রহ দারিদ্র্যের স্থূল মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই অবতীর্ণ হয়। ভগবান বলিয়াছেন—"নির্ধনত্ব মহারোগ মদনুগ্রহলক্ষণঃ।"

জীবশক্তি যতদিন মূলাধার নামক চক্রে পরিপূর্ণ হইতে থাকে, ততদিন জীব মনুষ্যত্ব লাভ করে না। মূলাধার চক্র শক্তি প্রবাহে পরিপূর্ণ হইলে তবে জীব মানুষ হয় এবং সেই শক্তি পুনরায় যখন অন্তর্মুখে উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই সেই জীব প্রতিভাশালী হয়; যখন সুচারুভাবে উত্থিত হয়, তখন জীব যোগী হয়। ইহাই শক্তি-রহস্য। মূলাধারে এই জীব শক্তি যখন উঠিতে আরম্ভ করে, তখন বহিঃশক্তির সঙ্কোচবশতঃ দারিদ্র্যাদি বিবিধ প্রকার উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা চিরবদ্ধ নিয়ম, এ নিয়মের অপলাপ হয় না।

প্রতিভা সামান্য জিনিষ নহে। কয়েকখানা পুস্তক বা নাটক নভেল লিখিলে বা দুইটা কলকব্জা তৈয়ারি করিলে, কি সভায় দাঁড়াইয়া দুই ঘণ্টা কাল অঙ্গভঙ্গি করিয়া উচ্চ গলায় বক্তৃতা করিলে কিংবা আকাশে জাহাজ

উড়াইলে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি গুণের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

শুধু ইহা নহে। অভাবই আবিষ্কারের মূল। অভাব বোধ না হইলে উদ্দীপনা আসে না, উদ্দীপনা না আসিলে উদ্যম আসে না এবং উদ্যম না আসিলে সিদ্ধি হয় না। আমাদের দেশের যে সকল লোক পাশ্চাত্য দেশের ধন-সম্পদ দেখিয়া সেই দেশকে ধনী দেশ বলিয়া বোঝেন এবং তাঁহাদেরই কার্য্যকর্ম্ম, আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে অসাধারণ মনে করেন এবং তাঁহাদের উপদেশগুলিকে শিরধার্য্য করিয়া সকল বিষয়েই তাঁহাদের অনুকরণে যত্নবান হন, তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত যে দেশে অর্থ রাশি সঞ্চিত হইলেই দেশ ধনী হয় না। দেশের প্রকৃতি ধনী হওয়া চাই। ধন-সম্পদ মানুষের কল্পনা কৌশলে, মেধাশক্তির বলে উপার্জ্জিত হয় মাত্র তাহাকেই কেবল প্রতিভা বলিলে চলিবে না, তাহা ঠিক প্রতিভাও নহে, বিশিষ্ট গুণ মাত্র। তাহা হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধাজনক উপায় ভিন্ন আর কিছু নহে। ধন দেশে জন্মায় কিন্তু কেবল তাহাতেই মানুষ তৈয়ারি করিতে পারে না। যে দেশের প্রকৃতি ধনী সেই দেশকে ও সেই দেশবাসীকেই ধনী বলা চলে। ভারতবর্ষ যথার্থ ধনী-দেশ। একদিন পাশ্চাত্য জগতের আদর্শ স্থানীয়া মার্কিন রমণী ম্যাডাম ব্লেভেটাস্কি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন। অর্থের অভাবে প্রতিভার উপর ছাপ থাকে না, গুণের বিকাশ ছাপা থাকিতে পারে। সেইজন্য স্বতঃই এ দেশের লোক আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য সহজেই অনুভব করিত ও প্রতিভা সম্পন্ন হইত। জীবিকার দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহারা তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বরং প্রতিভা বিকাশের অধিক সুযোগ পাইত। ভারতবর্ষের যাবতীয় সাধকবৃন্দই ইহার প্রমাণ স্থল, তাই প্রতিভা একমাত্র ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রায় হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবম পত্র।—বর্ণনায় রূপকের আড়ম্বর করিয়া বটে, স্বীয় মতের পোষকতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও বটে, আমি পূর্ব্ব পত্রে আরব্ধ কাহিনীর উপসংহার করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। যে মধুর ভাব পত্রে প্রস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছিলাম, সেই মধুর ভাবের অনুভবে বিমুগ্ধ হইয়া প্রায় একপ্রহর প্রাঙ্গনের উপর বসিয়াছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যৌবন-কান্তিমতী কোনও রমণী বেত্র নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ করে গ্রহণ করিয়া বালকদ্বয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছেন দেখিলাম। বালকদ্বয় একই স্থানে পূর্ব্ববৎ বসিয়াছিল। রমণী বালকদ্বয়ের সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বেই আবেগ-ভরে বলিলেন,—"আহা ফিলিপ, আমার বড় সুবোধ!" অনন্তর, রমণীর দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইলে, আমি কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ভদ্রে! এই সুকু-

মায় বালকদ্বয় কি আপনারই সৌভাগ্যের নিদর্শন ?" রমণী অনুরূপ উত্তর দান করিয়া, পরক্ষণে বালকটীর হস্তে একটা মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন এবং শিশুটীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত হইয়াই তাহার মুখচুম্বন করিলেন। পরে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বালকটীকে শিশুর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কিঞ্চিৎ ময়দা, চিনি ও শিশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এই মৃৎ-পাত্রটী ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বড় দুরন্ত। এর অনুরূপ পাত্রটী সে কাল ফিলিপের সহিত বিবাদ করিতে করিতে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি পাত্র মধ্যে কয়েকটী মিষ্টান্ন রাখিয়াছিলাম—সেই মিষ্টান্ন লোভে উহারা পাত্র লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার সে পুত্রটী এখন কোথায় ?" রমণী বলিলেন,—"সে হয়ত এমন মাঠ হইতে হংসগুলি লইয়া গৃহে ফিরিতেছে।" রমণীর কথা শেষ হইতে না হইতে একটী বালক মাঠের উপর দিয়া লম্ফে ঝম্পে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছে,দেখিতে পাইলাম। তখন অনুমানে বুঝা গেল—এইটীই রমণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার হস্তে একটী বেত্র ছিল। সে, বোধ হয়, ভ্রাতার জন্য বেত্র গাছটী সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিল ; কারণ, আসিবা মাত্র, উহা ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিল। কথা প্রসঙ্গে রমণী আমাকে বলিলেন,—"এই গ্রামের গুরুমহাশয় আমার পিতা। আমার স্বামী তাঁর পিতৃব্যের মৃত্যুর পর বৈষয়িক সম্পত্তি উদ্ধারের আশায় হলাণ্ড দেশে গিয়াছেন। প্রথমে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি কয়েক খানি পত্র লেখেন। কিন্তু, যখন পত্রের উত্তর প্রত্যাশা করিয়া একবারে নিরাশ হইলেন, তখন স্বতঃই তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য অবশ্য কোন চক্রান্ত হইতেছে। তখন, সেই সন্দেহে নিজ উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করিয়া, হলাণ্ড যাত্রা করিলেন। তদবধি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।" এই অসন্দিগ্ধস্বভাবা রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় আমার অন্তর ব্যথিত হইতে লাগিল। "মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া শিশুকে দিবেন" এই বলিয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড মুদ্রা ও বালকদ্বয়কে এক একটী মুদ্রা দিয়া, রমণীর নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম। সখা! এইরূপ সুখের জীবন দর্শন করিলে আমার ন্যায় অশান্ত চিত্তের যে প্রতীকার সাধিত হয়, জগতের অন্য কিছুতেই চিত্তের সেরূপ স্থিরতা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। স্বল্পপরিসর অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ এইরূপ রমণীর জীবন কি শান্তি, কি নিরুদ্বেগে পরিচালিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমানে নিমগ্ন থাকিয়া ইনি অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। ঘূর্ণিত কাল চক্রের অবিরাম গতি ইহার ভাবস্রোতের বিঘ্ন উৎপাদনেও সমর্থ নহে। যখন বৃক্ষ শাখা হইতে গলিত পত্ররাশি নিপতিত হইতে থাকে, তখন ঋতুরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এই ভাব মাত্র তাঁহার অন্তরে উদিত হয়, তদতিরিক্ত কোনও ভাব উদিত হয় না।

ইহার পর আমি বহুবার ঐ স্থানে গিয়াছি।

বালকেরা এখন আমার বড় ঘনিষ্ঠ। প্রাতঃকালে যখন কাফি পান করি, তাহারা আসে—আমি তাহাদিগের হস্তে একটু একটু চিনি দিই। রাত্রিতে যখন আহার করি, তখনও তাহারা আসে, আমি তাহাদিগকে কোনও দিন একটু রুটী, কোনও দিন একটু দুগ্ধ দিই। প্রতি রবিবারে আমি তাহাদিগকে এক একটী তাম্র মুদ্রা দিই। আমি ভজনগৃহে প্রবেশ করিয়া উপাসনায় নিরত থাকিলে, তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যায়; এজন্য, সেই বিপণির বৃদ্ধা যেন তাহাদিগকে এক একটী তাম্র মুদ্রা দেয়, এরূপ বলিয়া দিয়াছি। বালকেরা তাহাদের সরল হৃদয়ের সকল ভাবই আমার নিকট প্রকাশ করে, তাহাদের সকল অভাব অভিযোগ আমার কর্ণগোচর করে—তাহারা ভাবে আমিই তাহাদের অতি নিজ-জন। একদিন, ইহাদের মা, ইহারা আমাকে বিরক্ত করে কি না জানিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম—বালকগণের ব্যবহারে কে প্রীতি লাভ না করিয়া থাকিতে পারে। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলাম, তিনি যেন বালকদিগকে কিছুমাত্র সংযমিত না করেন এবং তাহাদিগকে বাল-সুলভ আনন্দ পূর্ণ মাত্রার অনুভব করিতেদেন। রমণী আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

—০—

দশম পত্র।—পূর্ব্বে চিত্র সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, কাব্য সম্বন্ধেও সেই কথা। সৌন্দর্য্যের ধারণায় সেই অনুভূত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার উপযোগিনী ভাষা—কবিতার প্রধান উপকরণ। আজ কি সুন্দর দৃশ্যই উপস্থিত হইয়াছিল! ইহা মনোহারিণী কাব্যগাথারই উপযুক্ত। কিন্তু কাব্য বা গীতিকারই উল্লেখ করি কেন? প্রকৃতির প্রত্যেক মনোহর বিষয়ই যে কাব্য বা ছন্দে গ্রথিত করিতে হইবে, এমন কোন অলঙ্ঘ্য কারণ দেখি না।

এরূপ ভূমিকা দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন আমি কোনও উচ্চ বর্ণনীয় বিষয়ের অবতারণা করিতেছি,তাহা হইলে নিরাশ হইবেন। কেননা আমার প্রীতিকর বলিয়াই জনৈক গ্রাম্য যুবক আমার এ প্রসঙ্গের বিষয়। আমি চিত্রের আভাস মাত্র দিব কেননা, ইহাই আমার রীতি। তথাপি, তুমি চিত্রে যেমন অতিরঞ্জনই দেখ, সেরূপ ইহাতেও হয়ত অতিরঞ্জন দেখিবে—বলিবে,ইহাও এই ওয়ালহিমপ্রদেশের কোনও স্বপ্নময় চিত্র। গ্রামের কয়েকজন মিলিত হইয়া ভজনমন্দিরের সংলগ্ন অঙ্গনে বৃক্ষচ্ছায়ায় কাফি পানের আয়োজন করিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গ আমার আসক্তিকর না হওয়ায় আমি আহূত হইয়াও তাহাদের দলে যোগ দিই নাই। আমি মাঠে বেড়াইতেছিলাম। একদিন যে লাঙ্গলের উপর বসিয়া চিত্রাঙ্কণ করিয়াছিলাম আজ তাহা, ভগ্ন ও ব্যবহারের অযোগ্যভাবে পতিত দেখিয়া, পল্লীবাসী কোনও যুবক তাহার সংস্কার করিতেছিল। ইহা দেখিয়া আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। যুবকের সৌজন্যময় ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলাম। কথোপকথনে উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিল।

যুবকের অবস্থা জিজ্ঞাস্য হইলে যুবক মুক্তকণ্ঠে স্বীয় কর্ত্রীর প্রশংসাগান করিয়া অবশেষে তিনি বিধবা একথাও বলিল। আমি বুঝিলাম—যুবক স্বীয় অবস্থায় দাসত্বের ভাব অনুভব করে না বরং সে অবস্থায় সে সন্তুষ্ট। যুবকের মুখে শুনিয়া বুঝিলাম তাহার কর্ত্রী যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন। এ কারণ, বিশেষতঃ দাম্পত্য জীবনে স্বামি-সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বৈধব্যব্রতেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। রমণীর প্রসঙ্গ কালে সেই যুবা হৃদয়ের কত আপনার অনুরাগময় নিদর্শন ব্যক্ত হইয়া পড়িল;—সেই অজ্ঞাত-ভর্তৃস্নেহা রমণীর জীবন নূতন সুখের পথে প্রবাহিত করিতে সেই যুবা-হৃদয়ের কত অভিলাষ ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সে প্রণয়ী-হৃদয়ের অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, যুবকের মুখের সকল কথারই আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি কালে তাহার বদনের ও সেই নয়নদ্বয়ের অপূর্ব্ব ভাব কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? কল্পনাবিলাসী কবিই কেবল সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ। নিরর্থক বর্ণনায় আমি প্রবৃত্ত হইব না। সখা! কল্পনার আশ্রয়ে আমার লিপিচাতুর্য্যের বহির্ভূত সেই অনুরাগের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লও।

স্বীয় অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়া যেন রমণীর গৌরব ভঙ্গ করিয়াছে—ইত্যাকার আশঙ্কায় যুবক ব্যাকুল হইল। আমি রমণী-চরিত্রের কোন দোষদর্শী না হইতে পারি, এজন্য যুবক এমন অকৃত্রিম প্রেমের উচ্ছ্বাসে সেই রমণীর গরিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল যে তাহা এখনও স্মরণ করিলে পুলকিত হইতে হয়। উপসংহারে যুবক বলিল, "রমণী যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যৌবনের লাবণ্য এখনও সে দেহে একটু মাত্রও মলিন হয় নাই!" এরূপ অকপট প্রণয় আমি পূর্ব্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। অথবা উদার হৃদয়ে অনুরাগ সম্ভবতঃ এরূপই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই অনুপম কোমলতা ও অনুরাগের নিদর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম—সখা! এ কথা শুনিয়া আমাকে উপহাস করিও না। সেই প্রণয়ী-যুবকের অনুরাগের সরল বর্ণনা আমার মর্ম্মে এমনই প্রবেশ করিয়াছে যে, মনে হয়—তাহার সেই অনুরাগ বুঝি আমাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। মনে হয়—যে প্রেমে সে উন্মত্ত, সে প্রেমের আমিও প্রেমিক হইয়াছি। যুবকের মনোহারিণী এই রমণীকে দেখিব—কোন্ অবসরে দেখিব ইহাই ভাবিতেছি। কিন্তু হয়ত, আমার পক্ষে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করাই অধিকতর বিবেচনার কার্য্য হইবে। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনায় এমন মোহকর হইয়াছে—চর্ম্মচক্ষে সে সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে, বোধ হয়, আর তাহা তেমনটী থাকিবে না। প্রেমিকের মোহময়ী দৃষ্টিতে যে মাধুরী স্তম্ভিত হয়, সাধারণ দৃষ্টিতে সে মাধুরী দর্শনের সম্ভাবনা অল্প। আমি ত সে প্রণয়ীর নয়ন দুইটী লাভ করি নাই,—তাহার চিন্তার অধিকারী হইয়াছি এই মাত্র। একবার সেই রমণীকে চক্ষে দেখিলে,—যে সৌন্দর্য্যের চিত্র এখন কল্পনায় দেখিতেছি—সে কল্পনার

চিত্র বিলীন হইবে। তৎসহ কল্পনার সুখও অবসান হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীললিতমোহন মিত্র বি-এ।

—০—

পুষ্পবতী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা।

পুষ্পবতী উদ্যান বাটীকায় একটি ঘরে বসিয়া কতকগুলি ফুল গুছাইতেছে। নানারূপ পুষ্প স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়াছে—বালিকা এক এক স্তর হইতে এক একটি লইয়া সূত্র দ্বারা মালা গাঁথিতেছে! মাল্য অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে—একটি সাদা ফুল, একটি লাল ফুল, একটী নীল ফুল, একটি পীতবর্ণের ফুল বালিকা এই ভাবে মালা গাঁথিয়া আনন্দ বোধ করিতেছে ও নিজে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মালা গাঁথা শেষ হইলে সে একবার ভাল করিয়া দেখিল, একবার নিজ গলায় পরিল, তারপর খুলিয়া লইয়া হস্তে করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। এ মালার যোগ্য কে? এ মালা কাহার গলায় শোভা পায়? তাহাই পুষ্পবতী ভাবিতে লাগিল! সেই ঘরে নানারূপ তৈলচিত্র শোভা পাইতেছিল, দেখিল একখানি রাজা অজয়সিংহের ছবি মধ্যেস্থলে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; বালিকা মনে করিল এ মালা এই গলার উপযুক্ত কারণ তিনি তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ত এই সামান্য জিনিস উপহার দেওয়া যাইতে পারে। শুধু কি কৃতজ্ঞতা? বালিকা নিজের হৃদয় বুঝিল না, কৃতজ্ঞতা হইতে যে প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না। বালিকা চারদিকে একবার দৃষ্টি করিল, দেখিল কেহ কোথাও নাই, তখন সে এত যত্নের মালা গাছি রাজার ছবির গলায় ঝুলাইয়া দিল, অমনি কে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল; পুষ্পবতী দেখিল—দুষ্ট লীলাবতী পশ্চাতে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। পুষ্পবতীর গণ্ডস্থল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লীলাবতী বলিল—বা বা গন্ধর্ব্ব বিয়ে হ'ল দেখ্‌ছি। আর ছবির সঙ্গে কেন? রাজাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বো?" পুষ্পবতী বলিল—তোর কাজ থাকে ডেকে আন্। আমার ত দরকার নাই। লীলাবতী বলিল—তা বেশ বুঝেছি, ছবিটার উপরই বুঝি অনুরাগ। ভালইত কোন গোলমাল নাই।" পুষ্পবতী দৌড়াইয়া আসিয়া লীলার গলা ধরিয়া একটি চুম্বন করিয়া বলিল—চুপ, কেউ শুন্‌বে। লীলাবতী বলিল—শুনিলেই বা কি? তুই যদি তোর প্রাণ বেচা ব্যবসা করিস্, তোকে কে বাধা দিবে, আর সেই ব্যবসার জন্য লোকে যা ইচ্ছা বলুক। পুষ্পবতী কৃত্রিম ক্রোধে বলিল—তুই যা খুসী বলিস্. তোর সঙ্গে আর কথা বল্‌বো না। এবার লীলা হাসিয়া বলিল—আমার সঙ্গে কথা না বল্‌বো আমি মানময়ী রাধার মান ভাঙ্গিতে পায় ধর্‌বে না, যে পায় ধর্‌বে তার সঙ্গে মান করিস্। পুষ্পবতী লীলার নিকট পরাজিত হইল,

তারপর বলিল—সই! আমি হারলেম, এখন তোর যা খুসী বল্। লীলাবতী উত্তর করিল—এখন পথে আয়। বল্ দেখি দাদাকে ভালবাসিস্ কি না? পুষ্পবতীর মখখানি রক্তবর্ণ হইল সে, উত্তর করিতে পারিল না, লীলাবতীর বুঝিতে বাকী থাকিল না যে পুষ্পবতী ফাঁদে পড়িয়াছে। এমন সময়ে কে ডাকিল—লীলা! লীলাবতী দেখিল রাজা অভয়সিংহ দাড়াইয়া আছেন, তখন সে রাজার নিকট গিয়া বলিল—কি দাদা! রাজা বলিলেন—পুষ্পবতীর কোন কষ্ট হচ্ছে না ত? লীলা মৃদু হাসিয়া বলিল—পুষ্পবতীর কষ্ট হইলে তোমার বুঝি কষ্ট হয়! রাজা উত্তর করিলেন না, বালিকার কাছে এ বিষয়ের [illegible]তে লজ্জাবোধ করিলেন। পুষ্পবতী [illegible] এক কোণে লুকাইল। লীলাবতী বলিল—ও ভুলেছি, বাবা যে আমাকে ডেকেছিল, এই বলিয়া দুষ্ট বালিকা দৌড়াইয়া পলাইল। রাজা বড় বিপদে পতিত হইলেন, তিনি প্রকোষ্ঠ মধ্যে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—স্বর্গীয় দেবীর ন্যায় পুষ্পবতী দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়াছে, যেন তাহার কত মূল্যবান জিনিস আছে। অভয়সিংহ নিকটে গিয়া বলিলেন—পুষ্পবতী, তোমার ত কোন কষ্ট হয় নাই?" সেই স্বরে পুষ্পবতীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা হইল চিরকাল এই স্বর শুনে, কিন্তু কোন উত্তর করিতে পারিল না। অভয়সিংহ বলিলেন—যদি কোন অসুবিধা হয় তবে আমাকে বলবে। পুষ্পবতী এইবার বহু কষ্টে বলিল—না বেশ আছি, তবে মায়ের কোন খবর পেয়েছেন কি?" অভয়সিংহ বলিলেন—আমি লোক পাঠিয়েছি, সংবাদ এলেই তোমাকে জানাবো। পাগলিনী এসেছিল, সে বল্লে তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, বোধ হয় সে তোমার প্রকৃত পরিচয় জানে। আমাকে বল্লে যে, সময় মত পরিচয় পাবে। এ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে?" পুষ্পবতী এ কথায় কোন উত্তরই করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, সে বুঝিল রাজা তাহাকে ভালবাসেন, তাহার কি এমন ভাগ্য? চিরদিন কষ্টে লালিত পালিত, এখন কি সে সুখী হতে পারবে? রাজা বুঝিলেন—পুষ্পবতীও তাহাকে ভালবাসেন, তিনি পুষ্পবতীর হস্ত ধারণ করিলেন। পুষ্পবতী বলিল—কেউ দেখ্‌বে। রাজা বলিলেন—একবার বল আমার অদৃষ্টে এই সুখ আছে কি না? পুষ্পবতী উত্তর করিল না বটে কিন্তু তাহার চক্ষু রাজার দিকে ন্যস্ত হইল, রাজা তাহাতেই সদুত্তর পাইলেন। দুষ্ট লীলাবতী আড়াল হইতে সব দেখিতেছিল এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, রাজা পুষ্পবতীর হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। লীলা-গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—গন্ধর্ব্ব বিবাহ হয়ে গেল, ছবির গলে মালা দেওয়া হল, আর ভাবনা কি? আমরা সব আমোদ করে বেড়াবো। রাজা হাসিয়া বলিলেন—লীলা! তোকেও শীঘ্র আবদ্ধ করে দিচ্ছি, মথুরা সানকে এই রত্ন দিয়ে আমি সুখী হব। লীলা এবার ছুটিয়া পলাইল, রাজা ও বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীশ্যামলানন্দ বসু বি,এ।

—•—

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র।

কে তুমি গো দেবদূত, এসেছিলে এ মর ধরায় ?
ভাবে ভোর—ব্রহ্মানন্দ,একতন্ত্রী মধুরে বাজায়,—
একি নৃত্য! একি হাস্য! একি মহা হরিসঙ্কীর্ত্তন !
সচেতন ভাবে ভোলা,হায় ভাবে একি এ নর্ত্তন?
চিনেছি এবার তোমা,ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবের পূজারী ;
শাক্য, মহম্মদ, গোরা, ঈশাদাস তুমি ব্রহ্মচারী।
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যে তব মুগ্ধ আজ স্বদেশ বিদেশ,
যোগী,ভক্ত কর্ম্মী,জ্ঞানী,আনিলে কি স্বর্গেরসন্দেশ ?
হায়রে ভারত ! নারিলে সে ল'তে পরসাদ
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় ! ঘুচাইল বিরোধ বিবাদ !
নয়নে দেখিনি মূর্ত্তি, আপেক্ষ সে মহা অবসাদ
আজ আর কিছু নাই এই তুমি মিটাইলে সাধ।
ব্রহ্মানন্দ ! ব্রহ্মানন্দে আছি সদা হয়ে ভরপুর
ভুলে গেছি বিষাদের কথা—পুরাতন লয়-
তান-সুর।
থেমে গেছে কর্ম্ম-কোলাহল জগতের যা' কিছু
উৎপাত।
আজ তব শ্রীচরণে ব্রহ্মানন্দে করি প্রণিপাত

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

"বর্ষায় বঙ্গনারী।"

(১)

নিবিড় নীরদে আবৃত গগণ,
খেলিছে চমকি দামিনী সুন্দরী,
অবিরল ধারে বর্ষে বর্ষাবারি,
কড় কড় নাদে অশনি-পতন।

(২)

ওহো কি ভীষণ শব্দ শুনা যায়,
প্রকৃতি বিকৃতি অচল চঞ্চল,
উথলে কল্লোলে নদনদী জল
প্রভঞ্জন বলে তরু ভেঙ্গে যায়।

(৩)

কে কামিনী ওই বাঁস বাঁধা ঘাটে,
বসনে আবৃত সুচারু আনন,
হস্তে করি ওই মাজিছে বাসন,
বঙ্গনারী বলে এত কষ্ট ঘটে !

(৪)

ধন্য সহিষ্ণুতা—নাহি দুঃখলেশ,
ঝড় বৃষ্টি কত অতিক্রম করি,
সংসারের কার্য্য কত ধীরি ধীরি
করিয়া লভিছে মহিমা অশেষ।

(৫)

কর্দ্দমাক্ত পথ অত্যন্ত পিছলা,
বাম কাঁকে করি কলসী মৃন্ময়,
অতি সাবধানে ফেলি পদদ্বয়,
দুর্য্যোগে চলেছে বঙ্গের অবলা !

(৬)

সরসী সলিলে অবগাহি দেহ ;
বহুকষ্টে এবে কুম্ভপূর্ণ করি,
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা রূপ ধরি ;
চলেছে কাতরে সঙ্গে নাহি কেহ !

(৭)

তনে রন্ধন করি সমাপন,
তি পুত্র আদি যত পরিজনে ;
ভাজন করায়ে প্রফুল্ল পরাণে,
রিতৃপ্ত সদা বঙ্গনারীগণ !

(৮)

নিখুঁত প্রতিমা বঙ্গীয় রমণী,
পিতৃমাতৃ ভক্তি ভ্রাতৃ স্নেহশীলা ;
পতি প্রেমাকাঙ্ক্ষী স্বভাব সরলা,
ভারত-শ্মশানে-শান্তি স্রোতস্বিনী।

(৯)

মহিমা মণ্ডিতা রূপে করি আলো ;
তাতে যে ভারত গৌরব কিরণে ;
সে কেবল, ওই বঙ্গনারী গুণে ;
যাহার আদর্শ চির-সমুজ্জ্বল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

সাহিত্য-সমালোচনা।

রামের উইল।—শ্রীযুক্ত রামপদ ...ধ্যায় প্রণীত একখানি উপন্যাস। রামপদ বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত। রামপদ বাবুর উপন্যাস লিখিতে বেশ শক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার উপন্যাস যে এত মধুর হয়, তাহার কারণ দুইটী ; প্রথম কারণ তিনি প্রায়ই সত্য ঘটনা মূলক উপন্যাস লিখিয়া থাকেন, দ্বিতীয় কারণ তাহার উপন্যাস গুলি সমস্তই ধর্ম্মমূলক। হিন্দুর আদর্শ গৃহচিত্র অঙ্কিত করাই তাঁহার লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য। এরূপ উদ্দেশ্যে যত উপন্যাস প্রচার হয়—ততই মঙ্গল। রামপদ বাবু দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী থাকুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। পুস্তকের কাগজ ছবি ও বাঁধাই মনোজ্ঞ, মূল্য ১।০ আনা। কলিকাতা—গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ-বচন।—স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্রের উপদেশের সারতত্ত্ব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ভক্তের প্রাণের কথা, তাই ইহার সমালোচনা চলে না। হাওড়া, ব্রহ্মানন্দ আশ্রম হইতে তদীয় ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পথের কথা।—নবীন গল্পলেখক শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের কথা ছাত্রদিগের পারিতোষিক দিবার জন্য এবং লাইব্রেরীতে রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ফকিরবাবুর জয়জয়কার হউক, তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছেন দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

ভারতবর্ষ।—যে ভারতবর্ষের অনুষ্ঠান করিয়া কবিকুঞ্জের কোকিল দ্বিজেন্দ্রলাল স্বর্গগত হইয়াছেন, ইহা সেই ভারতবর্ষ মাসিক পত্র। দেখিতে দেখিতে ইহার চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া গেল ; এই চারি সংখ্যা দেখিয়া যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে ভারতবর্ষ কালে মাসিক পত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে—আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। দেশের যাবতীয় কৃতী লেখক নানাবিধ লিপি-কৌশলে ইহার কলেবর সুশোভিত করিতেছেন। যে দুই জন সাহিত্য-রথীর হস্তে ইহার কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা এ কার্য্যের যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রবীণ স্বনাম-ধন্য জলধর বাবু ও পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহাতে ভারতবর্ষের নাম অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ বৃথা গল্প-গুজবে ইহার কলেবর পূর্ণ না করিয়া যাহাতে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি ইহাতে বিশেষরূপে আলোচিত হয়—আমরা তাঁহাদের ন্যায় কৃতী লেখকের নিকট সেইরূপই আশা করি। আর এক কথা—ইহার কাগজ, ছবি, ছাপা ও কলেবর হিসাবে ইহার বার্ষিক মূল্য কিছু কম হওয়া উচিত। এই দরিদ্রের দেশে পরিচালকগণের এরূপ বদান্যতা একান্ত প্রার্থনীয়।

REGISTERED No. C. 116.

সপ্তদশ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩২০ সাল। [৮ম সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখ-পত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত বর্ম্মা।

TRANSLATOR'S OFFICE
CALCUTTA
Dated 22-1-1914

সূচীপত্র।

বিষয়।		নাম।	পৃষ্ঠা।
১।	[illegible]বের ত্রিশূল ও [illegible]	শ্রীশীতল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ বিদ্যানিধি	২০৯
২।	জয়মতী (গল্প)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	২১১
৩।	কন্যার ভক্তি (পদ্য)	শ্রীনন্দলাল দে	২১৩
৪।	দেশের উন্নতি	শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মিত্র	২১৮
৫।	মায়া	শ্রীরসিক লাল দে	২২০
৬।	সহসা ও প্রতিমা	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল	২২৫
৭।	অবসান (দৃশ্যকাব্য)	শ্রীমহেন্দ্র মোহন ঠাকুর।	২২৫
৮।	পুরী বা জগন্নাথ ক্ষেত্র	শ্রীআনন্দ গোপাল সেন, বি-এ	২২৮
৯।	গান	শ্রীধ্রুবলাল দত্ত বর্ম্মা	২৩৫
১০।	হিরণ্যগর্ভ-দেবতা	শ্রীচন্দ্রশেখর বসু	২৩৫
১১।	পুষ্পবতী—উপন্যাস	শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ	২৩৯

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

—কার্য্যাধ্যক্ষ—

আলোচনা কার্য্যালয়,
হাওড়া।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

LEPROSY.

Wonderful Treatment of Leprosy & Skin Diseases etc.

PUNDIT RAMPRAN SHARMA, Kaviranjan, SPECIALIST IN LEPROSY miraculously cures all sorts of Leprosy attended with Swellings of the Face, Nose, Ears, etc., BATRAKTA and even the decayed and decaying Leprosy mercurial Diseases, Syphilis, various sorts of circular Spots without any sensation, Skin, diseases, LEUCODERMA, Female Diseases, Acdity, Colic, Dyspepsia, Nervous Debility &c. The following is the extract from what has been stated of me by highly respectable-gentlemen, medical practitioners and Editors of News papers :—

(1) Dr. S. Basu, M.A., M.D.—Your medicine has been tried and found efficacious. (2) Dr. A. Latif, M.D.—The nine patients had been cured and your medicine should be used in Hospitals. (3) Dr. Charlu, M.D. —I am glad to find the efficacy of your medicine which I shall recommend to all Doctors. (4) Dr. P. Ibrahim, Calcutta,—My brother has been cured by your medicine. (5) Pundit Bisweswar Prasad, M.B. Of all the medicines I have used, yours is the best. (6) Dr. P. N. Dass, M.B—Your successful treatment of this incurable diseases has made you the object of esteem. (7) Pundit Ram Charan Pathak, Rajvaidya.—The effect of your medicine is miraculous. (8) Sir, Chandra Madhab Ghosh, Kt Late Chief Justice, Calcutta High Court.—The patient has made considerable progress under your good treatment and your reputation will soon spread throughout the country. (9) Mr. M Thadin, Addl. Dist. Judge, Yamethin, U Burma—The Patient has improved by the use of 30 days medicines. The red and rough spots on the hands face,etc. have subsided and aching pain in the hands is no more. (10) Dr. P. K. Bose, Retired Dy. Magistrate and Collector, Howrah,—My servant who was suffering from a bad type of Leprosy has been cured by your treatment, (11) Roy Jyot Kumar Mukherjee Bahadur, Zemindar, Utterpara,—A good Sanskrit Scholar and experienced and good physician, (12)—A. T. Bose, Govt. Pleader, Howrah. He has cured many persons suffering from Leprosy. (13) Babu Chandra Kumar Bose Zemindar Kendrapara.—The bad ulcer of the patient have all been redically cured. (14) A. B. Patrika—of 8th Feb. 1913—Has established his reputation by successfully treating case of Leprosy and Skin diseases and is also a good physician having great experience in Ayurvedic System of treatment. (15) Mr. G. C. Chatterjee, M.B. Asst. Bacteriologist, Medical College, Calcutta—after examining one of my patients of Asansol expressed his opinion :—Examined the blood of the ears and found no bacili in it.

Address—

HOWRAH KUSTHA-KUTIR,
KHURUT ROAD, HOWRAH.
Branch—79|1, Cornwallis Street,
Calcutta.

দেখুন দেখি।

এই ঔষধটী আপনার পক্ষে

উপযুক্ত কি না! ইহা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা প্রস্তুত নহে, এই ঔষধ স'স্র সহস্র রোগে পরীক্ষিত হইয়া প্রত্যেক চিকিৎসকের দ্বারা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরাতন মেহদোষ

এবং ইন্দ্রিয় শিথিলতা, রতি শক্তির দুর্ব্বলতা, শুক্রদোষ, শুক্রতারল্য, অক্ষুধা, অজীর্ণ, দমকাভেদ এবং পুরুষত্বহানী ও মানসিক অবসাদ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া চিকিৎসা জগতে এক অভিনব কাণ্ড ঘটাইয়াছে। ঔষধের নাম

১৪ নং রতিবল্লভ যোগ

দেড় মাসের ব্যবহার্য্য ঔষধের মূল্য সডাক ২॥০ আড়াই টাকা।

পণ্ডিত, রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরঞ্জন,
হাওড়া কুষ্ঠ কুটির, হাওড়া।
শাখা—৭৮।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

Printed and Published by—J. N. Singha, at the Carmayogi Printing Works, Howrah

শিবের ত্রিশূল ও শিঙা।

ত্রিশূল যে শিবের বিশেষ চিহ্ন—তাহা হিন্দুকে বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। চিত্রের শিবমূর্ত্তির হস্তে শিঙাও অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই দুইটী চিহ্নের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা আলোচনা করিয়া বুঝাবার জন্যই আমরা উপস্থিত প্রবন্ধ আরম্ভ করিতেছি।

শিবের আদিরূপ বেদের রুদ্র। রুদ্র আবার অগ্নিরই বিকাশ। এই প্রকারে শিবত্ব অগ্নিরই বিকাশ বিশেষ। শিবের অষ্ট মূর্ত্তির নামের মধ্যেও আমরা অগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাই যথা—"সূর্য্যোজলং মহীবহ্নির্বায়ুরাকাশমেবচ। দীক্ষিতো ব্রাহ্মণ চন্দ্র ইত্যেতা অষ্ট মূর্ত্তয়ঃ ॥"

বৈদিক অগ্নির আবার আমরা তিনটী রূপ দেখিতে পাই যথা—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ। এই তিন অগ্নি একত্র "ত্রেতা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এবং যজ্ঞশালায় এই তিন অগ্নি স্থাপিত থাকায় ইহার নাম ত্রেতাগ্নিশালা দেখিতে পাওয়া যায়। শিব পূর্ব্বোক্ত অগ্নিত্রয়াত্মক বলিয়া এই অগ্নিত্রিতয়ের সূচক রূপেই তাঁহার ত্রিশূল পরিকল্পিত হইয়াছে। শূলের অগ্রভাগ অগ্নিশিখার সাদৃশ্য অতি সুন্দর রূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে। শিবের অগ্নি দ্বারা ত্রিপুর ধ্বংসের মধ্যেই তাঁহার অগ্নিরূপের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা মনে করি।

এক অগ্নিই তিনরূপে প্রকাশিত হইয়া ত্রেতা হইয়াছেন বলিয়া যেমন অগ্নিত্রয় শিবের স্বরূপ, তেমই এক অগ্নিও শিবের স্বরূপ। এই রূপে শূল যেমন শিবের সূচক—ত্রিশূলও তেমনি শিবের সূচক, তাহাতেই শিবের যেমন "শূলী" নাম পাওয়া যায়, তেমনই "ত্রিশূলী" নামও পাওয়া যায়।

ত্রিশূল যে শিবের অগ্নি রূপেরই সূচক তাহার অন্যতর প্রমাণ এই যে শিবোপাসকের ললাটে যে শিবচিহ্নরূপ "ত্রিপুণ্ড্র" চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহা ত্রিশূলাকৃতিরই অনুরূপ। ইহার ত্রিপুণ্ড্র নামটী ও যেন ত্রিশূল নামেরই অনুকরণে কল্পিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন ভস্মদ্বারা অঙ্কিত করার যে বিশেষ বিধি পাওয়া যায় যথা—"ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনাসদা" তাহাতেও ইহা যে অগ্নিরূপী শিবেরই চিহ্ন—তাহাই প্রমাণিত হয়। কারণ অগ্নির সহিত ভস্মের যেমন সম্বন্ধ, অপর কিছুর সহিত ইহার তেমন সম্বন্ধ নাই।

অগ্নি ভস্মের মধ্যে লুকায়িত থাকে বলিয়াই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপী শিবও "বিভূতি (ভস্ম) ভূষণ" হইয়াছেন; এবং তাঁহার

এই ভস্মভূষণই তাঁহার সাধকেরও ললাটের ভূষণ হইয়াছে। শৈবত শাক্তগণ যে ত্রিপুণ্ড্রেরই ন্যায় রক্তচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ললাটে ধারণ করেন, তাহাতেও আমরা শিবের অগ্নিরূপেরই নিদর্শন প্রাপ্ত হই। কারণ অগ্নির রক্তবর্ণের সূচক রূপেই শিবের চিহ্নরূপে রক্তচন্দনের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

অগ্নি হইতে যেমন শিবের বিকাশ—অগ্নির সপ্তজিহ্বা "কালী করালী" মনোজবা প্রভৃতির অন্যতম "কালী" নাম হইতেও তেমনই কালী বা দুর্গার বিকাশ হইয়াছে, তাহাতেই শিবের যেমন "শূলী" নাম পাওয়া যায়; কালী বা দুর্গারও তেমনই "শূলিনী" নাম পাওয়া যায়।

আমরা উপরে যে পর্য্যালোচনা করিলাম, তাহাতে ত্রিশূল যে শিবের অগ্নিরূপেরই পরিচায়ক, তাহা বিশেষরূপেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। এক্ষণে আমরা শিবের হস্তের শৃঙ্গ বা শিঙার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা পাইব।

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে শৃঙ্গ বা শিঙাকে আমরা পশু শীকারের বিশেষ উপকরণ রূপেই প্রসিদ্ধ দেখিতে পাই। তাহাতেই Hunters Loom শিকারীর শিঙা এই কথাটী সুপ্রচলিত হইয়াছে। ইহা হইতে আর্য্যগণ যখন মধ্য এসিয়াতে পশু-পালনে জীবন অতিবাহিত করিতেন, তখনই যে শৃঙ্গের বা শিঙার ব্যবহার হইত, তাহাই আমরা অনুমান করি। শিবের বিকাশও তখনই হয় বলিয়া মনে হয়। শিবের "পশুপতি" নামেই সেই ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। এই পশুপতি নামের প্রথমোৎপত্তি আমরা বেদেই লক্ষ্য করিতে পারি।* পশু-শীকার উপলক্ষেই পশুপালন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়—ইহাই প্রত্নতত্ত্বের মত। সুতরাং শৃঙ্গ বা শিঙার পশু-শিকারের সহিত সম্বন্ধ হইতে পশুপালনের সহিতও সম্বন্ধ হইয়াছে। তাহাতেই আমরা ভাগবতে পশুচারণের সঙ্গেও শৃঙ্গের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। যথা—

> কচিদ্বনাশায় মনোদধদ্‌ব্রজাৎ প্রাতঃ
> সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান।
> প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা বিনির্গতো
> বৎসপুরঃসরোহরিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ঃ।

পশুচারণের সহিত সম্বন্ধ হইতে শৃঙ্গ বা শিঙার ক্রমে কৃষির সহিতও সম্বন্ধ হইয়াছে। তাহাতেই ইংরাজিতে যেমন Hunters Loom কথা পাওয়া যায়, তেমনই Ploughman's Loom কৃষকের শৃঙ্গ কথাও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় Horned moon কথায় চন্দ্রকে শৃঙ্গাকার রূপে বর্ণিত দেখা যায়। শৃঙ্গাকার চন্দ্র বা অর্দ্ধচন্দ্রকে আমরা শিবেরও চিহ্নরূপে বর্ণিত দেখি—তাহাতেই শিবের নাম "চন্দ্রশেখর" হইয়াছে—দুর্গাকেও তদনুসারে ধ্যানে "অর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শৃঙ্গাকার চন্দ্রেরই রূপকভাবে শিবের হস্তে শৃঙ্গ বা শিঙা ন্যস্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। শৃঙ্গের সহিত যেমন আমরা কৃষির যোগ দেখিতে পাইয়াছি—চন্দ্রের সহিতও [illegible] কৃষির যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] ইহার নাম "ওষধীশ" হইয়াছে। [illegible]

* ঋগ্বেদ ১।১২।৭১, ১।৮৮।৯।

আমরা কৃষিদেবতারূপে পূজিত হইতে দেখি—তাহাতেই তাঁহার নাম 'ক্ষেত্রপাল', 'ক্ষেত্রপ' হইয়াছে। শিবের হস্তের শৃঙ্গ বা শিঙা এই কৃষিসম্পদেরই রূপকভাবে কল্পিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য Horn of plenty (প্রাচুর্য্যের শৃঙ্গ) এই প্রকারেরই রূপক এবং শিবের ন্যায় ইহাও শিরিস্ (Ceres) বা শ্রীদেবীর হস্তে শোভা পায়।

গ্রীক্‌দেবী ডায়েনার (Diana) প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এক দিকে যেমন তাঁহাকে চন্দ্রদেবতারূপে বর্ণিত দেখা যায়। তেমনই অপর দিকে মৃগয়াদেবতারূপেও বর্ণিত দেখা যায়। এই প্রকারে চন্দ্র ও মৃগয়ার মধ্যে একটী বিশেষ সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। শিবের সহিত চন্দ্রের যোগে তদ্রূপই সোম ও পশুপতি উভয় দেবপ্রকৃতিরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পশুপতি বা মৃগয়াপতিরূপে মৃগয়ার চিহ্নরূপেই হউক বা ক্ষেত্রপতিরূপে উর্ব্বরতার চিহ্নরূপেই হউক প্রকৃত শৃঙ্গ বা অর্দ্ধচন্দ্ররূপক শৃঙ্গ বা শিঙা যে বিশেষ পরিচায়করূপে শিব কর্ত্তৃক ধৃত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বিদ্যানিধি।

জয়মতী।

জয়মতী আসাম রাজবংশীয় মহাবীর মহারাজা গদাপাণির সহধর্ম্মিণী এবং রাজা রুদ্রসিংহের জননী।

একদিন আসামের রাজনৈতিকগগণ গভীর তমসাচ্ছন্ন ছিল। রাজশক্তি দুর্ব্বল, স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রীবর্গ রাজমস্তক লইয়া কন্দুক-লীলায় মগ্ন। তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা, রাজ সিংহাসনে বসাইতেছেন, আর দু'দিন যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া আর একজন রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেছেন। অমাত্যগণের কন্দুক-ক্রীড়ায় এইরূপে ক্রমে ছয়টি রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক ও স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিল। অভিষেকের মঙ্গল শঙ্খরবের সহিত শ্মশানের ভীষণ রোদন ধ্বনী জাগিয়া উঠিল। অবশেষে আর একজন রাজশিশু রাজ-শোণিত-সিক্ত পাপ সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তাঁহার নাম চুলিকফা। শিশু বলিয়া আসামী ভাষায় আসামের লোকেরা তাঁহাকে লরা রাজা বলিত।

রাজা শিশু হইলেও তিনি যে মন্ত্রীগণের খেলার পুতুল, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই যে এ পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন পুতুল গড়িতে পারিতেন অপর কোনও রাজকুমারকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তরলমতি শিশুরাজা সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজবংশ রাজকুমার শূন্য করিতে পারিলে, তাঁহার ধ্বংসের পথ রুদ্ধ ও রাজপদ স্থায়ী হইবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে তিনি গুপ্ত ঘাতক দ্বারা রাজকুল নির্মূল করিতে লাগিলেন। পুত্রহীনা জননী, ভ্রাতৃহীনা ভগিনী ও পতিহীনা রাজকুল-গৃহিণীর করুণ বিলাপ নিনাদ ও উষ্ণ অশ্রুপাতে আসামের রাজধানী মুখরিত ও সিক্ত [illegible] উঠিল। মন্ত্রী-গণ আত্মকলহে দুর্ব্বল ও হীনপ্রভ; সুতরাং

সে ভীষণ রাজ অত্যাচার প্রশমনার্থ কাহারও কার বাহু উত্তোলিত হইল না। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের অবসান কালে লরা রাজা রাজকুমার গদাপাণির বিনাশের নিমিত্ত গুপ্ত ঘাতক প্রেরণ করিলেন।

গদাপাণি নিস্পৃহ—বীর। রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার শান্তিপূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক স্বভাব-সুন্দর পার্ব্বত্য উপত্যকায় পর্ণকুটীর ভবনে তিনি পতিব্রতা পত্নী জয়মতী ও দুইটি শিশু পুত্রসহ স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতেছিলেন।

তাপস-প্রাণ গদাপাণিকে বধ করিবার জন্ত রাজা কর্তৃক গুপ্ত ঘাতক নিযুক্তের দুঃসংবাদ ক্রমে সেই পার্ব্বত্য শান্তি-কুটীরে পঁহুছিল। বীর গদাপাণি মঙ্গলময় শ্রীভগবানও স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে আপনার পর্ণ-কুটীর-ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিব্রতা সতী জয়মতী এ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে ত্রাসে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"স্বামিন্! ভগবানের দয়া এবং তোমার বাহুবলে আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু রাজা বহু প্রভাবশালী, যারপরনাই নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও তোমার পরম শত্রু। অতএব তুমি আর এক মুহূর্ত্তকাল মাত্র বিলম্ব না করিয়া এস্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান কর। আমাদের জন্য বৃথা চিন্তা করিও না। তোমার প্রত্যাগমনের আশায়—মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র নামে ও তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা এ কুটীরে নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিব। তুমি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এখনই আত্মগোপন করতঃ আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান হও, ত্বরায় দ্রুতবেগে পার্ব্বতীয় গভীর বনপথে পলায়ন কর।

নির্ভীক বীর গদাপাণি সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সুপরামর্শ ও বিনীত প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। তিনি স্নেহ-ভক্তি-প্রীতিময়ী পতিব্রতা পত্নী এবং প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ পুত্রদ্বয়কে সেই পার্ব্বত্য কুটীরে রাখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সেই শান্তির কুটীর পরিত্যাগ করিয়া বিজন পার্ব্বত্য পথে প্রস্থান করিলেন। সাধ্বীসতী জয়মতী একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখী হইয়া যোড়-হস্তে চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত হইল। অশ্রুমুখী জয়মতী তদ্গত-চিত্তে প্রার্থনা করিলেন,—"ভগবন্! আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ গ্রহণ করিয়া আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা কর।" কে জানে—সাধ্বীর এ কাতর প্রার্থনা ভগবানের পবিত্র দরবারে পঁহুছিল কিনা।

গদাপাণির পলায়ন বার্ত্তা রাজকর্ণে পঁহুছিল। তিনি তাঁহাকে ধৃত ও হত্যা করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার লোকলজ্জাভয় তিরোহিত হইল। তিনি রাজ কুলবধূ সাধ্বীসতী জয়মতীকে বন্দিনী করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসার অনলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

জয়মতী বীরপত্নী। ... [illegible]

তিনি স্বামীর গুপ্ত সংবাদ বলিলেন না। রাজা তাঁহার প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। অত্যাচারের পর অত্যাচার চলিতে লাগিল। অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া তীব্র হইতে তীব্রতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। যখন কিছুতেই জয়মতী স্বামীর গুপ্তবাসের সন্ধান-বার্ত্তা বলিলেন না, তখন সেই নরঘাতক পাষণ্ড রাজা, সেই সতী সাধ্বী রাজ-কুলবধূকে প্রকাশ্য রাজপথে উলঙ্গিনী করিয়া অজস্র কষাঘাত করিতে লাগিলেন। লজ্জা, ঘৃণা ও মর্ম্মভেদী দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি সতী পতির সন্ধান বলিলেন না। তিনি নির্ভীক অন্তরে নিয়ত পাষাণ-কঠোর প্রাণ ঘাতকের দারুণ কষাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন।

পাপিষ্ঠ রাজা তাঁহাকে স্নেহমধুর সহানুভূতির ভাষায় কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কত ভোগ বিলাসের আপাতঃ মধুর প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে যত্ন করিলেন, কত উচ্চ আশার রসায়ন চিত্র প্রদর্শন করিলেন, কিছুতেই সতী জয়মতী পতির গুপ্ত বাসস্থানের সংবাদ দিলেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি ঘোর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। রাজাদেশে উলঙ্গিনী বেশে পাশ-বদ্ধ রাজ-কুল-বধূকে শত সহস্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইল; কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখে কথাটি মাত্র ফুটিল না, সতী প্রাণান্তেও পতি গদাপাণির গুপ্ত-নিবাস-স্থলের সন্ধান বলিলেন না।

একটি মাত্র মুখের কথা—স্বামীর সন্ধান বলিলেই তিনি এ ঘোরতর অমানুষিক অসহ্য পাশবিক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু পতিব্রতা সতী পতির জীবনের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে বসিয়াছেন; তিনি একটী মাত্র চীৎকার, বিলাপ ধ্বনি, বা একবার মাত্র আর্ত্তনাদ না করিয়া বীর-জায়ার ন্যায় অকাতরে সেই অমানুষিক ঘোর অত্যাচার সহিতে লাগিলেন। শত প্রহারেও সতী নীরব—নিস্পন্দ; তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলহীন—বিশুষ্ক। সতী তখন পতি-চিন্তায় বিভোর; বাহিরে কোথায় কি হইতেছে, তাঁহার সে জ্ঞান নাই। তিনি ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় মুদ্রিত নয়নে ভগবৎ-চরণে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনায় বাহ্যজ্ঞান বিহীন—পতি-চিন্তায় সতী তখন সমাধিস্থ।

সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি জয়মতীর প্রতি নিদারুণ পাশবিক অত্যাচারের বিরাম হইল না। সে সপ্তাহ-ব্যাপী ঘোর অত্যাচারের তীব্র কাহিনী ক্রমে আসামের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সুদূর নাগা পর্ব্বতের নিবিড় গুহায় বীর গদাপাণির কর্ণে এ নিদারুণ সংবাদ পঁহুছিল। তিনি তদ্গতপ্রাণা সতী সাধ্বী পত্নীর প্রতি এই অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারের ও বিষম অবমাননার সংবাদ শ্রবণে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর গদাপাণি উন্মাদের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক সাধ্বী পত্নীর নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। পত্নীর সেই শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার পাষাণ-কঠোর বীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে গদাপাণির দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। প্রেম-প্রীতি ও স্নেহময়ী

প্রাণীর অমানুষিক সহিষ্ণুতা দর্শনে এইবার তিনি প্রকৃতই পাগল হইয়া উঠিলেন। এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া উন্মাদ গদাপাণি আন্তরিক আবেগ ভরে যারপরনাই করুণ স্বরে গাহিলেন—

"স্নেহ-প্রীতি প্রেমবতী ওগো দেববালা!
সহিতেছ যার তরে, শত দুঃখ অকাতরে,
বল তার কথা দেবী বল এই বেলা;
পতি কি সহিতে পারে সতীর এ জ্বালা?"

গাইতে গাইতে পাগল কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সে গান জয়মতীর কর্ণে পঁহুছিল না; জয়মতী তখন *বাহ্যজ্ঞান হীন*; জয়মতী যোগ-মগ্না। ধ্যানস্থা যোগিনীর কর্ণে সে আবেগময় স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনী প্রবেশ করিল না। সমস্ত দিন গাইতে গাইতে গদাপাণি শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তথাপি যোগমগ্না জয়মতীর সমাধি ভঙ্গ হইল না। রাজ-অনুচরগণ ভাবিল, একটা উন্মাদ আপন মনে কি গাইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে উন্মাদ বৃক্ষ-তল পরিত্যাগ করিল। কেহ তাঁহার পরিচয় পাইল না, সন্ধান লওয়া বা তাহার অনুসরণ করা প্রয়োজনও মনে করিল না। সে উন্মাদ; দরিদ্র কাঙ্গাল। এ সংসারে কাঙালের সংবাদ—উন্মাদের সংবাদ কে লয়?

পরদিন আবার সেই বৃক্ষতলে সেই পাগল সেই আবেগময় কণ্ঠে সেই গান গাইতে লাগিল। আজ সে গান বড় মধুর—বড় ললিত ললাম—বড় প্রাণস্পর্শী স্বর্গীয় ভাব পূর্ণ। এইবার সেই আবেগপূর্ণ সুমধুর সুরসঙ্গীতের অমিয়—মধুর স্বরলহরী স্বর্গীয় বীণা ধ্বনীর ন্যায় জয়মতীর কর্ণে প্রবেশ করিল, সে গান শুনিয়া তিনি মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে সতী চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে তাঁহার পতি! হায়! যাঁহার জন্য তিনি এত ক্লেশ—এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছিলেন, আর বুঝি তাঁহার সেই চিরারাধ্য প্রাণের দেবতার রক্ষা হয় না। হায়, মুহূর্তে বুঝি তাঁহার এত যত্ন—এত আকিঞ্চন সব ফুরাইয়া যাইবে। তিনি এই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ভীতিবিহ্বল কম্পিত হৃদয়ে তিনি একবার স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন। সে করুণ দৃষ্টির অর্থ,—স্বামীন্! তুমি এখান হইতে দূরে সরিয়া যাও—এখনি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। কিন্তু গদাপাণি তাঁহার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও একপদ ভূমি দূরে সরিলেন না। তখন স্বামীর আকস্মিক বিপদ আশঙ্কায় সহসা পতি-প্রাণা-সতী জয়মতী ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন।

যখন জয়মতীর এইরূপ অবস্থা, তখন রাজ-অনুচরগণ স্বামীর সংবাদ বলিয়া তাঁহার আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধিমতী সতী সাধ্বী জয়-মতী—উন্মাদিনী জয়মতী রাজপুরুষগণের কথার উত্তর দান ছলে স্বামীর গানের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় গাইতে লাগিলেন—

"সরে যাও, আসিও না সম্মুখে আমার!
পতি লাগি সহে সতী,
শত বজ্র শির পাতি,
পতি তরে সতী সহে মুক্ত [illegible]
দূরে যাও মায়া-মোহে ভুলাওনা [illegible]

জয়মতীর গান শুনিয়া রাজ পুরুষেরা মনে করিলেন, বিষম অত্যাচারে জয়মতী উন্মাদিনী হইয়াছেন ; তাই গানে তাঁহাদের কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন। কিন্তু বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান ছদ্মবেশী উন্মাদ গদাপাণি পত্নীর এ গানের মর্ম্ম বুঝিলেন, তাঁহাকে দূরে রাখিয়া তাঁহার জন্য তাঁহার পতিব্রতা পত্নী আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রার্থনা করিতেছেন। নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া গদাপাণি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সতীর প্রার্থনা পূর্ণ হইল।

এত অত্যাচারে ও সতী জয়মতী পতি সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না। রাজপুরুষদের ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল। ক্রমে জয়মতীর প্রতি আরও কঠোর অত্যাচার আরম্ভ হইল। নিরুপায় সাধ্বীসতী জয়মতী পতির মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানস্থা যোগিণীর ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া সে কঠোর কষাঘাতের অরুন্তুদ যন্ত্রণা নীরবে সহিতে লাগিলেন। দারুণ কষাঘাতে তাঁহার কুসুম-কোমল দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া অজস্র ধারায় শোণিতপাত হইতে লাগিল। তথাপি সাধ্বী জয়মতী কিছুতেই স্বামীর সন্ধান বলিলেন না।

মানুষের প্রাণ—রক্ত-মাংসের দেহ, আর কত সহিতে পারে? ষোড়শ-দিবস-ব্যাপী ঘোর অত্যাচারের কঠোর যন্ত্রণা ও অনশন-ক্লিষ্টা জয়মতী স্বামীর মঙ্গল কামনায় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পার্থিব সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন। স্বর্গের দেবী মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সতীর প্রতি এ ঘোর অত্যাচারে লরা রাজার পাপের ভরা পূর্ণ হইল। অমিত বিক্রম গদাপাণি তাঁহাকে বিনাশ করিয়া আসামের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সতীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ হইল। পাপিষ্ঠের সব ফুরাইল, কেবল দুষ্কর্ম্মের অক্ষয় স্মৃতি—অনন্ত কলঙ্করাশি যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিল।

রাজা গদাপাণি সতীর পবিত্রস্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্বসুখ ভোগান্তে পরলোক গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

রুদ্রসিংহ রাজা হইয়া প্রথমেই স্নেহময়ী জননীর পুণ্যকীর্ত্তির পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য—রাজবাটীর বহির্ভাগে যেস্থানে সেই পতিপ্রাণা পুণ্যবতী জয়মতী পতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সেই পবিত্র তীর্থে 'জয়সাগর' নামক একটি সুবৃহৎ সরোবর খনন করিয়া তাহার তীরে "জয়দোল" নামে এক সুশোভন সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই মন্দির দ্বারে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন,—

পতি লাগি সহে সতী,
শত বজ্র শির পাতি,
পতি তরে সতী মরে মুক্ত স্বর্গ-দ্বার।

সেই সরোবর তীরে দাঁড়াইয়া মন্দিরের পানে তাকাইলে আজিও তাঁহার অসাধারণ পতিপ্রেমে শোচনীয় মৃত্যুর অপূর্ব্ব পুণ্যকাহিনী, তাঁহার সেই পুণ্য-ব্রতের পবিত্র স্মৃতি দর্শকের প্রাণে জাগিয়া উঠে। আজিও যেন শুনা যায়,

অত্যাচারে জর্জ্জরিতা সাধ্বী সতী পতিব্রতা অশ্রুমুখী জয়মতী করুণ স্বরে গাইতেছেন,—

পতি লাগি সহে সতী,
শত বজ্র শির পাতি,
পতি তরে সতী মরে মুক্ত স্বর্গদ্বার।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

কন্যাদায় পীড়িত পিতার প্রতি

কন্যার উক্তি।

(১)

বাবা! থাকুক আমার বিয়ে
চাইনা আমি এম, এ, বি, এ,
কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত, যাদের
ছেলের হাটে গিয়ে।
সোণার চেইন সোণার ঘড়ি
গর্ব্ব যাদের গলায় পরি
অমন পশু কিনো না'ক
কানা কড়ি দিয়ে।

(২)

থাকুক আমার বিয়ে
বিবাহ যে কি পদার্থ
বুঝে না যে অপদার্থ
অর্থ লোভে পুরুষার্থ
যে ফেলে বেচিয়ে।
অমন শিক্ষায় শত ধিক্
দর্শনে সে অন্ধ অধিক
বিজ্ঞানে তার নাইক জ্ঞান
(কেবল) মরমা সাজিথ টিয়ে।

(৩)

থাকুক আমার বিয়ে
চাইনা ভণ্ড দেশ-হিতৈষী
ওরাই রক্ত শোষে বেশী
ভাম্পায়ার বাদুড়ের মত
বাতাস দিয়ে দিয়ে।
ধিক্ সে ওদের উচ্চ-শিক্ষা
ধিক্ ওদের স্বদেশী-দীক্ষা
কিসে তরবে এ পরীক্ষা
পশুর আত্মা নিয়ে।

(৪)

থাকুক আমার বিয়ে
নয়'ত ইহা রাজ্য-নীতি
রাজদ্রোহের নাই'ক ভীতি
কেবল ইহা মোহের প্রীতি
টাকার লাগিয়ে।
কেউ না এতে কাটে মারে
ইচ্ছা করলে সবাই পারে
শান্তি সুখে দেশ ভরিতে
ভ্রান্তি বিনাশিয়ে।

(৫)

থাকুক আমার বিয়ে
কুলীন চেয়ে ভাল কুলী
ডোম মুচি কসাই গুলি
সারা জীবন ফেরে কেবল
ছুরি সানাইয়ে।
যখন যারে কায়দায় পায়
যে ঠেকেছে মেয়ের দায়
ধর্ম্ম ভুলে চর্ম্ম খুলে
কর্ম্ম সারে [illegible]

(৬)

থাকুক আমার বিয়ে
বেচ্‌বে কেন ভিটে মাটী
বেচ্‌বে কেন ঘটি বাটী
মজ্‌বে কেন আমার তরে
পুখুর বাঁধা দিয়ে।

যে তোমার করবে দুর্গতি,
ভজ্‌ব কি সেই পশু-পতি,
পূজ্‌ব না হয় পশুপতি
উমার মত গিয়ে।

(৭)

থাকুক আমার বিয়ে
রেখে কোলে-কাঁকে-বুকে
পালন করলে কত সুখে
তোমার স্নেহ দয়ায় আজো
রয়েছি বাঁচিয়ে।

আজো তোমার এমনি ব্যাথা
যা কিছু পাও যখন যেথা
পাখীর মত দিচ্ছ এনে
নিজে না খোইয়ে।

সেই তোমারে চির দুঃখে
ফেল্‌বে যে গো পাষাণ বুকে
সে পশুকে পতি বলে
পুজব লুটাইয়ে।

ঘৃণা কি নাই নারীর মনে
সিদ্ধি নাই কি নারী-পণে?
মারবে যার ঘরে তোমায়
রুখে দাঁড়াও গিয়ে।

(৮)

থাকুক আমার বিয়ে
দড়ি আছে কলসী আছে
ডুববো কিম্বা ঝুলবো গাছে
দুষ্ট সমাজ তুষ্ট হ'ক
সে নারীর রক্ত পিয়ে।

রাজপুতানার মেয়ের মত
করব না হয় জহর-ব্রত
তারাও নারী মোরাও নারী
নারীর হৃদয় দিয়ে।

(৯)

থাকুক আমার বিয়ে
কোন জন্মে করলে পাপ
বাংলাতে হয় মেয়ের বাপ
বুঝতে নারি আমি নারী
বিধাতার কি হিয়ে।

আবার যদি জন্মে মেয়ে
চোখ তুলে দেখোনা চেয়ে
হাত পা বেঁধে দিও বাবা।
গঙ্গায় ডুবায়ে।

(১০)

থাকুক আমার বিয়ে
বাঙ্গালাদেশের সবাই পশু
কিসের ঘোষ, কিসের বসু
চাটুর্য্যে মুখুর্য্যে আদি
সবই পশুর হিয়ে।

কার বা গর্ভে কার ঔরষে
সাত পুরুষের পুণ্য বশে
মানুষ জন্মায় ক'টা;
রয়ে বংশ উজলিয়ে।

(১১)

থাকুক আমার বিয়ে
হায়রে পোড়া বাংলা দেশ
মেয়ের বাপ যেন দুগ্ধা মেষ
নিত্য-নিত্য খাচ্ছে তার
মাংস কেটে নিয়ে।
কি কুক্ষণে আদিসুর
আন্‌লে দেশে এ অসুর
মারলেনা কেন বল্লালেরে
চোখে নুন দিয়ে।

(১২)

থাকুক অমার বিয়ে।
কিসের ডিগ্রি কিসের পাস
ঐটি—হ'ল গলায় ফাঁস,
করলে দেশের সর্ব্বনাশ,
কলেজ—বসাইয়ে,
কলে জন্ম কলে—তৈয়ার
নর পশু—(কই) কলেজ বই আর—?
কলেজ হ'তে জঙ্গল ভাল
জংলী পশুর নাইক বিয়ে ডিগ্রির
দোহাই দিয়ে।

(১৩)

থাকুক আমার—বিয়ে
কার্পেণ্টার, নাইটিঙ্গেল, ডোরা
সিটিজ—সিষ্টার হব মোরা
থাকব বাবা দীনের সেবায়
জীবন সমর্পিয়ে।
দেশের হবে সুখ সুবিধা
বজ্জাতেরা—হবে সিধা
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে
পশুর গৌরব গিয়ে।
বাঞ্ছা পুরুক আশীষ কর বাবা, চরণ
ধুলি দিয়ে।

শ্রীনন্দলাল দে।

দেশের উন্নতি।

দেশবাসীর ব্যক্তিগত উন্নতিই দেশের উন্নতি। সংখ্যায় যে পরিমাণে উন্নত লোক পাওয়া যাইবে সেই অনুযায়ীই দেশের উন্নতি নির্দ্দিষ্ট হইবে। মানুষের উন্নতির দ্বারাই পারিপার্শ্বিকের উন্নতি হয়। পারিপার্শ্বিক আপনা আপনিই উৎকর্ষলাভ করে না। মনুষ্যের যত্নে পারিপার্শ্বিক সুপুষ্ট হইলে তাহার প্রভাব নিশ্চয়ই মানব সমাজের উপর পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়া পারিপার্শ্বিকের চিন্তা কেবল শূন্যপ্রসূ কল্পনায় পর্য্যবসিত হয় মাত্র।

লাভের তুলাদণ্ডে উন্নতি নির্দ্ধারণ করাও এক মহাভ্রান্তি। বিস্তৃত অর্থে লাভ অবশ্যই উন্নতির যথার্থ পরিমাপক, কিন্তু সচরাচর লাভ বলিলে সাধারণে ব্যক্তিগত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বুঝিয়া থাকে। এই শেষোক্ত অর্থে লাভ অবশ্যই উন্নতির পরিমাপক নহে। শিক্ষার ফল যদি টাকা—আনা—পাইয়ের মধ্যে খোঁজা যায়, তাহা হইলে শিক্ষা যন্ত্রতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই শিক্ষা যন্ত্রের মতই পরনির্ভরশীল না হইয়া থাকিতে পারে না। [illegible] শিক্ষায় কেবল কুফলই ফলিয়া থাকে। [illegible] পাত্র যেমন অনাধার না [illegible]

করিবারই সার্থকতা লইয়া বর্ত্তমান থাকে এবং শঙ্কার কারণ হইয়া অবস্থান করে, লক্ষ্য বিচ্যুত শিক্ষাও সেই প্রকার সমাজের অঙ্গে পীড়া দেয় এবং আঘাত করে, সমাজেরই কোনও কাজে লাগে না। যেখানে শিক্ষা শিক্ষিতের চরিত্র সম্যক পরিস্ফুট নহে, সেখানে শিক্ষাই নাই—বুঝিতে হইবে। প্রদীপ নিবু নিবু হইলে তৈলাভাব বা সলিতাভাব অনুমান করা যে প্রকার ভুল হয় না, হীন বা দুর্ব্বল চরিত্রও সেই প্রকার শিক্ষার অভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করে। লাভালাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যদি দেশে সকলেই প্রকৃত শিক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া, উঠিয়া পড়িয়া লাগে—তাহা হইলে এই ভারত শরীরের "মরাগাঙেই" বাণ ডাকিবে এবং যাহা কিছু অখ্যাতি রটিয়াছে, তাহার অবসান হইবে।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সুখসংগ্রহের উপায় যত বলুক আর নাই বলুক, দুঃখ সহিবার এবং দুঃখকে দলিত করিবার শক্তিতে পূর্ণ করিবে। কর্ম্মভীরু হইয়া জীবন যাপন করা যে বিড়ম্বনা, তাহা ভারতবর্ষের যুবকেরা এখনও বুঝিল না। "ঠাকুর পিঠ দিয়াছেন বইতে আর বুক দিয়াছেন সইতে" সরল পল্লী উক্তি যে দিন গৃহে গৃহে প্রত্যেক গৃহস্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, সেই দিন ভারতবর্ষের আশার [illegible] হইতে পারিবে। এই সরল প্রবাদের মধ্যে যে [illegible] বিশুদ্ধ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা শিক্ষার আলোকেই উদ্ভাসিত হইতে পারে— [illegible]। [illegible] হওয়ার গৌরব [illegible] এবং [illegible] দৃঢ় চিত্রপট মানস-নয়ন সমীপে ধারণ করে। শুধু খাওয়া পরার চিন্তায়" এখন ভারতবর্ষ বিব্রত—কেবল 'উদর' এবং 'অঙ্গ' লোকের নয়ন সম্মুখে ভাসিতেছে—সাধনা, তপস্যা, দয়া, দাক্ষিণ্য ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। গায়ে ধূলা লাগা, লোকে মহা অকল্যাণ বলিয়া মনে করে কিন্তু মন নরকে হামাগুড়ি দিলেও তাহাতে ক্ষতি অনুভব করে না। কুশিক্ষার প্রভাবে সমগ্র সমাজ শরীরে রোগ প্রবেশ করিয়াছে, এই জন্য চারিদিকে বিকারের লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান। লাথী খাও লজ্জা নাই, ইহা যে ললাট লিখন—অখণ্ডনীয়। মজুরি কর, মাথা ভাঙিয়া পড়িবে, মুখ লুকাইবার ঠাঁই পাইবে না। যে পিঠ বোঝা বহিতে অক্ষম, সে পিঠে যে রুষ্ট দেবতার চাবুক পড়া অবশ্যম্ভাবী—তাহা কি বুঝিতে পার না? হয় সংসারের ভার বহন করিয়া যশস্বী হও, না হয় লাথী, ঝাটা, অবমাননার জন্য প্রস্তুত থাক। পাপীর প্রতি ভগবান কখনই প্রসন্ন হইতে পারেন না। কর্ম্ম বিমুখ, ধর্ম্ম কাতর, অলসের মাথায় দেবতার অভিসম্পাতের নির্ম্মম বজ্র পড়িবেই পড়িবে। দেবতা উপহার চান হৃদয়ের—সম্পত্তির নহে। তোমার উদর কতটা পূর্ণ এবং তোমার শ্রীঅঙ্গ কতটা মার্জ্জিত এবং কি মূল্যের ভূষণ সম্ভারে ভূষিত—তাহা তিনি দেখিতে চাহেন না। বাগানের মালী যে প্রকার বন্ধ্যা বৃক্ষগুলিকে ইন্ধনের উপযোগীই মনে করে, দেবতাও তেমনই ধর্ম্ম-কর্ম্ম-চিন্তাবিহীন লোক সকলকে সন্তাপের যোগ্যই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

"ঐহিকের সুখ হলনা বলিয়ে, তা বলে কি তাঁরে যাবিরে ভুলিয়ে" এই ভাব যতদিন না আমাদের জাগরূক হয়, ততদিন আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই নিমজ্জিত থাকিব। নিঃস্বার্থ ভাব না আসিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না।" "লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে, লেখাপড়া করে যে,দুধিভাতি খায় সে",এই ছড়া স্নেহদুর্ব্বল দিদিমা এবং ঠাকুরমাদের মুখেই শোভাপায় কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই ছড়ার প্রতিধ্বনি আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন যুবকের হৃদয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত। লোভ দেখাইয়া লেখা পড়ায় অনুরক্ত করায় বিশেষ কিছু ফল হয় না। স্বর্গের লোভে বৃদ্ধারা যেমন পূজা অপেক্ষা সামান্য কারণ সকল অবলম্বন করিয়া কলহই অধিক করে এবং পূজার প্রধান অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান বিষয়ে অন্ধ থাকে, সেই প্রকার বিদ্যালুব্ধ বিদ্যার্থীরা বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনযোগী না হইয়া গাড়ী ঘোড়ার দিকেই সমধিক সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঠিক বৃদ্ধারা যেমন ধর্ম্ম না করিয়া মালা ঘুরাইয়া এবং জপ করিয়াই জীবন শেষ করে, এই সকল সুখের কাঙাল বিদ্যার্থিরাও তেমনি পুঁথি ঘাঁটিয়া ক্ষান্ত হয় এবং একটা বড় গোলামী কিম্বা ধনলাভের উপায় প্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।" এখন অধ্যয়ন তপ না হইয়া ভারি মজার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানের শিক্ষাপ্রণালীতে ত সংযম শিক্ষা মোটেই দেওয়া হয় না, আমোদ আহ্লাদ করিবার অবসরই অধিক দেওয়া হয়। ফলে দেখিতে পাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর অধিকাংশ ছাত্রই এক একজন বুড়ো আদুরে গোপাল তৈয়ার হইয়া আসিয়াছেন, চরিত্র নষ্ট করিতেছেন, টপ্পা গাহিতেছেন, নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া কেবল টাকার চেষ্টায় আপনার প্রাণপণ করিতেছেন। বিদ্যার পরিচয়ের মধ্যে বাহারে পোষাক এবং কথার আড়ম্বর ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কিছু অধিক গুণ লক্ষিত হয় না। ইহাদের গতিরোধ হইবে কবে জানি না? ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত না হইলে সখের পণ্ডিত ছাড়া, আমরা যথার্থ পণ্ডিত যে পাইব না, তাহা এক প্রকার স্থির।

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মিত্র।

মায়া।

সংসারের চারিধারে কেবল মায়ার খেলা। সংসারী-জীব কেবল মায়ার টানে নাক-ফোঁড়া বলদের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। জীব মায়ার ঘোরে মত্ত হইয়া অনিত্য-সুখকে আলিঙ্গন করিয়াছে, চৈতন্যের নিত্য-প্রীতি নিকেতন বিস্মৃত হইয়াছে। মায়ায় অন্ধ হইয়া মানুষ আপনাকে চিনিতে অক্ষম, মানুষ শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া "প্রেয়ের" অন্বেষণে উন্মত্ত।

এই মায়া হইতেই সংসারে আসক্তি এবং বাসনার উদ্ভব হয়। বাসনাই সকল অশান্তির মূল। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মনুষ্য সমাজে অবস্থান করিয়া শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, তাহার, বসন ভূষণ [illegible] বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন; [illegible]

প্রাপ্তির জন্য কামনার উদ্রেক না হইলে সংসার থাকে কেমন করিয়া ? কিন্তু বাসনা আমাদের বশ না হইয়া, আমরা বাসনার দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছি ; তজ্জন্য বাসনার তীব্র অনলে পড়িয়া আমরা অহরহঃ দগ্ধ হইতেছি।

এ বিশ্ব-সংসার, মায়া ও চৈতন্য জড়িত না হইলে সংসারের কার্য্য হয় না সত্য বটে ; তবে যেখানে মায়া, চৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে স্থানে জীবের দুঃখ,—আর যেখানে চৈতন্য মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়াও নিজ প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, সে স্থানে জীবের শান্তি, সুখ, প্রীতি ও আনন্দ।

কোন কবি বলিয়াছেন, যিনি বাসনা জয় করিয়াছেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি, বাসনা-জয়ই প্রকৃত জয় ; নেপোলিয়ান বল, সিজার বল, সকলের উপর তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত।" আবার সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা কারলাইল বলেন—The fraction of life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator .....Unity itself divided by Zero, will give Infinity. Make thy claim of wages a Zero, then thou hast the world under thy feet &c" অর্থাৎ এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে যেমন অনন্ত হয়, তদ্রূপ সুখ-সমষ্টিরূপে এককে বাসনারূপে হর দিয়া ভাগ করিবার সময় বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে, ভাগফলরূপ সুখ ততই বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে বাসনারূপ হরকে যদি শূন্যে পরিণত করিতে পার, তবে সুখও তোমার অনন্ত হইবে।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শান্তির অধিকারী।

জীব যে বস্তুতে যে পরিমাণে আসক্ত, সে বস্তু পাইবার জন্য অথবা সে বস্তুকে দেখিবার জন্য তাহার তত আকাঙ্ক্ষা বা লালসা জন্মে। পয়ঃ প্রণালীর কীট যেরূপ সুধাহ্রদে নিহিত হইলেও, আপনাকে তৃপ্ত বোধ করে না অথবা শিশু যেরূপে দুগ্ধ-ভাণ্ডের পরিবর্ত্তে কৃমি বিবর্দ্ধক শর্করার প্রতি আসক্ত হয়, তদ্রূপ আপাতমধুর সংসারের সুখকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করিয়া মানুষ তাহারই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, অগ্নির তেজ হ্রাস না হইয়া, যেমন উহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, মানুষ তদ্রূপে নিবৃত্তির পথে আপনার দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত না করিয়া তাহাতে বাসনার ইন্ধন সংযোজিত করিলে প্রবৃত্তির জ্বলন্ত শিখা হ্রাস না হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

"ন জাতু কামঃ কামানুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এ বাভি বর্দ্ধতে॥"

বিদ্যাপতি বলেন,—

"দীপক লোভে শলভ যেন ধাইল,
সো ফল ভুঁজইতে চাই।"

প্রজ্বলিতা দীপশিখা দেখিয়া পতঙ্গ তাহার

দিকে ধাবিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে, মানব বাসনার তীব্র আগুনের মনোলোভা রূপ সন্দর্শন করিয়া প্রলুব্ধ-নয়নে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে। যে মানব আত্মার উপর এই মায়ার আবরণ অপসরণ করিয়া আধ্যাত্ম জ্ঞান-সূত্রে নিজকে পরমাত্মা-কান্তের চরণতলে সমর্পিত করিতে পারেন, তিনি এই দেহেই রাধা-সহ রাধারমণের মিলন দর্শন করিয়া বৃন্দাবনের অতুল সুখ ভোগ করেন। তিনি শ্যামের বংশীরব শুনিতে শুনিতে বাহিরের কার্য্যে হস্ত ন্যস্ত রাখিলেও চিত্ত সেই প্রেমময় প্রাণবল্লভের চরণতলে সংযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এভাবে ভাবময় হইতে হইলে জীবকে স্বভাবে আসিতে হইবে।

তাহা হইলে জীবের আর ভাবের অভাব হইবে না। এইরূপে জীব মায়ার পাশ ছেদন করিয়া প্রকৃত প্রেমপাশে বদ্ধ হইতে পাইবে। কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির এরূপ অনুগত যে, তাহার নিকট স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত হইলেও তাহার দিকে না তাকাইয়া সে প্রবৃত্তির সদ্য প্রীতিকর পার্থিব বস্তুর দিকে প্রধাবিত হয়। তখন গরলই তাহার চক্ষে অমৃত, পয়ঃপ্রণালীর ঘৃণিত পূতি-গন্ধ বারিই তাহার চক্ষে গঙ্গোদক। জীব মায়ার নেশায় অন্ধ হইলে, পার্থিব আসক্তি তাহাকে কত হীন পথে লইয়া যায়, অদ্য তদ্বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান বর্ণন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উপাখ্যানটী এই,—

উত্তর-ভারতের কোন পল্লীতে এক বণিক বাস করিতেন। বণিকের পত্নী ও দুইটী পুত্র ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একের বয়স ৮ বৎসর এবং অপরের বয়স ৫ বৎসর। একটী মিষ্টান্নের দোকান হইতে তাঁহার সংসার চলিত। খরচ বাদে যাহা কিছু থাকিত, বণিক তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। এ বিষয় তাঁহার পত্নী অথবা পুত্র জানিত না। একদিন বণিক নিজ বিপণিতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়া আশ্রয়-ভিক্ষা করিলেন। বণিক দ্বিরুক্তি না করিয়া যথাস্থানে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

জলযোগাদি শেষ হইলে সন্ন্যাসী বণিকের নিকট শতধা-ছিন্ন বস্ত্রখানি সংস্কার করিবার জন্য একটু সুতা ও একটী ছুঁচ চাহিলেন। বণিক তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সন্ন্যাসী বণিকের নিকট বিদায় লইতে আসিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার সদ্ব্যবহারে অতি তুষ্ট হইয়াছি; কল্য তুমি আমায় আশ্রয় দিয়া যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমি কখনই ভুলিব না; তোমার প্রত্যুপকার করি, এরূপ সাধ্য আমার কি আছে? কেননা আমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী মাত্র। তবে যদি তুমি কোন অপার্থিব সামগ্রী লইতে ইচ্ছা কর, তাহা দিয়া আমি সুখী হই।"

বণিক বলিলেন,—"বাবাজী! আপনি সাধু-পুরুষ, আমায় দয়া করিয়া যাহা দিবেন, দিন।"

সন্ন্যাসী। "ঈশ্বর কৃপায় আমার [illegible] শক্তি আছে, যদ্বারা লোকের [illegible]

আমি তোমায় প্রদান করিতে পারি। তুমি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাবে কি? বণিক এই কথা শুনিয়া ঈষৎ চিন্তান্বিত হইলেন; পরে বলিলেন,—"ঠাকুর গোলকের নিত্য সুখ-কামনা কেনা করে? সেই প্রেম-রাজ্যে রাধাশ্যামের যুগল-মূর্ত্তি দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু মহাশয়! আমার পুত্রদ্বয় নিতান্ত শিশু, তাহাদের এ অবস্থায় রাখিয়া আমি আপনার সঙ্গে কিরূপে যাইব? যদি আমার উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ থাকে, তবে কিছুদিন পরে আসিবেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আচ্ছা আমি ৮ বৎসর পরে আসিব।" দেখিতে দেখিতে ৮ বৎসর অতিবাহিত হইল সন্ন্যাসী যথাসময়ে বণিকের গৃহে দেখা দিলেন। বণিক বলিলেন,—"মহাশয়! দুঃখের কথা বলিব কি, আমার পুত্রদ্বয় অসৎ-সংসর্গে প্রায় সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল, তাহাদের বিবাহ দিলে সৎপথে আসিতে পারে বলিয়া, তাহাদের বিবাহ দিতে মানস করিয়াছি;—আপনি;—সন্ন্যাসী তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি আর ৮ বৎসর পরে আসিব, তুমি প্রস্তুত থাকিও।"

পুনরায় আট বৎসর অতীত হইলে, সন্ন্যাসী আবার বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন কিন্তু দেখিলেন, বণিক গৃহে নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট বণিকের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইলেন এবং যোগ-বলে জানিলেন, বণিক বলদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত জমিকর্ষণ করিবার জন্য ক্ষেত্রে গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে বলদ গৃহে আসিল। সন্ন্যাসী সুবিধা বুঝিয়া গো-শালায় বলদের নিকট গিয়া নিজ কমণ্ডলু হইতে তাহার গাত্রে বারিসিঞ্চন করিলেন। বারির গুণে, সেই অপূর্ব্ব সলিলের গুণে বলদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন—"তবে আমার সহিত চল" বলদ বলিল—"আমার পুত্রদ্বয়ের অবস্থা দেখিতেছেন ত? আমি তাহাদের পরিত্যাগ করিলে তাহারা অনাহারে মরিবে, আমি এখনও সাধ্যমত তাহাদের কার্য্য করিতেছি; আর কিছুদিন পরে আপনার সঙ্গে যাইব"

সন্ন্যাসী "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপে পুনরায় ৮ বৎসর গত হইল। সন্ন্যাসী পুনরায় আসিয়া দেখিলেন—বণিকের গৃহদ্বারে একটি কুকুর রহিয়াছে; তাঁহাকে দেখিয়া কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যোগবলে জানিলেন,—"এ কুকুর আর কেহই নয়—সেই বণিক, এখনও মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।" কুকুরের গায়ে সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ বারি-সিঞ্চন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এবার চল। কুকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"মহাশয়! পল্লীতে চোরের যে উপদ্রব, তাহাতে আমি পাহারা না দিলে, দস্যুরা আমার পুত্রদ্বয়ের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যাইবে; আপনি আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন।"

কুকুর-রূপী বণিকের ঘোর আসক্তির বিষয় সন্ন্যাসী বুঝিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না, বলিলেন—"আচ্ছা, আমি ৮ বৎসর পরে আবার আসিব।"

কালচক্রের আবর্তনে আবার নির্দিষ্ট দিন

আসিল, সন্ন্যাসী এবার আসিয়া দেখিলেন, পুত্রদ্বয় আর এক অন্নে নাই। তাহারা "ভাই ভাই. ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পুত্রদ্বয় বলিল—"এই সন্ন্যাসীই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ, এই লোকটা যেদিন হইতে আমাদের ঘরে আসিতেছে, সেই দিন হইতে আমাদের লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে।"

সন্ন্যাসী বুঝিলেন—"পুত্রদ্বয়ের অর্থাভাবে মতিভ্রম ঘটিয়াছে" তিনি বলিলেন—"তোমাদের যদি এতদূর অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত, তবে এক কাজ কর, গৃহের দক্ষিণ কোণে এক গর্ত্তে কতকগুলি টাকা আছে, তোমরা উভয়ে তাহা বিভাগ করিয়া লও।"

সন্ন্যাসীর কথানুসারে গর্ত্তের নিকটে গিয়া পুত্রদ্বয় দেখিল এক—"ভীষণ সর্প"। পুত্রদ্বয় একে সন্ন্যাসীর উপর বিরক্ত, তদুপরি এই ঘটনা। তাহারা রাগে কাঁপিতে লাগিল এবং বলিল—ওহে ঠাকুর, তুমি আমাদের প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছ,—দেখ দেখি গুহার নিকট কি ?" এ সর্প—আর কেহ নয়, কুকুর-রূপী বণিক, এক্ষণে সর্প মূর্ত্তিতে নিজ পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন রক্ষা করিতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন—"আচ্ছা তোমরা সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখ, গুহার ভিতর এক কলসী দেখিতে পাইবে।"

পুত্রদ্বয় সর্পকে নিহত করিয়া কলসী উত্তোলন করিল। সন্ন্যাসী, এই অর্থ বিভাগ করিয়া লইবার জন্য, উভয়কে বলিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় সন্ন্যাসী সর্পের মৃত আত্মা লইয়া গিয়া এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে দেখিলেন, "এক রাজা ও রাণী পুত্রকামেচ্ছু হইয়া সন্ন্যাসীর অপেক্ষা করিতেছেন।" আমরা এইখানেই উপাখ্যান শেষ করিলাম। যদিও উপরিলিখিত বিষয়টী একজন সাধু কর্ত্তৃক কথিত গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি উহাতে আমাদের শিখিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে। জীব কিরূপ মায়ার দাস,—আসক্তির অনুগত, তাহা আমরা দৈনন্দিন ঘটনা হইতে জানিতে পারি। পাঠক, এই গল্পের সহিত তাহা মিলাইয়া লইবেন।

মায়ার বলে, আসক্তির উত্তেজনায়, বাসনার তীব্র অঙ্গুলি সন্তাড়নে জীব মোহিত হইয়া সম্মুখে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেও তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কিরূপ অধোগামী হয়, উপরি উক্ত ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। মায়ার কি অদ্ভুত কার্য্য। এই মায়াই চরাচর বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিসর্পিত রহিয়াছে। চৈতন্য এই মায়া-মেঘে আবৃত। অনন্ত লীলাময়ীর এই মায়া রহস্য ভেদ করা—অসীম শক্তিরূপিনীর সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের ন্যায় সীমাবদ্ধ জীবের দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ প্রহেলিকা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া আমরা করুণাময়ীর করুণা ভিখারী হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে, সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছি।

মায়ামুগ্ধ জীব আমরা, আমাদের উদ্ধারের জন্য চৈতন্যময়ী তুমি স্বইচ্ছায় সন্তানের প্রতি জননী-বাৎসল্যের ন্যায় কৃপা না করিলে আর উপায় কি মা ? পতিত জীবের উদ্ধারের উপায় তুমি না করিলে আর কে করিবে, মা। শরণাগত সন্তানকে পদাশ্রয় দাও।

শ্রীরসিকলাল দে।

সহসা।

(১)

না ফুরা'তে সঙ্গীতের দ্বিতীয় চরণ
কেন গেল থামি ?
না আসিতে অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ তপন
কেন গেল নামি'?
কেন ফুল পড়ে খসি, না হইতে বাসি,
কার অভিশাপে ?
নিদাঘের মাঝখানে কেন বর্ষা আ'সি,
সহসা বিলাপে ?

প্রতিমা।

(২)

এলোচুল, উচ্চহাসি, সন্তানের স্নেহ,
অনাদর ভান,
বিপদে কারুণ্যমূর্ত্তি, সম্পদে সন্দেহ,
মুক অভিমান,—
এ বিচিত্র ভাব পুঞ্জে যে রূপ তোমার
ছিল বিকশিত,
তাহারি প্রতিমা গড়ি, পরাণ আমার
চরণে পতিত !

—ঃ০ঃ— শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল।

অবসান।

প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠপুরী।

(লক্ষ্মী কমলাসনে, পার্শ্বে ভক্তি ও মুক্তি চামর-ব্যজনে নিযুক্তা)।

গীত।

ভক্তি ও মুক্তি।

আয় আয় পাপী তাপ জুড়াইতে
মধুর শান্তি-ধামে ;
জুড়াবে সে জ্বালা যে যাতনা পেলি
কুটিল করম-ভূমে।
ভুলে যাবে মিছে মায়ার স্বপন
ভুলে যাবে মিছে মরম-বেদন।
মধুরে ভরিয়ে প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে
দেখ্‌রে জীবন রামে,
হৃদয় মাতাও প্রাণ ভরে গাও
মাত মাত হরি হরি নামে।

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)।

গাওরে মন তাঁহার গুণ গান,
সুখ ধাম, প্রাণ রাম জয় জয় কারণ।
গাওরে দুঃখ-হারি, দানবারি-দীন-পালন
দয়িত হৃদয়েশ, পরমেশ মন-রঞ্জন।
জয়তি জ্যোতিঃরূপ ; জগ-সৃজন-লয় কারণ,
জনম জরা হীন, জগদীশ জগ-জীবন।

নারদ।—

বহু দিন, বহু দিন আসি নাই হেথা,
চিদানন্দ ময় এ গোলক-পুরী,
আঁধারে মগন ছিল যেন ;
এবে কমলার আগমনে
ফুল্ল মনে হাসিছে প্রাণের হাসি ;
প্রভারাশি উঠিছে ফুটিয়া।
নারায়ণ নব-রূপ-ধরি,
। মাঝে এখনও লীলায় ব্রতী,

সতী-সাধ্বী আপনার ব্রত
শিখাইয়া সতীত্ব মহিমা ;
এসেছেন নিজ পুরে।
কিন্তু বিম্বাধরে নাহি সে সুধার হাঁসি।
নিদারুণ বিরহ-বিষাদে
এখন ব্যাকুল প্রাণ ;—
নর-লীলা কত দিনে হবে অবসান ?
পিপাসিত প্রাণ কত দিনে পরিতৃপ্ত হবে ?
কমলার সনে কমল-আসনে,
নেহারিব নারায়ণে—
গোলক-মাঝারে অবিচ্ছেদ যুগল মিলন।
(প্রণাম)।

লক্ষ্মী।—

এস এস দেবর্ষি-নারদ,
কত দিন দেখি নাই তোমা
দেব-লোকে আছতো কুশলে ?

নারদ :—

মাতৃ অঙ্ক ছাড়ি গো জননী
শিশু কি সুখেতে থাকে ?
সুখ দুঃখ প্রসাদ তোমার।
এ গোলক ছাড়ি নররূপ ধরি,
মর্ত্তে অবতরি দুই জনে,
করিলে অদ্ভুত লীলা !
মোরা দীর্ঘ বিরহ বেদনে,
কাঁদিয়াছি অনুদিন ;
পৃথিবীর স্নেহ মমতার, এত কি বন্ধন দৃঢ় ?
কেমনে মা ভুলে ছিলে অধম সন্তানে ?

লক্ষ্মী।—

কি করিব বল বসে !
ছাড়ি নারায়ণে ব্যাকুলিত প্রাণে
তিলেক রহিতে নারি ;
না পারি ছাড়িতে সঙ্গ তাঁর ;
তাই নরদেশে, মানবীর বেশে
হয়েছিনু মমতার দাসী।
লীলা-কাল পূর্ণ প্রায় দেখি,
একাকিনী এসেছি চলিয়া !

নারদ।—

জানি মাগো জলধি-নন্দিনী,
শক্তি বিনা পুরুষ নিশ্চল,
হরিবারে ধরণীর ভার,
ত্রেতায় এ রাম অবতার ;
তুমি মাগো শক্তি-স্বরূপিণী,
সীতা-রূপে সঙ্গিনী তাঁহার।
কিন্তু কত দিনে আর হবে
রামলীলা শেষ ?

লক্ষ্মী।—

কেমনে বুঝিব বল,
মায়াময় মুগ্ধ বুঝি মর্ত্তের মায়ায়,
নহে ধরা মাঝে এখনো
কিসের তরে ?
মর্ত্ত হ'তে নাথের সকাশে
লভিনু বিদায় যেই দিন,
সেই দিন হতে, বিহ্বল
পরাণ তাঁর,
অবিরল হুতাশে বিবশ,
দেখি তাঁর এ নবীন ভাব
কত হাসি আপনার মনে।
এ রোদনে কি যে শিক্ষা
নারি বুঝিবারে।

নারদ।—

জননী গো!

প্রতি পদক্ষেপ তাঁর লোক-শিক্ষা হেতু।,

বাড়াইতে ভক্তের সম্মান,

রাখিবারে ভক্তাধীন নাম,

অবতার উদ্দেশ্য তাঁহার,

রাম-রাজ্য আদর্শ করিয়া

ভাবী রাজাগণ শিখিবেক প্রজার পালন।

রাজ-ধর্ম্ম কত যে কঠোর

কি কঠোর সত্যের পালন,

ধরণীর প্রতি মানবেরে শিখালেন রামচন্দ্র,

তুমি ওমা করুণা-রূপিণী,

হয়ে ঘোর কানন-চারিণী,

কি কঠোর পতিব্রতা-ব্রত

শিখায়েছ পতিব্রতাগণে,

এবে দম্পতির হৃদয়-যুগল

কি সুন্দর ডোরে বাঁধা,

কি অচ্ছেদ্য আত্মার মিলন—

রোদন করিয়া তব শোকে

শিখাবেন মানবেরে।

(মায়ার প্রবেশ)।

লক্ষ্মী।—

কহ মায়া! স্বপন সঙ্গিনী;

দেবলোক হ'তে কি সংবাদ করিলে বহন?

এবে কোথা হ'তে আগমন

বিরস-বদন কিবা হেতু?

মায়া।—

আসিতেছি দেবসভা হতে,

মিলি দেবগণে, নন্দন-কাননে;

মন্ত্রণায় ছিল নিয়োজিত,

কি উপায়ে রাম-লীলা হবে অবসান।

কুক্ষণে মন্দার হেতু পশিনু কাননে

মন্দাকিনী তীর পথে,

অলক্ষেতে শুনিতে মন্ত্রণা

লুকাইনু কল্পতরু পাশে,

দেখিলাম দুর্ব্বাসাদি যত ধীরে,

সে দেব-সভার মাঝে।

করি যুক্তি দেবগণে মিলি

দিল ভার কাল পুরুষেরে,

রাম সঙ্গে লক্ষ্মণের বিচ্ছেদ ঘটাতে,

দুর্ব্বাসা সহায় হবে তাঁর,

দেবাদেশ, স্নেহ লেশ না রবে অযোধ্যায়,

মমতার ছায়া হায়! নাহি ধরে রাম হৃদে

স্নেহ-মমতায় সঙ্গে লয়ে

আমারে ছাড়িতে হবে সে অযোধ্যা-পুরী।

তাই প্রাণ কাঁদিছে আমার,

কেমনে সে দেব আজ্ঞা করিব পালন?

নারদ।—

প্রভু-হারা হয়ে,

কারো প্রাণ নাহি স্থির;

ভাল যুক্তি করেছেন দেবগণে;

লীলাময় আপন ইচ্ছায় করেছেন

এ সকল লীলা!

বিশ্ব বিমোহিনী, এ সংবাদ-শুনি,

পুলকিত হইল পরাণ,

যাও তবে ত্বরা ধরামাঝে—

নারায়ণে আন গোলকপুরী।

লক্ষ্মী।—

সুযুক্তি করেছেন দেবগণ

লক্ষ্মণ পরাণ সম তাঁর

পালকের তরে লক্ষ্মণের বিরহ ঘটিলে
অসহ জীবন ভার হবে
অচিরে পুরিবে ক্ষুব্ধ আশংসেসবার ;
ইথে মায়া কি লাগি বিষাদ,
অবসাদ নাহি কি বিরহে তব ?
যাও, দেব আজ্ঞা করহ পালন।
মর্ত্ত্যমাঝে ভেটহ বামনে।

মায়া।—
আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য দেবী,
কিন্তু কি যে করি বুঝিতে না পারি হায়,
সাধিবারে পারি কিনা পারি দেবাদেশ।
(প্রস্থান)।

নারদ।—
আমিও বিদায় মাগি পায়
সে দেব-সভায়, যাই আমি ত্বরিত-গমনে,
উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইব ত্বরা।
(প্রস্থান)।

পটক্ষেপন। ক্রমশঃ।

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

পুরী বা জগন্নাথ ক্ষেত্র।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্রকে পুরুষোত্তম বলে এবং নীলাচলও বলিয়া থাকে। এস্থান বিমলা-দেবীর পীঠস্থান। জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব, কিন্তু জগন্নাথ মাহাত্মেই এ স্থানের এত গৌরব অর্থাৎ এস্থান পৃথিবীর মধ্যে এত বিখ্যাত। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, জগন্নাথদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলে, দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা। এমন চমৎকার মূর্ত্তি আর হয় না ; যেমন বড়, তেমনই ভয়ঙ্কর, তেমনই সুন্দর। ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর, ইহার মধ্যে কি দিব্যভাব নিহিত, পাঠক বুঝিয়া দেখুন। দর্শনে চক্ষু সফল, জীবন সার্থক, প্রাণমন শীতল। প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিলেও তৃপ্তি হয় না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ; বিনা দর্শনে, কেবল বর্ণনা পাঠে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। জগন্নাথের বৃহৎ মূর্ত্তির বামে সরস্বতী এবং দক্ষিণে অর্থাৎ জগন্নাথ ও সুভদ্রার মধ্যে লক্ষ্মীদেবী।

বঙ্গদেশ হইতে হাঁটা রাস্তায় শ্রীক্ষেত্রে আসিতে হইলে বৈতরণী নদী পার হইয়া আসিতে হয়। বৈতরণীকে বিরজা নদীও বলে। বৈতরণী পার হইলেই ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া যেন স্বর্গরাজ্যে আসা গেল। বৈতরণী তীরে সপ্ত মাতৃকা দেবী আছেন ; তাঁরা যমের মাসী পিসী। বৈতরণী পার হইলে আর যমে ছুঁতে পারে না, অর্থাৎ যম-দণ্ডের ভয় থাকে না। এ সকল বিষয় পরে বক্তব্য। অদ্য শ্রীক্ষেত্র বিবরণ কিঞ্চিৎ বলা যাউক।

শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট-বর্ত্তী হইলে দেখা যায় যে, শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে দীর্ঘ এবং সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীর খুব উচ্চ এবং পরিসরেও বিস্তৃত, যেন গড় বা কেল্লাররূপে গঠিত। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে। তন্মধ্যে সিংহদ্বার নামে যে দরজা বিখ্যাত, তাহাই সদর দরজা। যেমন পূর্ব্ব আর পর, তেমনই পূর্ব্বদিকের দরজাই প্রধান, তৎপরে [illegible]

পশ্চিম দরজা, উত্তর দরজা, দক্ষিণ দরজা। এই সদর দরজার নাম সিংহদ্বার কেন হইল, তাহা পরে বলিব। ইহার ইতিহাস বড় চমৎকার। এই সিংহদ্বারের বাহিরে, অনতিদূরে অরুণস্তম্ভ। খুব বড় থাম এবং অত্যন্ত উচ্চ। এ প্রকার উচ্চথাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। কলিকাতার মনুমেণ্টের আকার। প্রায় চক্ষু যতদূর যায় তত উচ্চ। অথচ একটী পাথরে নির্ম্মিত। কেমন করিয়া এমন উচ্চ স্তম্ভ একখানি পাথরে নির্ম্মিত হইল এবং কেমন করিয়াই বা এত অতিরিক্ত ভারি প্রস্তর উঠাইয়া বসান হইল,তাহা ভাবিয়া স্থির করা দুষ্কর। মনে হয় যেন দৈববল ভিন্ন মানুষের বল বিক্রম, বুদ্ধি কৌশলে এ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। ইংরাজেরা বিজ্ঞান বলে কত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সাহায্যে অতিরিক্ত ভারি দ্রব্যও উঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু এই স্তম্ভের শতাংশের একাংশও উঠান তাঁহাদের বিজ্ঞান বহির্ভূত! এই স্তম্ভ পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রে ছিল না, বা এখানে প্রস্তুত হয় নাই। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের বহু শত বর্ষ পুর্ব্বে শ্রীমন্দির হইতে চল্লিশ মাইল দূরে, কনারক নামক স্থানে ইহা বিদ্যমান ছিল, শ্রীমন্দির নির্ম্মাতা পুরীরাজ তথা হইতে এখানে আনেন। এই কনারকে প্রস্তরে খোদিত অতি চমৎকার চমৎকার শিল্পকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। হণ্টার সাহেব বলেন, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমনতর কারুকার্য্য দেখা যায় না। এই কনারকের সূর্য্য মন্দির হইতে একখণ্ড প্রস্তর একজিবিসনের সময় গবর্ণমেণ্ট হইতে ভগ্ন করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা [illegible] অনেক কষ্ট, অনেক চেষ্টায়, প্রায় একমাইল পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আর হইল না; তথায় পড়িয়া থাকিল; সুবিক্রমশালী ইংরাজ রাজ ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কনারকের বিষয় পরে বক্তব্য, কারণ শ্রীমন্দিরের সম্বন্ধে একটু প্রথমে দেখা উচিত। এই যে অরুণস্তম্ভ উল্লিখিত হইল, তাহা এত বড় পাথরের, অথচ শালগ্রাম শিলার ন্যায় কষ্টি পাথরের; ইহাকে অরুণস্তম্ভ অর্থাৎ সূর্য্যস্তম্ভ বলে; তা না বলিয়া আর কি বলিবে? অন্য কি নামই বা ইহার উপযুক্ত হইবে? সূর্য্যস্তম্ভ যে বলে, তাহা ঠিকই বলে, কারণ এত উচ্চে বাস, সূর্য্যদেবেরই যোগ্য। সূর্য্যদেব ভিন্ন কেই বা এত উচ্চে উঠিতে সমর্থ।

অরুণস্তম্ভ ছাড়াইয়া সিংহদ্বার,খুব বড় বাড়ী। দ্বার বলিলে দরজা মাত্র বুঝায়, কিন্তু এই সিংহদ্বার, ইনি দ্বারের কার্য্য করেন, অথচ একটী প্রকাণ্ড বাড়ী। ইহাকে প্রবেশদ্বার বলে। বড় কারিগরী। তার পর "বাইস পাপদ" অর্থাৎ বাইসটী সিড়ি—পঁইটা বা ধাপ। এই বাইস ধাপ উঠিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গনে যাইতে হয়। পাঠক বুঝুন, মন্দিরের প্রাঙ্গনই এত উচ্চ, তবে মন্দির কত উচ্চ হইবে! কথিত আছে, এই বাইস সিড়ি উঠিলে সকল পাপ দূর হয়; পাপ দূর হয় বলিয়াই "পাপদ" অর্থাৎ পাপক্ষয় বলে। উচ্চারণে পাপক্ষয়কে চলিত কথায় "পাপদ" বলিয়া থাকে। উড়িষ্যা-দেশের অন্তর্গত পুরীর শ্রীমন্দিরে এই বাইস 'পাপদ' হইতে পাপোষ কথাটী সর্ব্বদেশে সর্ব্ব স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রবেশ দ্বারের

ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে ঢুকিবার জন্য যে আসন ব্যবহার হয়, এখন সাধারণ কথায় সর্ব্বত্রই তাহাকে পাপস বলিয়া থাকে। এই প্রকার, কোথা হইতে, কি কারণ হইতে যে কোন কথা উঠিয়াছে, তাহার নিরাকরণ নাই, তার প্রমাণ দেখুন পাপক্ষয় হইতে পাপদ, তৎপরে পাপদ হইতে পাপোস কথাটীর উদ্ভব।

এই বাইস সিঁড়ি উঠিয়া ক্রমে শ্রীমন্দিরে অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমেই ভোগ মন্দির। ইহা চতুর্দ্দিকে ঘেরা, দরজা জানালা আছে। অথচ চকমিলান করা বাড়ীর প্রণালীতে প্রস্তুত। কেহ জগন্নাথদেবের ভোগ দিয়া বহু সংখ্যক লোক খাওয়াইলে, ইহার মধ্যে সে কার্য্য সমাধা হয়। ভিতরে সকলে খাইতেছে, অথচ বাহিরের লোকে দেখিতে পায় না, কেবল জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখের বড় দরজা খোলা থাকে, যেন ঠাকুর লোকজনের খাওয়া দেখিতেছেন, এবং তাঁর সুদৃষ্টি পড়াতেই প্রসাদ অমৃত তুল্য হইয়াছে। এই ভোগমন্দির বড়ই জীর্ণ হইয়াছিল, সম্প্রতি মেরামতে ইহা নবকলেবর করা হইয়াছে এবং মজবুৎ রাখিবার জন্য বড় বড় লৌহ স্তম্ভ প্রভৃতি দ্বারা সুদৃঢ় করা হইয়াছে। বাহির হইতে বাড়ীটি যেন ছবির ন্যায় দৃষ্ট হয়।

ভোগ-মন্দির অতিক্রম করিয়া নাট মন্দির; ইহা অতিশয় প্রশস্ত, কত হাজার হাজার লোকের সংকুলান হয়। ইহার দেওয়ালে ও স্তম্ভে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। নাট মন্দিরের মধ্যেই যাত্রা গান, নাচ তামাসা, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়া থাকে, যেমন অন্যান্য ঠাকুর বাড়ীর নাটমন্দিরে হয়। নাট্যশালা বা নাট্যমন্দির হইতে অপভ্রংশে নাটমন্দির কথাটীর উদ্ভব হইয়াছে।

নাটমন্দির হইতে আরও অগ্রসর হইলে জগমোহন মন্দির। ইহা যেন জগন্নাথদেবের Reception hall বা audience hall বা audience chamber তাঁর খাস কামরা, কারণ এই জগমোহন মন্দির হইতে সাধারণে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া থাকে। তবে জগন্নাথের কৃপায়, তাঁহার সেবক অর্থাৎ পাণ্ডাদিগের সহিত বন্দোবস্তে মণিমন্দিরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়। ইহারই দেখা দেখি, রাজারাজড়া, জমিদার ও বড়মানুষের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করার পদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমার একটি কথা মনে পড়িল। একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী কৌতুকছলে বলিয়াছিলেন যে "বাবা ভগবান মানব মাত্রের কার্য্যফলে যে যেমন, অর্থাৎ তাদের ইহ জন্মের কর্ম্ম ফলানুসারে, পরলোকে তাহারা যেমন কাজ করিয়াছে, তদুপযুক্ত স্থান পাইতেছে; যে আজীবন সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্যযুগের উপযোগী মানুষ হইয়াছে, তাহাকে ভগবানের এক এক লোমকুপ মধ্যে যে অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার করিতেছে, তার মধ্যে কোথাও সত্য, কোথা ত্রেতা, কোথা দ্বাপর এবং কোথায় বা কলি। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সত্যযুগের উপযোগী কার্য্য করিল, তাহাকে সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যেখানে সত্য [illegible] তথায় স্থাপন করিলেন; যে দ্বাপরের উপযোগী কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে [illegible] দ্বাপরের

মধ্যে কোন এক দ্বাপরে, যে কলির উপযোগী কার্য্য করিল, তাহাকে কলিতেই স্থাপন করিলেন। বাবা "মহাজনো যেন গতস্য পন্থা" ভগবানের এই বন্দোবস্ত দেখিয়া আমাদের বর্ত্তমান ইংরেজ রাজ, তোমারা যে যেমন কাজ করিতেছ—তদুপযোগী ফল দিতেছেন অর্থাৎ কাহাকে বা তার উন্নতির জন্য প্রমোশন দিতেছেন, কাহাকেও বা কর্ম্মে শিথিলতা বা অযত্ন জন্য নামাইয়া ডিগ্রেড করিতেছেন। বাবা, এই প্রমোশন, ডিগ্রেড, বাহাল, বরতরফ প্রভৃতি কার্য্য ভগবানের কার্য্য দেখিয়াই ভগবানের Representative যে রাজ,তাঁহারাও তাই করিয়া থাকেন। যেমন সিংহকে পশুরাজ বলে তেমনই দেশের রাজাকে নরেন্দ্র বলিয়া থাকে।" যে সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ করিলাম,তিনি বাঙ্গালা ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দি, পারস্য ভাষাতে পণ্ডিত। তাঁর পূর্ব্বোল্লিখিত কথার উদ্দেশ্য এই যে, পরজন্মে স্বর্গ-নরক ব্যবস্থা যাহা ঈশ্বর করিয়াছেন, তেমনই বর্ত্তমান রাজারাও Promotion,Degrade প্রভৃতি নকল করিয়াছেন, তেমনই পাপক্ষয় হইতে পাপদ বা পাপোস শব্দ, নাট্যমন্দির হইতে নাটমন্দির প্রভৃতি। কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহাকেই বলে—"ধান ভানতে শিবের গীত।" পাঠক যেমন যাত্রা দলের মধ্যে সংদের, তেমনই আমি নিজে সং হইয়া সংসারে আসিয়া সং সাজিয়া বসিয়া আছি, আমার দ্বারা সং দেওয়া ভিন্ন আসল কাজ আর কেমন করিয়া হইবে, তবে আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভরসা।

মণি-মন্দিরই জগন্নাথদেবের মন্দির। এই মণি-মন্দিরে জগন্নাথ থাকেন বলিয়া আমাদের অন্তরে, বক্ষঃস্থলে যথায় ভগবান বিরাজিত, সেস্থানকে মণি-মন্দির বলে। কোঠার ভিতর চোর কুঠরি। অথবা সাধুভাষায় হৃদয় সিংহাসন বলে। পুরীর এই মন্দির মধ্যে মণি-সিংহাসন অর্থাৎ রত্ন-সিংহাসনের উপর জগন্নাথদেব বিদ্যমান। দর্শন করিয়া এই রত্ন-সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পাণ্ডাদের ভাষায় প্রদক্ষিণ করাকে পরিক্রমা করা বলে। কথিত আছে যে এই মণি-সিংহাসন লক্ষ লক্ষ শালগ্রাম শিলার দ্বারা গঠিত!

প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা থাকে, এবং যখনই যাওনা কেন, লোকে লোকারণ্য, সকল সময়েই লোকের ভিড় ভিন্ন দেখা যায় না। প্রতিদিনই এইরূপ। কিন্তু পর্ব্ব উপলক্ষে যে কত অধিক ভীড় হয়—তাহা বর্ণনাতীত। আমার অদৃষ্টক্রমে আমার অবস্থিতি কালে এক রাত্রিতে জগন্নাথের ছদ্মবেশ হয়—তাহাকে পদ্মমুখ বলে; ইহা সচরাচর ঘটে না, কোন কোন বৎসর এক রাত্রির জন্য হইয়া থাকে। এ পদ্মমুখের দিন পঞ্জিকায় নাই; সুতরাং পর্ব্ব বলিয়া দূরবর্ত্তী লোকেরা না জানিতে পারায়, এসময়ে বৈদেশিক লোকের ভিড় তত সম্ভবে না কিন্তু তথাপি পদ্মমুখের দিন স্থানীয় লোকে পূর্ণ হওয়ায় এত অতিরিক্ত ভিড় দেখিয়াছিল যে তাহা বর্ণনাতীত। সেদিন মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেয়—অবারিত দ্বার। আমি বহুকষ্টে তিনজন বলবান পাণ্ডার সাহায্য অঙ্গিণার মধ্যে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মণি-মন্দির প্রবেশের সময়

এমন চেপ্টাইয়া গেলাম যে মাগো, বাবা গো বলিবারও সামর্থ রহিল না; চিৎকার করিলেই বা কে শোনে, এতই কলরবের উচ্চধ্বনি। বোধ হইল—লোকের পায়ে পায়ে আমার পায়ের পাতা চটকাইয়া গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, পায়ের অঙ্গুলি সকল ছিন্ন হইয়া কোন্‌টা কোথায় পড়িয়া আছে। আর একটা হাত ভিড়ের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, বোধ হইল যেন সে হাতটা আর নাই, দৃঢ়রূপে পেষিত হইয়া কোথায় লাগিয়া গিয়াছে, বুঝিলাম প্রাণবায়ু শীঘ্রই নির্গত হইবে, তজ্জন্য বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া, একদিন তো মরিতেই হইবে, অথচ জগন্নাথের মন্দির মধ্যে শ্রীমুখ দেখিতে দেখিতে মৃত্যু হউক, আশায় জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। দর্শন বেশ হইল—মৃত্যু হইল না। মন্দির হইতে ফিরিবার সময় যে হস্তের আশা ছিল না, দেখিলাম সে হাতখানি আছে কিন্তু অবশ। পায়ের দিকে আর তাকাইতে সাহস হইল না, কারণ পায়ের অঙ্গুলির একটীও থাকার সম্ভাবনা ছিল না; এবং পাছে দেখিলে মূর্চ্ছা হয়, এজন্য তাকাইলাম না, বা তাকাইতে সাহস মাত্র হইল না, পরে এক দোকানে আসিয়া প্রথমে একটু জল প্রার্থনা করিয়া দেখিলাম যে সকল অঙ্গুলিই বর্ত্তমান আছে, দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম এবং পুনরায় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! রব করিতে লাগিলাম। পাঠক! ভিড়ের কথা বলিয়া বুঝান যায় না, একবার প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিবেন না। কিন্তু এত যে কষ্ট দর্শনানন্দে সব ভুলিয়া যাইবেন। দর্শনের পর আর বিন্দুমাত্র কষ্ট থাকিবে না এমনই দর্শনের ফল, এমনই জগন্নাথের মাহাত্ম্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা থাকে। কেবল মাত্র ভোগের সময় পাণ্ডারা দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু তাও বার বার—ঘন ঘন, কারণ দিবা রাত্রির মধ্যে বায়ান্ন বার ভোগ দেওয়া হয়, এজন্য জগন্নাথের বায়ান্ন ভোগ বলিয়া কথাটা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ভোগও দুইবার এক রকমের হয় না, বায়ান্নবার পৃথক পৃথক বায়ান্ন রকমের, এমন কি তন্মধ্যে একবার ভিজাভাত পান্তাভাত ও তদুপযোগী দ্রব্যাদি ও থাকে। আর রাজ ভোগের তো কথনই নাই। এলাহি কারখানা, ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মঙ্গল আরতি, তারপর রাত্রি বেশত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান, বেশ পরিবর্ত্তন, পাঁকাল ভোজন অর্থাৎ ভিজাভাত পান্তাভাত ভোগ। এই প্রকার সমস্ত দিন রাত নানা প্রকার সেবা-সুশ্রূষা, ভোগ রাগাদি হইতে থাকে। বড় পূজা রাত্রি দুই প্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে হইয়া থাকে। তথনকার বেশ অতি সুন্দর সাজান গোজান। বেশভূষা হইলে সেবাদাসীদের নৃত্যগীত হয়, ইহা মণি-মন্দিরের মধ্যেই হইয়া থাকে, ঠিক যেন সেবাদাসীরা ঠাকুরকে ঘুম পাড়াইতেছে। এই সেবাদাসীরা বিবাহ করিতে পায় না; ঠাকুরকেই আত্মসমর্পন করিয়া রাখে এবং সংসার নির্ব্বাহ জন্য মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে। তারপর শয়নান্তে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়; পরে প্রাতে আবার মঙ্গল আরতি ইত্যাদি।

বড় শৃঙ্গারের বেশ মঙ্গল আরতির সময়েও থাকে, তারপর দন্ত ধাবন ইত্যাদি। এই মঙ্গল আরতি একটী গম্ভীর ব্যাপার, যেন প্রাতে ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, পাণ্ডারা স্তব স্তুতি করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইতেছে "জগন্নাথ উঠ" বলিয়া কাতরে কত ডাকিতেছে, যেন এক এক বার দরজা খুলিতে যাইতেছে কিন্তু দরজার কাছে গিয়া কান পাতিয়া বুঝিল যে, ঠাকুর শয্যা ত্যাগ করেন নাই, অমনই নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে দূরে আসিয়া পুনরায় "জগন্নাথ উঠ", জগন্নাথ উঠ, প্রভৃতি রব করিতে লাগিল। ক্রমে যেন ঠাকুর উঠিয়াছেন বলিয়া বুঝা গেল, অমনই অনেক লোকে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। "জয় জগন্নাথ" রব মন্দির ভেদ করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ঠাকুর গত রাত্রের শৃঙ্গারের বেশ ধরিয়া আপন স্থানে দণ্ডায়মান, দর্শনে মন প্রাণ মোহিত হয়। পাঠক, আপনি অবশ্য অন্য অনেক তীর্থই দেখিয়া থাকিবেন, যদি জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন, তবে আপনি আমার অপেক্ষাও অধিক বুঝিতেছেন কিন্তু যিনি কখনও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন নাই, তিনি যেন সুবিধামত একবার দর্শন করেন; তাহা হইলে দেখিবেন—এমন প্রাণ-মনোহর মূর্ত্তি আর হয় না; দর্শনে হৃদয় শীতল হয়, পাপ তাপ দূরে যায়। তাপ দূরে না গেলে প্রাণ শীতল কিরূপে হইবে। এই জন্যই শ্রীক্ষেত্রের এত মাহাত্ম্য, জগন্নাথ, জগমোহন, পতিতপাবনের এত নাম। জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!! জয় জগন্নাথ!!!

(প্রার্থনা) হে প্রভু! এ পতিতজনকে উদ্ধার কর; আমি অতি কৃপাপাত্র; আমার যত পাপ, সমস্তই জ্ঞানকৃত। আমার ন্যায় অধমের তোমার কৃপা বিনা আর গতি নাই। আমি বৃথা সামান্য, অস্থায়ী বস্তুর লোভে মুগ্ধ হইয়া, পরম ধন ভুলিয়া আছি। তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে পারিলাম না। তোমা হইতেই উৎপত্তি, এবং পুনরায় তোমার কাছেই যাইব, যেন তোমাকে ভুলিয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে মত্ত না হই। হে প্রভু! আমি অপরাধী, আমার দিন গিয়াছে, আর সময় মাত্র নাই। তুমি কৃপাময় দীনবন্ধু, আমাকে কৃপা কর, অন্ততঃ আমি যেন তোমার নাম সাধন করিতে পারি; কারণ নাম সাধনে সমুদয় অপরাধ নষ্ট হইয়া যায়। দয়া কর, নাথ, দয়া কর।

গীত।

"চল মন, নিজ নিকেতন।
কেন আশার আশায় অচেতন!
এতো নয় তোমার নিবাস, থাক পরেরি আবাস
কোন দিন তাড়িয়ে দেবে, যেতে হবে,
করবে হা হুতাশ;
তখন এ বৈভব, যত সব, দেখিবে নিশার স্বপন!
ভেবে দেখ মনেতে, তুমি আস্‌বার কালেতে,
বলুলে যেমন যাব, না রহিব, আস্‌বো ত্বরাতে;
গেলে বাড়ী ফেলে,নাহি বলে,হইলে তা বিস্মরণ।
এসে পরেরি মোকাম, সদা করূছ চুণকাম,
তাকে নকল ক'রে, চক্ষে হেরে,পুরাও মনস্কাম;
সে যে পাকাবাড়ী, তাহা ছাড়ি, কাঁচা
বাড়ীতে যতন।
যার প্রসন্ন কপাল, হলে প্রসন্ন গোপাল,
ওরে ভ্রম ঘুচিবে, ঠিক বুঝিবে,গিয়ে সব অজ্ঞান
গোঁসাই রাধাচরণ, বলেন দাস, সাধুসঙ্গে
হও চেতন।"

ভাইরে, ভগবান আছেন। অর্থাৎ এক-জন যে কর্ত্তা আছেন, ইহা মনুষ্য মাত্রেরই

মনের অটল ভাব। ভগবান মানে ঈশ্বর—নয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়, তিনি ভক্তের উপাস্য ধন। উপাস্য কে? না, জগন্নাথ জগতের নাথ, জীব মাত্রের ঠাকুর। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলের তিনি ঠাকুর! অতএব একমেবাদ্বিতীয়ম্; ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা; তাই তাঁহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ।

মনের আবেগে, আমার প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; পাঠক মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহ শরীর রথ বা বাহন বিশেষ, আর মন সারথি। সারথি যেদিকে চালায়, সেই দিকেই যেতে হয়। "মন গিয়েছে ছড়িয়ে আমার, কুড়িয়ে আনা ভার" লোক-লজ্জায় মনকে সংহত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় মনে করিতে চেষ্টা করি।

ঐযে শ্রীমন্দির, তার বাহিরে অথচ বাহিরের প্রাচীরের মধ্যে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু আছে। যথা:—বিমলা দেবীর মন্দির, লক্ষ্মীর মন্দির, সরস্বতীর মন্দির, নর-সিংহ, নারায়ণ, বটকৃষ্ণ, রোহিণী-কুণ্ড, যাহাতে কাক পক্ষী চতুর্ভুজ হইয়াছিল, স্নান মণ্ডপ, কৈল বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ কলির বৈকুণ্ঠ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীপাদ-পদ্ম চিহ্ন, মহাপ্রভুর হস্তাঙ্গুলি চিহ্ন (অর্থাৎ গরুড়-স্তম্ভের নিকট যথায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন, তথায় তাঁর পায়ের নীচের পাথর ক্ষয় হইয়া যে পদচিহ্ন হয়, এবং যে স্তম্ভের পার্শ্বে হাত দিয়া তিনি দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন, সেখানে হাতের অঙ্গুলি পাঁচটীর দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, এবং যাহা অদ্যাবধি বিদ্যমান ও অসংখ্য শ্রীক্ষেত্র-যাত্রীর নয়ন-মন-রঞ্জন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ষড়ভূজার মন্দির, শীতলা, বলিরাজ, মহাবীর, বট-মঙ্গল, গদাধরের পাদ-পদ্ম, সিদ্ধ গণেশ, পতিতপাবন প্রভৃতি সকলই এই জগন্নাথ-দেবের আঙ্গিনার মধ্যেই স্থাপিত।

আঙ্গিনার বাহিরে অর্থাৎ আঙ্গিনার প্রাচীরের বাহিরে, বারভাই, মহাবীর, বেড়া লোকনাথ, বেড়া কালিকা, কাশী বিশ্বনাথ, দোলবেদী প্রভৃতি নানা মন্দির।

শ্রীমন্দির যেখানে স্থাপিত, তাহাকে নীলাচল বলে। রথের সময় শ্রীমন্দির হইতে সিংহদ্বার দিয়া একক্রোশ পর্য্যন্ত রথ পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গুঞ্জবাড়ী, বা গুণ্ডিকাবাড়ী বা কুঞ্জবাড়ী, বা নিকুঞ্জে উপস্থিত হয়। ইহার নাম সুন্দরাচল। রথের প্রথম দিন হইতে আট দিনে একটু একটু করিয়া রথ চলিয়া গুঞ্জবারী যায়, পরে উল্টারথের দিন ঠাকুর সহ শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আইসে।

এই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে ছয়ক্রোশ ধরিয়া চতুর্দ্দিকে নানা তীর্থ আছে; যথা:—লোকনাথ, চন্দনবাসা লোকে যাহাকে নরেন্দ্র সরোবর বলে, মার্কণ্ডেয় স্বরঃ, স্বর্গদ্বার সমুদ্র-স্নান সিদ্ধ-বকুল, গঙ্গামঠ, রাধাকান্ত মঠ, বিদুর মঠ, শঙ্কর-মঠ, নানক-মঠ প্রভৃতি বহুসংখ্যক মঠ, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই কাশীমিশ্রের বাড়ী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, যথায় এখনও মহাপ্রভুর ভগ্ন কমণ্ডলু ও ছেঁড়া কাঁথা যত্নে রক্ষিত

আছে; শ্বেত গঙ্গা, মনি-কর্ণিকা হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপীনাথ ইত্যাদি।

এই ছয় ক্রোশের পর চতুর্দ্দিকে অন্য অন্য তীর্থ, যথা:—সাক্ষীগোপাল;—এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই, যেমন বড় তেমনই সুশ্রী; মন্দিরও অতি চমৎকার। আর এক দিকে ভুবনেশ্বর শিব। লক্ষ শিবমন্দির, কেদার গৌরী, উদয়গিরি অস্তগিরি, কপিলেশ্বর মহাদেব, বিন্দু-সরোবর, সীতার আঁতুড়-ঘর এবং গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি। আর একদিকে বালিহন্তা, যেখানে বালিবধ হইয়াছিল,গোপমঙ্গলা,কনারক, একচক্র সূর্য্যমন্দির সপ্ত অশ্বযুক্ত, এমন বৃহৎ ও শিল্পনৈপুণ্য-যুক্ত মন্দির পৃথিবীর অপর কোথাও নাই। চিল্কাহ্রদে ভগবতী-মন্দির, কালী-মন্দির। আর একদিকে কপিলেশ, ললিতাগিরি, উদয়গিরি, শারদাদেবী, শরণাদেবী, বলরামজী, অসুরেশ্বর মহাদেব, ধবলাগিরি ইত্যাদি।

উল্লিখিত এক একটীর বিবরণ অতি আশ্চর্য্য এবং মনোমুগ্ধকর।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি, এ।

গান।

ভৈরবী—ঠুংরি।

আমি কি হে প্রভু এমনি অভাগা,
প্রাণের এ জ্বালা কি জুড়াবে না?
দিবানিশি মোর কেঁদে কেঁদে যায়,
নয়নের জল কি মুছাবে না?
বুকভরা দুখে কতই যে ডাকি
শুনেও কি তুমি তা' শুনিবে না?
হৃদয়ের ব্যথা তুমি না বুঝিলে
আর তাহা কেহ ত বুঝিবে না!
শত দোষে দোষী তোমার চরণে
সে সকল দোষ কি ক্ষমিবে না?
দীন হীন দাস আমি যে তোমার
এ ভেবেও কি পদে রা'খবে না?

শ্রীব্রজলাল দত্ত বর্ম্মা।

হিরণ্যগর্ভ দেবতা।

ব্রহ্মা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩১। হিরণ্যবর্ণ অণ্ডের উৎপত্তি ও তন্মধ্যে প্রভু হিরণ্য গর্ভের আবির্ভাব, এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সেই অণ্ড খণ্ডিত হওয়া সর্ব্ববাদি সম্মত। তাহা অনেক পুরাণেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। হরিবংশে ২২৩ অধ্যায়ে লেখেন—অণ্ডটী কেবল দ্বিখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া থামে নাই। তৎপরে নারায়ণ ঐ অণ্ড আবার অষ্টধা ভেদ করেন। কেবল লোক সৃষ্টিই এই অষ্টধা ভেদের প্রধান উদ্দেশ্য। এইরূপ বিভাগের পর ক্রমে ক্রমে জগৎ বিভক্ত হয়।"

৩২। ফলে এক সুবর্ণ অণ্ড বা লয় মণ্ডল হইতে অগণ্য অণ্ড নিঃসৃত হওয়া সর্ব্ববাদী সম্মত হইলেও প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণ primordial staff হইতে আরো যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মৌলিক অণ্ড উৎপন্ন হয় নাই, এরূপ বলা যায় না।

৩৩। শাস্ত্রের উক্তি সমূহ প্রায়ই সংক্ষিপ্ত। বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের তুল্যার্থবাচী পদ সকলের এক বাক্যতা স্মরণ পূর্ব্বক সেই কথা গুলি চিন্তা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, স্থূলসৃষ্ট্যারম্ভে মহাভূতমাত্রা সমূহ, সংহত ও পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইয়াছিল। তাহাই কালে অণ্ডাকারে পরিণত হইল। সেই অণ্ড মধ্যে বটফলের গর্ভস্থ বীজের ন্যায় অসংখ্য

খণ্ড-অণ্ড নিহিত ছিল। তাহার কতকগুলি তেজোময় ও অগ্নিমূর্ত্তি; কতক নিস্তেজ ও মৃত।

৩৪। বিদীর্ণ হইবামাত্র সেই তেজোময় অংশসকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া অসীম শূন্যক্ষেত্রে অগণ্যাগণ্য গ্রহতারারূপে বিস্তৃত হইয়া স্বর্ণ পুষ্পের ন্যায় গগণপটকে সুশোভিত করিল। তাহার অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ অংশ সকল পৃথিবীর ন্যায় অথবা হীনতর অণ্ড মণ্ডলে পরিণত হইল। তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী কেন্দ্রগ্রন্থীটী মর্হজনোতপঃ সত্যাদি ব্রহ্মস্বর্গ রূপে বিদ্যমান্ রহিল। তাহা সকল লোকের আদি, প্রথমজ অগ্নিলোক বলিয়া উক্ত হয়। সেখানে অনন্ত-স্বর্গলোকফল পাওয়া যায়। তাহা জগতের প্রতিষ্ঠাস্থান।

> অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
> লোকাদিমগ্নিং! (কঠোপনিষৎ)॥
> অস্য ভাষ্যং। অনন্ত লোকাপ্তিং
> অনন্ত স্বর্গলোকফল প্রাপ্তি সাধন-
> মিত্যেতৎ অথো অপি প্রতিষ্ঠাং
> আশ্রয়ং জগতোবিরাড়্রূপেণ।
> লোকাদিং লোকানাং আদিং প্রথম-
> শরীরত্বাৎ।—

তাৎপর্য্য এই যে উক্ত ব্রহ্মভুবন রূপ স্বর্গলোক, সকল-অণ্ডলোকের আদি মণ্ডল।

৩৫। ফলতঃ অণ্ড একটী নহে। অসংখ্য। প্রকৃতির আদিম-ব্যাকৃত মহাভূতজই হউক, অথবা খণ্ডরূপই হউক,তাহার সংখ্যা নাই। সেই অসংখ্য মনোহর লোকমণ্ডল সকল, শূন্যক্ষেত্রে গ্রহতারা-চন্দ্র-তপনরূপে শোভা পাইতেছে এবং নানা মূর্ত্তিধর অসংখ্য প্রাণির বাসস্থান ও ভোগ-স্থান হইয়া আছে।

> হেতুভূত মশেষস্য প্রকৃতিঃ পরমামুনে।
> অণ্ডানাং তুসহস্রানাং সহস্রাণ্যযুতানিচ
> ঈদৃশানাং তথাতত্র কোটি কোটি শতানিচ॥
> (বিষ্ণুঃ পুঃ ২। ৭)

হে মুনিঃ! পরমা প্রকৃতিই অশেষ ব্রহ্মাণ্ডের হেতুভূত। তাহা সহস্র সহস্র অণ্ডের কারণ। ঈদৃশ অণ্ড সহস্র সহস্র, অযুত অযুত,এবং শতশত কোটি কোটি আছে। তন্মধ্যে অসীম শূন্য প্রাঙ্গনের নানাদেশে কোটি কোটি দৃশ্যতঃ নিহারবৎ ক্ষুদ্রাবয়বী তারাময় সুরালয় সকল শোভা পাইতেছে। তৎসমূহ অসংখ্য পুঞ্জ পুঞ্জ বীথিতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব কক্ষতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সমস্তই অণ্ডরূপী। সকলেরই গর্ভ্ত পঞ্চভূতের আবর্ত্তনশীল আগ্নেয় তরল ধাতুতে পূর্ণ।

৩৬ বক্তব্য। এই সকল নক্ষত্র পুঞ্জের অনেক গুলি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার সমষ্টি যে, সে সমস্ত তারা দুরবীক্ষণ যন্ত্রেও স্পষ্ট দৃষ্ট হয়না। ঘনলিপ্ত নিহারকণার ন্যায় দেখা যায়। এজন্য তৎসমূহ, গ্রহনিহারিকা, স্বর্গগঙ্গা বা ছায়াপথ বলিয়া উক্ত হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে তাহা nabulae or nabulous stars এবং milky way নামে খ্যাত। অর্থাৎ মেঘের ন্যায় অথবা দুগ্ধের ন্যায় লিপ্ত কণা বিশিষ্ট।

"Nebulae in astronomy, are certain spots in the heavens; some of which by the discoveries of Dr. Herschel, are found to consist of clusters of telescopic stars, and others appear as more luminous spots of different forms. Their distance and real size

exceed all powers of human conception."

"Stars—Those not reduced to classes, are called nebulous stars ; being such as only appear faintly, in clusters, resembling little lucid *nebulae* or clouds."

"Dr. Herschel was enabled to count hundreds in the field of his telescope and the milky way is an assemblage of an almost infinite number of stars ; indistinct to the naked eye ; but Herschel counted ten-thousand in a square degree, the whole forming a vast cluster of stars in the space, of which the sun is one and of which all the single stars visible are also parts ;" (taken from Samuel Maunders Scientific and Literary Treasury. 1848 London.)

এ সমস্ত তারা, নক্ষত্র,গ্রহ,উপগ্রহ প্রত্যেকে এক একটী লোক। পৃথিবীর ন্যায় বা তদপেক্ষা বৃহৎ। সর্ব্বত্রেই প্রাণিগণের নিবাস।

"These worlds came out of the Solar atmosphere, being condens ed from vast solar rings. Sci ence confirms this view."(Staller key to the Summer land by A. J. Davis Past I 1868 Boston.)

"Our sun and its planets belong to the milky way not only, but the milky way itself is nearly one community of suns and planets of an infinitude of similar systems and communities that float and sing the so ngs of harmony in the celestial atmosphere of the univercaelum."(Ibid)

Dr. Dick "derived conclusion that, on the planets in space, which circle around their parent suns, other persons like ourselves really could and do exist." He adds "we are assured on certain date that 2019100000000, worlds may exist within the bounds of the visible universe." (Ibid)

৩৭। শাস্ত্রেও কোটি কোটি অণ্ড থাকার উল্লেখ আছে। তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। অপিচ সেই সমস্ত লোকে মনুষ্যাদি প্রাণিগণের বসতি ও তাহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উল্লেখ আছে। তথা—"যস্মিন্ লোকাঃ নিহিতা লোকানশ্চ।" (মু ২।২।২।) "যস্মিন্ লোকাঃ ভূবাদয়ঃ নিহিতাঃ স্থিতাঃ লোকিনঃ চ লোকনিবাসিনঃ মনুষ্যাদয়ঃ" (শঙ্কর] যাঁহাতে [ব্রহ্মেতে] ভূরাদি লোক সকল এবং 'লোকিনঃ' সেই সকল লোকনিবাসী মনুষ্যাদি প্রাণীসকল নিহিত রহিয়াছে। আরও শ্রুতি আছে (মু ১।১।৮) "প্রাণ মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং।" 'প্রাণ' শব্দে 'হিরণ্যগর্ভ'। তাঁহা হইতে 'মনঃ' 'অহঙ্কার'। তাহা হইতে "সত্যাখ্যং আকাশাদিভূতপঞ্চকমভিজায়তে তস্মাৎ সত্যাখ্যাদ্ভূত পঞ্চকাৎ লোকাঃ ভূরাদয়ঃ। তেষু লোকেষু মনুষ্যাদি প্রাণি বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু নিমিত্তভূতেষু অমৃতং কর্ম্মজং ফলং চ অভিজায়তে" (শঙ্কর)। অর্থ—হিরণ্যগর্ভ হইতে অহঙ্কার (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ)। তাহা হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মিল। সেই আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথিবী ও পৃথিবীর ন্যায় অণ্ডমণ্ডল সকল উৎপন্ন হইল। সেই সমস্ত লোকে মনুষ্য ও মনুষ্যের ন্যায় প্রাণিগণের বসতি বিস্তৃত হইল। বর্ণাশ্রম ক্রমে তাহাদের কর্ম্মসকল সৃষ্ট হইল। কর্ম্ম হইতে অমৃত ফল ব্যবস্থাপিত হইল। উপনিষৎ ইহা প্রতিপাদন করেন। আশ্চর্য্য !

৩৮। শাস্ত্রের ন্যায় যোগবল, (revelation) লব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার হিন্দুর ভবনে আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয়। বিজ্ঞান" তাহাই প্রসারিত করিতেছে।

৩৯। মানবস্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্রে উক্ত আদি-

অণ্ডজাত পুরুষের হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ। তিনিই মূল-সূর্য্যদেব। অর্থাৎ উভয়াত্মক। এজন্য কোথাও ব্রহ্মা, কোথাও সূর্য্য, কোথাও বা ব্রহ্মা পিতা ও সূর্য্যপুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। * উভয়রূপেই তিনি ব্রহ্ম। সেই এক প্রথম সূর্য্যের অসংখ্য সূর্য্যাংশ, উক্ত নক্ষত্রবীথি সমূহের মধ্যে অগণ্য সূর্য্যমণ্ডল-আকৃতিতে, স্ব স্ব কক্ষাগত গ্রহগণের আকর্ষণ-কেন্দ্র হইয়া আছে। ব্রহ্মা এবং সূর্য্য উভয়েই মূলতঃ সেই আদি হিরণ্যবর্ণ অণ্ডমণ্ডল-জাত। শুদ্ধ জাত নহেন, কিন্তু তদভিমানী বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তাঁহারা উভয়েই সেই এক ব্রহ্মের ঔপাধিকী আবির্ভাব। উভয় মূর্ত্তিতেই তাঁহারা উপাস্য। হিরণ্যবর্ণ অণ্ডজাত বিধায় উভয়েই হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞায় উক্ত হন।

৪০। ছান্দোগ্যোপনিষদের নিম্নস্থ শ্রুতিচতুষ্টয়, বেদের গূঢ় অভিপ্রায় প্রতিপাদন করেন। প্রাগুক্ত মনুবচনের সহ একবাক্য পূর্ব্বক উহা পাঠ করিলে উপরিউক্ত কথাগুলি বিষদরূপে বুঝা যাইবে। পুরাণ-শাস্ত্রেও সে সম্বন্ধে উপাদেয় তত্ত্বকথা বিন্যস্ত আছে। ফলে তাহা এ স্থলে প্রদর্শন করা বাহুল্য।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে উনবিংশোধ্যায়ঃ।

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ স্তস্যোপব্যাখ্যানম-সদেবেদমগ্রআসীৎ। তৎসদাসীত্তৎসমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎসংবৎসরস্যমাত্রমশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্।১।

অর্থ। আদিত্যব্রহ্ম। ইহাই আদেশ। ইহার উপব্যাখ্যান এই। অগ্রে এই জগৎ অসৎ (অব্যক্ত) ছিল। পরে সৎ (ব্যক্ত) হইল। ইহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। পরে একটা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। সেই অণ্ড একবৎসর কাল শয়নে রহিল। পরে স্বতো বিদীর্ণ হইল। তাহাতে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ রজত ও অন্য সুবর্ণ।১।

তদ্যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎসুবর্ণং সা দ্যৌ র্যজ্জরায়ু তে পর্ব্বতা যদুল্বং সমেঘো নিহারো যা ধমনয় স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ॥২॥

অর্থ। যাহা রজতখণ্ড তাহা পৃথিবী হইল। সুবর্ণখণ্ড স্বর্গলোক হইল। স্থূল জরায়ু সকল পর্ব্বত হইল। সূক্ষ্ম শিরাসকল মেঘ ও নিহার হইল। ধমনী সকল নদী এবং যাহা গর্ভোদক ছিল তাহা সমুদ্র হইল।২।

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলুলবোঽনুদতিষ্ঠন্ত সর্ব্বানি চ ভূতানি সর্ব্বং চ কামাঃ তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলুলবোঽনুত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বানিচ ভূতানি সর্ব্বং চ কামাঃ।৩।

অর্থ। অতঃপর সেই অণ্ড হইতে যাহা জন্মগ্রহণ করিল তাহাই আদিত্য। তিনি জন্মিবামাত্রে চতুর্দ্দিক হইতে হুলুধ্বনি উত্থিত হইল এবং সর্ব্বভূত ও তাহাদের কামনার বিষয় সকল সমুদিত হইল। সেই অবধি প্রতিদিন সূর্য্যোদয় কালে ঐরূপ হুলুধ্বনি ও সর্ব্বভূত ও তাহাদের কামনা উত্থিত হইয়া থাকে।৩।

সযএতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মে
ত্যুপাস্তেঽভ্যাসো হ যদেনং
সাধবো ঘোষা আচ গচ্ছেয়ু
রূপচ নিম্রেডেরন্নিম্রেডেরন্। ৪।

যিনি এই প্রকার জানিয়া আদিত্যকে ব্রহ্ম-বলিয়া উপাসনা করেন, মঙ্গল ঘোষণা সকল তাঁহারো কর্ণপথে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে সুখী করে। ৪।

৪২ বক্তব্য। (১) উক্ত একবর্ষকালের অর্থ ব্রাহ্মপরিমিত এক বৎসর। তাহার সংখ্যা ৩:১০৪০০০০০০০ বৎসর। ইহা ব্রহ্মলোকের বর্ষ। মূল সৌর অণ্ডটী পরিপক্ব হইতে অতকাল লাগিয়াছিল। পরে সৃষ্টি, প্রাণীগণের বাসো-পযোগী হইতে কোটি কোটি বর্ষ লাগিয়াছিল।

"Astonishing fact! The Hindu revelation which proclaims

* শাস্ত্রে ইহাদের রূপান্তরও আছে। যথা বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র বিবস্বান-সূর্য্য। তৎপুত্র বৈবস্বত-মনু। মনু হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

the slow and gradual formation of worlds, is of all revelations the only one whose ideas are in complete harmony with modern science" (M. Lowia Jacolliot 1870 p. 181.)

গীতাস্মৃতির অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তথায় ঐ কালটী "যোগবল লব্ধ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপিচ ৮।১৭। যোগবল লব্ধ অর্থাৎ "revealed"।

(২) উক্ত অণ্ডটী অশেষ লোক মণ্ডলের গর্ভ কোষ ছিল। স্বর্গ, মর্ত্ত প্রভৃতি লোক ও তৎসমূহের মধ্যে যত পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল—তৎসমস্তই অণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

(৩) সেই অণ্ড হইতে সূর্য্য বাহির হইলেন। তিনিই ব্রহ্মা। ইতি পূর্ব্বের উদ্ধৃত মনুবচনে তিনি ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তথায় অণ্ডটীর রজতাংশ ও সুবর্ণাংশ উক্ত হয় নাই। কিন্তু তাহা হেম বর্ণ ও সংস্র সূর্য্যের প্রভা বিশিষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে।

(৪) আদিত্যকে ব্রহ্মভাবে অর্চনার ব্যবহার গায়ত্রীর ধ্যানে প্রচলিত আছে এবং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে তাঁহাকে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে চিন্তা করিবার পদ্ধতি আছে।

৺চন্দ্রশেখর বসু।

পুষ্পবতী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

রেণুকা এখন বয়স্থা হইয়াছে, এখন দৌড়াইয়া গিয়া আর পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় না। পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, রেণুকা তাঁহার নয়নের পুত্তলি। হুকুমচাঁদ যখনই বাটী আসেন,রেণুকা নিকটে না আসিলে তাঁহার ভাল বোধ হয় না। রেণুকা নিকটে না আসিলে আহার হয় না। গৃহিণী মধ্যে মধ্যে নথের বাহার দিতে স্বামীর নিকট আসেন, রেণুকার বিবাহ লইয়া স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। রেণুকা আব্দার পাইয়া নষ্ট হইতেছে—বিবাহ হইলে কি যে করিবে,তাহার স্থির নাই। হুকুমচাঁদ হাসিয়া বলেন—"সে জন্য তোমার ভাবতে হবে না। তুমি ত আর সঙ্গে যাবে না।" গৃহিণী রাগ করিয়া,চলিয়া গেলেন।

প্রেমচাঁদ সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, দিদিকে দেখিয়া রেণুকার বড় আনন্দ। সে সর্ব্বদাই দিদির নিকট থাকে। দিদি একদিন বলিল "রেণু! তোর যখন বে হবে, তখন কি কর্‌বি?" রেণুকা লজ্জায় কথা বলিল না। প্রেমচাঁদ বলিলেন—আর বে হ'য়ে দরকার নাই আমার সঙ্গেই কেন হউক না, দুবনে এক সঙ্গে থাক্‌বে আর ছাড়াছাড়ি হবে না।" রেণুকার এবার মুখ ফুটিল, সে উত্তর করিল—এক জনকে পেয়েছ এই যথেষ্ট আবার আশা কেন?" প্রেম চাঁদ ও রসিক পুরুষ ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি বলিলেন "লোক আশাতেই বেঁচে থাকে, দুটি রত্ন যদি পাই তবে, একটিতে সন্তুষ্ট থাক্‌বো কেন?" তাহার স্ত্রী বলিল, যাও বামন হয়ে চাঁদে হাত দিও না আমাকে পেয়েছ এই তোমার ঢের অদৃষ্টের জোর।" প্রেমচাঁদ—কত তপস্যা করেছি, তাই তোমাকে পেয়েছি। বোধ হয় দ্বিগুণ তপস্যা করেছিলেম, তাই দ্বিগুণ পাচ্ছি। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল যে জনৈক ভদ্রলোক বাহিরে-তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; প্রেমচাঁদ আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহিরে গেলেন, দেখেন তাঁহার পরম বন্ধু রায়চাঁদ সদাগর উপস্থিত হইয়াছেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, রায়চাঁদ বলিলেন—বন্ধু বড় বিপদ থেকে ভগবান উদ্ধার করেছেন, তুমি আমার পত্র পেয়েছিলে? প্রেমচাঁদ সহাস্যে বলিলেন—"এক লক্ষ টাকা তোমাকে কর্জ্জ দিয়েছি, সে ঋণ এখন শোধ দেও। রায়চাঁদ ব্যস্ততার সহিত বলিলেন বন্ধো কি? সত্যই কি টাকা দিয়েছ, প্রেমচাঁদ বলিলেন—তুমিও কি পাগল হয়েছ। আমি কি এতই নির্ব্বোধ? রায়চাঁদ তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আমি তোমাকে লিখিতে বাধ্য হয়েছিলেম,দস্যুরা বড় দুর্দ্দান্ত। না লিখলে হয় তো

প্রাণ নষ্ট কর্‌তো। তুমি কি উত্তর দিলে? প্রেমচাঁদ উত্তর করিলেন—আমি এর মধ্যে একটু বুদ্ধি খেললেম, অবস্থা বুঝে ছিলাম। দেখলেম যদি টাকা না দিই তবে তোমার বিশেষ অনিষ্ট হতে পারে, সেইজন্য সময় নিলেম। আমি বললেম—এত অল্পসময়ে এতটাকা দিতে পার্‌বোনা। বন্ধুর জন্যে টাকা অবশ্যই দিব, তবে এক সপ্তাহ সময় চাই। আমার হাতে এখন টাকা নাই। সংগ্রহ করি, তার পর ঠিক এক সপ্তাহ পরে এসে টাকা নিও। তাহারা বলিল—যে যত বিলম্ব হবে ততই তোমার বন্ধুর কষ্ট হবে। আমি বল্‌লেম—যে উপায় নাই তবে তাকে কষ্ট দিও না, যদি আমি শুনি যে সে সুখে ছিল তা হলে আরও দশ সহস্র মুদ্রা তোমাদিগকে পুরস্কার দিব। তাহারা ঐ কথায় স্বীকৃত হয়ে চলে গেল। তোমার কি কি ঘটনা হয়েছে বল দেখি। রায়চাঁদ সওদাগর আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বলিলেন। তারপর কি রূপে উদ্ধার পাইলেন তাহাও বলিলেন। লেফটেনেন্ট ফষ্টেরের নিকট চির কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এই সব কথা বার্ত্তার পর প্রেমচাঁদ বলিলেন—ভাই। তুমি শীঘ্র যেতে পারবেনা, কয়েক দিন এখানে থাক।" রায়চাঁদ স্বীকৃত হইলেন। হুকুমচাঁদ বাটী আসিলে প্রেমচাঁদ তাহার সঙ্গে রায়চাঁদের পরিচয় করিয়া দিলেন। হুকুমচাঁদ রায়চাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, প্রেমচাঁদের নিকট রায়চাঁদের সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। হুকুম চাঁদ রেণুকার সঙ্গে রায়চাঁদের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং প্রেমচাঁদকে গোপনে এই কথা জানাইলেন। এক দিন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদকে সঙ্গে লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নিজের শয্যার উপর বসাইয়া নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে বলিলেন—ভাই! তোমাকে এখন আপন করিতে ইচ্ছা হচ্চে। রায়চাঁদ "হো" "হো" করিয়া হাসিয়া। বলিলেন—আমি কি তবে পর যে আপন কর্‌তে হবে। প্রেমচাঁদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেরূপ আপন পর নয়, তোমাকে এবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবো। বলিয়া তিনি ডাকিলেন—রেণুকা! একটু খাবার জল নিয়ে আয়তো। রেণুকা জানিত না যে অপর এক ব্যক্তি ঐ ঘরে আছে, সে নিশ্চয়কোচে জল লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল প্রেমচাঁদের নিকট একটি সুন্দর যুবক বসিয়া আছে, তখন লজ্জায় জলপাত্রটি মৃত্তিকায় রাখিয়াই পলায়ন করিল। রায়চাঁদ দেখিলেন—রেণুকা সুন্দরী। তখন তিনি প্রেমচাঁদের কথায় অর্থ বুঝিতে পারিলেন কিন্তু উত্তর করিলেন না। প্রেমচাঁদ বলিলেন—এ রত্ন তোমার ভাগ্যে আছে কি না জানিনা, তবে তোমার মত কি? রায়চাঁদ উত্তর করিলেন—আমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'র, আমার মতামত কি? আমার মায়ের যদি মত হয়, তবেই যথেষ্ট। প্রেমচাঁদ মনে মনে রায়চাঁদের মাতৃভক্তিতে প্রশংসা করিলেন তারপর বলিলেন—তুমি যথার্থ বলেছ, আমি অদ্যই তোমার মাতার নিকট লোক পাঠাব। রেণুকা সুন্দরী, রেণুকা সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুন, রেণুকা সরলা, এরূপ স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা চাই। দেখি তোমার ভাগ্যে আছে কি না। তাই বলছিলেম এখন তোমাকে আপন করে লবো। তুমি ধনী, তুমি সম্মানীকিন্তু গৃহিণী শূন্য সংসারে উন্নতি হয় না। তোমার মা বৃদ্ধা হয়েছেন এখন একজন সাহায্য করার লোক চাই, রেণুকার মত দাসী পেলে তিনি পরম পরিতুষ্ট হবেন। রায়চাঁদ হাসিয়া বলিলেন—তুমিও বুঝি একটি রত্ন সাগর ছেঁচে পেয়েছ, আর একটি আমাকে দিচ্ছ। তোমার তো বেশ তপস্যার বল ছিল? প্রেমচাঁদ উত্তর করিলেন, হাঁ তা না হলে কি আমার ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন হয়? রেণুকার ভগ্নী পার্শ্বের ঘর হইতে এই সব শুনিতেছিল। সে হাসিয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিল এবং যাওয়ার সময় চরণের গহনা "রুণু ঝুণু" "রুণু ঝুণু" বাজিয়া উঠিল। প্রেমচাঁদ অমনি বলিয়া উঠিলেন—পালাচ্ছ কেন? গোপনে গোপনে সব শুনছিলে? তোমার নিন্দা নয়, স্তুতি। রায়চাঁদ বলিলেন—তুমিত বেশ রসিকতা শিখছ! প্রেমচাঁদ বলিলেন—না শিখে করি কি, তুমিও দুদিবস বাদে শিখবে। যা হক আমি ও তুমি দুজনে একবার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যাই, তারপর একজন লোক তোমার পূজনীয়া মার নিকট পাঠাইব। এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে লইয়া চলিলেন।

শ্রীজয়নারায়ণ বসু বি-এ।

যোগতত্ত্ব।

আজ কাল যোগতত্ত্ব লইয়া সকলকেই আলোচনা করিতে দেখা যায়। অধুনা অনেকেই উক্ত কঠিন বিষয়ের মীমাংসায় কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। অবশ্য হিন্দুর আলোচ্য যোগ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য এই ভারতবর্ষই প্রসিদ্ধ স্থান, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমা-দিগেরই আলোচ্য বিষয়গুলি সময়ে সময়ে আমরা এমনই বিসদৃশ-ভাবে আলোচনা করিয়া থাকি যে, তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিফলই হইয়া থাকে। আজ আমরা আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যঋষিগের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ গুলি পণ্ড করিয়া, আমাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিতেছি। আর মহামনা কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি সুদূর আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া, আর্য্যঋষিদিগের যাগ-যজ্ঞাদির অধিষ্ঠান-ভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া, যোগের অলৌকিক কার্য্য-কলাপের পরিচয় দিয়া, আমাদিগকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিতেছেন। এই সকল ব্যাপার [illegible] আমরা আমাদিগের উন্নতির [illegible] চেষ্টা না করিয়া কেবল বৃথা বাগাড়ম্বরেই ব্যাপৃত আছি। ইহা অপেক্ষা আমাদিগের ধৃষ্টতার পরিচয় আর কি হইতে পারে! আমরা যদি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব কার্য্যে মনোযোগী হইতাম, তবে আর আমাদিগকে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, করকাপাত, ঝঞ্ঝাবাত, প্রভৃতিতে নিপীড়িত হইয়া, নিতান্ত নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় কাল কাটাইয়া, অপরের স্কন্ধে অযথা দোষারোপ করিতে হইত না।

বর্ত্তমান-কালে সকল বিষয়েরই যেন একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অভিলাষী নহেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কেহই আর স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক নহেন। যাহার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, সে তাহাই করিতেছে। কেহ কাহারও বিধি-নিষেধ মানিতে প্রস্তুত নহে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই ধর্ম্মোপদেষ্টা, সকলেই নেতা, সকলেই বক্তা। শ্রোতার দলভুক্ত হইতে অনেকেই অনিচ্ছুক। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ যোগাদির অনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন। ক্ষত্রিয় রাজাগণ রাজ্য-রক্ষা ও ঋষিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ

করিতেন। বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্যে কাল কাটাইয়া, সকলেরই অভাব মোচনের জন্য ও আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টাবান্ হইতেন। শূদ্রেরাও উপরি উক্ত তিন বর্ণের শুশ্রূষাদি কার্য্যে নিরত থাকিয়া, আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞানে পুলকিত হইত। অবশ্য যাগ-যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের অধিকার ছিল না, তাহা আমি বলিতে পারিব না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদিতে বিশ্বামিত্র, গুহক, বিদুর প্রভৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সে সন্দেহ অবশ্যই নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত অধিকারী হওয়া চাই। অধিকারী না হইয়া, অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। এক্ষণে সেই অধিকারীর বিচার করিতে যাইলে শেষে হয় ত লাঠালাঠী বাধিয়া যায়। রাজাও আর যোগীদিগের অর্থাৎ প্রকৃত কার্য্যাধিকারীদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত নহেন। বরং দৈব বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, সাধক উচ্চমার্গে উঠিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কিন্তু রাজ-বিভীষিকায় পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। অবশ্য রাজার দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কতকগুলি অনভিজ্ঞ অধস্তন রাজকর্ম্মচারীর দোষেই অনেক সময়ে প্রকৃত সাধুকেও নির্য্যাতিত হইতে হয় ও অসাধুও নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। আজ আমি যে, ইহা কল্পনার বলে অঙ্কিত করিতেছি তাহা নহে। আমি স্বয়ং স্বীয় তদন্তের ফলে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। বর্ত্তমান রাজ-আইনগুলি আবার স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, মনস্বী, মনীষি, বাকপটু বক্তা ও সমালোচক লেখকদিগের বাক্য ও লেখনী সর্ব্বদাই শশঙ্কিত ভাবে প্রয়োগ ও পরিচালনের জন্য সংযত করিয়া রাখিয়াছে। বিন্দু-মাত্র অসতর্কতা অবলম্বিত হইলেই অমনই আইনের অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং আমাদিগের ভারতীয় ভ্রাতৃগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সদুপদেশ প্রদান করিবার পক্ষে স্বাধীনভাবে ন্যায়সঙ্গত কোন কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ারও নানাবিধ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য রাজার আইনগুলিকেও একেবারে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ উচ্ছৃঙ্খল সমাজ আজ কাল যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া, নিজ নিজ কার্য্যোদ্ধারে নানাবিধ প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকে রাজ-আইন, কাহারও লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। অগত্যা আইনের শৃঙ্খলে উদ্দাম সমাজকে বন্ধন করাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা যদি পুরাকালের ঋষিদিগের আইন (শাস্ত্র) মানিয়া চলিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের রাজাকেও এইরূপ নিত্য নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া, আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইত না। শাস্ত্র কাহাকে বলে? যঃ শাসয়তি সঃ শাস্ত্রি। শাস ধাতু ত্র অর্থাৎ যিনি শাসন করেন তিনিই শাস্ত্র। যিনি শাস্ত্র প্রণেতা বা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিনিই শাস্ত্রী। আমাদের দেশে বহুতর শাস্ত্র বর্ত্তমান, তন্মধ্যে মনুসংহিতাই

আমাদিগের চরিত্রাদি সংশোধনের উপযোগী শাস্ত্র বা আইন। যিনি ঐ শাস্ত্রের প্রণেতা, তিনিই মনু। মনু শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া, মানব এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আমরা মানব মাত্রেই মনুর পুত্র। অতএব মনু আমাদিগের পিতা। পিতার আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাল্য। আমাদের চরিত্রাদি সংশোধন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের উপযোগী ব্যবস্থাই তিনি মনুসংহিতায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজের কঠোর আইনগুলির মধ্যে উক্ত সংহিতারই অনেক ধারা নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা মূল আইন পরিত্যাগ করিয়া, পরিশ্রুত আইন মানিয়া, কার্য্য করিয়া থাকি। মনু আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কেমন সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তদ্দ্বারা আমাদিগের ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দাদি হইতে আর যোগচর্য্যাদি পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে সুসিদ্ধ হইতে পারে, অতঃপর তাহার সামান্য সামান্য নিদর্শন প্রদর্শনান্তে আমার প্রবন্ধের মৌলিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

একটী দ্বিতল গৃহে আরোহণ করিতে হইলে আরোহণী বা সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃ উপরে উঠিতে পারা যায়। একেবারে লম্ফ প্রদান করিয়া, কখনই উপরে উঠা যায় না। বরং তাহাতে বিপদেরই বিশেষ সম্ভাবনা। তাই সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কার্য্য যোগাদির অনুষ্ঠানে রত হইতে হইলে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যাদি পূর্ব্বাশ্রমের কার্য্যগুলি ক্রমপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। তাই মনু বলিতেছেন,—

"অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষ্যচর্য্যামধঃ শয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥"

(মনু ২য় অঃ ১০৮ শ্লোক)

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী যতদিন না সমাবর্ত্তন করেন অর্থাৎ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ততদিন গুরুকুলে থাকিয়া, প্রতিদিন প্রাতঃসায়াহ্নে, হোম-কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন, ভিক্ষাচরণ, খট্টাদিতে শয়ন না করিয়া, অধঃশয্যায় শয়ন এবং গুরুর হিতকর কার্য্য সমুদয় সমাপন করিবেন।

এইখানে স্পষ্টই বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, কৃতোপনয়ন দ্বিজ গুরুগৃহে বাস কালে সতত সংযমী থাকিয়া, গুরুর সন্তোষ-বিধানে যত্নবান হইবেন। অনন্তর গুরুগৃহে থাকিয়া, যথা নিয়মে বেদাদি অধ্যয়নে নিরত থাকায় আমাদিগের হিন্দু-ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া, সেই ব্রহ্মচারী যদি পিতৃ-মাতৃহীন ও পোষ্যবর্গের আশ্রয়-হীন হওয়ায় সংসারের ব্যাপার সম্যক বুঝিয়া লইয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন; তবে এইখান হইতেই উক্ত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। নচেৎ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ও পোষ্য বর্গের ভরণ-পোষণাদির জন্য পিতৃকুলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, দার-পরিগ্রহান্তে দ্বিতীয়াশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, দেব দ্বিজাদি ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ হইবেন। মনু এখানেও কিরূপ আদেশ করিতেছেন?

শক্তিতোঽপচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা।
সংবিভাগশ্চ ভূতেভ্যঃ কর্ত্তব্যোঽনুপরোধতঃ॥"

রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ সংসীদন স্নাতকঃ ক্ষুধা।
যাজ্যান্তেবাসিনোর্ব্বাপি নতন্যত ইতি স্থিতিঃ॥
ন সীদেৎস্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধশক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণ মলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি॥
ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ॥
(মনু ৪র্থ অঃ ৩২—৩৫ শ্লোক)।

অর্থাৎ যাঁহারা পাক না করেন,এমন ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে গৃহস্থ যথাশক্তি অন্নাদি প্রদান করিবেন এবং যাহাতে আত্মকুটুম্বের পীড়া না জন্মে এই জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত রাখিয়া, সমুদয় প্রাণীগণকে খাদ্যাদি বিতরণ করিয়া দিবেন। বেদস্নাতক,বিদ্যা বা ব্রতস্নাতক গৃহস্থ ক্ষুধায় কাতর হইলে ক্ষত্রিয় রাজার নিকট ধন প্রার্থনা করিবেন,অথবা যজমান বা শিষ্যের নিকট ধন যাচ্ঞা করিবেন ; কিন্তু অন্যের নিকট প্রার্থনা করিবেন না। শক্তি থাকিতে স্নাতক বিপ্র কোন মতে ক্ষুধায় অবসন্ন হইবেন না কিংবা বিভব থাকিতে জীর্ণ মলিন বাস পরিধান করিবেন না। স্নাতক গৃহস্থ মুণ্ডিত হইবেন না ; পরন্তু কেশ, নখ, শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, তপঃ ক্লেশ সহিষ্ণু হইবেন, শুক্ল বাস পরিধান করিবেন, অন্তর্বাহ্যাদি শুচি হইবেন, প্রতিদিন স্বাধ্যায় * কার্য্যে উদ্‌যোগী থাকিবেন এবং শুরু ভোজনাদি দ্বারা নিত্য আত্মহিত পরায়ণ হইবেন। ৩২-৩৫।

এইরূপ প্রতি আশ্রমীর আচরণীয় বিধি নিষেধ উক্ত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পরিলক্ষিত হয়। তাহা সমগ্র উদ্ধার করিয়া বুঝাইতে যাইলে প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং প্রায় সমগ্র মনুসংহিতাই উদ্ধৃত করিতে হয়। তাই যে গুলি বিশেষ আবশ্যকীয়, সেইগুলিই ইহাতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে ও হইবে মাত্র। এইরূপে স্নাতকগণ (বেদাদি সমাধান পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ) গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন ও পুত্রোৎপাদনাদি কার্য্য সমাপনান্তে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্রমে তদাশ্রমোচিত কার্য্য করিতে করিতে সন্ন্যাসাশ্রমের ভাবসকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেই ত্যাগধর্ম্ম আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন যোগ চর্য্যায় যে কি আনন্দ তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়া, তিনি তখন সদাই সদানন্দে মগ্ন থাকিবেন। সে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহা তিনি কাহাকেও বুঝাইতে পারিবেন না। কেবল আপনি সেই ভাবে বিভোর হইয়া, কেমন এক অজানা অচেনা রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকিবেন। আপনার ভাবে আপনিই মজিয়া যাইবেন। এই ভাব যে সংসারে থাকিয়া অনুভব করা যায় না তাহা নহে। কিন্তু বড় কঠিন। পঙ্কে পাঁকাল বা বাইন মৎস্যের ন্যায়, পদ্মপত্রে বারি বিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে সকল কার্য্য সংসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করিতে পারিলেই এ সংসারে থাকিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু সে বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলেই ঘটিয়া থাকে। রামপ্রসাদাদি চিরস্মরণীয় সাধকবৃন্দই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ

* স্বাধ্যায়—বেদাদি পাঠে নিযুক্ত থাকাকে স্বাধ্যায় বলে।

হইয়া রহিয়াছেন। রামপ্রসাদ সংসারের সকল কার্য্যে রত থাকিয়াও ব্রহ্মময়ীর বিকাশ সকল পদার্থেই দেখিয়াছেন। আবার সাংসারিকের ন্যায় গাছপালা রক্ষার জন্য বেড়া বাঁধিতেও বসিয়াছেন। অথচ সেই বেড়ার দড়ি আবার স্বয়ং সেই ব্রহ্মময়ীই ফিরাইয়া দিতে দিতে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদও তাঁহার সেই উপস্থিত গানে তাহার উল্লেখ করিতেও বিরত হয়েন নাই। বলিয়া গিয়াছেন,—"ওমন বের হয়ে দেখ্ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া" ইত্যাদি। এই বলিয়া ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ হটযোগ ছাড়িয়া, ভক্তিযোগ ধরিয়া, ভক্তি-ডোরে মাকে বাঁধিয়া, মনকে মায়ের চরণ ছাড়া হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আবার মহাত্মা তুলসী দাসও বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"তুলসী এয়সা ধেয়ান ধরো য্যায়সা
বিহানকা গাই।
মুখে তৃণ্ চানা টুটে রোখে আপ্না বাছাই॥"

অর্থাৎ নবপ্রসূতা গাভী তৃণ চনকাদি ভক্ষণ করিতে করিতে যেমন আপনার নবীন বৎসটীর রক্ষার বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থাকে অর্থাৎ সে দিকে লক্ষ্য রাখে, সেইরূপ হে তুলসী তুমি সংসারের সকল কার্য্য করিতে করিতে যাহাতে সেই ভগবৎপদারবিন্দে মন রাখিতে পার এইরূপ ধ্যান-যোগী হও। ইত্যাদি। এক্ষণে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগী বানপ্রস্থাবলম্বনীদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের পিতা মনু কি উপদেশ দিতেছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, আমি যোগব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। মনু বলিতেছেন,—

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেৎতু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥
সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈববা
অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নি পরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্ম্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্ নির্ব্বপেদ্বিধি পূর্ব্বকম্॥
বসিত চর্ম্মচীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানিচ॥
যদ্ভক্ষ্যং স্যাৎ ততো দদ্যাদ্বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূলফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদাশ্রমাগতান্॥
স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্র সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ॥
বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধিঃ।
দর্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ॥
ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণঞ্চৈব চাতুর্ম্মাস্যানিচাহরেৎ।
তুরায়ণঞ্চ ক্রমশো দাক্ষস্যায়নমেবচ॥

(মনু ৬ষ্ঠ অঃ ১—১০ শ্লোক)

অর্থাৎ এইরূপে স্নাতক দ্বিজ যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম পালন করতঃ জিতেন্দ্রিয়ভাবে তপঃস্বাধ্যায়াদি নিয়মযুক্ত হইয়া, যথাবিধান বানপ্রস্থ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে,আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, কেশের পক্কতা জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে, তখন তাঁহার অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। যত্নোৎপাদ্য আহার ও গো, অশ্ব, শয্যাদি ভোগ পরিত্যাগ করিয়া,

পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, অথবা সমভিব্যহারে লইয়া, তিনি বনগমন করিবেন। বৈদিক অগ্নি গৃহ্যাগ্নি এবং স্রুক-স্রুবাদি উপকরণ সমুদয় গ্রহণ করিয়া, অরণ্য গমন এবং নিয়তেন্দ্রিয়ভাবে তথায় বাস করিবেন। নীবারাদি পবিত্র অন্ন দ্বারা অথবা অরণ্যজাত শাক, মূল ও ফলের দ্বারা তথায় প্রতিদিন বিধিপূর্ব্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। অরণ্যবাসকালে মৃগাদিচর্ম্ম বা তৃণবল্কলাদি নির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ড পরিধান, সায়ং ও প্রাতঃস্নান এবং নিত্য জটা, শ্মশ্রু নখ ও লোম ধারণ করিবেন। তাঁহার যাহা ভক্ষ্য থাকিবে, তাহা হইতে পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত বলি প্রদান এবং ভিক্ষুক ও আশ্রমাগত অতিথি জনকেও সেই জল, মূল, ফলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। বানপ্রস্থে, বেদাধ্যয়নরত শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব সহনশীল, পরোপকারী, সংযতমনা সতত দাতা, প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত এবং সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইবে। গার্হপত্যকুণ্ডস্থ অগ্নি, আহবনীয় কুণ্ড ও দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে অবস্থিতির নাম 'বিতান,' তাহাতে যথাবিধি বৈতানিক অগ্নিহোত্র 'হোম' করিবেন এবং পর্ব্বযোগে দর্শপৌর্ণমাস যাগও করিবেন। নক্ষত্রযাগ, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্যাদি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন যাগও সম্পন্ন করিবেন। ১-১০।

এইখানে বেশ প্রতীতি হইল যে, গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগী বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণকেও কতকাংশে বনে থাকিয়াও গৃহীর ন্যায় আচরণ অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু নির্লিপ্তভাবে উক্ত কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। তবেই ত্যাগধর্ম্ম—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আয়ত্বাধীনে আসিবে। বনবাসী হইলেই তাঁহাকে যাগ-যজ্ঞাদিতে নিযুক্ত হইতে হইবে। যতই এইরূপ বনবাসীদিগের দ্বারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে, ততই কর্ম্মভূমি ভারতভূমির মঙ্গল হইতে থাকিবে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই ভারত আবার সোনার-ভারত হইয়া দাঁড়াইবেন। প্রচুর শস্যাদির উৎপাদিকা শক্তিশালিনী হইবেন। অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাৎ ভবতি পর্য্যন্যো যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩য় অঃ ১৪ শ্লোক)

অর্থাৎ অন্ন দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং পর্য্যন্য অর্থাৎ মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। আবার যজ্ঞদ্বারা পর্য্যন্যের ও কর্ম্মদ্বারা সেই যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব বেশ বুঝা গেল যে, কর্ম্মভূমি ভারতভূমিতে কর্ম্ম করিবার জন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের আগমন ও তাঁহাদিগের সতত সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করাই একান্ত বিধেয়। প্রথমে কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম ত্যাগ হইতে পারে না। কর্ম্ম থাকিলে তবে ত কর্ম্ম ত্যাগ হইবে। অতএব অগ্রে কর্ম্ম থাকা চাই। অগ্রে কর্ম্মী হওয়া চাই। তবে কর্ম্ম ত্যাগ হইবে ও সেই কর্ম্মীপুরুষ আবার কর্ম্মত্যাগী মৌনী সন্ন্যাসী হইবেন। অতএব সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে হয়। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয়োঽধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে যথা,—

"নকর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।

নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ নিষ্কামভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, কেহ কখনও জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা অর্থাৎ নিঃশেষে সমস্ত কর্ম্ম বিরহিত হইয়া কেবল মাত্র সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কারণ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত হয়; তৎপরে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে পারে। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এ জন্মে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব না হইলেও কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব প্রথমেই যে, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অগ্রে কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট রূপে অনুষ্ঠিত হইলে তবে জ্ঞানযোগ, সাংখ্য-যোগাদিতে অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

স্বামী যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী।

হিরণ্যগর্ভ দেবতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪৩। অতএব হিরণ্যগর্ভ ও সূর্য্যদেব তাৎপর্য্যতঃ একই পুরুষ, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের অভিমানী দেবতা। পরমাত্মা ব্রহ্মই সৃষ্টির অনুরোধে আপনাকে সেই ঔপাধিকী মহা-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি একই পুরুষ না বল, তবে ব্রহ্মাকে পিতা ও সূর্য্যকে পুত্র বলিতে পার। কিন্তু তাহা হইলে একই অণ্ডে পিতাপুত্রের জন্ম মানিতে হয়।

৪৪। হিরণ্যগর্ভের তত্ত্ব ও উপাসনা সম্বন্ধে শ্রুতিতে অনেক কথা আছে।

প্রথমতঃ—জীবশ্রেষ্ঠ মানবের সূক্ষ্মদেহে তাঁহার অন্তর্যামিত্ব। পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং মনোবুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সংঘাতকে সূক্ষ্মদেহ কহে। তাহা স্থূলদেহ অপেক্ষা তেজোময় এবং জীবাত্মার চৈতন্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়ায় হিরণ্যবর্ণ। সে জন্য ব্যষ্টিসমষ্টিভেদে ঐ অন্তর্য্যামি দেবতা তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহা উপনিষৎ ও বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অতএব ব্রহ্ম-লোক হইতে, মানবদেহে পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব। এই অন্তর্য্যামি পুরুষের ধ্যানই ব্রহ্মোপাসনা। এ ধ্যান সম্পূর্ণ অপ্রতীক।

দ্বিতীয়তঃ—হিরণ্যগর্ভ দেবের সকামোপাসনা। ঈশোপনিষদে আছে,—

"সম্ভূতিঞ্চ * বিনাশঞ্চ † যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
বিনাশেন মৃত্যুংতীর্ত্বা২সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥

'অসম্ভূতি' অর্থাৎ প্রকৃতি আর 'বিনাশং' অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। এখানে "প্রকৃতি" শব্দে ক্রিয়া আর "হিরণ্যগর্ভ" অর্থে ক্রিয়ার অধি-পতি দেবতাসমষ্টি। অতএব দেবতা ভক্তিরসহ সপ্রতীক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তাৎপর্য্য। যিনি

---

* "অকার লোপশ্ছান্দ সঃ।"

† "বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভং।" প্রাকৃতিক-প্রলয় কালে হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন। এ জন্য তিনি বিনশ্বর।

তাহা করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ দ্বারা অনৈশ্বর্য্য এবং স্বাভাবিক মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রিয়া-নুষ্ঠানের ফলে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ করেন। "অমৃতং কর্ম্মজং ফলং" * অর্থাৎ তিনি স্বর্গলাভ করেন। 'যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ" যেখানে এক দেবপতি ইন্দ্র অধিবসতি করেন। (মুঃ ১।২।৫) "নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি।" (মুঃ ১।২।১০) তাদৃশ সকাম-কর্ম্মিরা (নাকস্য—স্বর্গস্য পৃষ্ঠে) স্বর্গলোক ¶ সুকৃত অনুভব করিয়া এই মর্ত্ত্য-লোকে বা হীনতরলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

তৃতীয়তঃ—হিরণ্যগর্ভের নিষ্কামোপাসনা।

"তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তাবিদ্বাংসোভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা ॥"

(মুঃ ১।২।১১)

জ্ঞান যুক্ত বাণপ্রস্থ সন্ন্যাসি শান্তস্বভাব যে সকল সাধু স্বীয় আশ্রমবিহিত তপস্যা ও হিরণ্য-গর্ভাদি বিদ্যা, অরণ্যেবাস পূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করতঃ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেবন করেন; তাঁহারা পুণ্যপাপ হইতে বিধুত হইয়া সূর্য্যদ্বারমার্গদ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যেখানে সেই প্রথমজোহিণ্যগর্ভ অব্যয়াত্মা পুরুষ বিরাজ করেন। বলা বাহুল্য যে, এই হিরণ্যগর্ভ বিদ্যার সেবা অপ্রতীক উপাসনারূপে গৃহীত হয়।

যাঁহারা তাদৃশ উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করেন, তাঁহাদের তথা হইতে ক্রমে-মুক্তি হয়। যথা

ব্রহ্মনাসহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে। পরাস্যান্তেকৃতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরং পদং। 'প্রতিসঞ্চর' প্রাকৃতিক প্রলয়কাল সম্প্রাপ্তে, ব্রহ্মার শতবর্ষ পরমায়ুর অন্তে, সেই সকল কৃতাত্মা পুরুষেরা ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মার সহ পরমপদে প্রবেশ করেন। আর জন্ম হয় না।

৪৫ ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে হিরণ্য-গর্ভ দেবতার উদ্দেশে একটী সূক্ত আছে। তাহাতে তাঁহার জন্ম কর্ম্ম ও মহিমা সুমধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশ চন্দ্র দত্ত মহোদয়ের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য প্রদান করিতেছি। † প্রথম মন্ত্রটী ব্রাহ্মণমণ্ডলে বিখ্যাত। এজন্য কেবল সেইটীর প্রতিলিপি দিলাম।

"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম।

১ অগ্রে হিরণ্যগর্ভ জন্মিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র জাতপ্রভু। তিনি পৃথিবী ও আকাশকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কে সেই দেবতা যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব। ১

২ যিনি আত্মদা ‡ বলদা, বিশ্বসংসার

* এইটী দক্ষিণায়ন বা পিতৃযানমার্গ।

¶ এইটী উত্তরায়ণ বা দেবযানমার্গ।

† অর্থের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। দত্তজ মহাশয় লেখেন এই (১২১ সংখ্যক) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধনিক। এই কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। কিন্ত আমাদের তাহার অবসর ও স্থানাভাব।

‡ এস্থানে "আত্মা" জীবাত্মা নহে। জীবাত্মা সকল অনাদি। "আত্মা" শব্দে এখানে জীবের স্থূল সূক্ষ্ম দেহ। এই "অমৃতের" অর্থ আপেক্ষিক অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মজ ফল। "মৃত্যু" শব্দে দেহের বিনাশ। উভয়ই ব্রহ্মার ছায়া। কেন না জীবাত্মা স্বরূপতঃ অচ্ছায়।

যাঁহার পূজা করে, দেবগণ যাঁহার আজ্ঞাপালন করেন, অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যুও যাঁহার ছায়া; কে সেই দেবতা যাঁহাকে আমরা আহুতি প্রদান করিব। ২

৩ যাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল তুষার-মৌলি গিরি উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা-ধরা যাঁহার সৃষ্ট, দিক্ সকল যাঁহার বাহু, কে সেই দেবতা ইত্যাদি। ৪।

৪ যিনি স্বর্লোক ও নাকলোককে * উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছেন। যাঁহার আশ্রয়ে সূর্য্য উদিত ও প্রভা লাভ করেন, কে সেই ইত্যাদি। ৫।৬।

৫ ভূরিপরিমাণ জলরাশি বিশ্বভুবন প্লাবিত করিয়াছিল। তাহা গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নি উৎপন্ন করিল। তাহা হইতে যিনি দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কে সেই ইত্যাদি।

যখন জলগণ † বলধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপাদন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমা দ্বারা সেই জলের উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের এক মাত্র অধিপতি—কে সেই ইত্যাদি।

৭। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কে সেই ইত্যাদি। ৯।

৮। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন সিদ্ধ হয়। আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

সমাহার! বরণীয় হিরণ্যগর্ভদেবতার অনেক নাম। যথা—মহতত্ত্ব বা মহান্, ব্রহ্মা *ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, ধাতা, বিধাতা,* প্রজাপতি, পিতামহ এবং পুরুষ। ‡ তন্মধ্যে মহত্তত্ত্ব ও তাঁহা হইতে ক্রমপূর্ব্বক উৎপন্ন অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, হিরণ্যবর্ণ-অণ্ড, এবং ঐ অণ্ডজাত হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মা দেবতা এই সমস্ত তত্ত্ব পরব্রহ্মের তপস্যা দ্বারা সৃষ্ট। প্রকৃতি, তাহার বহিরঙ্গ

---

* "নাক" শব্দে দত্তজা নাগলোক লিখিয়াছেন। ফলে তাহা ভুল। উহার অর্থ সর্পবিশেষ। ইতিপূর্ব্বে একটী শ্রুতির সেই অর্থই দেওয়া হইয়াছে।

† এই জল সম্ভবতঃ পৃথিবীর সমুদ্র। প্রভু হিরণ্যগর্ভ তাহার সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহা কি তাহার অয়ন হইয়াছিল? ঠিক বুঝা গেলনা। অতঃপর সেই জলগণ অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। সে কোন অগ্নি? বোধ হয় বাড়বাগ্নি। পৃথিবী ও সমুদ্র সৃষ্ট হওয়ার পর সেরূপ উৎপাত সকল সংঘটিত হইত। ভূগর্ভস্থ কালানল স্বরূপ সর্ব্বনাগ্নি ভূগর্ভ ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার নিয়মে তাহা পর্ব্বত ও সমুদ্র দ্বারা আচ্ছাদিত। পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় সেই অগ্নি সর্ব্বদাই এবং অধিক পরিমাণে গিরি ও সিন্ধু ভেদ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইত। তন্মধ্যে যাহা সাগর বক্ষে প্রজ্বলিত হইত তাহারই নাম বড়বাগ্নি। প্রভু হিরণ্যগর্ভই সে সমস্ত উৎপাতের প্রশমিতা। বিশ্ববিখ্যাত হম্বোলট লেখেন। "In the youthful period of our planet the Substances that had continued in a fluid condition within the earth broke throught its crust. (Humbolts views of nature)

‡ পুরুষ শব্দে পরব্রহ্ম, জীবাত্মা এবং ব্রহ্মা এই তিনকেই বুঝায়। শাস্ত্রের প্রকরণ ভেদে অর্থ নিষ্পন্ন হয়।

উপাদান কারণ (material cause) এবং পর ব্রহ্ম অন্তরঙ্গ ও ঔপাধিক চৈতন্যময় নিমিত্ত-কারণ। (essential or spiritual cause) এই জন্য সেই গুলিকে "প্রাকৃতিক-সৃষ্টি" কহে। "সর্গ" শব্দেও কহা যায়! প্রকৃতি তাহার হেতু হইলেও পরব্রহ্মই অধ্যক্ষ। অতএব মহত্তত্ব অবধি অণ্ড ও হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত সর্গই পরব্রহ্মের সৃষ্ট। তাহার পর ব্রহ্মার সৃষ্টি। তাহাকে "বিসর্গ" অথবা "বৈকারিক সৃষ্টি" কহে। তাহা, ভুলোক, স্বর্গলোক ও অসংখ্য অণ্ডগোলক ও তৎসমস্তের পৃষ্ঠোপরিস্থ পর্ব্বত, অরণ্য, নদী এবং সমুদ্রের রচনা; এবং অগণ্য প্রাণী জাতের বসতি, অন্ন, পান ও বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ। আমরা এই মর্ত্ত্যপুরে তাঁহাকে মানবের আদিপিতা বলিয়া জানি। তিনি আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধাতা, এবং বংশের প্রজাপতি। তিনিই মিথুন ধর্ম্মের স্রষ্টা। প্রজা, পর্জ্জন্য, অন্ন, ও নানাবিধ ভোগ জাতের কর্ত্তা। এই মর্ত্ত্যধাম, তাঁহার রচিত ফল ফুলের সুরম্য উদ্যান। "এতদ্‌ব্রহ্ম-বনঞ্চৈব ব্রহ্মা রচিত নিত্যশঃ।" এই ব্রহ্মবনে ব্রহ্মা নিত্য বিরাজমান আছেন।

ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অপূর্ব্ব পুরাতনী কীর্ত্তির স্মরণোদ্দীপক সনাতন বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অহরহঃ সন্ধ্যাবন্দনা দ্বারা তপস্যা করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা এক দিকে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুরক্ষিত, অন্যদিকে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি উদিত, এবং চরমে তাঁহাদের স্বর্গাপবর্গের দ্বার উন্মোচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল বেদ মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাব তাহা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-বার্ত্তার অক্ষয়বীজগর্ভ! সেই সমস্ত বীজের বিস্ময়জনক জ্ঞান প্রসারণী শক্তি। তাহা হইতে উপাসক, সেই প্রাথমিক তমোভূত প্রকৃতিতত্ব, মহতত্ব, তন্মাত্রতত্ব, সমুদ্রতত্ব, সেই সমুদ্রার্ণব হইতে তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা ধাতার আবির্ভাব, তাঁহা কর্ত্তৃক সেই মূল অণ্ডখণ্ডক্রমে পৃথিবী, মহর্লোকাদি ঊর্দ্ধ স্বর্গ ও পিতৃ ও দেব-স্বর্গের সংস্থান এবং সূর্য্য চন্দ্র ও তারকামালা খচিত আকাশ-বিস্তার-বার্ত্তা স্মৃতি পথে আনিতে পারেন। ইহাও জানিতে পারেন যে এইরূপ পূর্ব্ব কল্পেও ছিল এবং পূজনীয় ধাতা তদনুসারে কল্পে কল্পে সৃষ্টি বিস্তার করিয়া থাকেন। এই বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনা দ্বারা প্রভু হিরণ্যগর্ভের ও তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বকীর্ত্তির স্মরণ মননাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এরূপ বিজ্ঞানগর্ভতপস্যা পদ্ধতি ধরণীর আর কোন্ ধর্ম্মে আছে? সর্ব্বভূতের অগ্রজ বরণীয় প্রভু হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা ও প্রজাপতিরূপে এই সব মঙ্গলানুষ্ঠানের অধিদেবতা। তাঁহার প্রজাপতিত্ব, তাঁহার ব্রাহ্মণবংশের পিতামহত্ব, এবং ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মণ্যদেবত্ব জন্য ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের সঙ্গে ভারতের অপর বর্ণসকল ধন্য হইয়াছেন। ইতি ৺চন্দ্রশেখর বসু।

জাতি বিচার।

ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বা, অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
ওঁ ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যক কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়তঃ॥

সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষকে নমস্কার। যাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু যাঁহার ক্ষত্রিয়, উরুদেশ যাঁহার বৈশ্য, যাঁহার চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি, সেই মহাপুরুষের চরণে কোটী কোটী নমস্কার করি।

অনন্ত গ্রহোপগ্রহমালিনী মহাশক্তির অঙ্গুরীয়কবৎ আমাদের এই সৌর জগৎটির ভিতর চক্ষু সংকীর্ণ করিয়া চাহিলে তাহার মধ্যে একটী অন্ধকার গোলক-পিণ্ড পরিদৃষ্ট হয়। সেইটী বিষ্ণুশক্তি পরিধৃতা পৃথিবী—আমাদিগের ধরিত্রী।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধূলিকণা স্বরূপ সেই গোলকটীর আবার তিনভাগ জল, একটীভাগ মাত্র স্থল। তাহার আবার সহস্রাংশের একাংশ মাত্র মনুষ্য পরিবৃত। একটী সাধারণ গৃহে যতগুলি জীবাণু সঞ্চারিত হয়, সমগ্র পৃথিবীতে তত গুলি মনুষ্য নাই। এই মুষ্টিমেয় মনুষ্য আবার বহুবিভাগে বিভক্ত। সেই বিভাগগুলি আবার পরস্পর সংঘর্ষযুক্ত। এই বিভাগগুলি সমাজ নামে অভিহিত হয়। বিপ্লবে, সংঘর্ষে এমন কত সমাজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির অঙ্গুলি-তাড়নে কত সমাজ ইতিহাসের আশ্রয়মাত্র লাভ করিয়াই জীবিত আছে।

এই সকল সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা একটী মাত্র সমাজকে প্রাচীনতম বলিয়া বুঝিতে পারি। সহস্র সহস্র বিপ্লবেও সে সমাজটী বিলুপ্ত হয় নাই। সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও সে সমাজের স্তম্ভ ভাঙ্গে নাই। সহস্র নির্য্যাতনের ভিতর দিয়াও সে সমাজ উন্নত শিরে এখনও দণ্ডায়মান আছে; এবং এখনও থাকিবে। উহা আমাদিগের এই হিন্দু-সমাজ।

মনুষ্যসমাজের আলোচনা করিতে যাইলে, সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে হিন্দু-সমাজের উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এবং কোন মন্ত্রবলে, কি উপায়ে ইহা আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে ও এতদিন ধরিয়া হইতেছে জানিতে ইচ্ছা হয়। শুধু এই অস্তিত্ব নহে, এ সমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, এ সমাজস্থ মনুষ্যের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। ইহাদিগের দৃষ্টির প্রখরতা শুধু এই পৃথিবী নহে, শুধু এই সৌরজগৎ নহে কোটী ২ সৌর জগৎ সচ্ছন্দে ভেদ করিয়া প্রসারিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু পৃথিবী বক্ষস্থ জীবজগৎ নহে, ভূঃর্ভুবঃ স্বঃ আদি সপ্তলোকের জীবসংঘের সংবাদ লইয়া, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাহাদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতেছে। তাঁহারা জড় প্রকৃতির অতীত অথচ উহারই অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত এক বিরাট সাম্রাজ্যের আবিষ্কার করিয়া, সে সাম্রাজ্যের লোক সকলের সাহায্য লাভ করিয়া সেই ছত্রধর সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে; এবং প্রখর করোজ্জ্বল বিবিধবর্ণ রঞ্জিত নানা প্রকার চিন্তামণি মালিকা স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছে। জড় বিজ্ঞানেরত কথাই নাই, সে অধ্যাত্ম রাজ্যের বিজ্ঞানেও তাহারা প্রাজ্ঞ। জড় ও আধ্যাত্ম উভয় রাজ্যেরই অভ্যন্তর দিয়া একই সম্রাটের একই বিরাট নিয়ম ক্রিয়াশীল। ইহা আবিষ্কার করিয়া সেই সম্রাটের সাম্রাট-অঙ্গে আপনাকে অঙ্গিভূত করিয়া লইয়াছে। আমরা মনুষ্য,আমাদিগের যেমন রাজা আছে, যাঁহাদিগের অধিকারে এই ভূক্ষেত্র; কিন্তু যেমন পশু সমাজ সে রাজার সংবাদ জানে

না,তদ্রূপ অন্য মনুষ্য-সমাজ এ বিরাট রাজরাজেশ্বরের সংবাদ জানিত না ও জানিতে চাহিত না। হিন্দু সমাজই এ সংবাদ জানিয়াছে ও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে। যতকিছু মহাসত্য অদ্যাবধি মনুষ্য সমাজে আবিষ্কৃত হইয়াছে, হিন্দুই তাহার আবিষ্কারক।

কিসের জন্য হিন্দু এত অগ্রসর। কোন্ শক্তির সাধনা করিয়া হিন্দু এত বল সংগ্রহ করিয়াছে? মনুষ্য শক্তি কি প্রকার কৌশল সাহায্যে চরম সীমায় হিন্দুকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। পরিণামশীল এ মর জগতের ভিতর অপরিণামী আত্মার সন্ধান বাহির করিয়া,এ নাস্তিত্বের ভিতর আপনার চির অস্তিত্বের সংবাদ দানে মনুষ্য সমাজকে নিরুদ্বিগ্ন ও শান্তিময় করিতে হিন্দু কি প্রকার সক্ষম হইয়াছে! কোন্ মন্ত্রবলে হিন্দুর এ উন্নত প্রতিষ্ঠা?

হিন্দুর এ উন্নতির সর্ব্বোত্তম প্রধানতম উপায় জাতিবিচার। হিন্দু প্রকৃতির শিষ্য। হিন্দু বিরাট বিশ্ব প্রকাশের মুখ চাহিয়া সকল কার্য্য করে, হিন্দু স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকেও মহাশক্তির অঙ্গমাত্র বলিয়া জানে। এবং সেই অঙ্গের ভিতর যেমন স্তর সকল, বিভেদ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য সমাজের ভিতরও হিন্দু তদ্রূপ স্তর ও ভেদ পরিদর্শন করিয়া সমাজকে সেই স্তরানুযায়ী বিভক্ত করিয়া রাখে। হিন্দু দেখে প্রাকৃতিকস্তর ভেদে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমে যেমন রীতিমত স্তরভেদ আছে এবং যেমন থাকা প্রয়োজন,এক না থাকিলে যেমন অন্যস্তর থাকিতে পারে না, মনুষ্য সমাজেও তদ্রূপ এই সকল স্তর বিভিন্নতা প্রয়োজনীয় জিনিষ; ইহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা না করিলে সমাজ সংরক্ষণ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। হিন্দু প্রকৃতি-পাঠশালায় ভগবান গুরুমহাশয়ের শিষ্য। মহাগুরুর মহাশিষ্য হইয়াই হিন্দু জন্ম গ্রহণ করে। হিন্দুকে এ সকল তত্ত্ব মাথা ঘামাইয়া বড় একটা বাহির করিতে হয় নাই। ভাবিও না হিন্দু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাহায্যে এই জাতি বিচাররূপ সত্য আবিষ্কার করিয়া জীবনের কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।

হিন্দু বিরাট-পুরুষের বিরাট অঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া স্থূল মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে; হিন্দু আপনার অস্তিত্বকে তীক্ষ্ণ-মেধার সাহায্যে লুপ্ত-রত্নোদ্ধারের মত বাহির করে নাই। হিন্দু মনুষ্যরূপে প্রকটিত হইবার পর হইতেই অমর পুরুষের অঙ্গীভূত বলিয়া আপনাদিগকে জানে এবং সেই পুরুষকে আদর্শ করিয়াই সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করে। তবে যত বংশপরম্পরানুক্রমে কালস্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে, ততই প্রকৃতিরূপ ডোর অবলম্বন করিয়া করিয়া সে শৃঙ্খল রক্ষা করিয়া আসিতেছে; বিচ্ছিন্ন হয় নাই। প্রকৃতির সাহায্যে আপনাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের অনুভূতি সকলকে জীবনদান করিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব প্রাচীন পুরুষোত্তম সকলের দর্শন ও অনুভূতি সকলকে সপ্রমাণিত করিয়া করিয়া প্রকৃতির সাহায্যে, তাহাদিগের সে মহাগুরুর দিকে আপনাদিগের প্রাণের প্রেরণা করিয়া, সে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ওই সকল প্রাণের প্রেরণাই, হিন্দুর আদরের দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্র। বেদ

প্রাচীন পুরুষোত্তম দিগের অনুভূতি ও প্রেরণা এবং হিন্দু উপযুক্ত হইলে, সেইরূপ বেদ অনুভব ও ধারণা করিতে সক্ষম হয় সে কথা পরে বলিব।

যাহা হউক, হিন্দুর সে সকল চিরসত্য অনুভূতি ও দর্শনের মধ্যে জাতি-বিচার একটী প্রধানতম দর্শন। এবং কালস্রোতে বংশানুক্রমে ভাসিয়া ভাসিয়া আজ কলির গহ্বরে আসিয়া পড়িয়াও,উহারই বলে এখনও আপনাদিগের সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ও পূর্ব্ব অনুভূত বেদন ও জ্ঞান সকলের আভাস পাইতে সক্ষম হইতেছে।

আমি বলিয়াছি প্রকৃতি-পাঠে হিন্দু শুধু চক্ষু লাভ করে; এবং সেই চক্ষে যাহা প্রকৃতিগত দেখিতে পায়, তাহাই সংরক্ষণে যত্নবান থাকে। হিন্দু এ জাতি-বিচার বিরাট অঙ্গে পরিদর্শন মাত্র করিয়াছে এবং পরিদর্শন করিয়া তাহা সংরক্ষণে চিরদিন যত্নবান আছে। সে যত্ন নিষ্ফল হয় নাই। সে যত্নের ফলে হিন্দু জগতে যাহা দেখাইয়াছে, তাহা মনুষ্য-শক্তি কখনও পারে বলিয়া কল্পনাতেই আসে না।

বিরাট-পুরুষের বিরাট অঙ্গে ক্ষুদ্র বালুকণার মত অন্ধকার-নিমগ্ন পৃথিবীটির বক্ষে বসিয়া গুটি-কয়েক মাত্র মনুষ্য, ভাসিয়া চলিয়াছে; যেন জল-নিমগ্ন ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনে ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোথায় স্রোত বাহিত হইয়া চলিয়াছে। সেই মুষ্টিমেয় মনুষ্যের মধ্যে আবার হিন্দু বলিয়া গুটিকয়েক পরিচিত। তাহাদের চক্ষুর জ্যোতিঃ দেখিয়া মনুষ্য-জগৎ ত দূরের কথা ঊর্দ্ধে দেবলোক অবধি বিস্মিত!

এস, আমরা সেই জ্যোতিষ্মান জাতি যাহাদিগকে গুরুরূপে জগতে পাইয়া এ জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি, ও রক্ষা করিয়া আসিতেছি, সেই জগৎগুরু ব্রাহ্মণদিগের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহারা যে উপায়ে এ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেই সকলের অন্যতম জাতি-বিচারের আলোচনা করি।

জাতি বিচার মনুষ্যের কৃত নহে, বিরাটের। হিন্দু ইহার রক্ষক। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধা-তত্ত্ব।

—:০:—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা।
সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

অর্থাৎ শ্রীমতি রাধা অনাদি ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি এবং তাঁহার পূর্ণানন্দদায়িনী প্রাণপ্রিয়া।

"রাধাকৃষ্ণে ভেদ নাই একই স্বরূপ।
লীলা আস্বাদিতে মাত্র ধরে দুই রূপ॥"

যেই রাধা সেই কৃষ্ণ; অথবা যেই কৃষ্ণ সেই রাধা, একেই দুই অথবা দুয়েই এক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমাত্মা,পরম পুরুষ এবং শ্রীরাধা তাঁহার অঙ্গ-সম্ভূতা পরমা প্রকৃতি।

"কোটি সৌদামিনী যিনি রাইরূপ খানি।
পদনখ দীপ্তে দীপ্তি কোটী দিনমণি॥"

এবং

"রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমবশ্চ রাধা।
রাধা ধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাণী।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা ;
রাধাময়ী মম বভুব কুত ত্রিলোকী ॥"

অর্থাৎ—আমার পূর্ব্বে রাধা, পশ্চিমে রাধা ; বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা ; আকাশে রাধা, আমার ত্রিভুবন যে রাধাময় হইল। রাধারূপ লুকাইয়া পড়িবার নহে।

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা রাধা স্ফুরে।"

রাধারূপ চিত্ত-গগনে উদিত হইলে, পৃথিবী রাধাময় হইয়া যায়।

প্রকৃতির লীলা নিকেতন, তমাল হিন্তাল পরিশোভিত, বিহগকাকলী-ঘোষিত, বৃক্ষলতা সমুদ্ভাসিত, কুসুম গন্ধামোদিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকা অবতীর্ণা! শক্তি ও শক্তিমানে যেমন অভেদ, আলোক ও উত্তাপ যেমন ভিন্ন হইলেও অভিন্ন, ভক্ত এবং ভগবান যেমন পরস্পরের মধ্যে অনুস্যূত, রাধা ও কৃষ্ণও সেইরূপ দুই হইলেও এক ও অভিন্ন। আলোক বুঝিতে বুঝিতে যেমন উত্তাপের জ্ঞান আপনি আসে, রাধাকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলে কৃষ্ণজ্ঞান আপনাপনই সাধকের চিত্ত-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়।

উষা যেমন পূর্ব্বাকাশে নূতন সৌন্দর্য্য-রাশি ঢালিয়া দেয়, হৃদয়ে শ্রীমতীর বিকাশ হইলে ভক্তের হৃদয় সেইরূপ নূতন ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। বহুভাগ্য বলে হৃদয়ে রাধাশক্তির আবির্ভাব হইলে, ভক্তের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকে না। মধুরতাময়ী উষার সঙ্গে সঙ্গে যেমন কুসুমকুল হাস্য করিতে থাকে, পক্ষীগণ সুনীল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া আপনাপন স্বর-লহরীতে জগতের প্রাণ মন বিমোহিত করে, সূচিভেদ্য অন্ধকারের স্থানে যেমন ফুটফুটে আলো শোভা পায়, সেইরূপ রাধারূপের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে দয়া, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি আপনাআপনি ফুটিয়া উঠে, হৃদয়-বীণায় শান্তির কোমল ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। অবিশ্বাসের আঁধার দূরে পলায়ন করে এবং শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ-মধুর কিরণে হৃদয় মধুময় হইয়া যায়। শরৎকালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সুধাকরের সৌন্দর্য্যরাশী মধুর হইতে মধুরতর মূর্ত্তি ধারণ করে, রাধা-ভাবের আবির্ভাব হইলে সেইরূপ রাধানাথের কোমল মুখ, হৃদয়ের ভিতর হইতে প্রাণের ইষদুন্মুক্ত কবাটের অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়! যিনি ভগবানকে পাইবার আশায় উন্মাদিনী হইয়া আত্মীয় স্বজনের মুখাপেক্ষা করেন নাই, যিনি শ্যাম নাম শুনিয়া অবধি, তন্ময় হৃদয় হইয়াছিলেন, যিনি জগৎপতির প্রণয় লাভ করিবার অভিলাষে প্রেমময় পতিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি ভগবৎ সত্বায় বিলীন হইবার জন্য কুলাচারকে পদ-দলিত করিয়া, দুর্ভেদ্য মায়াপাশকে অনায়াসে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আপনার প্রাণের অদমনীয় আবেগে ভগবানের দিকে ছুটিয়াছিলেন, যিনি গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী, স্বামীর অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও শ্যাম-বিরহে পাগলিনী, গৃহ কার্য্যে রত থাকিয়াও ভগবানের সঙ্কেত-মুরলী রব শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণা, তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে ভক্তের বুঝিবার আর কিছু বাকি থাকে না। বহু পুণ্যফলে, সাধনার বলে

এই অতুলনীয় রাধারূপ সাধকের চিত্তপটে প্রতিফলিত হয়। সাধক তখন রাধা ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন, রাধাভাবে ভাবিত হইয়া জগন্ময় তিনি ভগবানের আনন্দঘন সত্বার উপলব্ধি করেন; রাধাভাবে ভাবিত হইয়া তিনি দিন রাত চিত্ত-নদীর কুলদেশাভিমুখে তাকাইয়া থাকেন, সাংসারিক বিষয় হইতে কর্ণকে প্রত্যাহৃত করিয়া বিনোদ বাঁশরীর মধুর হইতে মধুরতর রব শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন, একবার হৃদয় পুলিনে সে অস্ফুট সঙ্কেত-রব শুনিবা মাত্র তিনি অভিসারিকা সাজিয়া বসেন। তাহার ন্যায় তিনি অনায়াসে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, নায়কের সঙ্গম-সুখের সুখময়ী কল্পনায় মিলনোচিত বেশভূষা ধারণ করিয়া, ভক্তির তাম্বুল-রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, বিশ্বাসের মনোরম কাঁচুলি হৃদয়ে আঁটিয়া, গুণকীর্ত্তনের নূপুর চরণে ধারণ করিয়া, প্রেমের কুসুম-মালিকা গলদেশে দোলাইয়া, গৃহ হইতে ছুটিয়া যান। রাধা-প্রেমের কি তীব্র রস। সে রসের বিন্দুমাত্র পান করিলেই সাধক আত্মহারা হইয়া পড়েন। সংসার তাঁহার নিকট নূতনমূর্ত্তি ধারণ করে, তাঁহার মনের ভিতর নূতন নয়ন ফুটিয়া উঠে। তিনি পুরুষ হইয়াও নারী সাজিয়া বসেন। প্রৌঢ়া হইয়াও যেন নবযৌবন ফিরাইয়া পান। নবীনার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে লজ্জা অথচ আসক্তি, অঙ্গে আলিঙ্গনেচ্ছা অথচ কাতরতা, চরণে ব্রীড়ামন্থরতা অথচ দ্রুত গমনাভিলাষ আসিয়া উপস্থিত হয়। বলি বলি করিয়াও তাঁর মুখ ফোটে না; যাই যাই করিয়াও যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায়; ধরি ধরি করিয়াও সে প্রাণের ধনকে, সে হৃদয়-বাঞ্ছিতকে, সে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরকে আলিঙ্গন করিতে বাহু যেন উঠে না। পদকর্ত্তা ঠিকই গাহিয়াছেন যে :—

"দোঁহে দোঁহার বদন, ও বদন হেরে রে
দাঁড়ালো।
যাই বলে আর যেতে, ও যেতে নারে রে,
দাঁড়ালো।
কথা নাই আর নিমিখ, ও নিমিখ নাই রে,
দাঁড়ালো।
আর নয়ন ফিরাতে, ও ফিরাতে নারে রে,
দাঁড়ালো।" ইত্যাদি।

হৃদয়েশ্বরকে আলিঙ্গন করিতে যেন বাহু উঠেনা। কি যেন এক অপূর্ব্ব, অপ্রকাশ্য, অবোধগম্য, আবেশময় ভাবে তাঁহার হৃদয়, মন পরিপূরিত হয়। নবীনার মুখ না ফুটিলেও ক্ষতি নাই, কারণ তাহার অনুরাগোদ্দীপ্ত আরক্তিম গণ্ড-স্থলে হৃদয়নিহিত ভাব সকল সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত থাকে, চুম্বন করিতে অগ্রসর হইয়া লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলেও প্রাণের আশা অপূর্ণ থাকে না, কারণ নায়িকার ঈষৎ আকুঞ্চিত শোণিতাভ ওষ্ঠাধরে নায়কের উষ্ণ-চুম্বন অযাচিত ভাবে সংলগ্ন হয়। রাধাভাবে ভাবিত সাধকও নবীনা হইলে, তাঁহার যত আশা, যত অভিলাষ, যত আকাঙ্ক্ষা সকলই একে একে সিদ্ধ হইয়া যায়। রাধামূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে সাধক, সংসারে থাকিয়াও অভিসারিকা হন; বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়াও কুলটা হন, সুখের অভিলাষ না করিলেও ভগবৎ-সঙ্গসুখে অধীর হন। তিনি কাহাকেও আপনার মনের

কপাট খুলিয়া, হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশের নিহিত আনন্দরাশী দেখাইতে পারেন না। ভাষায় শক্তি নাই বলিয়া আপনার মনোভাব জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ-মন কি এক অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়, সুখ, দুঃখ, লজ্জা, লিপ্সা জড়িত আলোক-আঁধারময় ভাবে বিভোর হইয়া যায়। নবীনার প্রথম নায়ক-মিলনের ন্যায় সে সুখ, সে প্রীতি, কাহাকেও বলিবার নহে, কেবল বুঝিবার। কিন্তু মুখে না বলিলে কি হয়, যাহারা সেই রসের রসিক, যাহারা ভাগ্যবলে সাধনার সরলমার্গে দণ্ডায়মান, তাহারা তাহাকে অনায়াসেই চিনিয়া লয়। নবীনার শরীরে নখক্ষত দেখিয়া, তাহার যথা বিন্যস্ত অলঙ্কাররাজির বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া, কস্তুরিকা-চন্দনের বিলোপ দর্শন করিয়া, যেমন তার কান্ত সম্ভোগ অন্যে অনুমান করিয়া লয়, অথচ সে নিজে কোন কথা বলে না, বলিতে গেলে, লজ্জায় তাহার জিহ্বা জড়াইয়া আসে, সেইরূপ যিনি ভগবানের কাছে প্রাণ-মন বিকাইয়াছেন, ভগবৎ-কথা বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠরোধ হইয়া আসে, ভগবৎ-সন্নিধানে যাইতে হইলে তাঁহার পদযুগল আবেশে অধীর হইয়া উঠে। পায় পায় তাঁর সরল-গতির ব্যাঘাত জন্মে, ভগবৎ-রূপের স্মরণে তাহার সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষ উপস্থিত হয়, তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, "এইরূপে লোক আপনা হইতেও প্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগবান্ ও গলিত-হৃদয় হইয়া কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখনও বা রোদন করেন, কখনও বা চিৎকার করেন, কখনও বা গান করেন, আবার কখনও বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন।" যাহার চিত্ত গলিয়া যায়, সে গদ্গদ-ভাবে কথা বলে, সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, সে লজ্জাশূন্য হইয়া কখন গায় ও কখনও নাচে। ভক্ত ভুবনকে পবিত্র করে।

তাই বলিতেছিলাম—যে হৃদয়ে শ্রীরাধার বিকাশ হইবে, রাধানাথের কোমল কিরণে সে হৃদয়ের অন্ধতমসা একেবারে বিদূরিত হইয়া যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর মুরলীর মোহন নিক্কণ একবার হৃদয়-আকাশে প্রতিধ্বনিত হইলে, ভক্ত আপনার সত্তা ভুলিয়া যান; আপনার নাম, রূপ, জাতি,কুল,বর্ণ, লিঙ্গ সকলই বিস্মৃতির অগাধজলে নিমজ্জিত করেন। তখন তিনি জগন্ময় রাধাশক্তির বিকাশ দেখিতে পান। তখন তাঁহার ভিতরে রাধা, বাহিরে রাধা, স্বর্গে রাধা, মর্ত্ত্যে রাধা, সর্ব্বস্থল যেন রাধাময় হইয়া যায়। তখন তিনি যথার্থই বলিতে পারেন যে "আমার পূর্ব্বে রাধা, পশ্চিমে রাধা, বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা, পৃথিবীতে রাধা, আকাশে রাধা, আমার ত্রিভুবন যেন রাধাময় হইল।

রাধারূপ লুকাইয়া রাখিবার নহে। কাহারও বহু পুণ্যফলে হৃদয়াকাশে সেরূপের ঈষৎ স্ফুরণ হইলে, তাহার গতি, বিধি, ভাব, বিলাস, ভঙ্গি ইঙ্গীত দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। যেখানে অসাধারণ গুণ, বা শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভ্যন্তরে গুপ্ত কোন বস্তু আছে বুঝিতে হইবে। মৃগনাভিকে আচ্ছাদন করলেও তাহার মনোহর গন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ সেই রাধাকে বুঝিব বলিয়া, রাধার প্রেম-

সমুদ্রে ডুবিব বলিয়া, রাধার নিঃস্বার্থ প্রণয়ের প্রবল-স্রোতে গা ভাসাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। রাধাকে বুঝি, বা, রাধাকে বুঝাইতে পারি, এমন সাধ্য আমার কিছু মাত্র নাই? এমন সাধনা, এমন সুকৃতি আমাদের কি আছে? তবে বৈষ্ণব-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-কাব্যের পদানুসরণ করিলে, শ্রীমতীকে বুঝিতে পারা সহজসাধ্য হয়।

আলোচনার পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন—রাধাতত্ত্ব যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া যেন আমাদের বিদিত করান।

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

"রাধে হে! কে চিনিতে পারে হে তোমায়।
২। এলে, গোলক করি শূন্য, ধরায় অবতীর্ণ,
পাতকির কুল উদ্ধারিবার জন্য,
জগৎকর্ত্রী ত্রিলোক মান্য,
ভব মান্য করেন যায়।
৩। রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে বেদে,
চারি ফল হয় উৎপন্ন ঐ পদে,
দৃষ্টি-মুদে যে জন পদ ভাবে হৃদে,
এড়ায় শমনের দায়॥"

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

১, হ্লাদিনীর সার—'প্রেম', প্রেমসার—'ভাব।'
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব'॥
২, মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
৩, রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্রে পরমাণ॥
৪, মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে, নাহি কভু ভেদ॥
৫, রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
৬, কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি—যাহে তিন প্রধান।
চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
৭, অন্তরঙ্গা, বহিঃরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সবার উপরে॥
৮, সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
৯, আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ, যারে "জ্ঞান" করি মানি॥
১০, কৃষ্ণকে আহ্লাদে জতে, নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
১১, সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
১২, হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ চিণ্ময়রস—প্রেমের আখ্যান॥
১৩, প্রেমের পরমসার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
১৪, প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
১৫, সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে, এই কার্য্য যার॥
১৬, মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ!
ললিতাদি সখী তাঁর কায়-ব্যূহ রূপ।
১৭, রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা!
১৮, সবে মাত্র সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

১৯, সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই, করে অনুগতি ॥
২০, রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥"

শ্রীআনন্দগোপাল সেন, বি, এ।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ।

স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে, এবং তাহাদিগকে বর্ণমালার পর আর কি শিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আরও গুরুতর। ইংরাজীতে যাহাকে elementary education বলে এবং যাহা আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বলিয়া তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছি—স্ত্রীলোকদিগকে ঐ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং উচিত আমরা তাহা প্রথমেই মানিয়া লইতে চাহি। প্রাথমিক শিক্ষার পর স্ত্রীলোকগণকে কি ভাবে শিক্ষা দিলে স্ত্রীলোকেরা আমাদিগের সংসার-যাত্রার বিঘ্ন না হইয়া বরং তাহাতে আমাদিগের সহায় হইতে পারেন, ইহাই আমাদিগের বক্ষ্যমান-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণে দেখা যাউক—শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? এক কথায় ইহার কোন উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় যে, ছাত্রের মানসিক শক্তির পূর্ণবিকাশ এবং সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার আর কোন লক্ষ্য থাকা উচিত নহে। আমরা ইহাতে বুঝাইতে চাহি না যে, যাহার হৃদয়ে চৌর্য্যবৃত্তি প্রবল, শিক্ষা দ্বারা তাহার ঐ বৃত্তির সাহায্য হউক, শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক ইহার বিপরীত এবং প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা তাহার ঐ বৃত্তি খর্ব্ব হইবে বা তাহা একবারেই বিদূরিত হইবে—ইহাই হইল প্রকৃত শিক্ষার ফল।

আমাদিগের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা অবশ্য উপরোক্ত লক্ষ্য এবং আদর্শের নহে এবং তদ্দ্বারা দেশের কতদূর মঙ্গল হইবে, তাহার বিচারের আমরা কোন আবশ্যকতা দেখি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে বড় চাকুরি এবং অর্থাগমের সুবিধা করা যদি প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বড় সহায়তা করিতেছেন না!

বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীলোককে সাধারণতঃ অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় না, কিন্তু তাঁহাদিগকে যাহা করিতে হয়—তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ শিক্ষিত নহেন, একথা বোধ হয় সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন। তাহার কারণও নানাবিধ সুতরাং আমরা কেবলমাত্র অবলা-কুলের দোষ দেখাইয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারি না, যদি এ বিষয়ে কাহারও দোষ থাকে, তাহা হইলে ঐ দোষ আমাদিগের নিজেরই, এবং যতদিন আমরা নিজের ঐ দোষ বা ত্রুটী সংশোধন করিতে না পারি, ততদিন আমাদিগের মহিলাগণের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে!

শেষ আদম-সুমারিতে প্রকাশ, ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তার হইতেছে এবং নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে শতকরা ৭১ জন লোক চাষের

কাজেই আছে এবং বাকী অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। সুতরাং যখন আমরা উচ্চ শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, বহির্বাণিজ্য, প্রভৃতি বড় বড় কথার আন্দোলন করি, তখন স্বতঃই মনে হয় যে, যে দেশের একশত লোকের মধ্যে ৭১ জন কৃষিজীবী, সেখানে এসব কথার সার্থকতা কি? কাজেই স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের স্বতঃই নৈরাশ্যের উদয় হয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে, এবং আমরা ২।৪।১০ জনের দোহাই দিয়া আমাদিগকে আমরা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রসর মনে করি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের এই অভিমান কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না? মনে করুন—দেশে যদি ২০।২৫।৫০ জন শিক্ষিতা মহিলা দেখা যায়, তাহা হইলে সমস্ত দেশকে স্ত্রীশিক্ষার শীর্ষস্থানীয় বলিতে পারি, না ২০০।৫০০ জন শিক্ষিত মহিলা থাকিলেই সমগ্র দেশকে সুশিক্ষিত বলিতে পারি!

বাঙ্গালা দেশের স্ত্রীমহলে এক্ষণে যে শিক্ষা প্রচলিত, তাহাতে অনেকে কার্পেট বুনিতে বা ঐ প্রকারের শিল্পকার্য্য করিতে পারেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপন্যাস গুলি পড়িতে পারেন ও অনন্যপরায়ণা হইয়া তাহা পাঠ করিয়া থাকেন? ইহাতে সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের কি সাহায্য হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সাবেক কালে স্ত্রী স্বামীর অৰ্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন, আধুনিক কালে তিনি স্বামী সোহাগিনী মাত্র। ইহাতে আমরা যে একটী বড় আদর্শ হারাইয়া ফেলিতেছি এবং আমাদিগের মহদনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি?

সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে Nineteenth century নামক পত্রিকায় এক মহিলা কি বলিতেছেন দেখুন:—

"In short, so far from approximating girls' school to boys', I would so far as possible approximate them to the best kinds of home education. And I would encourage the pursuit of handicrafts, needlework, embroidery, and every sort of technical skill, and give prizes for ingenuity in turning these to domestic use or adornment.

"When the girls had finished school course I would send them to the university only if they could afford the luxury of prolonged education, or if they were suited to, or intended for, the learned professions or the higher walks of the public service."

অর্থাৎ বালক বিদ্যালয়ের অনুরূপ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্ত্তে আমি যতদূর সম্ভব বালিকা বিদ্যালয় গৃহশিক্ষার অনুরূপ করিতে চাহি। আমি সূচিকার্য্য, চিকণ-কর্ম্ম প্রভৃতি

বিশেষ পারদর্শিতার কার্য্যে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী এবং যদি কেহ এই সকল গৃহের শোভা বৃদ্ধির বা ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে পারেন, তাহাকে পুরস্কার দিতে চাহি।

বালিকাগণ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর যদি কাহারও অধিক দিন যাবৎ শিক্ষা দিবার ক্ষমতা থাকে, তবেই তিনি যেন কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান; যদি কোন বালিকা বিদ্যা ব্যবসায়ী হইবার বাসনা রাখেন এবং তাহার উপযুক্তা হন বা সরকারী চাকুরিতে প্রবিষ্ট হইবার আশা রাখেন, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারেন।

যদি বিলাতে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত দেশে স্ত্রীলোকেরা অল্পবিস্তর লেখাপড়া জানাই যথেষ্ট নহে কি? আমাদিগের গৃহে তাঁহারা সুচারুরূপে গৃহিণীপনা করিতে পারিলেই ত আমরা কৃতার্থ হই! আমরা চাহি—তাঁহারা আধুনিক প্রথানুসারে গোপালন, শিশুপালন, রোগশুশ্রূষা প্রভৃতি গৃহস্থের অবশ্য করণীয় কার্য্যে শিক্ষিত হন। অতিথি অভ্যাগতের আদর যত্ন করেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন, রন্ধনশালা হইতে উড়িষ্যাদেশাগতগণকে বিতাড়িত করেন! যদি কেহ সূচিকার্য্য ও চিকণ-কার্য্য করিতে পারেন এবং তাহাতে আর্থিক সাহায্য হয়—অধিকন্তু ন দোষায়! আমরা এক্ষণে এই শিক্ষাই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট মনে করি, আমরা বাড়ীছাড়া, গাউন আঁটা, রন্ধনশালা-বিদ্বেষিণী বিদুষীর পক্ষপাতী নহি, বা তাঁহার সংশ্রবে সাধারণ গৃহস্থের কোন উপকার আছে—মনে করি না!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এল্।

শ্রেষ্ঠ কে ?

করি যত্নে বিশ্লেষণ বহ্নি, বায়ু, জল,
মাথা নাড়ি, কহে বৈজ্ঞানিক—
আকর্ষণে, বিকর্ষণে, এই ভূমণ্ডল
চলে মানি, বিধি আণবিক।

আলোড়িয়া বহু শাস্ত্র, করিয়া মন্থন
পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক,
প্রপঞ্চ এ দৃশ্যমান তাবৎ ভুবন,
বিজ্ঞভাবে কহে দার্শনিক।

বিশ্বভরা সৌন্দর্য্যের সরস পরশে
প্রেমমুগ্ধ হেরি' চারিদিক,
এই ধরা প্রেমময়ী, বিমল হরষে
কহে, যেই কবি ও প্রেমিক।

—গিরিজাকুমার—

দুটী কথা।

আমি তারে ভাল বাসি, এই মোর অপরাধ—
তাহাতেই এত কথা, চারিদিকে অপবাদ?
তা'হোক, আমিত তাহে বিন্দুমাত্র ভীত নয়,
কারণ,—আমার প্রেম নহে পূতি-গন্ধ-ময়।
আমি তারে ভালবাসি, চিরদিন বেসে যা'ব,
চাহি না ত প্রতিদান, কখনও নাহি চা'ব।

আছে এ বিশ্বাস মম,-একান্তই আমি তা'র,
এ লোকে নাহি হোক,প্রেমলোকে সে আমার।
সে যদি পরের হয়, কহিব না তার কথা,
আমার প্রণয় শুদ্ধ, নাহি ত'ায় আকুলতা।
আমিত চাহি না দেহ, দেহত দুদিন থাকে,
শুধু ভাল বেসে যাব, আমি ভাল বাসি যাকে।
অমর আত্মার সনে, অমর আত্মার যোগ,
সে নহে কথার কথা, নহে বিলাসের ভোগ।
আমি জানি ভালবাসা, মহাত্যাগ আত্মদান,
যে ভালবাসিতে জানে, সে চাহে না প্রতিদান।
কালের অজেয় প্রেম, প্রেমের মরণ নাহি,
নাহি হা হুতাশ আর নাহি তাহে পরিত্রাহি।
আমি আছি,ভাল আছি,তার স্মৃতি ল'য়ে আছি,
প্রেমেতে বিভোর হ'য়ে, শোক দুঃখ ভুলিয়াছি,
যা' ছিল সম্ভব কিছু, থা কিতে পৃথ্বীর দাগ,
আজ আর কিছু নাই,—আছে ঘন অনুরাগ।
আমি তারে ভালবাসি সে যদি বুঝিতে না'রে
আমি যাব না'ক কিন্তু চেষ্টা করি বুঝাবারে,
এই এত উপহাস, উপেক্ষা, গঞ্জনারাশি,
সব আমি ভুলে থাকি, মনে করে "ভালবাসি।"
আহা থাক, সুখে থাক, যেথানেই থাক বালা
আমি নিত্য তারে দিব, প্রণয়ের ফুল-মালা।
উজাড় করিয়া দিব, আমার এ পূতপ্রেম,
আমি তারে ভালবাসি, আমি তার চাহি ক্ষেম।
বলিতে কি আছে বাকি, আমি কি বলিব আর
দুটি কথা "ভালবাসি" নাহি বেশী বলিবার।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

আঁধারে।

একি দয়াময়, নীচে কত নীচে,
কোথায় ফেলিলে আমারে,
নাহি আলো হেথা, মরিগো কেবলি,
ফাঁফরি নিবিড় আঁধারে।
কভু নাথ যদি করিগো প্রয়াস,
হেরিতে তোমার কিরণ আভাস,
ধ'রে বেঁধে এরা মোহ-আবরণ,
ফেলে দেয় আঁখি উপরে।
ধ'রে তোল মোরে, তোল দয়াময়!
ব্যাকুল—ব্যাকুল—ব্যাকুল হৃদয়,
অন্ধকূপ হ'তে ধ'রে তোল নাথ,
তব প্রেমালোক মাঝারে।
অথবা—অথবা—অথবা হে স্বামি!
এস নেমে এস, জ্যোতির্ম্ময় তুমি,
দেহ ফুটাইয়া তব জ্যোতিঃরেখা,
ওই আঁধারের ওপারে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

গান।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুস্থির কর অস্থির মন, অশান্ত প্রাণ শান্ত রে।
ভুলি সব কাজ যেন হৃদিরাজ তব নাম জপি
অন্তরে।
সুখে, দুঃখে, শোকে, আপদে, বিপদে,
রেখো মোরে প্রভু ওই রাঙা পদে,
শেষের সে দিনে, যেন পড়ে মনে,
(ওই) অভয় চরণ অন্তরে।

শ্রীধ্রুবলাল দত্ত বর্ম্মা।

রামপ্রসাদ।

—ঃ০ঃ—

ভূমিকা।

আমাদের এই কানন-কুন্তলা—সমুদ্রমেখলা শস্যশ্যামলা ভারত-জননী সকল দেশের মুকুট-মণি। ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বিশ্ববিশ্রুত। জগতে এমন দেশ আর কোথাও নাই—যাহা কোন অংশে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে! ইহার গগন-পবন, বন-উপবন, প্রান্তর-প্রাঙ্গন, ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ইহার শিক্ষা-দীক্ষা সকলের আদর্শ, জগতের কুত্রাপি কোন দেশে ঠিক এমনটী আর দৃষ্টিগোচর হয় না—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য। এখন না হউক, এমন একদিন ছিল, যখন ষড়ঋতু এখানে সমান ভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লোকের স্বাস্থ্য বিধান করিত। পর্জ্জন্যদেব যথা সময়ে বারি বর্ষণ করিয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতেন, ফলশস্যে ভারত-ভাণ্ডার পরিপুর্ণ হইয়া লোকের অভাব মোচন করিত। দেশে অকাল-বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি স্থান পাইত না। সুখ-সৌভাগ্যের পূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত থাকিয়া একদিন ইহাকে স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত করিয়াছিল। ত্রিদিববাসী অমরগণও অমরার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পার্থিব স্বর্গ ভারতের সুধাস্বাদনে লালায়িত হইতেন। ভারতের যশোগৌরব তখন সর্ব্বতোমুখী হইয়া মর্ত্তে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, ভারতের বিজয়-কেতন অনুকূল পবনে প্রডডীয়মান হইয়া জগতের নিকট আপন প্রভাব বিঘোষিত করিত।

কেন, ভারতের যশোমান—সৌভাগ্য-সম্মান সভ্যতাভিমান—হিমালয় হইতে কুমারিকা, এমন কি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জীবজগতের শিক্ষা ও দীক্ষার নিদান ভূমি হইয়াছিল! কেন, ভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে, গগন-শোভিত তারকা মধ্যে স্নিগ্ধোজ্জল-দিপ্তি চন্দ্রমার ন্যায় সুশোভিত হইয়া আপন মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছিল! ভারত এত বড় হইয়াছিল কিসে? ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্বের মূল নির্ণয় করিতে হইলে সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইবে—ধর্ম্মে ও কর্ম্মে একাধিপত্য লাভ করিয়াই তাহার এত সৌভাগ্যোদয়—তাই সে জগতের সকল দেশ অপেক্ষা পূজনীয় ও বরণীয় হইয়া আপন কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতে পারিয়াছিল। আর সেই ধর্ম্মও কর্ম্মের অধি-নায়ক, তাহার একনিষ্ঠ কর্ত্তা, সাধকশ্রেষ্ঠগণকে অঙ্কে ধারণ করিয়াই ভারত জগতীতলে ধন্য ও কৃতার্থমন্য। পূজনীয় সাধক ও ধার্ম্মিকের জন্ম কেবল এই পুণ্যভূমি ভারত মাতারই গর্ভে হইয়াছিল, ইঁহারই পবিত্র ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া তাঁহারা ভুবন উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন—পুত্রের খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই মায়ের এত মুখোজ্জল হইয়াছে, তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধক পুত্রগণের জন্যই ভুবন-বিদিতা, জগৎ-পূজ্যা, আদর্শ দেশ বলিয়া পরিগণিতা! এই রত্নগর্ভা ভারতে যত সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত-সাধক

ধর্ম্মী ও কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তত আর কোথাও, জগতের কোন দেশে জন্মিয়াছে কি? বোধ হয়—ইহার শতাংশের একাংশ লইয়াও জগতের কোন দেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য দাবী করিতে পারে না। এই জন্যই জন্মভূমি মা আমার সকল দেশের শ্রেষ্ঠ, ঐ সকল মহাত্মাগণের পদস্পর্শে এদেশের রেণু স্বর্ণরেণু অপেক্ষাও মূল্যবান—পবিত্রাদপি-পবিত্র এবং তজ্জন্যই ইহার সুখসম্ভোগের ইচ্ছা অমরগণ স্বর্গের সুখ ছাড়িয়াও বাঞ্ছা করিতেন।

এ দেশ পবিত্র দেশ, সাধকের দেশ। যত পুণ্যাত্মা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, জন্ম জন্মান্তরের বহু পুণ্যবলে ভগবদ্ভক্ত সাধকরূপে কেবল এই সুপবিত্র দেশে জন্ম লাভ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং দেশকেও ধন্য করিয়াছেন। এদেশের সাধকের সংখ্যা করিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয় এবং তাহারও অভাব নাই, সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তমাল" গ্রন্থই তাহার নিদর্শন কিন্তু তাহা বহুপূর্ব্বে রচিত হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী সাধকগণের নাম—তাহার শ্রেণীভুক্ত হয় নাই। এই দুরন্ত কলিকালে ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ হইতে বসিয়াছে, এ যুগে মাত্র একপাদ পরিমিত ধর্ম্ম—কেবল সত্যরূপে মাথা তুলিয়া আছেন—কিন্তু তাহাও কেহ মানে না। এ সময়েও ,এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনেও ভারতের নিভৃত পল্লীভূমি পবিত্র করিয়া কত ধার্ম্মিক, কত সাধক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা কে করে?

আজ আমরা অপরাপর সকলের কথা ছাড়িয়া দিয়া কলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধক, ক্ষেমঙ্করীর খাস্-তালুকের প্রজা স্বর্গীয় রাম প্রসাদ সেন কবিরঞ্জনের পবিত্র জীবন চরিত সাধ্যানুসারে সাধারণে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেছি। যাঁহার গান প্রতিদিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হইয়া প্রাণে অপার আনন্দ প্রদান করে—যাঁহার অমিয়-মধুর সঙ্গীতের একটা না একটি বাঙ্গালীর স্ত্রী পুরুষ, এমনকি, নিরক্ষর প্রাণেও সুধা বর্ষণ করে, বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালী নাই, যিনি সাধক কবি রাম প্রসাদের সঙ্গীতের একটী মাত্র কলিও অনবগত আছেন। নিজস্ব সুরলয়ে সঙ্গীত রচনা করিয়া যিনি শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া জগতের আদ্যাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছেন; যাঁহার মধুময় সঙ্গীত যাত্রায়, পাঁচালিতে, চণ্ডীর গানে, এমনকি দীন ভিখারী ভিক্ষুকগণের কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া শ্রোতার প্রাণে সুধা বর্ষণ করে—তাঁহার জীবন-কাহিনী, তাঁহার সাধন-ভজনের শিক্ষা-প্রণালী, ধর্ম্মময় জীবনের কর্ম্মময় চরিত্রাবলী, বাঙ্গালার কোন পাঠকের নিকট অনাদৃত হইবে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস, কারণ সাধন ভজনের অপরিপক্কাবস্থায় যত মতভেদ, যত দ্বেষাদ্বেষী ভাব কিন্তু পরিপক্কাবস্থায় আর তাহা থাকে না—সকলেই এক লক্ষ্যে সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্, পরম পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। স্রোতস্বতী যেমন রাজ্যের সমস্ত অপবিত্র আবর্জ্জনা বিধৌত করিয়া সুপ্রশস্ত হৃদয়ে অন্তহীন, নির্ব্বিকার সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া এক হইয়া মিশিয়া যায়—তখন যেমন তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে

না—যেমন সমস্ত একাকার ভাব ধারণ করে, সেইরূপ সাধক যখন সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার জন্ত সোপানাবলী আরোহণ করিতে থাকে, তখনই তাহার ভেদজ্ঞান, তখনই তাহার শাক্ত, শৈব,সৌর,বৈষ্ণব,গাণপত্য প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ। নদী যে দিক দিয়া যেমন ভাবেই গিয়া সাগরে মিশ্রিত হউক না কেন—পরিণাম যেমন একাকার হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, সাধকও সেইরূপ যে যে মতে পরিচালিত হইয়া, যেদিক দিয়া অগ্রসর হউক না কেন—সেই মহাসাগরে পড়িলে তাহারা যে সকলেই এক হইয়া অস্তিত্ব হারাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কলির মুক্তযোগী স্বনামধন্য সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন তান্ত্রিক সাধনার প্রভাবে নিজের প্রগাঢ় ভক্তিবলে ভক্তবৎসলা ভবারাধ্যা ভগবতীকে কিরূপ করায়ত্ত করিয়াছিলেন; জীবনের উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে সাধন-ভজন করিয়া মহামায়ার পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন—এই পুস্তকে তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—সেই সকল সঙ্গীত যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করতঃ এই গ্রন্থের অবতরণিকা করিলাম, শক্তি আমার নহে। সাধকের সাধনতত্ব বিবৃত করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করি—ক্ষুদ্র আমি—আমার এমন সাধ্য কোথায়? তবে যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়—পঙ্গু দুরারোহ গিরি অতিক্রম করিতে পারে—যাহার কৃপায় শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জুরিত হয়—অসম্ভবও যাঁহার করুণাবলে সম্ভব হইতে দেখা যায়, আমার ভরসা কেবল তাঁহার—সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার পাদপদ্ম ভরসা করিয়াই আমি এই প্রাতঃস্মরণীয় সাধক-চরিত্র বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি—মায়ের কৃপা হইলে জগতে জীবের অসাধ্য কিছুই নাই। ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!!

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেন-বংশ।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে হালিসহর মহকুমা, জেলা ২৪পরগণার মধ্যে এই মহকুমার অন্তবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রাম এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। নবদ্বিপাধিপতি মহারাজা কৃষ্টচন্দ্র রায়ের অধিকার ভুক্ত এই গ্রামে এক-কালে অসংখ্য লোকের বসতি ছিল—হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম এই গ্রামে অতি সমারোহের সহিত সমাহিত হইত; এই গ্রামের মনোরম শোভা সন্দর্শন করিয়া এবং অধিবাসী সকলকে ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত আস্থাবান দেখিয়া মহারাজা তথায় বায়ুসেবনালয় এবং একটী ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত করিয়া অধিকাংশ সময়েই তথায় অতিবাহিত করিতেন। কুম্ভকারগণের বাসস্থান বলিয়া এই গ্রামের নাম কুমারহট্ট হইয়াছিল। বহুসংখ্যক কুম্ভকার এই গ্রামের শোভাবর্দ্ধন করিত, তদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতির সংখ্যাও এই গ্রামে অল্প ছিল না। এক সময়ে এই কুমার-হট্ট গ্রাম শিক্ষাদীক্ষার অধিষ্ঠানক্ষেত্র সব-

দ্বীপকেও পরাস্ত করিয়াছিল। ইহার অধ্যাপক মণ্ডলীর সংখ্যাও বড় কম ছিল না। প্রবাদ আছে—কোন সময়ে নবদ্বীপের কতকগুলি মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কুমারহট্ট গ্রামের অধ্যাপকগণের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সহিত বিচার করিবেন না, এরূপ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার মানসে একজন বৃদ্ধ সুচতুর কুম্ভকারকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কুম্ভকার অতিশয় চতুর, সে রমণীবেশে সজ্জিত হইয়া একটী বালক সঙ্গে ঐ অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট আসিয়া বলিল,—"বাবাঠাকুররা! আপনারা কি দাসী রাখিবেন? পণ্ডিতগণ মনে করিলেন, যখন এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে, তখন গৃহকর্ম্মের জন্য একজন দাসীত চাই। তাঁহারা রমণীর কথায় স্বীকৃত হইলেন এবং সেই দিন হইতেই স্ত্রীলোকটীকে তাহার কথামত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

সে দিনের দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিল। পণ্ডিতগণ সন্ধ্যোপাসনা সমাধা করিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে শয়ন করিলেন। দাসীও পুত্রটী লইয়া অপরগৃহে রজনী যাপন করিতে লাগিল। রজনীযোগে রমণীবেশী কুম্ভকার বালকটীকে শিখাইয়া রাখিল—তুই কল্য প্রাতঃকালে যখন পণ্ডিতগণ উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবেন—সেই সময় "কাক ডাকিতেছ কেন?" বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিবি। বালক তাহা শুনিয়া নিদ্রিত হইল এবং প্রাতঃকালে পণ্ডিতগণের শয্যাত্যাগের প্রকালে উঠিয়া, পূর্ব্বরাত্রের শিক্ষামত বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল। সেই চীৎকারে পণ্ডিতগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কোন বিপদ হইল নাকি, ভাবিয়া তাঁহারা শয্যাত্যাগ করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের রক্ষিতা দাসীর পুত্রটী মাতৃ-তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। পণ্ডিতগণকে দেখিয়া দাসী বলিল—"ঐ যা, উহাঁদের নিকট যা, উহাঁরা মহাপণ্ডিত, কাকগুলি ডাকিতেছে কেন—উহাঁরা বলিয়া দিবেন, এই বলিয়া ঝি পুনরায় গৃহকর্ম্মে মন দিল। বালক আস্তে আস্তে পণ্ডিতগণের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাকগুলো ডাকৃছে কেন, বলে দাও।" তখনও পণ্ডিতগণের নিদ্রোত্থিত-অবসাদ তিরোহিত হয় নাই—তাঁহারা বালকের কথা শুনিয়া বলিলেন—"কাকগুলো ডাকৃছে কেন, তা আমরা কি করে জানবো, সকাল হয়েছে—তাই ডাকৃছে। রাত্রেত বাসার বাহির হইতে পারে নাই।"

সে কথায় বালকের মনস্তুষ্টি হইল না। সে পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট আসিল এবং বলিল—মা! পণ্ডিতেরা কিছু জানে না, তুই বলে দে, কেন কাকৃগুলো ডাকৃছে।"

রমণীবেশী কুম্ভকার বলিল—ওঁরে হতচ্ছাড়া! তুই ছেলে মানুষ কি বুঝবি, তুই কি সংস্কৃত জানিস্?

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—না, তুই বল।

বালকের আগ্রহ দেখিয়া রমণীবেশী কুম্ভকার বলিল, তবে শোন ঃ—

"তিমিরারি তমোহন্তি শঙ্কাঙ্কিত মানসা।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥

ওরে বোকা—ঐ দেখছিস্ পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠছে, সূর্য্য উঠলে জগতে আর অন্ধকার বা কালো কিছুই থাকে না, সূর্য্য কিরণে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু কাকগুলো নাকি কালো চেহারা, অন্ধকারের মত কালো, তাই তাহাদের ভয় হয়েছে, পাছে সূর্য্যদেব তাদেরও বিনাশ করেন, এই জন্য ভয়ে ভয়ে তাহারা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিতেছে—হে দেব! আমরা কাল নহি, আমরা কাক্, আমরা কাক্, এই জন্য কলরব করতঃ উড়িয়া পলাইতেছে।" বালক মায়ের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং আপন মনে খেলাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ হীনজাতীয়া স্ত্রীলোকের মুখে অলঙ্কার-শাস্ত্রের এইরূপ সুন্দর শ্লোক শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—মা! তুমি এই সকল শ্লোক কোথায় শিখিলে? রমণী বলিল—বাবা! আমরা কুমোর-হাটের কুমোরের মেয়ে, সেখানে যে সব পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের আসেপাশে আমাদের বাস। তাঁহাদের মুখেই শুনেছি।"

পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত হইলেন। এ গ্রামের নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধি যদি এরূপ প্রখর হয়—ন; জানি, পণ্ডিতগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে কিরূপ উচ্চপদস্থ। এইকথা শুনিয়া তাঁহারা চিন্তাযুক্ত চিত্তে সেই দিন আহারাদি করিয়া রমণীকে বিদায় করিলেন এবং অপরাহ্লে তাঁহারাও তথাকার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার-বিতর্কের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকারের বুদ্ধিবলে অপদস্থ হইয়া পণ্ডিতগণ পলায়ন করিলেন, এই ঘটনা যখন তত্রত্য পণ্ডিতগণের কর্ণে প্রবেশ করিল—তখন তাঁহারা কুম্ভকারের উপস্থিত বুদ্ধির কথা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং একজন নীচজাতীয় কুম্ভকার তাঁহাদের মানরক্ষা করিয়াছে দেখিয়া, সেইদিন হইতে পণ্ডিতগণ ঐ গ্রামের কুমারহট্ট নামকরণ করিলেন।

এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও হালিসহর যে এককালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তথাকার ভগ্নোন্মুখ দেবমন্দির, অত্যুন্নত প্রাকার পরিখা, ভূলুণ্ঠিত হর্ম্মাবলী এখনও তাহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শুনা যায় ১৮৬০ সালে দুরন্ত কৃতান্ত-সহচর ম্যালেরিয়া এই সুদৃশ্য গ্রামখানিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, তাই আজ হালিসহর, কুমারহট্ট একপ্রকার জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার অবস্থা দেখিয়া বিচার করিলে ইহা যে এককালে সমুন্নত ও অবস্থাপন্ন নগরী ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতীতের সাক্ষী স্বরূপ ইহার ভগ্নাবশেষ লোকের মনে প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়।

এই কুমারহট্টের সেন-বংশ বড়ই প্রসিদ্ধ। ইহার আদিপুরুষ কীর্ত্তিবাস সেন দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অমায়িকতা গুণে বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, বদান্যতাও তাঁহার তেমনি চরিত্রগত গুণ ছিল। এই সেনবংশ তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন, বংশ পরম্পরায় ইহাঁরা দরিদ্র-সেবায় মুক্ত হস্ত—তন্ত্রোক্ত কোন একটী সামান্য ধর্ম্মকর্ম্মের

অছিলা করিয়া কীর্ত্তিবাস অজস্র অর্থব্যয় করিতেন—তাঁহার বদান্যতায় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমুহে অভুক্ত কেহই থাকিত না। হঠাৎ কেহ থাকিলে কীর্ত্তিবাসের কর্ণগোচর হইবামাত্র—তাহার অভাব দূর হইত, কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি এইরূপে কত লোককে যে ভীষণ দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই কীর্ত্তিবাস হইতেই সেন-বংশের দানশক্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনে-জনে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মৃত্যুর পর রামেশ্বর সেনও পিতৃপথানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন তাদৃশ ছিল না এবং তিনি অকালে মৃত্যুর অঙ্কে শায়িত হইয়া বেশী কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার সম্মানেই তাঁহার সম্মান হালিসহরে, কুমারহট্টে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বেশ অক্ষুন্ন ভাবে বর্ত্তমান ছিল।

তাঁহার পুত্র রামরাম সেন। পিতার জীবিতাবস্থাতেই রামরাম পরিণীত হয়েন। রামরাম সেন সেই সময়কার শিক্ষায় বেশ শিক্ষিত হইয়া সামান্য উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার উপর পিতার যৎসামান্য সম্পত্তির আয়ও ছিল—তাহার দ্বারা একরূপ তখনকার দিনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। রামেশ্বর অল্প বয়সেই নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা একটী পৌত্র-মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলেই তাঁহার মৃত্যুতে সুখ হয়, তিনি মনের আনন্দে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু রামরামের পত্নী যেরূপ স্থূলকায় হইয়াছেন—তাহাতে সকলেই বলিতেছে—তাহার আর পুত্রাদি হইবার আশা নাই। প্রতিবাসী রমণীগণ এইরূপ জল্পনা কল্পনা করায় রামেশ্বর পুত্রের দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং বংশমর্য্যাদা হেতু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। রামরামের দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ কার্য্য অল্পদিনের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে—ভগবান তাহা সফল হইতে দেন না; পুত্রের দুইটী বিবাহ দিলেন বটে কিন্তু পৌত্র মুখ-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না—তিনি অকালে কাল কবলে পতিত হইয়া সকল আশার পরিসমাপ্তি করিলেন। রামরাম পিতার মৃত্যুতে প্রমাদ গণিলেন। বাটীতে লোকাভাব, দুইটী অল্পবয়স্কা স্ত্রী গৃহে রাখিয়া তিনি কোথাও যাইতে পারেন না, এইজন্য অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ—লোকাভাবই তাঁহার উন্নতির অন্তরায় রূপে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। বংশের যশোমান বজায় রাখিবেন, সকলের মধ্যে গণনীয় হইবেন—এরূপ ইচ্ছা কাহার অন্তরে না জাগরিত হয়; কে না আপন বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে? রামরাম মূর্খও ছিলেন না, চেষ্টা করিলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে সংসার চালান যে তাঁহার দ্বারা অসম্ভব—তাহাও নহে। তবে এ সব ফেলিয়া তিনি কেমন করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, কাজেই তাঁহার মনের বাসনা মনেই রহিল—তিনি পিতৃপ্রদত্ত সামান্য সম্পত্তি দ্বারাই এক প্রকার দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বাটীতে বসিয়া কৃষি কার্য্যদ্বারা

তিনি ধনাগমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—এবং তাহাতে একপ্রকার কৃতকার্য্যও হইলেন। কিছু দিন পরে চাষাবাদে তাঁহার বেশ দুই পয়সা আয় হইতে লাগিল। রামরাম ধর্ম্মকর্ম্মে বিশেষ মতিমান ছিলেন; তান্ত্রিকের ক্রিয়া কলাপ তিনি যথাবিধি প্রত্যহ সমাধা করিতেন, এ সকল কার্য্যে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। ইহাতে উপার্জ্জনের ক্ষতি হইলেও তিনি তত ক্ষতি বোধ করিতেন না। কিন্তু দৈনিক ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হইলে তিনি মরমে মরিয়া যাইতেন; কোনরূপ ক্রটী হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। রামরামের পত্নীদ্বয়ও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী; সপত্নী বিদ্বেষ তাহাদের মধ্যে ছিল না, ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহারাও স্বামীর সহায়তা করিতেন, স্বামীর উপদেশানুসারে দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মসেবায় অতিবাহিত করিতেন। প্রথমপক্ষের স্ত্রী কাত্যায়নী, কনিষ্ঠা সিদ্ধেশ্বরীকে ঠিক ছোট ভগ্নীর মত দেখিতেন; সিদ্ধেশ্বরীও কাত্যায়নীকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় মান্য করিতেন—কখন তাঁহার কথার অবাধ্য হইতেন না। এই দুইটী লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নীর গুণে রামরামের সংসার অল্প আয়েও বেশ সুখে চলিয়া যাইত, দরিদ্রসেবায়ও তাঁহারা যথাসাধ্য মুক্তহস্ত ছিলেন, কেহ অভুক্ত আসিলে ফিরিয়া যাইত না, উদর পুরিয়া আহার করিয়া তাঁহাদিগকে দুই হস্ত তুলিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইত—মা! তোমরা সুসন্তান লাভ কর, তোমাদের মনের মত ধন হ'ক। তোমরা সুখী হও। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক।" অতিথি সেবার ফল কখন ব্যর্থ হয় না। বৎসরান্তে রামরামের দুইটী স্ত্রীই গর্ভবতী হইলেন। প্রথমা স্ত্রী কাত্যায়নীর গর্ভে একমাত্র নিধিরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী সে সময় একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন—তাঁহার নাম অম্বিকা। তৎপরে প্রথমা স্ত্রীর আর কোন সন্তানাদি হয় নাই; দ্বিতীয়া স্ত্রী ক্রমান্বয়ে আরও একটী কন্যা ও দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আমাদের গ্রন্থোক্ত সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ তৃতীয় পুত্র, তিনি মুসলমান রাজত্ব সময়ে অনুমান ১১২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং চতুর্থ পুত্র বিশ্বনাথ। পুত্র কন্যাগণ দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না। রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অম্বিকা ও সর্ব্বকনিষ্ঠ বিশ্বনাথের সম্বন্ধে কোন প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করা সুকঠিন—কেহই তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। তবে রামরাম সেনের দ্বিতীয়া কন্যা ভবানীর সহিত কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের শুভ পরিণয় সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাহার গর্ভে জগন্নাথ ও কৃপারাম নামক দুই পুত্র হইয়াছিল, এ সংবাদ পাওয়া যায়।

পিতামাতার অকৃত্রিম যত্নে প্রতিপালিত রামপ্রসাদের জীবনের উষাকাল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল। রামপ্রসাদ বাল্যকালে পিতামাতার বড় আব্দারে ছেলে ছিলেন, তিনি যে আব্দার ধরিতেন—তাহা সহজে ছাড়িতেন না। তবে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম কর্ম্মে তাহার মন বড়ই সংযুক্ত হইয়াছিল। পিতা যখন ইষ্টসেবায় রত থাকিতেন, প্রসাদও

সেই সময় পিতার নিকট চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া থাকিত। জানি না, এই অল্পবয়স্ক বালক জীবনের সেই উষাকালে, প্রভাতোদয় হইতে না হইতেই কি ধ্যান করিত, কি জপ করিত। ধার্ম্মিক পিতামাতা কিন্তু পুত্রের এই ধর্ম্মভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন, হৃদয়ে প্রভূত আনন্দানুভব করিতেন। তান্ত্রিক রামরাম পুত্র-কন্যাগণের হিতার্থে প্রতি বৎসর তন্ত্রোক্ত কালী পূজা বিশেষ ভক্তিভাবে সমাহিত করিতেন। ইহার দ্বারা তাঁহার বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—ইহাই বাসনা। এইরূপে ধর্ম্মের সংসার বেশ সুখে চলিতে লাগিল বটে কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য্য হইল না; কোন প্রকারে সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। রামরাম জানিতেন বেশী অর্থের চেষ্টা করিলেই পাপ কার্য্য, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে হইবে—কাজেই তিনি সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

সতী-সংবাদ।

এ সংসারে বড়লোকের বড় ঘরের কথা সকলেই জানে—সকলেই কাণ পাতিয়া শুনে। কিন্তু কাঙ্গালের ঘরের সুখের কথা—দুঃখের কাহিনী পৃথিবীর কেহ জানে না—বলিতে গেলেও কেহ বড় একটা শুনিতে চাহে না। দরিদ্রের নির্জ্জন পর্ণকুটীরে কত সীতা, সাবিত্রী ফোটে—কত শৈব্যা-দময়ন্তী ঘুঁটে ঘাঁটে, এ বিশাল বিশ্বের কয়জন তাহার সংবাদ লয়? তাঁহারা সুরভি-বনজ-কুসুমের ন্যায় বিজন বিপিনে আপনি ফোটে এবং নির্জ্জনে নীরবে নিয়ত বনদেবতা বা নরদানবের পদতলে লোটে। এখানেই তাঁহাদের পবিত্র আত্মার পরিসমাপ্তি—ইহাই তাঁহাদের মানব-জীবনের পরিণতি। এ সংসার তাঁহাদের নিকট গণ্ডী-বদ্ধ অতি ক্ষুদ্র। তাহাদের পবিত্র প্রাণের সুখ দুঃখের ক্ষুদ্র কাহিনী এ গণ্ডী-রেখা অতি-ক্রম করিয়া আমাদের সুবিস্তীর্ণ বিশাল জগ-তের কর্ণে পৌঁছে না—এ বিশাল বিশ্বের কেহ সে ক্ষুদ্র কথা শুনিতে চায় না। হায়। এরূপ ভাবে কত কোহিনুর, নীলকান্ত—কত পদ্মরাগ চন্দ্রকান্ত তুল্য অমূল্য রত্নরাজি খনির তিমির গর্ভে অনন্তকাল ডুবিয়া আছে, কে বলিতে পারে?

অধুনা আমরা সংবাদপত্র পাঠে মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনিতে পাই, আজ এখানে এক জন সতী, পতির মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে বা মৃত্যু-দর্শনে সহসা কালের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কাল ওখানে আর একজন পতিব্রতা মহিলা এইরূপ ভাবে মৃত পতির পদে মাথা রাখিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের সংবাদ ঐ পর্য্যন্তই। ইহার অধিক তাহাদের সম্বন্ধে আর কোনও কথাই প্রায় শুনা যায় না—আলোচনাও হয় না। ইহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি ক্ষুদ্র হইলেও বড় পবিত্র-লোকশিক্ষাপ্রদ। কিন্তু

সেই পূত চরিত্রের পুণ্য কথাগুলি এইখানেই চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। সংসারের লোক বুঝে না যে, সেই লোকশিক্ষাপ্রদ পবিত্র কাহিনীগুলি ক্ষুদ্র হইলেও খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় বড় মূল্যবান—বড় উজ্জ্বল।

সংপ্রতি সংবাদপত্রের মুখে জনৈক ব্রাহ্মণ-পত্নী ও একজন কায়স্থ মহিলা এবং একটী মুসলমান ললনার পতির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে জীবন ত্যাগের অদ্ভুত করুণ-কাহিনী আমরা শ্রুত হইয়াছি। পতির মৃত্যু হইল, অমনি পতিব্রতা পত্নী তাহার পদপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পত্নীর মৃত্যু বার্ত্তা এইটুকু মাত্র; কিন্তু মুসলমান মহিলার মৃত্যু কাহিনী আরও একটুকু বৈচিত্রময়, সুতরাং বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। বৃদ্ধ স্বামী মুমূর্ষুপ্রায়। পত্নী দ্বিতীয় পক্ষের পরিণীতা—তরুণী ও সুন্দরী। মুসলমানের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত দুই তিনটী শিশুসন্তান বর্ত্তমান। আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ সন্তানগুলির চিন্তায় সুখে মরিতে পারিতেছেন না। তাহার অভাবে রূপসী যুবতী স্ত্রী, অন্যের পরিণীতা হইলে, তাহার স্নেহের শিশুগুলির দশা কি হইবে? এই দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধ নিয়ত অস্থির। বিষম ভাবনায় তাঁহার মুমূর্ষু প্রাণে কিছুতেই শান্তির সঞ্চার হইতেছে না। শিশু সন্তানগুলির চিন্তায় পবিত্র খোদার নামও তাঁহার নিকট রুচিকর বোধ হইতেছে না—ভাল লাগিতেছে না। বৃদ্ধ দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণায় নিয়ত ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তখন বৃদ্ধ মুমূর্ষু স্বামী, যুবতী স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, আমার একটী শেষ অনুরোধ রক্ষা করিও; আমার মৃত্যু হইলে তুমি আর নিকা করিও না। তাহা হইলে আমার সন্তানগুলির বড় ক্লেশ হইবে।

মুসলমান সমাজে স্বামীহীনার পুনঃ পতি-গ্রহণ সমাজ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে; তাই পত্নীর প্রতি পতির এ চরম অনুরোধ। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে যুবতী বলিলেন, না আমি আর বিবাহ করিব না। এই বলিয়া পতিব্রতা পত্নী সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধ পতির বক্ষে মুখ লুকাইলেন, আর উঠিলেন না।

পত্নীর আশ্বাস বাক্যে পতির মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্ষণপরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধের শব অপসারিত করিতে যাইয়া সকলে দেখিল, পতির বক্ষে সতী মরিয়া পড়িয়া আছেন।

সামান্যমাত্র অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আমরা মুসলমান সমাজের আর দুই একটী সতী চিত্র প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমাদের গ্রামে একজন বালবিধবা মুসলমান মহিলা আছেন। তিনি আজীবন মৃত পতির পবিত্র স্মৃতিমাত্র হৃদয়ে লইয়া পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতঃ এখন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন। মহিলাটী বড় গরীব। জীবন সংগ্রামে তাঁহাকে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। পুনঃ পরিণীতা হইলে হয়ত তিনি জীবনে অনেক সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু পার্থিব ভোগসুখের আশা তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। রমণীকে কেহ পুনরায় বিবাহ (নিকা) করিতে অনুরোধ করিলে

তিনি বলেন,—"অদৃষ্টে থাকিলে একবারেই সুখী হইতে পারিতাম, তা পুনরায় বিবাহ করিয়া খোদার (ঈশ্বরের) বিরুদ্ধে কারিগরী করিতে যাইয়া লাভ কি? তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মানুষের সাধ্য কি যে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান খণ্ডন করে?"

কথা ঠিক। আমরা কোন কোন মুসলমান ও ইংরেজ রমণীর বহুবার বিধবা হইবার সংবাদ অবগত আছি। শ্রুত আছি একজন মুসলমান রমণী নাকি দ্বাদশ বার পর্য্যন্ত বিধবা হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইদানীন্তন আমরা দুইজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মহিলার একাধিকবার বিধবা হইবার কথাও জ্ঞাত আছি। শ্রীভগবৎ কৃপায় আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে কত কি শুনিব ও দেখিব, কে বলিতে পারে? মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

আমাদের নিবাস-ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীবাসিনী জনৈকা মুসলমান ভিখারিণী কর্ম্ম-বশে বা অদৃষ্টদোষে পূর্ণযৌবনে স্বামী-পরিত্যক্তা হইয়াছেন। স্বামী—যৌবনে, অন্য এক রমণীর পঙ্কিল-প্রেমে আশক্ত হইয়া, সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে সেই ব্যভিচারিণী কলঙ্কিনী নারীকেই নিকা করিয়া স্বীয় অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া লইয়াছে। উপায়হীনা প্রথমা-পত্নী ভিক্ষা করতঃ অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন। তথাপি আর দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করেন নাই।

পত্নীত্যাগী মুসলমান এখন কর্ম্ম-শক্তিহীন অতি বৃদ্ধ। তাহার উপপত্নী (নিকা করা স্ত্রী) এখন জরাজীর্ণ স্বামীকে গাত্রস্থ ময়লার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্ব-স্বামীর পুত্রগণের উপার্জ্জনে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এখন আর সে জরাজীর্ণ অতি শীর্ণ বৃদ্ধ পতির দিকে ফিরিয়াও চাহে না; কোন দিন তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল বলিয়াও স্বীকার করে না। কর্ম্মশক্তিহীন বৃদ্ধ এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। কঠোর পীড়া ও বয়োধর্ম্মে অধুনা সে যারপরনাই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্য বৃদ্ধ এখন ভিক্ষা করিতেও অসমর্থ—জীবিকানির্ব্বাহে সম্পূর্ণ অশক্ত।

স্বামীর এ দুর্দ্দশা দর্শনে,সেই যৌবনে পরিত্যক্তা, শত অত্যাচার-লাঞ্ছিতা, চির-অনাদৃতা ভিখারিণী স্ত্রীর হৃদয় দ্রব হইল। তিনি ব্যাধি-ক্লিষ্ট অতি বৃদ্ধ স্বামীকে সযত্নে আপনার পর্ণ-কুটীরে লইয়া গিয়া, গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় তাহার পদে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে কৃতার্থ হইলেন। সতী, স্বীয় বহু শ্রমলব্ধ ভিক্ষান্নে পতির প্রতিপালন ও কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া আপনার নারী-জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

রমণীকে কেহ তাঁহার স্বামীর পূর্ব্বকৃত ভীষণ দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া কোন কথা বলিলে, তদুত্তরে রমণী বলেন যে,—স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আমিত তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই। ভাল হউক, মন্দ হউক,তিনি ধর্ম্মতঃ আমারই স্বামী। এখন এ জরাজীর্ণাবস্থায় আমি সেবা না করিলে আর কে তাহা করিবে? আমি এ প্রাচীন

বয়সে যতটুকু পারি, প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও ভরণপোষণ করিয়া আপনার পবিত্র নারী-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব। ইহাই আমার সুখ—ইহাই আমার পরম ধর্ম্ম। তাঁহার দোষ গুণ বিচার করিবার আমার অধিকার কি?" ধন্য নারীর কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও স্বর্গীয় স্বামী-প্রেম! আধুনিক যুগে এরূপ উচ্চ অঙ্গের নিঃস্বার্থ স্বামী-প্রেম—এরূপ আদর্শ পতিভক্তি অতি বিরল। প্রার্থনা,—ভারতের ঘরে ঘরে এরূপ সতী-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হউক।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

স্বর্গীয় মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের স্মৃতি সভা।

গত রবিবার ২৭শে পৌষ অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতা বৈঠকখানা বাজারে "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রচারিণী" সভার উদ্যোগে উক্ত মহাত্মার স্মৃতি উদ্দীপনার্থ এক সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় সকলেই সম্ভ্রান্ত। আমাদের "আলোচনা"র প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মিত্র মহাশয় গিয়াছিলেন। হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়গণও উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃত ভক্তের বিষয় আলোচনা করিয়া সভা সার্থক হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। বঙ্গ, পরলোকগত শিশির কুমারের নিকট অনেক বিষয়েই ঋণী, সে সকল ঋণ পরিশোধ হইবার নহে। যাহারা সে সকল বিষয় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ এবং যাহারা সে সকল বিষয় অবগত নহেন তাঁহারা হতভাগ্য। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বেষাং এবদানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।" শিশির কুমার এই শ্রেণীর দাতা; তাঁহার এই দানের তুলনা হয় না। শিশির কুমার সম্বন্ধে এই সামান্য দুই একটী কথা বলিবার সুযোগকে আমরা স্বর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করি। সভারম্ভ সুললিত সঙ্গীতের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং হাওড়া হইতে প্রকাশিত "ভক্তি" পত্রিকার সম্পাদক কর্ত্তৃক তাহা গীত হয়। সভাশেষেও তিনি অতি সুন্দর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় স্তোত্রপাঠ এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মিত্র, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, "বঙ্গবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারি লাল সরকার, "নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণ স্বর্গীয় মহাত্মার সুন্দর, পবিত্র, কর্ম্মময়, ভয়হীন জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গত বৃহস্পতিবার ২রা মাঘ, হাওড়া কর্ম্মযোগ মুদ্রালয়ে আলোচনা সম্পাদক মহাশয়ের যত্নে উক্ত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার্থ এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মিত্র মহাশয় "শিশির কুমার আদর্শ নেতা কেন" সম্বন্ধে দীর্ঘকাল-ব্যাপী বক্তৃতা করেন। স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী ভারতী কর্ত্তৃক সঙ্গীত গীত হয়। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে হরিধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ করা হয় এবং এই হরিধ্বনিতে শতাধিক লোক যোগদান করেন। ম্যানেজার।

BENGAL LIBRARY 25 FEB 1914 WRITERS' BUILDINGS

আমাদের অতীত।

—:০:—

আপনার ঘরের কথা পরের মুখে শুনিলে ঠকিতে হয়। যাহার স্বার্থ আমার স্বার্থ হইতে ভিন্ন, সে কখনই আমার কথা স্নেহের এবং সহৃদয়তার সহিত বলিতে পারে না। মনুষ্যের প্রকৃতি এইভাবেই গঠিত। ইহাকে উড়াইয়া দিলে, সত্যই ইহা উড়িয়া যায় না।

আমাদের কথা আমাদিগকে আপনার চেষ্টায় জানিতে হইবে। পরে খাটিয়া, যত্ন করিয়া আমার হাতে তুলিয়া দিবে, এই প্রকার আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাকে যে ভালবাসে না, তাহার হাতে আমার বাগানের ভার দিলে, যতই কেন সতর্ক থাকি না, সে কিছু না কিছু ক্ষতি করিবেই করিবে।

আমাদের অতীত, আমাদের অত্যন্ত প্রিয়-বস্তু। সে যে আমাদের কি করিয়াছে এবং কি করিতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত ভাবে যে আমরা অতীতের সহিত দৃঢ়-সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহা একে একে বলিয়া ফুরান যায় না। অতীত আমাদের গৌরবের সামগ্রী; অতীত আমাদের আশার মন্ত্র। সেই অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া, শুধু লজ্জার বিষয় নহে,—হানিজনক। মায়ের আদর যেমন সন্তানেই উপলব্ধি করিতে পারে,—সেই প্রকার আমাদের অতীতের মর্য্যাদা, আমরা ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারে না। আপন জন ভিন্ন যে পরের নিকট বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সে পদে পদে বাধা পাইবে; এবং তাহার নিকট সমস্তই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে। পরের নিকট মায়ের কুৎসা শুনিয়া, মায়ের প্রতি বিরূপ হওয়া যে প্রকার মহাপাতক, সেই প্রকার পরের কথায় আমাদের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়া কৃতঘ্নতা। না, যে প্রকার আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন, অতীতও আমাদিগকে ঠিক সেই প্রকারই প্রসব করিয়াছে। অতীতের সহিত আমাদের যে একটা নাড়ীর টান রহিয়াছে, তাহা আমরা কিছুমাত্রও জানি না কিন্তু তাহা অবিসম্বাদিত ভাবে রহিয়াছে। আমাদের বোধের উন্মেষ হইলেই আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি। মা প্রকৃতপক্ষে আমার রক্ত-মাংসের দেহটীকে দিয়াছেন, কিন্তু অতীত আমাদিগকে যাহা কিছু সুন্দর, মহান্, উদার—সেই সকল দিয়া রাখিয়াছে। মায়ের স্নেহ যেমন হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে, অতীতের ভাণ্ডারও তেমনি বিস্মৃতির অন্তরালে সযত্নে রক্ষিত। সেই জন্যই বলি, মাতৃক্রোড়-প্রয়াসী বালকের মত আমাদিগকে অতীতের সমস্ত অঙ্গটিকে পবিত্র এবং স্নেহ-ভক্তির সংমিশ্রণের সহিত

জড়াইয়া ধরিতে হইবে। এই উপায় ছাড়া সেই অমূল্য ভাণ্ডারের সন্ধানের আর অন্য উপায় নাই। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য বিধাতা যেমন মাতৃবক্ষে পবিত্র স্বর্গীয় সুধার স্নেহ-নির্ঝর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রকার জাতীয় সঞ্জীবনী-সুধা, অতীতের মর্ম্মে মর্ম্মে মর্মরায়মান হইয়া প্রবাহিত। আমরা সেই সুধার কণিকামাত্র পাইয়া কোনও প্রকারে বাঁচিয়া আছি মাত্র; কিন্তু যতদিন না তাহা প্রাণের আবেগ মিটাইয়া পান করিতে পারি, ততদিন সবল, পূর্ণাবয়ব, তেজস্বী এবং রোগহীন হইতে পারিব না। মা যে প্রকার পুত্রকে কোন্‌টি গ্রহণ এবং কোন্‌টি ত্যাগ করিতে হয় শিক্ষা দেন, অতীতও সেই প্রকার জাতীয় কল্যাণের জন্য গ্রহণ-বর্জ্জন শিক্ষা দিয়া থাকে।

মানুষের মূলমন্ত্র উন্নতি। মানুষের সর্ব্বদাই বৃদ্ধির দিকে গতি। শরীরের বৃদ্ধির অবশ্যই সীমা আছে। কিন্তু জ্ঞানের যে কোথায় শেষ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অভিজ্ঞতার সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না। অভিজ্ঞতাও যথার্থপক্ষে অতীতের স্বহস্তদত্ত দান এবং বুদ্ধি গৃহীতা। এই অতীত যাহার যত সম্প্রসারিত, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। বৃদ্ধ হইলে এই জন্যই তাঁহার বেশী বুদ্ধির আশা করা যায়। কেন না—তাঁহার অতীত জীবনের দীর্ঘতা আছে। আবার এই জন্যই বোধ হয়,—"বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে" বলে। অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি অতীতের নিকট হইতে নানা উপায়ে অনেক রত্নরাজি গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। অতীত দেয়; কিন্তু যে গ্রহণ করে না, সে দরিদ্র থাকিয়া যায়। যাহারা জীবনের শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী, তাহারা বৃদ্ধ হইলেও বালকের আখ্যা পাইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে, তাঁহাদের অতীত জীবন বিস্মৃতির দ্বারা ধৌত এবং এই কারণেই তাঁহাদের জীবন পট বিচিত্র-রেখা-সম্পর্ক শূন্য—একখানি সাদা শ্লেটের মত।

যে জাতীর উজ্জ্বল অতীত আছে, সে জাতির—জীবনও সতেজ। কিন্তু সেই গৌরবময় অতীতের সুধা-নির্ঝরের সমীপবর্ত্তী হইয়া সুধাপান না করিলে সেই বলিষ্ঠতা লাভ হওয়া সুদূর-পরাহত। অতীতের সন্ধান না লইয়া, বসিয়া থাকিলে, অতীত মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ করিয়া তোমাকে সুধা বিতরণ করিতে আসিবেন না। যোগ-পরায়ণ হইয়া, অতীতের সাধনা করিয়া, জীবনের মধ্যে অতীতকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই তোমার জীবন বিভূতি-সম্পন্ন হইবে, নতুবা নহে। মাতৃস্তনে সুধা আছে সত্য, কিন্তু পানবিরত, পরিপাক-শক্তি-হীন বালকের যেমন তাহা উপকারে আসে না, সেই প্রকার অতীত-বিমুখ, অতীত-দ্বেষী জাতির পক্ষে অতীত বায়বী কল্পনা মাত্র। অতীতের প্রতি অনুরাগ এবং অতীতের সন্ধান জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, এই দুইটী অবলম্বন ছাড়িয়া দিলে, এক হতভাগ্য জাতির সৃষ্টি হয়। অঙ্গসঞ্চালন-শক্তি-রহিত মনুষ্যের মত তাহারা কৃপার পাত্র।

আমরা উপস্থিত যে অবস্থায় রহিয়াছি,

তাহা আর কিছু অধিককাল স্থায়ী হইলে, যাহারা ভবিষ্যতে আমাদের স্থান অধিকার করিবে, তাহাদের পক্ষে গৌরবময় অতীত লুপ্ত হইয়া, কালিমামধ অতীতের সৃষ্টি হইবে। রুগ্না জননী যেমন আপনার বৈকল্য এবং আময়তা সন্তানে সংক্রামিত করিয়া থাকেন, এই কালিমাময় অতীতও অধিক হইতে অধিকতর এবং অধিকতম কালিমাময় হইয়া জাতীয় জীবনকে চিরতরে পর্য্যবসিত করিয়া দিবে বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখনও আমাদের অতীত বিলুপ্ত হয় নাই। এই সময় হইতে সন্ধানের জন্য ব্রতী হইলে ইহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়। বিলম্ব করিলেই সর্ব্বনাশ হইবে।

বেদ, উপনিষদ, দর্শন ইত্যাদির পাঠ রহিত হওয়ায়, আমরা যে কি হারাইতেছি, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিয়া বুঝান যায় না। বেদ, উপনিষদ, দর্শন পাঠের সহিতই আমরা তাহা সম্যক বুঝিতে পারিব। যাঁহাকে হারাইলে সবই হারাণ হয়, আমরা তাঁহাকেই হারাইয়াছি। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মে মতি আমাদের দিন দিন লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ—দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, বাড়িয়া গিয়া আমরা যার পর নাই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। বাবু হইয়াছি কিন্তু মানুষ হই নাই, সৌখীন হইয়াছি কিন্তু ধার্ম্মিক হই নাই, সুখী হইয়াছি কিন্তু সুখ পাই না, অধঃপাতে যাইতেছি কিন্তু লজ্জাবোধ করি না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

রামপ্রসাদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌবন-কাহিনী।

পিতামাতার শিক্ষাগুণেই পুত্র কন্যার চরিত্র গঠন হইয়া থাকে। যে পিতামাতা বাল্যকালে এই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন, তাহাদের পুত্রগণ প্রায়ই কুকর্ম্মান্বিত হইয়া বংশমর্য্যাদা নষ্ট করে। পূর্ব্বজন্মের নিয়তি বা সুকৃতি,—দুষ্কৃতি স্বতন্ত্র কথা, ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেত জানা যায় না যে, ইহার সৌরভে দিগন্ত পরিপুরিত হইবে,কি সে কীট-দষ্ট হইয়া নষ্ট হইতে পারে, অথবা ভীষণ রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া যত্নের ত্রুটী করা কি উদ্যান-রক্ষকের উচিত? জীব নিয়তি অনুসারেই পরিচালিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তা বলিয়া তাহার পিতামাতা কি পুত্রের উন্নতির চেষ্টা করিবে না?

রাম প্রসাদের মতিগতি ধর্ম্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, তথাপি ক্রমশঃ বয়স হইতেছে; বিদ্যা শিক্ষায় আর উদাস থাকিলে চলিবে না। শিশুমন নবনী সমান,এখন ইহাতে যাহা অঙ্কিত করিবে—তাহাই চিরস্থায়ী হইবে। বেশী বয়স হইলে আর লেখা পড়া শিক্ষা হইবে না, ভাবিয়া রামরাম পুত্রের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। প্রথমতঃ গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট প্রসাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন বালক অল্পদিনের মধ্যে গুর

মহাশয়ের পাঠশালা শেষ করিলেন। তখন পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিতে পারিলেই সাংসারিক জীবনে তাহার আর কিছুই আটকাইত না; দৈনিক হিসাবনিকাশ, দলিল পত্র লেখা, মহুরীগিরি প্রভৃতিতে তাহার বেশ দখল হইয়া যাইত। পুত্র পাঠশালের শিক্ষায় বেশ পারদর্শী হইয়াছে দেখিয়া রামরাম পুত্রকে বাঙ্গালা পড়াইতে লাগিলেন, এ কার্য্য তিনি নিজেই করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলা ভাল ভাল পুস্তক, প্রাচীন কবিগণের পদাবলী প্রভৃতি পুত্রকে কণ্ঠস্থ করাইলেন। রামরাম পুত্রকে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির উপদেশ দিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ অসীম বুদ্ধিশক্তি বলে অল্পদিনের মধ্যে সে সমস্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই বার পিতার ইচ্ছা হইল পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করিয়া, নিজ ব্যবসায় কবিরাজীতে প্রবৃত্ত করিবেন, এই মনে করিয়া তিনি কুমারহট্টে বিদ্যানিধি মহাশয়ের চতুস্পাঠীতে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় রামপ্রসাদের নম্রতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাহাকে প্রাণ খুলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় রামপ্রসাদকে যাহা একবার বুঝাইয়া দিতেন, তাহা আর দ্বিতীয়বার বুঝাইবার আবশ্যক হইত না, বালক নিজ বুদ্ধিবলে তাহা আয়ত্ত করিয়া লইত, কাব্য পাঠে প্রসাদের বড়ই আসক্তি ছিল। তিনি অন্য বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া কাব্যে মনঃ-সংযোগ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার যথেষ্ট। ব্যুৎপত্তি লাভ হইল। এইবার তিনি পুত্রকে নিজ ব্যবসায় প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলিলেন কিন্তু পুত্র জ্ঞান পিপাসায় তখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। রামপ্রসাদের ইচ্ছা আরও কয়েকটী ভাষা আয়ত্ত করেন। রামরাম দেখিলেন—যখন মুসলমানের রাজত্বে বাস করিতে হয়, তখন যদি কখনও তাহাদের সহিত মিশিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা কিছু কিছু অভ্যাস করা উচিত. এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবং পুত্রের মনোগত ইচ্ছা জানিয়া, তিনি পারস্য ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিতে পুত্রকে অনুমতি দিলেন। রামপ্রসাদ নিজের চেষ্টায় এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা গুণে তাহাও মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের বয়স যখন অষ্টাদশ বর্ষ সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সাধনবীজ অঙ্কুরিত হয়। রামপ্রসাদের জীবন যে কেবল জড়পিণ্ড নয়, কেবল যে সাধারণ লোকের মত সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই, তাহা তাঁহার জীবন প্রভাতের সময় হইতেই বেশ বুঝা গিয়াছিল, কারণ এই অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ এবং ঈশ্বরানুরক্তির বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পিতা, পুত্রের যৌবন সমাগত দেখিয়া এবং নানাবিধ সদগুণে ভূষিত দেখিয়া তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবনের ত স্থিরতা নাই, কবে-কোন দিন এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণপাখী পলায়ন করিবে—এই সময় পুত্রকে সংসারী করিয়া যাইতে পারিলেই ভাল

হয়। রামরাম যাহা মনস্থ করিলেন, কার্য্যে পরিণত করিতে তাহার বেশী বিলম্ব হইল না। রামপ্রসাদের দ্বাবিংশ বয়ক্রম সময়ে বিবাহ দিয়া একটী সুন্দরী বধূ গৃহে আনিলেন। কবিরাজ বংশের নিয়মানুসারে তাঁহার দ্বিজ সংস্কার পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল। মানব জীবনের প্রধান সংস্কার—বিবাহ তাহাও সম্পন্ন হইয়া গেল। রামরাম পুত্রকে অনবরত সংসার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার দায়িত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং তিনিও আর্য্য-শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছেন যে, সংসার আশ্রমের তুল্য আশ্রম আর নাই। এই আশ্রমে থাকিয়া ঈশ্বর-সাধনায় উন্নতি করিতে পারিলেই যথার্থ বীরসাধক হওয়া যায়, নতুবা চিত্ত স্থির হইল না, ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিলাম না, কেবল প্রবৃত্তির দাস হইয়া আশা মিটিল না বলিয়া, যাহারা *সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, ঈশ্বর সাধনায়* এ জীবনে তাহারা কখন উন্নতি করিতে পারে না। ধর্ম্ম বনে নহে—মনে। তুমি যেখানেই থাক, আর যাহাই কর, তোমার জগতে আসা যে কেবল ঈশ্বর সাধনার জন্য, তাহা মনে থাকিলেই তোমার জীবনের কার্য্য ঠিক থাকিবে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে, নতুবা মনস্থির না করিয়া, মনকে স্ববশে না রাখিয়া কেবল গৃহের বাহির হইলে ত সমস্তই পণ্ড হইবে।

রামপ্রসাদ পিতামাতার প্রতি সাতিশয় ভক্তি করিতেন, তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না, বিশেষতঃ জননী সিদ্ধেশ্বরীর বাক্য তিনি স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরীর বাক্য মনে করিতেন এবং পিতার আদেশ তিনি দেবা-দেশ বলিয়া স্বীকার করিতেন। রামপ্রসাদ বিবাহীত হইয়াছেন, জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, এইবার তাহার দীক্ষা লইবার ইচ্ছা হইল। পিতা পুত্রের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন—তাঁহাদের কুলগুরু মাধবাচার্য্যকে আনিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর দীক্ষা কার্য্য শেষ করিলেন। তান্ত্রিক রামপ্রসাদ শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রত্যহ জপতপ ও সাধনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন কিন্তু গুরুদেবের নিকট তাঁহার উপদেশ গ্রহণ বেশী হইল না। মাধবাচার্য্য দীক্ষা প্রদানের পর দুই তিনবার রামপ্রসাদের নিকট আসিয়া তন্ত্রোক্ত কয়েকটী ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শিষ্যের আগ্রহ দেখিলে কোন গুরু না তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে যত্নবান হন? রামপ্রসাদ ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত গুরুদত্ত বীজমন্ত্র ও সাধন-*প্রণালী সকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন।* সময়ে সময়ে অভীষ্টদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ অবলোকন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু এ সৌভাগ্য রাম-প্রসাদকে বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই। দীক্ষা প্রদানের একবৎসর পরেই মাধবাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রসাদের জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইতে না হইতে, ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই, ক্ষেত্ররক্ষকের তিরোধানে রামপ্রসাদ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু মা বিশ্বেশ্বরী যাঁহার সহায়, তিনি যাহাকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন—তাঁহার কি কোনও বিষয়ের অভাব হইতে পারে? এই সময় সাধক শ্রেষ্ঠ, জীবন্মুক্ত-মহাপুরুষ আগমবাগীশ,

একবার কুমারহট্টে আসিলেন। তত্রত্য তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আনাইয়া কয়েক দিন উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ আগমবাগীশের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইলেন, এই মহাত্মার কৃপালাভ করিতে পারিলে—সাধনমার্গে তাঁহার অনেক সাহায্য হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া যখন পণ্ডিতগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া রজনীযোগে আপন আবাসে গমন করিতেন; সেই সময় আনন্দময় মহাপুরুষ আগমবাগীশ আনন্দময়ীর আনন্দে একাকী আপন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থান করিতেন। রামপ্রসাদ সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া আত্ম-কাহিনী জ্ঞাপন করিতেন। রজনীর সেই ভাগে আগমবাগীশের সাধন সময়ে তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিলে সহজে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না, কিন্তু রামপ্রসাদ ত ভয় পাইবার পাত্র নহেন? সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া লইলেন। প্রসাদের সৌভাগ্য সত্বর প্রস্ফুটিত হইবে জানিয়া সাধকপ্রবর আগমবাগীশ তাহাকে প্রাণ খুলিয়া সমস্ত শিক্ষাপ্রদান করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন—বৎস! তুমি সাধন-সমরে জয়ী হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস; একদিন তোমার যশোসৌরভে ভারত পরিপূরিত হইবে, তোমার সাধন-প্রভাবপূর্ণ সঙ্গীতে একদিন বাঙ্গালাদেশ পবিত্র হইবে। প্রসাদ ইহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন এবং তিনি যে কয়দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ প্রত্যহ তথায় আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। মাধবাচার্য্যের নিকট তিনি অনেক বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এইবার তান্ত্রিকাগ্রগণ্য আগমবাগীশের নিকট তাহার পরীক্ষা প্রদান করিলেন তিনি অল্পবয়সে রামপ্রসাদকে এতদূর উন্নতি করিতে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং অপরাপর ক্রিয়া নির্ব্বাহের সুলভ সন্ধান সকল বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কিন্তু সাধকশ্রেষ্ঠগণ এক স্থানে বেশীদিন অপেক্ষা করেন না। পাছে তাঁহাদের সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, পাছে সাধারণ লোক আসিয়া তাঁহাদের বাজে কাজের জন্য ব্যস্ত করে, এই জন্য দুই চারিদিন অপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আগমবাগীশ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন—আর কেনই বা না হইবে, অনন্ত ভুবনের অধীশ্বরী মা যাঁর ভক্তি-পাশে আবদ্ধ, এ জগতে তাহার অজানিত কি আছে? কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল—পণ্ডিতগণের সে বোধ শক্তি ছিল না; তাঁহারা তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত সাধক মাত্র জানিয়া, সেইরূপ বাহ্য-উপদেশ লইয়া ছিলেন।

কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া সাধক একদিন রজনী যোগে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। রামপ্রসাদ এই কয়দিন যে সকল বিষয় তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন—নির্জ্জনে সেই সকলের কার্য্য করিতে লাগিলেন। পিতামাতা রামপ্রসাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ

দেখিয়া বড়ই প্রীত হইতে লাগিলেন। তখনকার পিতামাতা পুত্রকে ধর্ম্মপথগামী দেখিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন, সেই কুলপাবন পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। এখন বালকগণ বাল্যকালে যদি ধর্ম্মের প্রতি মতিমান হয়, ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দেয়, তাহা হইলে সকলে তাহাকে "ছেলেটা বহিয়া গিয়াছে, অল্প বয়সে বড়ই জেঠা হইয়াছে" ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করে, পিতামাতা তাঁহাকে ধর্ম্ম পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন—'বাবা! বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হয়,এ কি ধর্ম্মোপার্জ্জনের সময়! এখনকার শিক্ষা এইরূপ হইয়াছে; কাজেই আমাদের আর ভদ্রস্থতা কোথায়? হায়! যে ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত তিল মাত্র বিচ্ছেদ ঘটিলে, হিন্দুর হিন্দুত্ব এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয়—তাহাদের শিক্ষা যদি এইরূপ হইতে আরম্ভ হইল, তবে আর উন্নতির আশা কোথায়! উন্নতির অর্থই ত ধর্ম্মোন্নতি; যদি চিরস্থায়ী উন্নতি অর্থাৎ আত্মার সম্যক উন্নতি বিধান করিতে চাও; যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দেবত্বের আশা কর, তবে একমাত্র ধর্ম্মই তোমাদিগকে সে সন্ধান বলিয়া দিতে পারে—তোমাদিগকে মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই চরমোন্নতিতে অধিষ্ঠিত করিতে পারে। জাগতিক বিষয় বৈভব, অর্থ-সামর্থ্য কাহার সাধ্য নাই, যে তোমার সেই একমাত্র অভীপ্সিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

রামপ্রসাদের পিতামাতা তখনকার লোক, তখন দেশে ধর্ম্মের এত হতাদর হইয়া মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; তাই পুত্রের ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় মতি দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহিত করিতেন, আপনাদিগকেও ধন্য জ্ঞান করিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের এ সুখসৌভাগ্য, এ আদর-আপ্যায়ন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কাল ত কাহার কথা শুনিবে না—কাহার উন্নতি অবনতি দেখিবে না। ভাল মন্দের বিচার করিবে না আবহমানকাল সে যেমন ভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেইভাবেই চলিয়া যাইবে—কোন বাধাই মানিবে না। একদিন হঠাৎ সামান্য পীড়ায় রামপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ ঘটিল। যে আনন্দের দুলাল আনন্দভরে—হাসিয়া খেলিয়া আপন কার্য্য-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল—সংসারের আব হাওয়া যাঁহাকে একদিনের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে নাই; হঠাৎ দুরন্ত কৃতান্ত তাঁহার আনন্দের খেলা ঘর এক ফুৎকারে লণ্ডভণ্ড করিয়া তাঁহার আশার বাতি নিভাইয়া দিল। প্রসাদ জগৎ সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিক বলিয়া—কাল তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না; তাঁহার আরাধ্য পিতৃদেবকে ইহসংসার হইতে অপসৃত করিয়া তাঁহার মস্তকে কঠোর অশণি নিক্ষেপ করিল। রামপ্রসাদ নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে, দুঃখভরা ভাঙা প্রাণে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিলেন,পরে যাহা কিছু সম্বল ছিল—পিতার স্মৃতিকল্পে তাঁহার পারত্রিক শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শুচি হইলেন।

জগতে কালের এই একটি মাত্র নির্দ্দয় আঘাতে প্রসাদ হেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যুবকও টলিয়া পড়িলেন কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। মনে-

প্রাণে মায়ের শরণাপন্ন হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সাধন-ভজনে তিনি অবহেলা করিলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন। সংসারের মধ্যে উপায়ক্ষম ব্যক্তি আর কেহ নাই। সুতরাং পরিবার প্রতিপালনের ভার সমস্তই তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি কয়েক বৎসর স্বগ্রামে থাকিয়াই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জননী সিদ্ধেশ্বরী ও পত্নী সর্ব্বাণী প্রাণপণ করিয়া সংসারের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রামে অবস্থানকালীন এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা এবং রামদুলাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বিরচিত "কবিরঞ্জন বিদ্যা-সুন্দরে" তিনি যে বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছেন—তাহারই সঠিক বিবরণ এখানে প্রকাশ করা হইল কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাঁহার রামমোহন নামে আরও একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহার কোন বিবরণ কোন পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না। তবে রামপ্রসাদের প্রপৌত্র. এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু কালীপদ সেন মহাশয়ের নিকট শুনা গিয়াছিল যে—সে পুত্রটী তাঁহার উক্ত পুস্তক রচনার বহু দিন পরে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, কোন পুস্তকে তাহার নাম লিপিবদ্ধ হয় নাই।

অনেকে বলেন—তিনি যেমন অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন—তাঁহার জননীও সেইরূপ তাঁহাকে অল্পবয়সে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, তাঁহার জননী আরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন। যাহা হউক, এইবার তাঁহার সংসারে বড়ই অভাব হইতে লাগিল; পিতার সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না; যৎসামান্য জমীজমা, চাষআবাদ যাহা ছিল, তাহাতে সংসার চলা কঠিন। রামপ্রসাদ কয়েক বৎসর দেশে থাকিয়া সংসার পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; অভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই অন্যত্র যাইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে বাধ্য হইলেন এবং একদিন ফাল্গুন মাসের শুভ তৃতীয়া তিথিতে রামপ্রসাদ জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, পতিব্রতা সর্ব্বাণীর অভিমতে দুর্গানাম স্মরণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অভাবের প্রভাবে।

সংসারীর পক্ষে সংসারের অনাটন বড়ই কষ্টকর। ইহাতে মানুষের মতি স্থির থাকে না, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নষ্ট হয়, চিত্তবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারে না; এক কথায় মানুষকে মনুষ্যত্ব বিহীন করিয়া ফেলে। কর্ম্মঠ মানুষকে জড় ভাবাপন্ন করিতে, হৃদয়ের যাবতীয় আনন্দ বিলুপ্ত করিতে—সাংসারিক অভাব যতদূর সক্ষম, ততদূর আর কেহই নহে; আর কিছুতেই মানুষকে ততদূর হীনপ্রভ করিতে পারে না। রামপ্রসাদ হেন সাধু-প্রকৃতি, ধর্ম্মবিশ্বাসী, ধৈর্য্য-

শাস্ত্রী ব্যক্তিকেও সাংসারিক অভাবের দ্বারা বিচলিত হইয়া আজ দেশত্যাগী হইতে হইল। রামপ্রসাদ জননী, স্ত্রী, পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া এই জীবন-মধ্যাহ্নে,এই মধুর-যৌবনে—অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবাসী হইলেন। এজন্য বলিতে হয়—সংসারী হইলে, তুমি ধার্ম্মিক, সাধু বা যোগী যাহাই হও না কেন,অভাব তোমাকে পরাজয় করিবেই করিবে। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস-বিহীন ব্যক্তি অভাবের দাস হইয়া সদা সর্ব্বদা কেবল অর্থের জন্য কাতর ভাবে ছুটাছুটী করে, ভাল কর্ম্ম, মন্দ কর্ম্ম কিছুই বিচার করে না, যে কোনও প্রকারে হউক, অর্থ সংগ্রহ হইলেই হইল। আর সংসারে যাহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী—ধার্ম্মিক, তাহারা ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া, সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ভক্ত-চূড়ামণি রামপ্রসাদ ইষ্টদেবীর পদে সমস্ত নির্ভর করতঃ কুমারহট্ট হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ কলিকাতায় আসিলেন। রামপ্রসাদ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ,কষ্টসহিষ্ণু ও মধুরভাষী ছিলেন; ধর্ম্মতেজে তাঁহার দেহখানি বেশ সুন্দর ও সুপুষ্ট ছিল; দেখিলে সকলেরই নয়ন আকৃষ্ট হইত। বাটী হইতে বাহির হইয়া রামপ্রসাদের মনে আর তাদৃশ কষ্টপ্রদ চিন্তা-লহরী-লীলার উদ্রেক হয় নাই; তিনি মাতৃপদে সমস্ত নির্ভর করিয়া মনের আনন্দে কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—অভাব হইলে তাহার পুরণ নিশ্চয়ই হইবে; মা কি কখন সন্তানকে উপবাসী রাখিতে পারেন?

রামপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া দুই এক জন ভদ্রলোককে তাঁহার অভাবের কথা বলিলেন। তখন কলিকাতা এখনকার মত সহরে পরিণত হয় নাই; তখন মুসলমান রাজত্বের শেষ। কলিকাতা তখন রাজধানী ছিল না, কাজেই এখনকার মত শোভা-সম্পদে কলিকাতা নগরী সুশোভিত ছিল না। তবে তখন এখানে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ধনীর বাস ছিল। তখনকার লোক কাহার দুঃখ দেখিলে, তাহার সাহায্য করিতে তৎপর হইত, যাহাতে তাহার উপকার হয়, তাহার চেষ্টা করিত; লোকের উপর তখন লোকে এখনকার মত ধর্ম্মহীন, স্বার্থপর ছিল না। রামপ্রসাদ কয়েকজন লোককে আপনার দুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করিবার পর, অতি সত্বরেই একটী চাকুরী পাইলেন। নবরঙ্গকুলাধিপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের অধীনে তাঁহার একটী মুহুরীগিরি চাকুরী হইল। * রামপ্রসাদ জননীর আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া ইহাতে আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। রামপ্রসাদ সেই দিন হইতেই তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং কার্য্যোপযোগী হিসাবনিকাশের খাতাপত্র,কাগজ,কলম ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বাসস্থানের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহও নির্দ্দিষ্ট হইল।

দারুণ অভাবের কথঞ্চিৎ পুরণ হইলে লোক স্বভাবতঃই আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ দুরন্ত অভাবগ্রস্থ রামপ্রসাদ বিনায়াসে এইরূপে অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণা-

* কেহ কেহ বলেন—তিনি দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ভবনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না।

নন্দময়ী ভগবতীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিলেন। এই নিবান্ধবপুরী, অপরিচিত স্থান কলিকাতায় এত সত্বর যে তাহার চাকুরী মিলিবে, এরূপ আশা তিনি করিতে পারেন নাই। অথবা তাঁহার আবার বন্ধুহীন স্থান কোথায়? ব্রহ্মময়ী মা যাহার সহায়—যাহার দুঃখ-দৈন্য নাশের জন্য তিনি সতত বিব্রত, তাঁহার আবার সামান্য দাসত্বের অভাব কি? আর তাহা সংগ্রহের জন্য বন্ধুই বা না মিলিবে কেন? যাহা হউক, রামপ্রসাদ মনের আনন্দে সে দিন সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। রাত্রি জাগরণ করিয়া কেবল মাতৃ-নামামৃত পানে বিভোর হইলেন; তাঁহার পদে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক স্বরূপ গান গাহিলেন :—

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো-মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥

যতদূর জানা গিয়াছে—এইটীই সাধক কবি রামপ্রসাদের সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত। তখন লোকে এখনকার মত টাকার মুখ দেখিতে পাইত না। রামপ্রসাদ একেবারে মাসিক ৩০৲ বেতনের চাকুরী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী মা'কেই বলিতেছেন—"মা! আমি নেমকহারাম নহি; তিনি জানিতেন,—এ বিষয় আশয় দুর্গাচরণ মিত্রের হউক, আর যাহারই হউক, মূলে কিন্তু আমার মায়েরই সব, তাঁহারা কেবল রক্ষক মাত্র। এই জন্য তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল—যখন অভাব হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পুরণ হইবে। সেই জন্য তিনি অধৈর্য্য হইয়া অভাব পূরণের জন্য সাধারণ লোকের মত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার বিরহিত হন নাই। এই সঙ্গীতই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রামপ্রসাদ সেইদিন হইতে তাঁহার হিসাব নিকাশের খাতায়ই আপনার রচিত সঙ্গীতগুলি লিখিয়া রাখিতেন, সেই খাতায় হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে কত কালী, দুর্গা, তারা, নাম লিখিত হইত। এইরূপে প্রায় একবৎসর অতীত হইল। একদিন তাঁহার কোন উপরিতন কর্ম্মচারী কোনও মহাজনকে টাকা দিবার গোলমাল হওয়ায়, রামপ্রসাদের খাতার সহিত মিল করিতে আসিলেন। রামপ্রসাদ তখন কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। কর্ম্মচারী মহাজনী খাতার হিসাবে প্রসাদের ব্যভীচার দেখিয়া বড়ই রুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই খাতা প্রভুর নিকট হাজির করিলেন।

জানিনা ভগবান কাহাকে কোন পন্থা দিয়া কোথায় লইয়া তাহার সৌভাগ্যের বিধান করেন। কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে মানব-ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়,তাহা কে বলিতে পারে? রামপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহাতে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে, রামপ্রসাদের অদৃষ্ট-গগন পুনরায়

কুয়াসাসমাচ্ছন্ন হইবে,প্রভুর নিকট এই অপরাধে তাঁহার চাকুরী যাইবে,প্রসাদকে আবার ভাগ্য-চক্রের দারুণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিশ্বজননী যাহার সহায়, তাহাকে অপদস্থ, অপমানিত করে বা তাহার অনিষ্ট করে, জগতে এমন সাধ্য কার! এই ঘটনাই প্রসাদের জীবন-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এই দিন হইতে প্রসাদের সাংসারিক সকল চিন্তার অবসান হইল। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয় ধার্ম্মিক গুণগ্রাহী, অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। খাতায় প্রসাদের এই সকল লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি বুঝিলেন—প্রসাদ যে প্রকৃতির লোক, সামান্য দাসত্বে না রাখিয়া তাহাকে আরও কত উচ্চ স্তরে স্থান দান করা উচিত। এরূপ মহাত্মাকে এই সামান্য দাসত্বে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার ইহ-জীবন নষ্ট করা, কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাতে আমাকেই পতিত হইয়া ভগবানের নিকট দায়ী হইতে হইবে।

জীবের বাল্য জীবনের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনের গতি কোন দিকে ধাবিত হইবে, সে কিরূপ ভাবে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারক হইবে? রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াই গুণগ্রাহী মিত্র মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, রামপ্রসাদের অমূল্য জীবন-স্রোত কোন্‌দিকে একটানা বহিয়াছে। দৈনিক হিসাব নিকাশ করা বা সাংসারিক কাজকর্ম্মে জড়ীভূত থাকা অপেক্ষা ইহা মানবজীবনের কত উচ্চতর কার্য্য সাধনের উপযুক্ত। ধার্ম্মিক দুর্গাচরণ সেইদিনই প্রসাদকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার দাসত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। রামপ্রসাদ বিনয় নম্র বচনে আপনার সাংসারিক অভাব অভিযোগের বিষয় নিবেদন করিলেন। খাতায় তিনি হিসাবের পরিবর্ত্তে যে মাতৃনামে পরিপূর্ণ করিয়া খাতা নষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহা যে তাঁহার উপরি-তন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রভুর নিকট আনীত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়াও তিনি কিছু মাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি ধীর অথচ বিনীত ভাবে সমস্ত সত্যকথা প্রকাশ করিলেন। মিত্র মহাশয় আজ এক বৎসরকাল প্রসাদের ন্যায় ভক্তবীরকে প্রতিপালন করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন—"রামপ্রসাদ! তোমাকে মুহুরিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আমার আর ইচ্ছা নাই; তোমার ন্যায় মাতৃভক্ত সাধককে আমার ন্যায় হীনব্যক্তি কখন অধীনস্থ করিয়া রাখিতে পারে না; তোমার জীবন মানবের অধীনতার জন্য সৃষ্ট হয় নাই; যাও বৎস! অনিত্য সংসার চিন্তায় আকুল না হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ কর; মাসিক তোমাকে যে ৩০্ টাকা বেতন দিতাম, এখন হইতে ঐ ত্রিশ টাকা বেতন হিসাবে না দিয়া বৃত্তি হিসাবে প্রতিমাসেই আমি আজীবন তোমাকে প্রদান করিব। আমার এই যৎ-সামান্য মাসিক বৃত্তি স্বীকার করিয়া তুমি আমাকে চরিতার্থ কর। প্রসাদ! তুমি যে কাজের

উপযুক্ত, যে মহৎকার্য্য সম্পাদানের জন্য তোমার জন্ম; জগতে যে মহৎ পদবী লাভের জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত,সে পদলাভ মনুষ্যমাত্রেরই লোভনীয়, তাহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে—যাও বৎস! মনের আনন্দে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সার্থক কর! এই বলিয়া মিত্র মহাশয় রামপ্রসাদকে বিদায় প্রদান করিলেন! রামপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন – মিত্র মহাশয়ের সদাশয়তার কথা শুনিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তখন তিনি দেখিতে লাগিলেন—"আমার ঘরেইত চিন্তামণি নিধি; তবে কেন অনিত্য ধনের জন্য দেশ বিদেশে ঘুরিয়া মরি; ভিতর অন্বেষণ করিলেই ত সব পাওয়া যায়, এই বলিয়া গান করিলেন:—

"মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা * পূর্ণীত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে।
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে। দীন রাম
প্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আশে॥

মিত্র মহাশয় প্রসাদের এই অমৃতপম সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সেইদিন তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া নূতন বস্ত্রাদি দান করিলেন—এবং উপযুক্ত পাথেয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া বিবিধ প্রকারে মিত্র মহাশয়কে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেই দিনই বিদায় হইলেন।

* প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া হং সঃ অর্থাৎ সোহহং ইত্যাদি জপে সিদ্ধিলাভ কর।

পুষ্পবতী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তগৃহ।

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর, মানবের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছেনা। অন্ধকার রাত্রি, কেবল খদ্যোতকুল ও নক্ষত্রেরা অল্প অল্প আলো দিতেছে। এমন সময়ে গুপ্ত গৃহে বসিয়া জোতারাম রূপার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রূপার বিলম্ব দেখিয়া এক এক বার বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু রূপা ব্যতীত তিনি সহায়-শূন্য; এক একবার সেই কথা মনে করিতেছেন। মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে, এখন আর একটি কন্টক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত, এ কণ্টক দূর করিতেই হইবে, অথচ কাহার মনে কোন সন্দেহ না হয়। তিনি একবার উঠিলেন, রূপার জন্য দ্বারের নিকট দাড়াইলেন আবার আসিয়া নিজ আসনে বসিলেন. এমন সময়ে সিড়িতে পদ শব্দ হইল, বুঝিলেন রূপা আসিতেছে। তখনই রূপার জন্য প্রস্তুত হইলেন - রূপাকে অদ্য নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। রূপা উপস্থিত হইল, আজ রূপার অত্যন্ত আদর—তাহাকে জোতারাম

হস্ত ধরিয়া নিজের নিকটে পাইলেন। রূপা এত দিন পরে এত আদরের অর্থ বুঝিল না, সে একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গেল।

জোতারাম বলিলেন—"রূপা আজ আমার মনে বড় আনন্দ,বোধ হয় শীঘ্রই তোমাকে নূতন আসনে বসাব।" রূপা উত্তর করিল, নূতন আসন কেমন? আজ আস্‌তে বলেছ কেন? মহারাণীর মৃত্যুর পর হ'তে আমি মৃত্যু তুল্য হ'য়ে আছি।" জোতারাম হাসিলেন, তিনি রূপার হস্ত খানি নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন"—রূপা! আমাদের দুঃখ এত দিনে বোধ হয় ঘুচবে। ক্রমে পথ পরিষ্কার হচ্চে। মহারাণীর মৃত্যু হ'ল, আমরা সেই জন্য বড় দুঃখিত, এখন আর একটু অগ্রসর হতে হবে।"

রূপা। আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না, স্পষ্ট করে বল।

জোতা। বুঝতে পাচ্ছ না? তোমাকে রাজরাণী কর্‌বো।

রূপা। আমি রাজরাণী হতে চাই না। ব্যাপারটা কি খুলে বল।

জোতা। মহারাণী আমাদের মুরব্বি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হ'ল। সকলকেই একদিন মর্‌তে হবে। তুমিও মরবে, আমিও মর্‌বো। এর জন্য আর দুঃখ কি? তবে তিনি স্বর্গে যাওয়াতে আমাদের মনে কষ্ট হ'য়েছে। এখন এই বর্ত্তমান রাজা আর আমাদিগকে গ্রাহ্য কচ্ছে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা, ইংরেজেরা জয়পুর রাজ্য নেওয়ার ফিকিরে আছে। মিছামিছি কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে ক'রে শেখাবতীতে গিয়ে গোলমাল করলে। আমি বল্‌লেম আমাকে সঙ্গে পাঠাও, কিন্তু কিছুতেই পাঠালে না। সেই খরচের জন্য সম্বর হ্রদ ও শেখাবতী এখন ইংরেজদের অধীনে। রাজাকে বল্‌ছি এত অপমান সহ্য করো না, রাজা কিছুতেই শুনছে না। বোধ হয় বেহারী মানের পরামর্শ নিচ্ছে। গোপনে গোপনে হয়ত বেহারীর নিকট চর যাতায়াত কচ্ছে। তা হ'লেই আমাদের সর্ব্বনাশ। রাজার উচিত আমাদের পরামর্শ মতে চলা—যদি না চলে—তবে আমাদের পথ পরিষ্কার করতেই হবে। আমি জোতারাম কোন বাধাই মান্‌ছি না। আমি জানি মেজর আণ্ডরসন্ এই সব কচ্ছেন। আমি সব দেখ্‌বো, আমার কাছে সব পরাজয় হতে হবে। তবে মাত্র তোমার সহায়তা চাই, অন্য কাহারও সাহায্য চাই না। এখন সব বুঝতে পেরেছ?

রূপা। হাঁ বুঝেছি, এখন কি কর্‌তে চাও?

জোতা। কি কর্‌তে চাই? একথা আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ? তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এ প্রশ্ন কচ্ছ? পথ সাফ্ চাই।

রূপা। পথ সাফ কেমন? তুমি কি কর্‌তে চাও?

জোতা। কি কর্‌তে চাই? পথের কণ্টক দূর কর্‌বো। রাজার শিশু ছেলে আছে, এই ছেলেকে রাজা কর্‌বো, আমি মন্ত্রী থাকবো, তা হ'লেই আমাদের ক্ষমতা—অপ্রতিহত থাকবে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছ?

রূপা। এখনও স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—তোমার কি উদ্দেশ্য।

জোতা। বর্ত্তমান রাজা নিজ হস্তে শাসন ভার নিয়ে আমাদিগকে গ্রাহ্য কচ্ছেন না, তিনি যার তার পরামর্শ নিচ্ছেন। এরূপ ভাবে থাকুলে আমাদের ত মোটেই ক্ষমতা থাকবে না, সামান্য ভৃত্য মাত্র থাকবো। অতএব রাজা আর রাজ্য শাসন করবে না, শিশু ছেলে সিংহাসনে বসবে, এরূপ করতে হবে!

রূপা। সর্ব্বনাশ! আবার একি শুনছি? তুমি পাগল হ'লে নাকি?

জোতা। পাগল কি? আপন পথ পরিষ্কার করবো।

রূপা! আমি ইহাতে থাকবো না। আমি তাহাকে লালন পালন করেছি।

জোতা। তাতে কি হ'ল, তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। তুমি সহজে কাজ সারতে পারবে।

এই বলিয়া জোতারাম কাগজে মোড়া একটা দ্রব্য রূপার হস্তে দিলেন, বলিলেন—যে কোন পানীয়ের সহিত মিশ্রিত ক'রে রাজাকে যেন খেতে দেয়। একদিনে কোন অনিষ্ট হবে না এবং কেহ বুঝতে পারবে না। এক সপ্তাহ মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ হবে। পানীয়ের স্বাদ বা রং কোন পরিবর্ত্তন হবে না। রূপা মোড়ক গ্রহণ করিয়া বলিল "আমি পারবো না, আর কেহ এ কাজ করলে হয় না?" জোতারাম বলিলেন—এ সব কথা কি অন্যের জানা উচিত? তুমিও আমি জানি এই যথেষ্ট, আর কাহারও কর্ণে একথা যেন যায় না।"

এই সময়ে সিঁড়ি হইতে শব্দ হইল—"ঈশ্বর সব দেখছেন, সাবধান!" পাপীষ্ঠ জোতারাম চমকিয়া উঠিল, রূপার হস্ত হইতে মোড়ক খসিয়া পড়িল। জোতারাম তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে দৌড়াইয়া গেলেন, কত খুঁজিলেন, কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। বাহিরে দ্বার যেমন বন্ধ ছিল, তেমনই আছে। তিনি আলোক লইয়া সিঁড়ির চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন রূপাকে বলিলেন—"কোন লোক নাই, আমার বোধ হচ্চে বাহিরে কোন শব্দ হয়েছে, তাই আমরা কি শুনতে কি শুনেছি। যদি কোন মানুষ হ'ত, তবে নিশ্চয়ই বাহিরের দ্বার বন্ধ থাকতো না। কোন লোক কেমন ক'রে ভিতরে আসবে? তুমি ভয় পেয় না।" রূপা ভয়ে কাঁপিতেছিল, জোতারাম তাহাকে বুঝাইয়া মোড়ক পুনরায় তাহার হস্তে দিলেন।

রূপা বলিল "আমার বোধ হচ্চে মানুষ নয়, কোন উপদেবতা হবে, তাদের যাতায়াতের ত আর কষ্ট নাই।" জোতারামও সেই বলিয়া রূপাকে বুঝাইলেন। রূপা বলিল—আমি নির্ভয়ে এত দিন তোমার সব কাজ করেছি, আজ এ কার্য্যে যেন আমার হৃদয় কাঁপছে। আমার বোধ হচ্ছে এবার আমাদের ভাল হবে না। এখনও সময় আছে, এখনও বুঝে দেখ।" জোতারাম হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ভয় পেয়েছ? এত ভয় কিসের? উপদেবতা আমাদের সাহায্য করবে। কোন ভয় নাই—কোন চিন্তা নাই—আমি তোমাকে রক্ষা করবো। রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এল, এখন তুমি যাও। সাবধান! আর কেহ না জানে, তা হ'লে উভয়ের প্রাণ

যাবে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর কি বুঝাবো। যদি তোমার ও আমার মঙ্গল চাও—যদি উন্নতি চাও—যদি সম্মান চাও—যদি অর্থ চাও—তা হ'লে এ কর্ম্ম অবশ্যই কর্‌বে। আর এক কথা তোমাকে বল্‌ছি—এ ভয় দেখান নয়। যদি না কর, তবে সেই কার্য্য জেগে উঠবে, এখন থেকে চেষ্টা হচ্ছে। এই দিকে সব শেষ হ'লে আর কোন কথাই উঠবে না, আমরা নিশ্চিন্ত হব—দুজনে সুখে জীবন নির্ব্বাহ কর্‌তে পার্‌বো। এখন সব বুঝলে ত?" রূপা আর কোন কথা বলিল না, একবার জোতারামের দিকে দৃষ্টি করিল, তার পর মোড়কের দিকে দৃষ্টি করিল, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। জোতারাম সেই স্থানে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুকু।

ভীলদুহিতা সুকু পুষ্পবতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। যখন পুষ্পবতী অপহৃত হইল, তখন সুকু অচেতন অবস্থায় ছিল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিল—পুষ্পবতী নাই, তখন সে নানা স্থানে তাহাকে অন্বেষণ করিল এবং অবশেষে পুষ্পবতীর মাতার নিকট আসিয়া সংবাদ দিল। পুষ্পবতীর মাতা এই কথা শুনিয়া একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইল, তারপর স্বয়ং নানাস্থানে গিয়া খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে কোনস্থানে না পাইয়া একস্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুকু সেই ক্রন্দনে যোগ দিল ও বৃদ্ধাকে নানা রূপ বুঝাইতে লাগিল। সুকুর পিতা আসিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিল এবং বৃদ্ধার অনুমতি পাইয়া পুষ্পবতীর অন্বেষণে বহির্গত হইল। সুকু সে আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারিল না, কিছুদিন পরে সে ছদ্মবেশে পুষ্পবতীর জন্য বাহির হইল। সুকু ভীল বালকের বেশে সজ্জিত হইল, হস্তে একটি তীর ধনুক লইল। সুকু বাল্যাবধি পিতার নিকট তীর ছোড়া অভ্যাস করিয়াছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর, প্রচণ্ড রৌদ্র তেজ পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছে। গো, মহীষ, বরাহ ইত্যাদি জন্তুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলে গাত্র ডুবাইয়া জ্বালা নিবারণ করিতেছে। বনমধ্যে অগ্নির তেজ অত্যধিক, স্থানে স্থানে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে। ভয়ানক গ্রীষ্ম, লোক ছট্‌পট্ করিতেছে। মরুভূমি ভয়ানক উত্তপ্ত, কাহার সাধ্য পা ফেলে, বালুকা রাশি অগ্নি অগ্নির ন্যায় গরম হইতেছে, স্থানে স্থানে দুই একটি বৃহৎ পাদপ দণ্ডায়মান হইয়া পথিকের শ্রান্তিদূর করিতেছে। পাখীরা বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। এমন সময়ে ছদ্মবেশী সুকু একটি বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আছে। কোন দিকে কোন মনুষ্য দেখা যাইতেছে না, অন্তরে ভীষণ মরুভূমি, সুকু ভাবিতেছে—কেমন করিয়া এ মরুভূমি পার হইবে। রজনী যোগে শীতল হইলে তবে মরুভূমি পার হইতে পারিবে, এতক্ষণ এই বৃক্ষতলেই অবস্থান করিতে হইবে। আহারের ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা একবার মনে পড়িল। সূর্য্যতাপে কমনীয় দেহখানি উত্তপ্ত. বদনখানি মলিন। ক্ষুৎপিপাসা আরও যেন কাতর দেখাই-

তেছে। সুকু চারিদিকে একবার নিরীক্ষণ করিল। কিছুই দেখিতে পাইল না। একবার বৃক্ষের উপরে দৃষ্টি করিল, দেখিল সুন্দর সুপক্ক ফল বৃক্ষে ঝুলিতেছে। সুকু পাহাড়িয়া মেয়ে হইলেও এ ফল চিনিতে পারিল না। মনে মনে করিল, যখন পাখীরা খাইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই বিষাক্ত ফল হইবে, আবার ভাবিল—এত রৌদ্রের তেজে বোধ হয় পাখীরা খাইতেছে না। তাহার বড়ই লোভ হইল। সুকু বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা আর আবশ্যক হইল না, সে তীর ছাড়িয়া ফল ভূমিতে পাতিত করিতে লাগিল। কয়েকটী সংগৃহীত হইলে সুকু ফলগুলি নিজক্রোড়ে টানিয়া লইল, তারপর ক্ষুধায় ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সেই ফল ভক্ষণ করিল। ইহার পরই বোধ হইল—তাহার জ্ঞানশূন্য হইতেছে, মুখ দিয়া লালা বাহির হইতেছে, তখনই সে বুঝিল ফলগুলি বিষাক্ত, অমনি পিতা ও পুষ্পবতীর কথা তাহার মনে হইল। অস্ফুট স্বরে বলিল "বাবা!—এ মেয়ের অপরাধ ক্ষমা কর। আমি পুষ্পবতীকে খুঁজিতে বাহির হয়েছিলেম। তুমি আর আমার জন্য কষ্ট করোনা, আমি চল্‌লেম। পুষ্প! তোমাকে প্রাণপেক্ষা ভালবাসি, তাই তোমার জন্য বাহির হয়েছি। কিন্তু তোর সঙ্গে দেখা হল না, ইহাই আমার বড় কষ্ট। তোকে দেখে যদি মরতেম, তবে আমার কষ্ট হ'ত না। আমি তবে যাই।" এই বলিয়া সে বৃক্ষতলায় ঢলিয়া পড়িল।

* * * * *

যখন সুকুর চৈতন্য হইল, তখন সে দেখিল, একটি পর্ণকুটিরে শয়ন করিয়া আছে, একজন স্ত্রীলোক তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। সুকু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, এস্থানে কেমন করিয়া আসিল, তাহাই ভাবিতে লাগিল। কথা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু স্ত্রীলোকটী কথা বলিতে বারণ করিল। সুকু পুনরায় চক্ষু মুদিল, তাহার বড়ই দুর্ব্বলতা বোধ হইল। যখন চক্ষু পুনরুন্মীলন করিল তখন আর স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে দেখিতে এই ভাবে কয়েকদিন গত হইল, সুকু সবল হইতে লাগিল। এই অবস্থায় কেবল দুগ্ধ আহার করিতেছিল। একদিন সন্ধ্যায় পর সুকু শয়ন করিয়া আছে, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এমন সময়ে দেখিল একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। সুকু অবাক হইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছিল, তাহার বোধ হইল, কোনও দেবতা সদয় হইয়া তাহাকে দেখা দিয়াছেন। সুকু ভীলদুহিতা এইসব বিশ্বাস ইহাদের যথেষ্ট, তাই—তাহার ঠিক প্রতীত হইল যে এ সন্ন্যাসী মনুষ্য নহে। তাহার মনে একটু ভয় ও হইল না। সন্ন্যাসী বলিলেন—"মা! ভয় করিও না,তোমার মনোসাধনা পূর্ণ হবে। তুমি বিষফল খেয়েছিলে, তাহার ফলে এত দুর্ব্বল হ'য়েছ। এখন আর প্রাণের আশঙ্কা নাই। তুমি একটু সবল হলেই আমি তোমাকে পুষ্পবতীর নিকট পৌঁছাইয়া দিব। পুষ্পবতী সুখে আছে, তাহার কষ্টের সময় অতীত হইয়াছে, এখন সে সুখী হবে।" সুকু ধীরে ধীরে বলিল"—আপনী কে?" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—আমি রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী।"

সুকু রামস্বরূপ ব্রহ্মচারীর নাম শুনিয়াছিল, অদ্য প্রত্যক্ষ দেখিয়া দেবতা জ্ঞানে জোড়হস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিল, ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সুকু অনেকক্ষণ এই সব বিষয় ভাবিল, পুষ্পবতী সুখী হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া সুকুর মনে আনন্দ হইল। সে তজ্জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। ইহার পর সে নিদ্রা গেল, সমস্ত চিন্তা বিস্মৃত হইল। স্বপ্নে সে পুষ্পবতী ও ব্রহ্মচারীকে দেখিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রকৃত প্রণয়।

এইবার পুষ্পবতীর পালা—সে লীলাবতীর উপর প্রতিশোধ লইতে সুযোগ পাইল। অদ্য মথুরা সান কার্য্যোপলক্ষে রাজা অভয়সিংহের নিকট আসিয়াছিলেন। পুষ্পবতী লীলাবতীর ঘরে গিয়া ডাকিল—"সই! একবার শুনবেনা? বোধ হয় আজ সময় নাই, আজ আর আমার কথা বুঝি মনে পড়ে নাই।" লীলাবতী বুঝিল—সে দৌড়াইয়া আসিয়া পুষ্পের গালে ঠোনা মারিয়া বলিল—"কি সই! কি হয়েছে? আজ আমার কাছে আস্‌তে অবসর পেয়েছ?" পুষ্পবতী হাসিয়া উঠিল, লীলাবতী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। পুষ্পবতী বলিল—সই! এ মধুর অধরের উপযুক্ত লোক চাই, আমি কি ইহা পাইতে পারি?

লীলা। সই, আজ তোমার কি হয়েছে?

পুষ্প। আজ আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না।

লীলা। কেন সই?" কি হয়েছে সই?

পুষ্প। এত "সুই" "সই" কেন? আজ দেখছি উথলা ভাব।

লীলা। কি ভাব? আমি ত বরাবরি তোমাকে ভালবাসি।

পুষ্প। ভালবাস বই কি? কিন্তু আর অধিক দিন নয়।

লীলা। কেন সই?

পুষ্প। ন্যাকা আর কি? উনি কিছু জানেন না?

লীলা। কি জান্‌বো সই?

পুষ্প। আজ কি মথুরা থেকে স্বয়ং বংশী-বদন উপস্থিত হয়েছেন।

লীলা। কেন? তোকে নিতে?

পুষ্প। শ্রীরাধা বৃন্দাবনে থাকৃতে, অন্যকে নেবে কেন?

লীলা। শ্রীরাধা আবার কে?

পুষ্প। তা আর বল্‌তে হবে না, কুঞ্জবন আলো করে বসে আছে।

লীলা। ভালই ত, তবে বুঝি শ্রীকৃষ্ণ আস্‌ছেন।

পুষ্প। এয়েছেন! একবার দেখ্‌বে?

লীলা। না, আমি দেখ্‌তে চাই না।

পুষ্প। চক্ষু মুদিলেই দেখ্‌তে পাবে, হৃদয়-আসনে বসে আছে।

লীলা। তুই দেখ্‌ছি বেশ মুখ খুলেছিস, এ বিদ্যা শিখ্‌লি কোথায়?

পুষ্প। তোমার কাছে।

লীলা। তবে গুরু বলো আমায়।

পুষ্প। এক শ বার। কিন্তু আমার একটি কথা রাখতে হবে।

লীলা। কি কথা সই?

পুষ্প। একবার বামে বসিয়ে দেখ্‌বো।

লীলা। তোর সখ হ'য়ে থাকে, গিয়ে নিজে বস্‌না কেন?

পুষ্প। আমাকে ত আর চায় না, যাকে চায় সে গিয়ে বস্‌বে।

লীলাবতীর আজ বড় কষ্ট হইতেছিল, আজ পুষ্পবতীর কথার উত্তর দিতে পারিতেছিল না। লীলাবতী মুখরা বটে, কিন্তু আজ বেশী কথা বলিতে বাধ বাধ করিতেছিল। লীলাবতী পুষ্পের হস্ত ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল, উদ্যানে গিয়া দুজনে বসিল। পুষ্পবতী বলিল—"কি সই এখানে এলে কেন? এখানে মিলন হবে না কি? আমি দুগাছা মালা গেঁথেছি, দুজনকে পরিয়ে দিয়ে চক্ষুর ও মনের স্বার্থকতা করবো।" এই কথা বলিয়াই পুষ্পবতী বাগানের দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিল, লীলাবতী সে দিকের বিপরীত দিকে তাকাইয়া ছিল। পুষ্পবতী দেখিল অভয় সিংহ ও মথুরা সান দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতেছেন। তখন পুষ্পবতী বলিল—"সই! ভাল কথা মনে পড়েছে, আমি যে কাকাতুয়ায় খাবার দিয়ে আসি নাই, সে হয় ত ক্ষুধায় এতক্ষণ চীৎকার কচ্ছে। তুমি একটু বসো, আমি এলেম বলে।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া পলাইল। লীলাবতী আসনে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রাজা ডাকিলেন—"লীলা!" লীলাবতী রাজা অভয় সিংহের শব্দ পাইয়াই ফিরিয়া বসিল, কিন্তু দেখিল—মথুরা সান সঙ্গে আসিয়াছেন। তখন লজ্জায় বদনখানি রক্তবর্ণ হইল। অভয় সিংহ বলিলেন—"লীলা! তোমার উদ্ধারকর্ত্তা মথুরা সান এসেছে, অভ্যর্থনা কর। লীলাবতী কোন কথাই বলিতে পারিল না। মথুরা সান বলিল—সখে! অনর্থক একে বিরক্ত কর্‌তে এসেছ কেন? চল আমরা অন্যত্র যাই। ইনি বাগানে বসে আরাম কচ্ছেন,এ সময়ে কি বাধা দেওয়া উচিত? এইবার লীলাবতীর মুখ ফুটিল,সে বলিল—দাদা! আপনি অতিথি সঙ্গে করে এসেছেন—ভালই। আমি যাই আপানারা এখানে বেড়ান।" লীলাবতী মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু মন আর চলিল না। মন যেন মথুরা সানকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ব্যগ্র হইতেছিল। মথুরা সানের মনও লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইতেছিল। রাজা অভয় সিংহ বলিলেন,—ভাই! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি লীলার পিতার নিকট একবার যাব, বিশেষ দরকার। এই বলিয়া রাজা সহসা চলিয়া গেলেন। লীলাবতী তাড়াতাড়ি পলাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু মথুরা সান তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। মুখরা লীলাবতীর যেন মুখবন্ধ হইল, মথুরা সান বলিলেন—"পালাবে কোথায়? আজ ধরেছি।" লীলাবতী উত্তর করিল, কেহ দেখ্‌বে সরে যান্‌।" মথুরা সান বলিলেন—দেখে দেখ্‌বে, আমরা কি চুরি কচ্ছি? লীলাবতীর মুখ ফুটিল, সে বলিল, আপনি চোরের ন্যায় আমাদের কুটীরে গিয়েছিলেন, তা কি মনে নাই? মথুরা সান

হাসিয়া বলিলেন, বেশ মনে আছে, কিন্তু চুরি করেছি কি,বল দেখি? বরংডাকাতেরা আমাকে আক্রমণ করে, সব ডাকাতি করে নিয়েছে। চোর বরং ভাল, দস্যু আরও ভয়ঙ্কর, প্রাণ নিয়া টানাটনি।" লীলাবতী চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল পুষ্পবতী কোথাও আছে কি না। তারপর বলিল—ডাকাতেরা ত কিছুই ডাকাতি করে নিতে পারে নাই, তবে যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হয়ে দাঁড়ালেন।" মথুরা সান এ আক্রমণ বুঝিলেন, তিনি লীলাবতীর হস্ত দুখানি নিজ হস্তে টানিয়া লইলেন, লীলাবতী প্রথমতঃ একটু বাধা দিল, তারপর ক্রমে যেন সে চেষ্টা দুর্ব্বল হইতে লাগিল। মথুরা সান বলিলেন।—লীলাবতি! বল দেখি আমাকে ভালবাস কি না? আমি কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য এত ঘন ঘন এখানে আসি। তোমাকে দেখিতে সর্ব্বদাই মন উচাটন হয়, কি মোহিনী-শক্তিই জান—তাহা ঈশ্বর জানেন। তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, তোমাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া দিবারাত্রি পূজা করিতেছি। লীলা! কি মধুর নাম। "লীলা" নাম সর্ব্বদাই জপ কচ্ছি। বল, তুমি আমার হবে কিনা? লীলাবতী কোন উত্তর করিল না, কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি উত্তর দিল। মথুরা সান তাহার হস্ত ত্যাগ করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তবে আমি যাই, রাজা অভয় সিংহকে সব বল্‌বো, আমার পক্ষ হয়ে তিনি তোমার পিতাকে বল্‌বেন এমন দিন কবে হবে,যেদিন এই রত্ন হৃদয়ে ধারণ কর্‌বো।" লীলাবতী মথুরা সানের দিকে দৃষ্টি করিলেন। এমন সময়ে পুষ্পবতী একটি কুঞ্জবন হইতে হাসিয়া হাসিয়া বলিল—তবে ত এখনই বিয়ে হ'য়ে গেল, আর অনুমতির আবশ্যক কি? উলুধ্বনি দিব। সই! এই বুঝি বাহাদুরী, সব মাটি হ'য়ে গেল।" লীলাবতী পুষ্পবতীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—প্রাণের সই! তোমার কাছে আবার গোপন কি! তুমি আমার হৃদয়ের—সই। এস, দুজনে যাই, ইনি বাগানে বেড়ান।" মথুরা সান বলিলেন—"অন্ধকারে কি বেড়াবো? চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই যখন এস্থান ত্যাগ কচ্ছে।" উহারা হাসিয়া হাতাহাতি করিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহারাজার মৃত্যু।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একদিন রাজ-প্রাসাদে ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল, মহারাজা পীড়িত। কত চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছে, কিন্তু কোন ফলই হইতেছে না। ক্রমেই যেন তিনি অধিক কাতর হইতেছেন। মহারাজা তৃতীয় জয়সিংহ যদিও সকলের প্রিয়-পাত্র ছিলেন না, তথাপি জয়পুরের অধীশ্বর। জোতারামকে আজ কাল তিনি প্রশ্রয় দিতে-ছেন না, এই জন্যও প্রজারা তাঁহাকে ভাল-বাসিত। অদ্য তিনি বড় কাতর, রাজ্যময় তাঁহার মঙ্গল-বিধানের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি হইতেছিল। রূপা, দিবারাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে,

এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রু ফেলিতেছে। জোতারাম ঘন ঘন আসিয়া সংবাদ লইতেছেন, তিনি রাজাময় স্বস্ত্যয়নের আদেশ করিয়াছেন এবং মহারাজের মঙ্গল হইলে প্রজাদিগকে এক বৎসরের কর মাপ দিবেন ও নানা প্রকার দান করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিতেছেন। একজন দিল্লীর হাকিম আসিয়া নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন। ক্রমেই নাড়ী দুর্ব্বল হইতেছে। এক্ষণে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, ভয়ানক গরম, মহারাজা শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। "উঃ, প্রাণ যায়।" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, হাকিম কিছু বুঝিতেছেন না, কিন্তু দেখিতেছেন,—নাড়ী ক্রমশঃ ডুবিতেছে।

মহারাণী পুত্র ক্রোড়ে করিয়া,স্বামীর পার্শ্বে আসিলেন, তখন অন্য কোন লোক তথায় আসিতে দেওয়া হইল না। রাণী দেখিলেন,—স্বামী ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছেন, বুঝিলেন,—এবার রক্ষার উপায় নাই। তিনি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পুত্রটি নাবালক, সে পিতার চরণতলে বসিল। মহারাজ অন্যান্য সকলকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে, রাণীর হস্ত দুখানি ধরিয়া মহারাজ বলিলেন,—"প্রিয়ে! আমি চল্লেম, কিন্তু কুমারকে সাবধানে রেখো। এ রাজপুরে তোমার মিত্র নাই, মৃত্যু সময়ে আমার মা এ সব বলিয়াছিলেন, আমি শুনি নাই। পরম পূজ্যপাদ রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তখন শুনি নাই। এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিতেছি। একটি কথা বলছি—আমার মুখের কাছে তোমার কর্ণ নিয়ে এস।" রাণী চক্ষুর জল মুছিয়া স্বামীর নিকট গেলেন। মহারাজা বলিলেন,—"জোতারাম ও রূপাকে বিশ্বাস করিও না, এরা দুজনে অকৃতজ্ঞ ও ভয়ানক লোক। সাবধান! আমি উপদেশ না শুনে প্রাণ হারালেম। এরা আমাকে বিষ দিয়েছে, নইলে শরীরে এত জ্বালা হবে কেন? আমি এদের কণ্টক, কণ্টক দূর কর্‌লে। তুমি কুমারকে রক্ষা করতে পারবে না। কোন বিশ্বাসী লোক দ্বারা পলিটিক্যাল-এজেণ্ট সাহেবকে পত্র দেও, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। এ কথা কেহ যেন না জানে। আমি চল্লেম, আর রক্ষার উপায় নাই।" রাণী সমস্ত শুনিলেন, অশ্রু মুছিয়া বলিলেন,—"স্বামিন্‌! এর প্রতিশোধ ভগবান দিবেন। কুমারকে রক্ষার ভারও তিনি নিবেন, তবে আমি আপনার আদেশ মত পত্র পাঠাইব।" মহারাজা কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহার দুই এক দিন পরেই সংবাদ আসিল, পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেব মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন! জোতারামের মুখ শুষ্ক হইল। তিনি রূপাকে গোপনে ডাকাইয়া বলিলেন,—"কি উপায় হবে?" রূপা বলিল,—'চুপ কর, কেউ শুনবে। যা হবার হয়েছে। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে সাবধান করেছিলেম, তখন শুন্‌লে না।" জোতারাম বলিলেন,—"টের পাবে না, আমরা খুব সতর্ক আছি।" রূপা বলিল,—"যদি সাহেব আসে

ও সাহেব-ডাক্তার সঙ্গে আসে, তবে সমস্ত ধরা পড়বে। তা'হলে আমাদের গতি কি হবে?" জোতারাম চিন্তিত হইলেন, তিনি রূপাকে বলিলেন,—"মনে করেছিলেম, সাত দিন সময় দিব, এখন দেখছি তা হবে না! সাহেব আসার পূর্ব্বেই—বুঝলে ত?" রূপা উত্তর করিল,—"কি করতে হবে?" জোতারাম তাহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া কি বলিলেন, রূপা শিহরিয়া উঠিল। জোতারাম বলিলেন,—না হইলে উপায় নাই, যদি সাহেব আসেন আর এই সমস্ত প্রকাশ পায়, তা'হলে আমাদের দুইজনকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে, এখন সব বুঝতে পেরেছ?" রূপা সব স্বীকার করিল। জোতারাম এক দ্বার দিয়া ও রূপা অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।

সেই দিবস রাত্রেই মহারাজের অবস্থা খারাপ হইল, সকল চিকিৎসকই নিরাশ হইল। রাণী বুঝিলেন,—আর জীবনের আশা নাই, তখন তিনি একজন বিশ্বস্ত অনুচরের দ্বারা পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের নিকট পুনরায় পত্র পাঠাইলেন, তাহাতে অনুরোধ করিলেন,—"যত সত্বর হয়, ইংরেজ-ডাক্তার-সহ তিনি আসেন।" কিন্তু সাহেব আসিয়া পৌঁছিতে পারিলেন না, রাত্রির শেষ ভাগেই মহারাজ সংসারলীলা সম্বরণ করিলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ।

আউলচাঁদ।

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম পতিতের গতি, সুখের নিদান, প্রেমের প্রস্রবণ ও সংসার মরুভূমির শান্ত ছায়াকুঞ্জ, মহাত্মা আউলচাঁদ তাহারই শাখা বিশেষের প্রবর্ত্তক—বঙ্গদেশবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে, কর্ত্তাভজা বা এক-মুনে নামক একটি সম্প্রদায় আছে। কাঁচড়াপাড়ার নিকটে ঘোষপাড়াই তাহাদের পীঠস্থান, এইখানে মহাত্মা আউলচাঁদের প্রধান শিষ্য রামশরণ পালের বংশধর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল মহাশয়ের চেষ্টায় আউলচাঁদের মহনীয় কীর্ত্তি-কলাপ, প্রগাঢ় হরিভক্তি ও দৈবশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্যভাষায় দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে "আউলিয়া বলে। আউলিয়া হইতেই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে যেমন বিস্মিত হইতে হয়, তেমনই হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়।

দুইশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা—গ্রামে মহাদেব দাস নামে একজন বারুই ছিল। সে একদিন পানবরজের মধ্যে একটী পরম সুন্দর শিশুকে দেখিতে পায়, মহাদেবের সন্তানসন্ততি ছিল না; সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বালকটীকে বাটীতে—আনয়ন করিলে, তাহার স্ত্রী শিশুটীকে পরম সুন্দর দেখিয়া তাহার নাম 'পূর্ণচন্দ্র' রাখিল এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। বালক ক্রমশঃ শশীকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন তাহার বয়স অনুমান আট বৎসর, তখন মহাদেব বালককে গোচারণে

নিযুক্ত করিল। পূর্ণচন্দ্রকে মহাদেবের সংসারে আরও অনেক কাজ করিতে হইত। ইহার জন্য মহাদেবের নিকট বালককে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত, তাহার কর্কশ ভাষা ও প্রহারের দারুণ যন্ত্রণায় একদিন পূর্ণচন্দ্রের প্রাণ প্রায়াণের উপক্রম হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর মহাদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া পূর্ণচন্দ্র সেই গ্রামে হরিহর বণিক নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। হরিহরের বাটীতে সুমধুর হরিসংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ, এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষভাবে আলোচনা হইত, পূর্ণচন্দ্র দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া সময় পাইলেই হরিহরের নিকট গমন করিতেন। হরিহর তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং সময় পাইলে একটু একটু সংস্কৃত পড়াইতেন। পূর্ণচন্দ্রের প্রতি মহাদেব যে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। উপর্য্যুপরি তাড়নার পর মহাদেবের বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্র হরিহরের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে,তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া—পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে হরিহরের নিকটে বিদায় লইয়া ১৬২০ শকের চৈত্রমাসে পূর্ণচন্দ্র শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন —এইখান হইতে তিনি উদাসীন হইয়া "আউলচাঁদ" নামে অভিহিত হইলেন এবং তাঁহার গুরু বলরাম দাসের আশ্রয়ে দেড় বৎসর বাস করেন। তৎপরে গুরুশিষ্যে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, সেখান হইতে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটনের পর তিনি বজরা গ্রামে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের বাইশ জনের নাম মাত্র পাওয়া যায়—

হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল।
লক্ষীকান্ত, নিত্যানন্দ, খেলারাম মাল॥
কৃষ্ণদাস, হরিদাস, নয়ন শঙ্কর।
বিষ্ণুদাস, ভীমরায়, কিনু মনোহর॥
নিধিরাম, শিশুরাম, আনন্দ, নিতাই।
শ্যামচাঁদ, পাঁচুমুচি, গোবিন্দ, কানাই॥

রামশরণের উপরই আউলচাঁদের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তিনি রামশরণকে শূল ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যয়সঙ্কুলান করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত,তাহা রামশরণেরই প্রাপ্য হইত। এই সময়ে রামশরণের জননী জীবিতা ছিলেন বলিয়া তিনি গুরুর ন্যায় একেবারে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আউলচাঁদের ভক্তেরা বলিতেন—যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপের লীলা সম্বরণ করিয়া পুনরায় আউলচাঁদরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা রামশরণের সহধর্ম্মিনীকে—শচি বা সতী-মা বলিয়া ডাকিত। আউলচাঁদকে তাঁহারা কর্ত্তা বলিতেন। তিনি ভিক্ষা করিতেন বটে কিন্তু অতিথি সৎকার—ধর্ম্মপ্রচার ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের স্বহস্তে সেবা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদিও এখনকার উপাসক মহাশয়দের বুদ্ধির দোষে মহাত্মা আউলচাঁদের অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোক-শিখা উত্ত-

রোত্তর মন্দীভূত হইতেছে,তথাপি এই শান্তিময় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এককালে যে কত নিরক্ষর নরাধমের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

"প্রকৃতি সাধন বিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বোধ হয়, কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদার ভাব অবলম্বন করিতে পারেন নাই, ইহাদের পরমার্থ সাধন কেবল দুই একটী নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না। কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর পতিত ও অপতিত স্ত্রীপুরুষ ইহাদের সাধন সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে; ফলতঃ ইহারা কিরূপ মতাবলম্বী তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি ইহাদের স্বভাব বড়ই উদার, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পায় না। যাহারা প্রকৃত আউলচাঁদের শিষ্য তাহাদের প্রকৃতি বড়ই অমায়িক। বাউল ও নেড়ারা যেরূপ শশ্রু ও ওষ্ঠলোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, আউলচাঁদের শিষ্যবর্গ সেরূপ করে না। শশ্রু-লোমাদি সমস্তই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। ৪০।৫০ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটী আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল, এক্ষণে ঐ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

আউলচাঁদ শিষ্যদিগকে দশটী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন যথা—

১।	পরস্ত্রী গমন	কায়িক
২।	পরদ্রব্য হরণ	কায়িক
৩।	জীবহত্যা করন	কায়িক
৪।	মিথ্যা কথন	বাচনিক
৫।	কটুবাক্য প্রয়োগ	বাচনিক
৬।	অনর্থক বাক্যকথন	বাচনিক
৭।	প্রলাপ ভাষণ	বাচনিক
৮।	পরস্ত্রী গমনেচ্ছা	মানসিক
৯।	পরদ্রব্য হরণেচ্ছা	মানসিক
১০।	জীবহত্যা করনেচ্ছা	মানসিক

১৬৯১ শকের বৈশাখ মাসে সায়ং সময়ে বোয়ালিয়া গ্রামে ভক্তকুলমণি আউলচাঁদের প্রাণবায়ু বিনির্গত হয়। প্রতি বৎসর পূর্ণিমাতে ঘোষপাড়ায় পূর্ণচন্দ্র আউলচাঁদের গুণানুকীর্ত্তন হইয়া থাকে। এখনও যেন তাঁহার উজ্জ্বল চিত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতি-বিচার।

দ্বিতীয় কথা।

জাতি-বিচার স্বার্থপরতা নহে।

তুমি আমি সকলেই এক সমদর্শী ঈশ্বরের সৃষ্ট, অতএব তোমাতে আমাতে সমান। সমান না হইলেও সমান; কেন না ঈশ্বর সমদর্শী। নতুবা তাঁহাকে বৈষম্য-স্রষ্টা বলিতে হয়। তবে সমাজ বন্ধনে আমি তোমার নিম্নে থাকিব কেন? তুমি কিসের জন্য সকলের পূজ্য— প্রত্যক্ষ গুরু, আর আমিই বা কি জন্য নিকৃষ্ট, পরপদসেবী দাস? তুমি সমাজে এ বৈষম্য ঘটাইবার কে? সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের মস্তক নমিত করিয়া তুমি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে

আরোহণ কর কোন্ সাহসে? কিসের তেজে তুমি আমাদিগকে অপসারিত করিয়া সুখ-শয্যা রচিত করিয়াছ? দেব দেবীর সঙ্গে তোমার পূজা করিতে হইবে, তোমার পদরজঃ দিবা-রাত্র শিরে বহন করিতে হইবে, প্রত্যেক কার্য্যে করজোড়ে দাসানুদাসের ন্যায় তোমার মুখ প্রত্যাশী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে —কেন? কোন্ বলে তুমি বলিয়ান্? কিসের তেজে তুমি তেজস্বী? তুমি এ অযথা অত্যাচার করিবার কে? আমরা তোমায় চাহি না, তোমার আইন চাই না, তোমার ভণ্ডামী চাই না। তোমার জাতি-বিচার, তোমার স্বার্থ সাধনের অপূর্ব্ব কৌশল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এত দিন অন্ধ ছিলাম; পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, ও সব উঠাইয়া দাও। ব্রাহ্মণের নীতি শাস্ত্র গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কর। ব্রাহ্মণের শিখা ধরিয়া আমাদের সহিত সমান ক্ষেত্রে দাঁড় করাও। উহাদের উদারান্নের সংস্থান নাই, তার উপর বৃত্তি বন্ধ কর। যে জাতি এত দিন এত লোককে ভুলাইয়া আপনার স্বার্থ পোষণ করিতেছিল,আজ এককালে তাহাকে বিধ্বংসিত কর। আমি, তুমি সব সমান। হিন্দু-সমাজ বৈষম্যময়! সাম্য চাই! সাম্য চাই!

আজ কাল এইরূপ একটা রব উঠিয়াছে। কথাও যথার্থ। যদি আপন স্বার্থ পোষণ জন্য ব্রাহ্মণ, কূট বুদ্ধি বলে জাতিগত উচ্চ-নীচতা সংগঠিত করিয়া আপনি সর্ব্বোচ্চ রত্নময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকে, তবে ইহা অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কথা আর নাই। ব্রাহ্মণের উচিতমত দণ্ড বিধান করা আমাদের অপরি-ত্যাজ্য প্রধান কর্ত্তব্য।

• কিন্তু তাই কি? যথার্থই কি ব্রাহ্মণ এই অনপনেয় জগতে তুলনারহিত সর্ব্ব মহাপাপের শীর্ষস্থানীয় স্বার্থপরতা-পাপে মহাপাপী? যথার্থই কি ব্রাহ্মণ স্বার্থান্ধ হৃদয়ে আপন দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে, আপন জঘণ্য লালসাবৃত্তি পরিপুষ্ট করিতে, সরল, শান্তিময়, উদার, নির্ব্বিরোধী হিন্দুজাতিকে লুণ্ঠিত, পেষিত, পদদলিত করিয়া জগতের গৌরব ইতিহাসে আপনার নাম ঘোর কালিমাঙ্কিত করিয়াছে? যথার্থই কি ব্রাহ্মণ স্বার্থের জন্য সকল লোকের স্বাধীনতা-রত্নময়-মুকুট অপহরণ করিয়া তাহাতে আপনার চরণ-শয্যা নির্ম্মাণ করিয়াছে? হায় ব্রাহ্মণ! যথার্থই কি তুমি মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত নিকৃষ্ট বন্য পশু মাত্র?

অসম্ভব! জাতিগত আচরণ ভাবিয়া দেখ দেখি!—দেখ দেখি ব্রাহ্মণ, আপনি শাস্ত্রকার হইয়া, আপনার উদারান্নের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছিল? ভিক্ষা! যাহা অপেক্ষা হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য জগতে মনুষ্য মাত্রেই অহর্নিশ দারুণ সংগ্রামে জর্জ্জরিত। যাহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মনুষ্য আপন মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত অকা-তরে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তোমাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়া সেই অসহ, অসহনীয় যন্ত্রণাময় দারিদ্র্য-সাগরে আপনি স্বইচ্ছায় নিমজ্জিত হইল। কুণ্ঠিত হইল না, পশ্চাৎপদ হইল না, আপন স্বার্থের দিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চাহিল না। সমাজ রক্ষার্থে যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার

অনন্ত জ্ঞানে অবধারিত হইল, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর কর্ত্তব্য আপনার জন্য বাছিয়া রাখিল। ব্রাহ্মণ দেখিল—জ্ঞান ভিন্ন জগতের উন্নতি অসম্ভব। দেখিল—মনুষ্য ও পশুতে শুধু জ্ঞান লইয়াই পার্থক্য; দেখিল—মনুষ্য দারুণ মোহাবদ্ধ—দেহ লইয়াই ব্যস্ত; দেখিল—দেহ মনুষ্য নয়, আত্মাই মনুষ্য; দেখিল—জ্ঞান, আত্মজ্ঞান ব্যতিত সে আত্মার উদ্ধার নাই; দেখিল—বিলাস-বাসনা তিল-মাত্র থাকিলেও সে নির্ম্মল জ্ঞান হৃদয়ে স্থায়ী করা অসম্ভব। আর দেখিল, সে বিলাস-বাসনা ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য—মনুষ্যকুল নায়কহীন, সে কষ্টের পথে অগ্রসর হয় এমন লোক কেহ নাই; দেখিল জগৎ সে পথে যাইতে, সমাজ জ্ঞানমুখী হইতে ভীত, সন্ত্রাসিত। দেখিল—ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সকলের বুদ্ধি, মেধা, সাহস সমান নহে। দুইটী বালুকাকণার মধ্যেও পার্থক্য বর্ত্তমান; দেখিল অন্যাপেক্ষা আপনার জ্ঞান কিছু অধিক; দেখিল—আপনি এ কঠোর পথে অগ্রসর না হইলে, জগতে যথার্থ মনুষ্যের সৃষ্টি হয় না, মনুষ্যকুল পশু হইয়া যায়; দেখিল—মহানির্ব্বাণোন্মুখী প্রকৃতির মহাযাত্রার এই খানেই অবসান হয়! আর দেখিল—সমযাত্রী সকলে উদ্বেগ-পূর্ণ-চিত্তে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তখন সে মহান্ হৃদয় স্বর্গীয় সাহসে পূর্ণ হইল, স্বর্গীয় সার্ব্বজনীন প্রেম সেই সাহসকে সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিল; আর ব্রাহ্মণ স্থির থাকিতে পারিল না। এস ভাই! ধীরে ধীরে তোমরা আমার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হও—"ভয় নাই" বলিয়া সেই অন্ধকারে পা বাড়াইল! ব্রাহ্মণ সুখসেব্য সুধাভাণ্ড তোমাদিগকে বাঁটিয়া দিয়া আপনি বিষধারা পান করিল। জানে না কি হইবে, জানেনা কি হইতে পারে; কল্পনা বলে মনুষ্য-জ্ঞান যতটুকু দেখিতে পায়, তার উপর নির্ভর করিয়া, আর সেই অনন্ত পুরুষের চরণ শরণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিষ পান করিল। অমনি স্বর্গের আলোক মর্ত্তে উদ্ভাসিত হইল; স্বর্গীয় সৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত হইল; দেবতা পুষ্পবৃষ্টি করিল; ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জগৎ পূজা করিল। সকলে সুধা সেবনে অমর হইল। ব্রাহ্মণ বিষ পানে মৃত্যুঞ্জয় হইল।

এমন আত্মবলিদান না হইলে কি এত উচ্চ হইতে পারে? পুরস্কার দেখিয়া কার্য্যের তার-তম্য বুঝা যায়। ব্রাহ্মণের যে এত ক্ষমতা হইয়াছিল, এখনও যে ব্রাহ্মণের এত ক্ষমতা বর্ত্তমান, ওরূপ আত্মবলিদান ব্যতীত কোন্ পুণ্য-কার্য্যের ওরূপ পুরস্কার হইতে পারে? কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে ঈশ্বরকে অবিচারী বলিতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণের যে ওরূপ আত্ম-বলিদানের ওরূপ পুণ্যফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আর বাস্তবিক ব্রাহ্মণের হাতে যে ধরণের ক্ষমতা—সেরূপ ক্ষমতা, কই অপর সমাজে ওইরূপ সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া কেহ গ্রহণ করুক দেখি! ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক দিতেছি। উদরান্নের জন্য ব্রাহ্মণের মত পরমুখাপেক্ষী হইতে বলি না; সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হয়—এরূপ পরিমাণের বিষয় লইয়া, আর অধিক পাইবে না, কেবল এই পণে, পার্থিব উন্নতি চিন্তায় জলাঞ্জলি দিক্ দেখি! জগত আপনা

হইতে তাহার পূজা করিবে, চেষ্টা করিয়া পূজা লইতে হইবে না। সমাজ আপনি তাহার পদে লুণ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মণকেও চেষ্টা বা কৌশল করিয়া এ সম্ভ্রম আদায় করিতে হয় নাই; আপনা হইতে তাহার ক্ষমতার কাছে সমাজ ভক্তিভরে প্রণত হইয়াছে। সমাজ আপনি তাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণের আদেশ তাহারা পালন করিবে কেন? গুণ না থাকিলে ব্রাহ্মণের উপর সমাজ পরিচালনের ভার দিবে কেন? যদি বল তাহারা তখন অজ্ঞ ছিল, ভাল বুঝিতে পারে নাই। ভাল তারপর এই ত যুগ যুগান্তর গেল, কেহই কি বুঝিল না? কেহই ব্রাহ্মণের ধূর্ত্ততা ধরিতে পারিল না?

বাস্তবিক পক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্রাহ্মণের যে সামাজিক অবস্থা, সে বড়ই শক্ত, সে বড়ই দুরারোহ। অসংখ্য প্রলোভন পূর্ণ সংসারের মাঝে এই দুর্জ্জয়, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু করাত দূরের কথা, কোন দেশের কোন কবির কল্পনাতেও সংসার-নির্লিপ্ততার এইরূপ সুন্দর, জলন্ত ছবি কখনও বিকাশ পাইতে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ আপন উদরান্নের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেখিবে?

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্প দ্রোহেন বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি॥

মনু—৪র্থ—২ঃ।

অর্থাৎ কৃতদার দ্বিজ বিপৎপাত না হইলে শিল উঞ্ছাদি বেধবৃত্তি (যাহাতে প্রাণী মাত্রের কিছু মাত্র অনিষ্টাচরণ হয় না) ও যাচিত্রাদি বৃত্তি (যাহাতে লোকের কিঞ্চিৎ মাত্র অনিষ্টাচরণ হয়) এই উভয় বৃত্তির দ্বারা জীবনোপায় করিবে।

একটি একটি করিয়া পতিত শস্য সংগ্রহের নাম "উঞ্ছ" আর মঞ্জরীরূপে ধান্যাদি সংগ্রহের নাম শিল। যাচিত—ভিক্ষায়। দেখিলে কেমন ব্যবস্থা!

ইহার পর অপরকে অধ্যাপন, যাজন ও সৎপ্রতিগ্রহ, এই তিনটি ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায়। আর তার সঙ্গে অধ্যয়ন, যজন ও দান এই তিনটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অধ্যাপন জীবিকার উপায়, কিন্তু ছাত্রের নিকট হইতে অর্থ লইতে পারিবে না। যাজন কত বাছবিচার, কত বাঁধ সাধ দিয়া তবে করিতে পারিবে। আর প্রতিগ্রহের ত কথাই নাই। মনু বলেন,—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।"
"ন বক ব্রতিকে বিপ্রে না বেদ বিদিধর্ম্মবিৎ॥"

অর্থাৎ যাহা বায়সদিগকেও দেওয়া যায়, তাহাও ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা বিড়ালতপস্বী বা বকধর্ম্মী অথবা বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিবে না।

এই ত জীবিকার ব্যবস্থা, তার আবার এত বাঁধা বাঁধি। পাত্রের তারতম্য হইলে তাহার পাপের অংশ লইতে হইবে। চোরের দান গ্রহণে তাহার ন্যায় দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এমন কি, যে গ্রামে মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করে ও গ্রামবাসীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়, রাজা সেই গ্রামবাসীদিগকে ও শাসন করিবেন। ইহাই মনুর ব্যবস্থা। কিন্তু ইহাতেও আশা মিটিল না। বলিলেন,—

প্রতিগ্রহ সমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি ॥

৪র্থ অঃ ১৮৬।

বিদ্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বিষয়ে অধিকারী হইলেও তাহাতে বারম্বার প্রবৃত্তি করিবেন না। যেহেতু প্রতিগ্রহের দ্বারা অতি সত্বর তাঁহার ব্রহ্ম প্রাপ্তিযোগ্য প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়।

অতপাস্তন ধীয়ানঃ প্রতিগ্রহ রুচিদ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্ম পুবেনেব মহতে নৈব মজ্জতি ॥৪র্থ-১৯০

যে ব্রাহ্মণ তপস্যা করে না, বেদাধ্যয়ন করে না,কেবল প্রতিগ্রহ লোলুপ হয়; যেমন পাষাণ-ময় ভেলা দ্বারা গভীর জল সন্তরণকারী, সেই ভেলার সহিত জলে নিমগ্ন হয়, সেও সেইরূপে অযোগ্য পাত্রে দানকারী দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া যায়।

ব্যাপার ত স্পষ্ট বুঝা গেল। ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় তিনটির সমালোচনা করিয়া কি দেখা গেল? ইহা কি ভিক্ষার অপেক্ষা কিছু সাশ্রয় জনক? ইহার মধ্যে স্বার্থের কিছু কি গন্ধ আছে? বিলাসিতা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা, সুখস্পৃহতা প্রভৃতির নামও কি কেহ ইহার মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে?

ব্রাহ্মণ ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিবে,বিষয়-বৈরাগ্যময় শান্তিপূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়ে ঈশ্বর চিন্তা করিবে, জগতের মঙ্গল কামনায় অহর্নিশি গভীর চিন্তাকুল থাকিবে,রাজাকে রাজকার্য্যের, ব্যবসায়ীকে ব্যবসার কার্য্যে,কৃষককে কৃষিকার্য্য, এবং সর্ব্বোপরি মানব মাত্রকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য যে অনন্তপথ অতিক্রম করিয়া অনন্তে লীন হওয়া, সেই মহা চরম উদ্দেশ্যের সাফল্যের দিকে অগ্রগামী করিবে, তৎপরিবর্ত্তে কাহারও কাহারও নিকট হইতে সুধু প্রাণধারণোপযোগী শুধু দেহে-প্রাণে গ্রথিত থাকে,এমন সামন্য বৃত্তি গ্রহণ করিবে—এই ত ব্রাহ্মণের কার্য্য। রাজ্য তোমার,ঐশর্য্য তোমার,বিষয় তোমার, পার্থিব যত সুখ সৌন্দর্য্য সকলই তোমার, তুমি কেবল সংযত চিত্তে—মানব জীবনের মহা উদ্দেশ্যের পথে বিঘ্ন না হয়, তোমার জীবাত্মা সে বিলাস সুখে মগ্ন হইয়া পশুতুল্য না হয়, তোমার—যাত্রার পথে কাঁটা না পড়ে, এমন করিয়া আমার উপদেশ মত চলিয়া, তোমার সেই মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সর্ব্বস্ব উপভোগ কর। আমি কিছু চাহি না, যাহা ভাবিতে হইবে যাহাতে যাত্রা সুখ সাধ্য হয়, যাহাতে জগতের শান্তি বজায় থাকে, যাহাতে শীঘ্র আমাদের এ মহাযাত্রার মহাবসান হয়, আমি অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া সেইরূপ পরামর্শ দিতেছি, আমি অনন্যচিন্ত্য হইয়া কেবল তাহারই সদুপায় উদ্ভাবন করিতেছি;—কেবল আমায় দুইটি খাইতে দাও!—এই কি ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা নহে? এই কথাই কি ব্রাহ্মণ বলে না? শাস্ত্রীয় জাতিগত বিধান পাঠে এই কথাই কি জানা যায় না? ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোল্লিখিত নিত্য কর্ত্তব্য সকল বিশিষ্টরূপে পরিচর্য্যা করিলে ও তাহার মধ্যে বিলাস সাধনার তিলমাত্র আকাঙ্ক্ষা কি পরিলক্ষিত হয়? তবে আবার ইহার ভিতর স্বার্থ কোথায়? ইহাতে যে স্বার্থের কথা উত্থাপন করে, সে ত পাষাণ্ড—বর্ব্বর।

যদি কিছুমাত্র স্বার্থাভিলাষ থাকিত, তাহা

হইলে ব্রাহ্মণ কি অনায়াসে নিজের জন্যও একটি ভাল জীবন যাত্রার উপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারিত না? তবেই স্পষ্ট সহজ জ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছে যে, ইহাতে ব্রাহ্মণের তিল মাত্র স্বার্থচিন্তা নাই। যখন স্বার্থচিন্তা নাই, তখন নিশ্চয়ই এ জাতি-বিচারের মধ্যে কোন একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। বেদ, দর্শন, পুরাণ, কাব্য,যাঁহাদিগের জ্ঞান-কল্পতরু-স্ফুটিত কুসুম-নিচয়, যাহার ঈষৎ মাত্র সৌরভাঘ্রাণে সুদূর আমেরিকা অবধি আজ চমকিত;—দর্শন-শাস্ত্রে জ্ঞানের শেষ সীমায় যাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, (In Vedanta Philosophy human speculation seems to have reached its very acme." *Maxmullar*) বলিয়া ইউরোপ ঘোষণা করিতেছেন, যাঁহাদের বিজ্ঞানের ছায়াপাতে বিজ্ঞানমূলক সত্যরাজ্য আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদিগের পূর্ণজ্ঞানের পরিচয় ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, সমাধি, যোগৈশ্বর্য্য, সিদ্ধি, মোক্ষ, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বর তুল্য; সেই ব্রাহ্মণ যখন নিঃস্বার্থ-চিত্তে সমাজ সংগঠন করিতে বসিয়া এ জাতি-বিচার সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন কি ইহার মধ্যে কোন গূঢ় মহৎ উদ্দেশ্য নাই? না বুঝিয়া, না ভাবিয়া তাঁহারা কি শুধু খেয়ালের উপর এ বিভাগ-প্রণালী স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন? তবে জাতি বিচার ভাল নহে বলিয়া জগতে আজ এ চীৎকার কেন?

ক্রমশঃ

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রের 'শশী' নামের মূলতত্ত্ব।

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরু বাসের পুরাতত্ত্বের ইতিহাস।)

চন্দ্রের 'শশী' নামটী সকলেরই সুবিদিত। 'শশধর' ও 'শশাঙ্ক' ইহারই অনুরূপ ও এক মূলার্থক। এই সকল নাম হইতে চন্দ্রের কৃষ্ণ চিহ্নটীর শশের ন্যায় আকারই যে শশী নামের মূল, তাহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়। শব্দ-শাস্ত্রকারগণও 'শশী' নামের ব্যুৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই প্রকারে শাব্দিকদিগের দ্বারা শশী নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইলেও, ইহার মধ্যে যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অবসর আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা উপস্থিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

'শশ' শব্দের দ্বারা 'শশী' নামের ব্যাখ্যা হইলেও, 'শশ' শব্দটীর আবার ব্যবহার প্রয়োজন। কারণ 'শশ' শব্দটী আমরা সাধারণতঃ যে শশক-বাচী বলিয়া মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহাই কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের কারণই বিদ্যমান দেখা যায়। 'শশাঙ্ক' নামেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ আমরা যে 'মৃগাঙ্ক' নাম প্রাপ্ত হই—তাহাতেই আমাদের সন্দেহ বিশেষরূপে উদ্রেক করাইয়া দেয়। উভয় নামের পূর্ব্বোক্ত সৌসাদৃশ্য হইতে 'শশ' শব্দ মৃগ-বাচী বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়। বস্তুতঃ অভিধানে অনুসন্ধান করিলে আমরা মৃগের এক জাতি বিশেষ 'শশ' নামেই অভিহিত দেখিতে পাই, যথা:—

"সমুরু রোহিতো ন্যঙ্কুঃ সম্বরো বক্রণোরুরু।
শশৈণ হরিণাশ্চেতি মৃগা নব বিধিমতা॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকাপুরাণ।

চন্দ্রের শশাঙ্ক নামের অনুরূপ যেমন কয়েকটী নামই অভিধানে পাওয়া যায়, ইহার 'মৃগাঙ্ক' নামের অনুরূপও তেমন বহু নামই অভিধানে পাওয়া যায়। উভয় প্রকারের নামের তুলনা করিলে বরঞ্চ শেষোক্ত প্রকারের নামেরই বিশেষ বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। 'শশাঙ্ক' নামের অনুরূপ আমরা কেবল 'শশী' 'শশধর', 'শশভৃৎ' ও 'শশলাঞ্ছন' এই চারিটী নাম প্রাপ্ত হই। কিন্তু 'মৃগাঙ্ক' নামের অনুরূপ 'মৃগলাঞ্ছন', 'মৃগপিপ্লু', 'মৃগলক্ষ্ম', 'ছায়ামৃগধর', 'হরিণাঙ্ক', 'এনাঙ্ক', 'এণতিলক', 'এণভৃৎ' এই আটটী নাম প্রাপ্ত হই। ইহা হইতে চন্দ্রে মৃগ সাদৃশ্যই যে অধিকরূপে কল্পিত হইয়াছে—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'শশ' শব্দের অর্থে 'মৃগবিশেষ' প্রদত্ত হইয়াছে। মৃগজাতির পৌরাণিক উৎপত্তি বিবরণেও আমরা শশ, পুলস্থভার্য্যা, মৃগী হইতে উৎপন্ন হয়, এরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হই যথা—

মৃগ্যাস্তু হরিণাঃ পুত্রা মৃগাশ্চান্যে শশাস্তথা।
ন্যঙ্কবঃ শরভা যে চ পুরবঃ পৃষতাশ্চ যে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বহ্নিপুরাণম্।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের বোধ হয় যে, চন্দ্রের কৃষ্ণচিহ্নটীর সহিত প্রথম মৃগেরই সাদৃশ কল্পিত হয় এবং ইহার দ্বারা এই মৃগ নামে এবং ইহার হরিণ ও 'এণ' নামে যেমন চন্দ্রের উপরিউক্ত বিবিধ নাম হয়, তেমনই ইহার শশ নামেও উপরি উল্লিখিত "শশী' প্রভৃতি নাম হয়।

চন্দ্রের মধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নটীর সহিত মৃগরূপের সাদৃশ্যই যে ইহার 'মৃগাঙ্ক' নামের প্রকৃত নির্দ্দেশক, তাহা ইহার 'ছায়ামৃগধর' নামটীতেই স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইতেছে। 'শশ' শব্দ যোগে গঠিত চন্দ্রের কোন নামেই আমরা এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেখিতে পাই না। চন্দ্রের কৃষ্ণ চিহ্ন যে কবি কল্পনায়ও স্পষ্টাক্ষরে মৃগরূপে বর্ণিত, ভারতচন্দ্রের কবিতায় তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তই বর্ত্তমান যথা—

"কাঁদেরে কলঙ্কীচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥"

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তই লাভ করা যায় বলিয়া, আমরা মনে করি যে চন্দ্রের ছায়া চিহ্নের শশকের (শশের) সহিত পৃথগভাবে সাদৃশ্য হইতেই হউক্ বা মৃগের সহিত প্রথম সাদৃশ্য হইতে মৃগের 'শশ' নাম হইতেই হউক, যেরূপেই "শশী" নামের উৎপত্তি হইয়া থাকুক্ না কেন, চান্দ্রর ছায়াচিহ্নের সহিত মৃগেরই সাদৃশ্য প্রথম পরিকল্পিত হয়।

ঐতিহাসিক প্রমাণও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। আর্য্যদিগের প্রথম যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে মৃগের সহিতই তাঁহাদিগের প্রথম সংস্রব সঙ্ঘটিত হয়। এই জন্যই 'মৃগ' * পশু সাধারণেরই নাম হইয়াছে, পশু শিকারের সাধারণ নাম ইহা হইতেই 'মৃগয়া' হইয়াছে; এবং পশু শীকারকারী জাতির নামও 'মৃগাজীব', 'মৃগাবিৎ' হইয়াছে। বর্ত্তমান উত্তরমেরু মণ্ডলের অধিবাসীদিগের মৃগই আমরা প্রধান অবলম্বন দেখিতে পাই।

* পশোবপি মৃগাঃ।

মৃগদ্বারা তাহাদের গাড়ী (stedge) বাহিত হয় বলিয়া এই মৃগ বল্গাহরিণ (rein-deer) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আর্য্যগণ উত্তর-কুরুবাসী ছিলেন সুতরাং উত্তরমেরুবাসিদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও যে হরিণই প্রধান সহায় ছিল, তাহা বিশেষরূপ সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। হরিণ ঋষিদিগের আশ্রমে যে অন্য জন্তু অপেক্ষা অধিক যত্নে এক প্রকার পরিবার নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত, তাহা তাঁহাদের ইহার সহিত সর্ব্ব প্রথম সংস্রবের দ্বারা ঘনিষ্ঠ-ফল বলিয়াই বোধ হয়।

হরিণের সহিত আর্য্যদিগের এইরূপে প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে পর, যখন চন্দ্রের ছায়াচিহ্ন নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে তাঁহাদের চিন্তা ব্যাপৃত হইল, তখন তাঁহাদের নিত্য পরিচিত হরিণের সহিত সাদৃশ্য কল্পিত হওয়া যেরূপ স্বাভাবিক ছিল, অন্য কোন জন্তুর সহিত সাদৃশ্য কল্পিত হওয়া তেমন স্বাভাবিক ছিল না। এই প্রকারে চন্দ্রের 'শশী' নামের সহিত মূলে যে মৃগেরই যোগ, তাহার ভাষা-প্রমাণ যেমন আমরা উপরে পাইয়াছি—তেমনই তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণও আমরা এখানে প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আকাশ।

অনাদি অনন্ত তুমি হে আকাশ !
কোথা হ'তে তব হয়েছে প্রকাশ ?
যত দূর দেখি তত দূর যাও।
শেষ কি তোমার নাহিক কোথাও ?
কে তোমায় দিল পাঠায়ে ধরায় ?
নাম কি তাঁহার, থাকেন কোথায় ?
কত শত রঙে হও সুশোভিত।
শ্বেত, পীত, নীল, হরিৎ, লোহিত।
কভু শশধর হাসিছে তোমাতে।
কখন বা ঘিরে অমার নিশাতে।
কখন বা ঢাল অরুণ কিরণ।
পুলকে ভরিয়া উঠে প্রাণ মন।
কভু বারি ধারা, অশনি পতন।
কভু তারা-হাসি হৃদি বিমোহন।
কত শোভা তব কি লিখিব আর।
তোমার ও শোভা অনন্ত অপার।
কোটি প্রণিপাত চরণে তাঁহার,
যে জন করিল সৃজন তোমার।

শ্রীধ্রুবলাল দত্ত বর্ম্মা।

অজ্ঞান ও জ্ঞান।

(বেদান্তসার)

১ বেদান্তসার সদানন্দ যোগীন্দ্রের প্রণীত। প্রায় ৬০ বর্ষ হইতে অনেকে উহা পাঠ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অনেকে উহার মূল উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্রাদি পাঠ করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা মূলের সহিত গ্রন্থখানির সম্বন্ধ অবগত নহেন। এই জন্য এই প্রবন্ধ।

২ বিশেষতঃ "অজ্ঞান" নামক যে পদটীর ব্যাখ্যা দ্বারা যোগীন্দ্রপ্রবর মোক্ষ-লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই উক্ত গ্রন্থের প্রধান অবয়ব। ঐ শব্দটী আমাদের অপরিচিত

নহে। শাস্ত্রের ও লোকের কথায় উহা সর্ব্বদাই শ্রুত হয়। *

৩ সামান্যতঃ "অজ্ঞান" শব্দে লোকে বুঝে, জ্ঞানের অভাব। † কিন্তু ঠিক তাহা নহে। যাহা অনাত্মা, যাহার জ্ঞান নাই—তাহাই "অজ্ঞান।"

৪ তাহা স্বভাবতঃ একপক্ষে স্বাত্ম এবং পরমাত্ম জ্ঞানের আচ্ছাদক এবং অপর পক্ষে জগৎ ও দেহাদি জড় পদার্থের উপাদান। ‡

৫ স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি ও প্রাণবায়ু সঙ্ঘাত-সূক্ষ্মদেহ এবং তৎসমস্তের ভোগ্য জগৎ এই সমস্ত পদার্থ অজ্ঞান পদের বাচ্য।

৬ তৎসমস্তই প্রকৃতির বিকার। অতএব প্রকৃতিই অজ্ঞান। তাহার নামান্তর অবিদ্যা, মায়া, কারণ-শরীর। বেদান্তে উহাকে উপাধি কহে। উহাই দেহবীজ।

৭ এই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া শব্দ, জীবের অবিদ্যা-প্রকৃতিকে বুঝায়। তাহা জীবের কর্ম্মদ্বারা জড়িত এবং সমলা। তাহা ত্যজ্যা। ইহা হইতে ভিন্না মহামায়া বা পরমাপ্রকৃতি। তিনি পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি এবং তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্রা। তিনি বিমলা এবং পূজ্যা।

৮ জীবের কর্ম্ম, উক্ত অজ্ঞান-প্রকৃতির সহ সমানাধিকরণে স্থিতি করে। বাসনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং অদৃষ্ট ঐ কর্ম্মের নামান্তর। সবগুলি প্রকৃতির সহ অনাদি।

৯ জীবও অনাদি। জীবই আত্মা এবং পরমাত্মার সদৃশ বস্তু, বিভু এবং নিত্য। প্রকৃতি অনাদি হইলেও অজ্ঞান, অচেতন, এবং অবস্তু।

১০ অবস্তু অর্থাৎ আত্মার ন্যায় নিত্য-চৈতন্য স্বরূপ স্বতোসিদ্ধ বস্তু নহে। তাহা মূলতঃ জড় এবং অচেতন-কর্ম্মাকৃষ্ট। জীবের জ্ঞানোদয়ে তাহা থাকে না।

১১ যে পুরুষ, আপনাকে প্রকৃতি ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার

---

* "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং" [গীতা ৫ম]। "অজ্ঞাননেবাস্তহিমূলকারণং" [রামগীতা]। "অজ্ঞানানাম্ভানির্ব্বচনীয়ং" [শঙ্করাচার্য্য]।

† "জ্ঞানাভাবোঽজ্ঞানমিতিমতং নিরস্ততি। ভাবরূপমিতি।" [বিদ্বন্মনোরঞ্জিণী]।

‡ "অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকংশক্তিদ্বয়মস্তি।" [বেদান্তসার]
আবরণশক্তিস্তাবৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপমাবৃণোতীত্যাবরণশক্তিঃ। বিক্ষেপশক্তিস্তাবৎ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তং জগৎ জলবুদ্বুদবন্নামরূপাত্মকং বিক্ষেপতি সৃজতীতি বিক্ষেপশক্তিঃ। ইতি শক্তিদ্বয়মজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ।" [বেদান্তসারে সুবোধিনী টীকা]। অর্থ—এই অজ্ঞানের দুই শক্তি। আবরণ ও বিক্ষেপ। যে শক্তি দ্বারা উহা সচ্চিদানন্দ সরূপ আত্মাকে আবৃত করে, তাহার নাম আবরণ-শক্তি। আর যে শক্তিদ্বারা উহা ব্রহ্মার শরীর অবধি, সমস্ত জীবদেহ ও স্থাবরান্ত নাম রূপাত্মক অনিত্য জড়জগৎ সৃজন করে, তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি। অজ্ঞানের এই শক্তিদ্বয় ইত্যর্থ। সহজ কথা এই ;—যথা। প্রকৃতিই জড়, অনাত্ম ও অজ্ঞান। তাহাই অনন্ত কোটি জড়-জগতের উপাদান-বীজ। তাহাই জগৎ নির্ম্মাণের উপযোগী বিচিত্র কার্য্যময় স্থূল-উপাদান-রাশিতে পরিণত হয়। পরিণত হইয়া শরীরাদি সমস্ত জড়-জগৎ সৃষ্টি করে। তাহার সেই মহাসামর্থ্যের নাম—বিক্ষেপ বা সৃজন-শক্তি।' অতঃপর জীব যে মহাভ্রম বশতঃ ঐ শরীরাদিকে আত্মা ভাবিয়া, স্বীয় আত্মসরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপ কে দেখিতে পান না, সেই ভ্রমের নাম অজ্ঞানের 'আবরণ শক্তি' অথবা অজ্ঞানাবরণ।" যাঁহার জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ যিনি বিবেক-জ্ঞান-প্রভাবে জানিতে পারেন যে; শরীরাদি আত্মা নহে। শরীর মরণধর্ম্মী। আত্মা স্বতন্ত্র ও অবিনাশী। শরীরাদি বিনশ্বর পদার্থে তাঁহার বাসনা ও রুচি নিবৃত্ত হয়। সুতরাং আর তিনি দেহ ধারণ করেন না এবং তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রলোভন ও প্রয়োজন রহিত হয়। অতএব অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন তিনি পরমাত্ম জ্ঞানে জাগিয়া উঠেন। তাহাতে তাঁহার সম্মুখ হইতে উহার আবরণ সরিয়া যায়। এই কথাগুলি অতি সহজ ও সম্পূর্ণ সঙ্গত। (*Perfectly rational.)*

সম্বন্ধে প্রকৃতি ও কর্ম্মের প্রবাহ রহিত হয়। ঐরূপ জানার নাম আত্মজ্ঞান। পরমাত্মজ্ঞান তাহার কেন্দ্র, উৎস, আশ্রয় এবং অভয়প্রতিষ্ঠা।

১২ পরমাত্মা, সকল আত্মার আত্মা এবং একমাত্র অদ্বিতীয়। তাঁহার জ্ঞানই পরমাত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এবং মোক্ষের অভিন্ন-স্বরূপ। মোক্ষে, আত্মা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, আনন্দ-স্বরূপ পরমসত্য-স্বরূপ পরমাত্মার সর্ব্ব-ব্যাপী আকাশকল্প অভয়ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করেন।

১৩ মোক্ষই জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান। যাহা কিছু তদিতর সমস্তই অজ্ঞান। সমস্তই মোহময়। সমস্তই প্রকৃতির বিকার, মায়াকল্পিত এবং অবিদ্যার-প্রবাহ।

১৪ এই অজ্ঞান-সাগর হইতে জীবকে উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্তে বেদান্তের অভ্যুদয়। শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্র, স্বীয় বেদান্তসার গ্রন্থে তাহাই অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৫ বেদান্ত অতিবিস্তীর্ণ শাস্ত্র। তিনি তাহার মধ্য হইতে কতিপয় সারগর্ভ অবয়ব সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞান পদটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত অজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা "জ্ঞান" পদেরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

১৬ নিম্নে সেই অবয়ব সমূহের নাম দেওয়া যাইতেছে। অবয়ব শব্দের অর্থ বিচারাঙ্গ-বাক্য। প্রত্যেক অবয়বের যাহা তাৎপর্য্য এবং যে যে অবয়ব উপনিষদের যে যে বচন এবং বেদান্তের যে যে সূত্র হইতে আকর্ষিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে বিবৃত হইবে।

(ক) বেদান্ত কি?

(খ) বেদান্তের অধিকারী কে?

(গ) ব্রহ্ম কি?

(ঘ) গুরু।

(ঙ) অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়।

(চ) গুরুর উপদেশ প্রণালী।

(ছ) মোক্ষ। (ক্রমশঃ)

৺চন্দ্রশেখর বসু।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচার সমিতির সভ্যগণের সরস্বতী পূজোপলক্ষে রচিত

গীত।

বেহাগ—আড়াঠেকা, মূলতান—একতালা, ললিত—আড়াঠেকা ও ভৈরবী—ঝাঁপতাল। এই চারি সুরে গাওয়া যায়।

জয় জয় ভারতী।
দেহ পদে রতিমতি ॥
মোরা অতি মূঢ় মতি, না জানি ভকতি স্তুতি।
করি মাগো, এই মিনতি ; হয় যেন সুমতি ॥
অবোধ অজ্ঞানগণে, বিন্দুমাত্র কৃপা দানে।
মা তোমার ছলনা কে'নে, সুধাই মা, ক'রে মিনতি ॥
সন্তান অবোধ হ'লে, মা'কি তারে, করে না কোলে।
ত্যজে কি মা, কোন কালে, বল না মা সরস্বতী ॥
পুনঃ মোদের এই মিনতি, শুন গো মা ভগবতী।
হৃদে রেখে, নিতি নিতি, পূজিব তোমায় দিবারাতি ॥
যোগধ্যানে, যোগানন্দ, পাইয়ে পরমানন্দ।
মিটাইয়ে, সকল দ্বন্দ্ব, নির্দ্দ্বন্দ্ব হ'লো সম্প্রতি ॥

BENGAL ... 10 APR 1914 ... WRITERS' BUILDINGS

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

১ "মন প্রাণ দিয়ে, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
হরি হরি বল বদনে।
এ কলি-কলুষ, হইবে শেষ,
মধুর মধুর তানে॥
২ বল উচ্চৈস্বরে, যতন ক'রে,
কেশব' মাধব, যাদব, শ্রীহরে,
শ্রীপতি, শ্রীধর, শ্রীকৃষ্ণ, কংসারে,
ডাক শ্রীনন্দ নন্দনে।
৩ যেই নাম লাগি, সদাশিব যোগী,
সর্ব্বস্ব ত্যাগী, হলেন বৈরাগী,
নামে অনুরাগী, জটাধারী যোগী,
হরি হরি গুণ গানে।
৪ হরিনাম ব্রহ্ম, চারি যুগে বলে,
নাম-বলে জলে ভেসেছিল শিলে,
পিতা পুত্রে ডাকি নারায়ণ ব'লে,
গেল সে কৈবল্য ভবনে।
৫ গজরাজ হয়ে, বিপদে পতন,
উচ্চে ডাকে রক্ষ, শ্রীমধুসূদন,
কহে খগে বেগে চক্র সুদর্শন।
ছুষ্টে দুষ্ট করে প্রাণে॥"

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি গোপী-জন বল্লভ। যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই পালনী-শক্তি-গোপী, সেই পালনী-শক্তি-রূপী অবিদ্যাকলার যিনি বল্লভ, তিনিই অবিদ্যার প্রেরক ঈশ্বর এবং অনন্ত জগতের অধিষ্ঠাতা। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি বা মায়া হইতে এই প্রপঞ্চ জগৎ জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত গোপীজন শব্দে জগৎ জানা যায়। জগতের স্বামীই গোপীজন-বল্লভ। তাঁহাকে জানিলেই জগৎ জানা হইল।

কৃষ অর্থে সত্বা এবং ন শব্দে আনন্দ। সেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দীপ্তি পাইতেছেন, বৈদ্যুতিক আভাযুক্ত হইয়া তিনি উত্তপ্ত মনে শান্তি প্রদান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এক নাম গোবিন্দ। গো অর্থে বেদ বা তত্ত্বজ্ঞান। যিনি সেই বেদ ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ, তিনিই গোবিন্দ। তিনি গোপ-বেশে জগতের পালন করিতেছেন, তাহাই তাঁহার মধুর সত্ত্বমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ, তিনি ধর্ম্মপালন করেন এবং পাপের নাশ-সাধন করিয়া জগৎকে রক্ষা করেন। তিনি চতুর্ভুজ অর্থাৎ পূর্ণশক্তিসম্পন্ন হইয়া রাজসিক করে শঙ্খ (পঞ্চভূত), সাত্ত্বিক করে চক্র (কালস্বরূপ মন), তামসিক করে গদা (আত্মমায়া) এবং অহঙ্কার করে পদ্ম (বিশ্ব)

ধারণ করেন। তিনি জগতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বপার্থিব বলকে দৈত্যবলে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন,পৃথিবীর পাপ-বল ধ্বংস করিতেছেন, অসুর সকলের বিনাশ সাধন করিতেছেন। যাহা মানুষের অদৃষ্ট. তাহা ভগবানের সুদর্শন চক্র। সেই সুদর্শনচক্র-বলে সমস্ত আসুরিক-বলের ধ্বংস-সাধন হয়।

বসুদেব হইতেছেন নির্ম্মল সত্ত্বগুণ। নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরমপুরুষ বাসুদেব প্রকাশিত হন। এই সত্ত্বগুণে যখন পরমা ভক্তিরূপিণী দেবকির সম্মিলন হয়, তখন তাহার ফল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মের আবির্ভাব।

মথুরা জীবের সুষুপ্তি, বৃন্দাবন স্বপ্নাবস্থা, দ্বারকা জাগ্রতাবস্থা। নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা করিয়া থাকেন। জন্ম-রহিত, নিত্য-প্রকাশ-স্বরূপ আত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। যে সত্ত্বগুণ দেহকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন ভেদে নানা অবস্থায় প্রকটিত হয়।

দ্বারকালীলায় আত্মা সমস্ত পাপাসুরকে দমন এবং রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সত্ত্বগুণের (বসুদেবের) আধিপত্য স্থাপন করেন। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মবীরত্ব, শক্তি ও আন্তরিক বল-বীর্য্যের পরিচয় হয়। পৌরাণিক দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও বল-বীর্য্যের প্রকাশ স্থান। রিপুকুলকে পরাজয় করিয়া তিনি দ্বারকা সংস্কার করিয়াছিলেন। এই দ্বারকা সংস্কারই চিত্ত-সংস্কার। এই দ্বারকা অবস্থায় আত্মা কর্ম্মবীর! কর্ম্মবীরত্ব লাভ করিয়া যখন তিনি জ্ঞানাধিকারী হন, তখনও তাঁহার সংসারাসক্তি সমুদয় বিনষ্ট হয় না। তথাপি কংসরূপ এক পাপাসুর সংসারাসক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণকে সংহার করিতে চাহে। জ্ঞানযোগ দ্বারা সংসারাসক্তি একেবারে সংহার করিতে পারিলে, চিত্তের অক্রূরতাহেতু ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন সূর্য্য দর্শন হয়, আত্মাতে তেমনই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। জলমধ্যে অক্রূর সেইরূপ অনন্তদেবকে দেখিয়াছিলেন।

ধ্যানযোগের একনিষ্ট উৎকট চেষ্টার নাম মথুরা-লীলা। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সংসার মন্থন করিয়া যেখানে সংসারের সারভুত শ্রীকৃষ্ণ লব্ধ হইয়াছেন, সেই ধামকে মথুরা বলে।

কুরুক্ষেত্র :– কর্ম্মযোগ দ্বারা সংসারের পুণ্য কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মাত্মার সাত্ত্বিকতা সাধন দ্বারা বিজয় লাভ করাই কুরুক্ষেত্র-লীলা। এই কুরুক্ষেত্র-লীলায় কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা জ্ঞানলব্ধ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এই কুরুক্ষেত্র-লীলায় নর-নারায়ণের একত্র মিলন। কুরুক্ষেত্রের সমরে দুর্য্যোধনরূপ ধর্ম্মবৈরির নিপাতসাধন হইয়াছিল।

ব্রজপুর :—হৃদয়ের সেই ধামই ব্রজপুর, যেস্থানে ভগবান রমণ করেন। ব্রজ শব্দের অর্থই বিহার। জীবের সাত্ত্বিক প্রেমানন্দে মাতিয়া আনন্দময় ভগবান এই ব্রজধামে সাক্ষাৎ রমণ করেন। জীবের সেই আনন্দরূপিণী হ্লাদিনী শক্তিই রাধিকা। তাঁহার সহচরী গোপীগণ সেই প্রেমানন্দের অঙ্গসঞ্চারিণী-শক্তিরূপা। গো সকল সেই বেদ-জ্ঞানরূপ, যাহাতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে। গোপালগণ সেই গোগণে পরিবৃত হইয়া সাক্ষাৎ

ভগবানের সহিত সখ্যলীলা করেন। আর নন্দ যশোদা বাৎসল্য রূপে ভগবানকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহার সহিত বাল্যলীলা করেন। ব্রজলীলা সমস্তই বাল্যভাবের লীলা।

দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র ও ব্রজভাব।

রাগ, ভয়, ক্রোধাদি,অবগত হইয়া চিত্তশুদ্ধি ও স্থৈর্য্য জন্মিলেই দ্বারকা-লীলা জানিতে পারা যায়। আত্মজ্ঞান রূপ তপস্যা দ্বারা মথুরা ও কুরুক্ষেত্র উপলব্ধ হয়। আর সামীপ্যলাভই সদ্ভাব প্রাপ্তি ব্রজ-রমণ। এই সমস্ত লীলা যিনি প্রকৃত পক্ষে জানিতে পারেন,তিনি মুক্ত হয়েন। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী এবং বৈদিক শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী-মূর্ত্তির আবির্ভাব অনুভব করেন, তাঁহাদের ব্রহ্ম-দর্শন ঘটে। তাঁহারা আত্মহৃদয়েই কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বিকাশ দেখিতে থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মের দিব্যজ্ঞান বশতঃ তাঁহা-দের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে ও সারূপ্যমুক্তি লাভ হয়। সাধকের হৃদয়ে তিনি সাধনা প্রভাবে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েন, অথচ অন্তর্যামীরূপে সকলের হৃদয়েই বর্ত্তমান। তাঁহার সেই আবির্ভাবই জন্ম ও তাঁহার লীলাদি সাত্ত্বিকভাবের বিরাট-বিকাশ। এই সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ সমস্ত একাদিক্রমে স্থূললীলায় প্রদর্শিত।

ভগবান সূক্ষ্ম শক্তিময় দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই মনুষ্যলোকে আধ্যাত্মিক-লীলায় নিরত থাকিয়া ভোক্তৃ রূপে ভূতগণকে সংসারলীলা করাইতেছেন। ভোগাঙ্গরূপে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং আবার যোগরূপ ধারণ করিয়া যোগীরূপে সেই জীবকে মুক্তিপথে আনয়ন করিতেছেন। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের নিত্য নিয়ম, এজন্য এ লীলা নিত্য। পুরাণের অবতার-বাদ এই নিত্য আধ্যাত্মিক-লীলার বিরাট-বিকাশ। রামায়ণ, মহাভারতাদিতে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিত্য লীলা। ভগবানের এই অনন্তলীলা অতি সূক্ষ্ম, যেহেতু ভগবানের অনন্ত শরীরই সূক্ষ্ম শক্তিময়।

ভগবান অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, শক্তিময়রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন। এই অব্যক্তরূপই গীতোক্ত বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি, তিনি স্বকীয় পরাপ্রকৃতির সম্বন্ধ বলে অন্তর্যামী হইয়া যথানিয়মে এই বিশ্বের পাপ-তাপের বিনাশ সাধন করিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন করিতেছেন। সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তিই দেব-দেবী। সেই নিয়ন্তৃ শক্তিতে তিনি নিত্যকাল এই জগৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টি-কালে এই শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং কেবল মহাপ্রলয়ে তাহার লয় সাধন হইবে। নতুবা নিখিল স্থিতি কাল ব্যাপিয়া সেই শক্তি নিত্যরূপে বর্ত্তমান আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন— তাঁহার আবির্ভাব আছে, তিরোভাব-নাই।

ভগবান অন্তর্যামী রূপে জীবের আত্মাতেই বিরাজ করিতেছেন। যখন জীবের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, এবং যখন জীব সেই চিত্তে একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ হন, তখন তিনি ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সেই শুদ্ধচিত্তে প্রতিবিম্বিত দেখেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার সত্ত্বমূর্ত্তি দেখিতে পান। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জীবের মায়া এবং মায়া-সম্ভূত জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। জীব যখন সাধনা-বলে এই মায়াজাল বিমুক্ত হয়েন, তখন

তাঁহার আত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ প্রভাসিত হইয়া পড়ে, গগন পরিস্কৃত হইলে যেমন সূর্য্যের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তেমনই মায়ার ঘোর যতদিন না কাটিয়া যায়, ততদিন আত্মস্বরূপে ভগবান দেখা দেন না। আত্মস্বরূপে ভগবান প্রকাশিত হইলেই সমস্ত আধ্যাত্ম জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ও ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়।

বেদমতে যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন, অবিবেকী, তাহারা হাজার বিদ্যাবুদ্ধি (ব্যবহারিক) সম্পন্ন হউক না কেন, তাহারা আত্মা ও পরলোক-তত্ত্ব বিষয়ে ঘোর অন্ধ। জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাসই পরলোকের প্রমাণ। ঈশ্বর অনন্ত, অনাদি,এজন্য ত্রিকালজ্ঞ। মানবের জ্ঞান পরিমিত, এইজন্য অনন্তকে গ্রহণ করিতে বা ধারণ করিতে অসমর্থ। অজ্ঞানীর জন্য বাহ্যজগৎ এবং জ্ঞানীর জন্য অন্তর্জগৎ। স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসাদি সমস্ত অন্তর্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত। সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব তদ্রূপ স্থূল অবয়বে দেব-দেবীরূপে প্রতীয়মান। ভক্তের নিকট যাহা বাহ্য জগতের পৌরাণিক ঘটনা বলিয়া প্রথিত, জ্ঞানীগণের নিকট তাহা অধ্যাত্ম জগতের সত্য বলিয়া উপলব্ধ।

তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে বিবেকোদয় হয় না, বিবেক উদয় না হইলে আত্ম সাক্ষাৎকার সম্ভবে না। এই আত্মজ্ঞানই পরমাত্মা স্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই প্রতীত হয়যে – "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥
তাঁহার আকারে শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে, তাঁরে, ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞান-মার্গে লইতে পারে, কৃষ্ণের বিশেষ।
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি॥
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় আত্ম-কান্তি।
আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জলন।
মূল এক দীপ, তাঁহা করিবে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্ব কারণ কারণ।
ব্যক্ত কৰি ভাগবতে কহে বার বার!
কলিযুগে ধর্ম্ম, নাম সংকীর্ত্তন সার॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-কার্য্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু, কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য, গোপী ভাব বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ যাহা, নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে, স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য, নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য, হয় প্রেম তো প্রবল ॥
অতএব কাম-প্রেমে, বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।
যেই জপে, তাঁর কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
নাচো গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তা'র সর্ব্বজন ॥
রাধার স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্প-পাতা ॥
গোপী অনুগতি বিনা, ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায়, ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নাম বলে, সুখে মুক্তি হয়।
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, কিবা শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে, চরিত যাহার ॥

* * * *।

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ॥
'নন্দসুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই ॥

দয়াল নিতাই বলেন :—

ভজ গৌরাঙ্গ,কহ গৌরাঙ্গ,লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ ॥

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

যোগ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগ বহুপ্রকার যথা :—কর্ম্মযোগ, ভক্তি-যোগ, জ্ঞানযোগ, সাঙ্খ্যযোগ, হঠযোগ, রাজ-যোগ, রাজাধিরাজযোগ, নাদযোগ, লয়যোগ, ত্রাটকযোগ, প্রাণায়ামযোগ, কুম্ভকযোগ, সমাধিযোগ ইত্যাদি। সুতরাং প্রত্যেক যোগের বিশেষ বিশেষ আলোচনায় নিযুক্ত হইতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলাইবে না। সাবকাশমত "যোগতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ লিখিয়া, তাহার বিস্তারিত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

প্রথমতঃ—যোগ কাহাকে বলে, এইটুকু বুঝিতে যাইয়াই দেখিতে পাইলাম, পাতঞ্জল দর্শন-শাস্ত্রের সমাধিপাদের ২য় সূত্রে ভগবান পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥"

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। আমাদিগের মনোবৃত্তিগুলি চঞ্চল মর্কটের ন্যায় অথবা মত্ত হস্তীর ন্যায় সততই বহির্ম্মুখী হইয়া নানাবিধ বাহ্য বিষয়ে প্রধাবিত হইতেছে। তাই কখনও সুন্দর টুকটুকে মাকালফলের ন্যায় বিষয়াদি প্রপঞ্চের আশু সুখকর মনভুলান রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগকেই আপনার মনোমত সার বস্তু বলিয়া বুঝিয়া লইয়া, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচে মজিয়া যাওয়ার ন্যায় তাহাতেই মজিয়া যাইতেছে। শত শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় মানব যেরূপ অস্থির হইয়া শেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, সেইরূপ সহস্র সহস্র বিষয়-বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ প্রকারে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে ও সেই জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে শেষে কালকবলে নিপতিত হইয়া, পুনর্ব্বার জন্ম-মরণের অধীন হইতেছে। তথাপি আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেছে না। কেবলই মায়ার বশে,

মোহের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া, কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা পরিহার্য্য, তাহার বিচার করিতে অক্ষমতা হেতু যেটা সর্ব্বনাশকারী, সেইটারই আশ্রয় পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতেছে। তাহার পরিণাম যাহা ঘটিতেছে, তাহা ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহার উপায় কি? সে উপায় পূর্ব্বেই পাতঞ্জল দর্শন-শাস্ত্র বলিয়া দিয়া ছেন,—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার নাম যোগ। অতএব সেই যোগাবলম্বন কর। মত্ত হস্তী দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে; তাহাকে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার মস্তকে অঙ্কুশ আঘাত কর। বুদ্ধিরূপ আলানে তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিলেই সে আর কোথাও দৌড়াইয়া বাহির হইতে পারিবে না। তখন সে তোমারই বশে থাকিবে। তখন তুমি অনায়াসে সেই হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে যথা তথা আপনার গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারিবে। যোগীরা এইরূপ হাতী চড়িয়াই সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব হাতী চড়িতে হইলে, অগ্রে সেই মত্ত হস্তীকে স্ববশে আনা চাই। উহাকে বশীভূত করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানাঙ্কুশ আঘাত করা চাই। যখনই তোমার মন কোন বিপরীত কার্য্যে প্রধাবিত হইতেছে দেখিতেছ, তখনই তাহাকে ফিরাইবার জন্য তোমার সতর্ক দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইলেই সে আপন বশে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার অভ্যাস হইলে ধ্যান করিবার ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। আসনাদি প্রথমেই অভ্যাস করিতে হয়! আসন অভ্যাস হইলে অর্থাৎ একাসনে অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে বিনাক্লেশে বসিয়া থাকিতে সক্ষম হইলে প্রাণায়ামাদি দ্বারা কোন এক বিষয়ে, (অবশ্য সৈদ্বিষয়ে) চিত্তের অভিনিবেশ নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইষ্টদেবতার রূপ প্রভৃতি ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত একবার অভিনিবিষ্ট হইলে তাহা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসে। চিত্তাভিনিবেশ যতই গাঢ় হইতে থাকে, ততই ধারণা করিতে শক্তি-সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে। ধারণা বিশিষ্টরূপে অভ্যস্থ হইলেই সমাধি আপনি আসিয়া সাধকের বা যোগীর অন্তরে অপার আনন্দ রাশি বিতরণ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সমাধিতে যে কি সুখ আছে, তাহা কেহ কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারে না। সে অনির্ব্বচনীয় সুখ; সে সুখ কেহ কাহাকেও দিতেও পারে না। এই জন্যই বোধ হয়, ঘেরণ্ড-সংহিতায় সমাধি যোগাধ্যায়ে ঘেরণ্ড ঋষি বলিতেছেন;—

"সমাধিশ্চ পরোযোগো বহু ভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ॥
বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতি রাত্মপ্রতীতির্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী সুশোভনাভ্যাসমুপৈতিসদ্যঃ॥
ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়াৎ মুক্তসংজ্ঞো-দশাদিভিঃ॥
অহং ব্রহ্ম নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্॥
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥
(১-৪)

অর্থাৎ বহু সৌভাগ্যবলে সমাধি নামক

পরম যোগ লাভ হইয়া থাকে। গুরুর কৃপা হইলে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই সমাধি যোগ লাভ হইয়া থাকে। দিন দিন, বিদ্যা, স্বীয় গুরু এবং আত্মার প্রীতি ও যাঁহার মনের প্রবোধ জন্মে, সেই সাধক পুরুষই সমাধি যোগ-সাধনের প্রকৃত অধিকারী। ঘট হইতে অর্থাৎ দেহ হইতে মনকে পৃথক করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন করাকেই মুক্তিদশাদিস্বরূপ সমাধি কহে। তখন সমাধি যোগ-সাধকের এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে যে, আমি স্বয়ং ব্রহ্ম, আমি জড় নহি, আমি ব্রহ্ম স্বরূপ, আমি শোক-ভাক্ নহি,আমি সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি, আমি স্বভাববান্ ও মুক্ত পুরুষ। এই জন্যই আমি ডাকের কথা লিখিবার সময় বলিয়াছিলাম,—

"সমাধিতে কি সুখ আছে।
যার হ'য়েছে সেই বুঝেছে॥"

এক্ষণে যোগসাধনের কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে সাধক যোগ-সাধনে নিরত হইবেন। এ বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রই বলিতেছেন,—

"অর্দ্ধরাত্রি গতে যোগী জন্তনাংশব্দবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পুরককুম্ভকং॥
শৃণুযাদ্দক্ষিণ কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং।
প্রথমঞ্চঝিঞ্জীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরং॥
মেঘঝর্ঝর ভ্রমরী ঘণ্টা কাংস্যস্ততঃ পরং।
তুরী ভেরী মৃদঙ্গাদি নিনাদানকদুন্দুভিঃ॥
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্জোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥
এবং ভ্রামরী সংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
(৭৭—৮১)

অর্থাৎ ভ্রামরী-কুম্ভক যোগাভ্যাস সম্বন্ধে উক্ত শাস্ত্র বলিতেছেন যে, অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে, সমস্ত প্রাণিগণের শব্দ বর্জ্জিতাবস্থায়, যোগী নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া, পূরক ও কুম্ভক যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপ করিলে যোগী দক্ষিণ কর্ণে নাদযোগ সমুত্থিত প্রথমে ঝিঞ্জীনাদ অর্থাৎ ঝিল্লীরব, পরে বংশীধ্বনি, অনন্তর মেঘগর্জ্জন, ততঃপর ঝর্ঝর নামক বাদ্যশব্দ এবং তাহার পর ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ধ্বনি শুনিতে পাইবেন। অনন্তর যথাক্রমে ঘণ্টা, কাংস, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে থাকিবে। নিত্য এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ ধ্বনি কর্ণগোচর হইবে। অনন্তর অনাহত নামক হৃদয়স্থ দ্বাদশদলকমলান্তর্গত শব্দ ও সেই শব্দ হইতে উদ্ভূত প্রতিধ্বনি কর্ণপুটে প্রবিষ্ট হইবে। তৎপরে যোগী মুদিত নেত্রে হৃদয়মধ্যে সেই দ্বাদশদলকমলের প্রতিশব্দের অন্তর্গত জ্যোতিঃ ও জ্যোতির অন্তর্গত মন দর্শন করিবেন। সেই জ্যোতিই পরব্রহ্ম। যোগীর মন সেই ব্রহ্মে সংযোজিত হইলে ব্রহ্মরূপী হরির পরম পাদপদ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে ভ্রামরীকুম্ভকসিদ্ধ হইয়া,যোগী সমাধি সিদ্ধি লাভ করিয়াথাকেন। ইহারই নাম **"স্বরূপ সিদ্ধি"**। এইরূপে সাধক ব্রহ্মের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তখন সমস্ত

পদার্থেই তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে পান। তখন আহার বিহার প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার কোন প্রকার আসক্তি থাকিতে পারে না। নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে আপনার আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনে প্রতীতি জন্মিলে তখন আর তাঁহার জাতি বিচার প্রভৃতি কিছুই বিদ্যমান্ থাকে না। তখন সকল বিষয়ই পরিত্যাগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় যদৃচ্ছাক্রমে বিহার করেন। তাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপিতস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারঃ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ তখন তাঁহার তান্ত্রিকাচার অথবা বৈদিকাচারের আর আবশ্যক কি? ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাচারই বিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেই বেদান্ত শাস্ত্রান্তর্গত বিবেকচূড়ামণি বলিতেছেন,—

"চিন্তাশূন্যমদৈন্য ভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু,
স্বাতন্ত্রেণ নিরঙ্কুশাস্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোধণাদিরহিতং দিগ্বাস্ত শয্যা মহী,
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়াপরে
ব্রহ্মণি ॥"

(৫৪০ শ্লোক)

অর্থাৎ আত্মজ্ঞ যোগিগণের চিন্তাহীন দীনতা প্রকাশশূন্য ভিক্ষান্ন আহার, নদীতেই জল পান, স্বেচ্ছায় অনিবার্য্যরূপে অবস্থিতি, নির্ভয়তাহেতু শ্মশানে বা কাননে নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোধণাদি রহিত দিগ্বসন, ভূমিশয্যা ও বেদান্তরূপ মার্গে গতিবিধি এবং পরম ব্রহ্মেই রমণ হইয়া থাকে।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখন কি ভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না। তাই উক্ত শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ দিতেছেন যথা,—

"ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজ বিভবঃ,
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং।
প্রাজ্ঞঃ সতত পরমানন্দসুখিতঃ ॥" ৫৪৪ ॥

অর্থাৎ নিত্য পরমানন্দে আনন্দিত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও মূর্খের ন্যায়, কখনও পণ্ডিতের ন্যায়, কখন বা মহারাজ-বিভবশালী, কখনও ভ্রান্তবৎ কখনও প্রশান্ত, কখন বা অজগর ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত আহারে পটু, কখনও সম্মানিত, কখনও বা অবমানিত, কখনও অপরিচিতের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তখন তিনি একমাত্র শূন্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। তাই মহাকাশের সহিত স্বীয় ঘটাকাশের তুলনা করিয়া, ভোলানাথের চরণে মিশিয়া, ব্যোম ভোলা হইয়া পড়েন। ঠিক আমার এই যুক্তিই শিবসংহিতায় কিরূপে সমর্থিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এইখানে উক্ত সংহিতায় রাজযোগ ও তৎফলোপদেশ পরিচ্ছেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আদ্যমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভং।
চন্দ্রকোটি প্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনো যস্য ভবেদ্ ধ্রুবং।
স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ॥"
(২০৯—২১১)

অর্থাৎ ঐ শূন্য অনাদি অনন্ত ও মধ্য, উহা কোটিসূর্য্যবৎ দীপ্তিশালী এবং কোটি শশধরবৎ প্রসন্ন,উহার ধ্যানাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি নিত্য অনলস হইয়া, ঐ শূন্যের ধ্যান করেন, এক বৎসর মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি ক্ষণার্দ্ধকালও চিত্তকে শূন্য ধ্যানে স্থির রাখিতে পারেন; তিনি সর্ব্ব-লোক-পূজিত সদ্ভক্ত ও যোগী রূপে পরিগণিত হয়েন। অবশ্য এইরূপ যোগী ব্যক্তি সংসারীর চক্ষে পাগল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। প্রবন্ধলেখক স্বয়ংই এক সময় এ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। কত লোকের কত অত্যাচারই যে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। তাই সম্প্রতি "অবাককাণ্ড" নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত জীবনীস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সাধনোপদেশ মালার একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাগল যখন বাস্তবিক পাগল হয়, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, লোকে তাহাকে পাগল বলিতেছে। কিন্তু যদি সে যথার্থই কাজের পাগল হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই সেই পাগল আবার সাধারণের নিকট আদরনীয় হইয়া থাকে। *

যাহা হউক এইরূপে যোগী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তখন তাঁহাকে আবার মস্তক মুণ্ডন করিয়া, শিখাসূত্র পরিত্যাগী দণ্ডকমণ্ডলু ও কৌপীনমাত্র পরিধায়ী দণ্ডী বা সন্ন্যাসী হইতে হয়। অর্থাৎ উক্ত সন্ন্যাস ভাব, তাঁহার তখন স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তিনি পরমহংসের ন্যায় যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিয়া, সমাজশিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়া, পরিব্রাজক-রূপে পর্য্যটন করিতে থাকেন ও কোন নির্দ্দিষ্ট মঠের অধ্যক্ষ হইয়া থাকেন। সন্ন্যাস গ্রহণের মূলে যে শিখাসূত্র পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে তাহা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যথা,—

"শিখামাশ্রিতা পিতরো দেবদেবর্ষয়স্তথা।
সর্ব্বাণ্যাশ্রম কর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি॥
অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বাঃ দেবর্ষি পিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্র পরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ।
যজ্ঞসূত্র শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসস্যাৎ দ্বিজাথনাম্॥"

অর্থাৎ পিতৃগণ, দেব, দেবর্ষিগণ ও সমস্ত আশ্রম-কর্ম্ম শিখা আশ্রয় করিয়া বাস করেন। অতএব সেই সকল দেবর্ষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিলেই দেহী ব্রহ্মময় হইয়া যান। যজ্ঞসূত্র ও শিখাত্যাগ হইলেই দ্বিজগণের সন্ন্যাস হইয়া থাকে।

অতএব দেখুন মনু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে কেশ মুণ্ডন করাইয়াছিলেন ও গার্হস্থ্যাশ্রমে এবং বানপ্রস্থাশ্রমে আবার যে কেশ ও জটাদি রক্ষা

* সহরে ১৲ টাকা ও মফঃস্বলে ডাকমাশুলাদি সহ ১।০ পাঁচসিকা অগ্রিম জমা দিয়া, যিনি ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ২৲ টাকা মূল্যের "অধ্যাত্ম-তত্ত্ব" গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তিনি "অবাককাণ্ড" পুস্তক উপহার পাইবেন। অথবা ৵১০ পয়সার ডাক টিকিট সহ প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান আর্য্যধর্ম্ম প্রচার সমিতি ২৩৯ নং সার্কুলার রোড শিবপুর হাওড়া এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে কেবল মাত্র "অবাককাণ্ড" পুস্তকখানি ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। "অবাককাণ্ড" পাঠ করিলে বাস্তবিকই অবাক হইতে হইবে।

করিবার বিধি দিয়াছিলেন ; সন্ন্যাসাশ্রমে সেই কেশ জটাদি সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, ত্যাগ হইয়া গেল। এখন সাধক আবার পৈতা পুড়াইয়া ব্রহ্মচারী হইলেন। আর চেনা বামনের পৈতার আবশ্যক রহিল না। বন্ধুগণ! যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক রহিল। সময়ান্তরে "যোগতত্ত্ব" গ্রন্থ লিখিয়া সে বাসনা পূরণ করিবার অভিলাষে এইখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

স্বামী যোগানন্দ ভারতী (সরস্বতী)।

বিক্রয়কারী বণিক মহাশয়।

১

সে হইল অনেক দিনের কথা,আমরা তখন পাঠশালায় পড়ি, তখনকার ভাষায় বলিতে গেলে "লিখি" বলিতে হয়।

কলিকাতার অনতিদূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র সহরে ঐ পাঠশালা বসিত। দোতলা পশ্চিম দ্বারী সাদা ধপ ধ'পে কোঠাবাড়ী, তাহাতে প্রবেশ-পথের দুই দিকে উচ্চ প্রশস্ত রোয়াকই ছিল আমাদিগের পাঠশালা। রোয়াক পার হইয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গন, ঐ প্রাঙ্গনের উত্তর দিকে প্রকাণ্ড দরদালান। ঐ দালানে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত দেবজীউ নামে বিগ্রহ বিরাজমান। রাধাকান্তদেবের প্রচুর বিষয়াদি ছিল, আয়ও তৎপরিমাণ। পূর্ব্বে বার মাসে তেরপার্ব্বণ বাদ যাইত না, কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সরিকগণের মধ্যে মামলা চলিতেছিল। সুতরাং রাধাকান্ত দেবকেও মোকর্দ্দমা-নিরত সেবাইতগণের ন্যায় নীরবে সেই বিপুল কলহের অবসান প্রতীক্ষা করিতে হইতেছিল।

পাঠশালা বাটীর সম্মুখে এক সুরকী বাঁধান নির্জ্জন রাস্তা উত্তর দক্ষিণে রক্তবর্ণ অজগরের ন্যায় পড়িয়া আছে। ঐ রাস্তার উপরে একটী ফটকওয়ালা হরিসভা। বাটীর উত্তর দিকের এক গলি পথের দক্ষিণে একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ একতলা কোঠা—ইহাই হইল বণিক মহাশয়ের বাস্ত।

২

বণিক মহাশয়ের কি নাম ছিল তাহা এক্ষণে সঠিক স্মরণ হয় না ; কিন্তু যিনি একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বণিক মহাশয়ের নাতিদীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব গৌরকান্তিদেহখানি, তাঁহার সর্ব্বদা হাস্যময় শশ্রু গুম্ফ বিমণ্ডিত মুখমণ্ডল ও কেশ বিহীন ক্ষুদ্র মস্তক ও অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গি৹ পাঠশালার বালক বালিকাগণের কৌতুক উৎপাদনে কখন বিরত ছিল না। আমাদিগের যেদিন বণিকমহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভ না হইত, সেদিন পাঠে মনঃসংযোগও হইত না।

বণিকমহাশয় এক সাধু সরল বিগত যৌবন নিঃসন্তান মোদক দম্পতীর গৃহ উজ্জ্বল করেন। কোন্ বৎসর কোন্ মাসে কোন্ বারে কোন্ তিথিও নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হয় আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারি নাই,তবে তাঁহার জন্ম উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হইয়াছিল, এরূপ শ্রুত আছি। অপরিমিত স্নেহ ও আদরে প্রতিপালিত ষোড়শবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমপ্রাপ্ত নবপরিণীত

ক্ষেত্রমোহনের পিতা যখন কালের করাল গ্রাসে পতিত হন,তখন তিনি যে বৎসরেক অতীত হইবার পূর্ব্বেই মাতৃহারা হইবেন, তাহার কল্পনাও করেন নাই ; সুতরাং পিতৃমাতৃহীন ক্ষেত্রমোহন বস্তুতঃই সংসার আঁধার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও টাকা কড়ি ছিল দেখিয়া, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া নিজবাটীতে লইতে আসিলেন বটে এবং ক্ষেত্রমোহন পৈতৃক অর্থাদি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন বটে কিন্তু এ নিমন্ত্রণ তাঁহার বড় আদরের বলিয়া বোধ হইল না। ক্ষেত্রমোহনের পিতা সন্দেশ তৈয়ার করিবার পক্ষে একজন উৎকৃষ্ট কারিকর ছিলেন। পুত্রকে নিজ ব্যবসায়েও দীক্ষিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, ক্ষেত্রমোহন এক্ষণে তাহাতেই নির্ভর করিয়া, নিকটে এক ময়রার দোকানে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষানবীশের নিগ্রহ ছাড়া দিন যায় না। কখন তাহার উপর তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারি ভারি কড়া নামাইবার হুকুম হইত, কখন বা গরম সন্দেশ ছাঁচে তুলিবার আদেশ হইত। বলা বাহুল্য কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটী হইলেই উৎপীড়নের অবধি থাকিত না। এইরূপে শোকে দুঃখে আতঙ্কে ও নিগ্রহে ক্ষেত্রমোহনের পরাধীন চাকুরীর বিশেষ রসাস্বাদ হইল এবং উন্নতির আশা-সত্বেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পৈতৃক অর্থে স্বয়ং কারবার করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সঞ্চিত অর্থ হস্তগত হইবার নানাপ্রকার বিঘ্ন ও বিলম্ব বুঝিয়া অগত্যা পত্নীকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীর সাহায্যে নূতন সংসার পাতিলেন এবং স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টান্ন ফেরি করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বণিকমহাশয়ের বাণিজ্যের মূলধন যেরূপ সামান্য,তাঁহার গুণপণা সেরূপ নহে। দরিদ্র ব্যক্তির শতগুণ থাকিলেও সাধারণের চক্ষে তাহা অকিঞ্চৎকর। সৎ দরিদ্র অহঙ্কারী বলিয়া সাধারণের নিকট স্বতঃই অপরাধী। পক্ষপাতশূন্য দরিদ্র তদপেক্ষা অধিক দোষী। আমাদিগের বণিক মহাশয় ঠিক এই সমস্ত বুঝিতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা এই মাত্র জানি বণিকমহাশয়ের অধিক সঙ্গী ছিল না। মানুষের বন্ধুত্ব তাঁহার নিকট তত উপভোগ্য ছিল না। একটী টীনের বাক্স ও একটী খালি বারুদের কৌটা বণিকমহাশয়ের নিত্য সহচর দেখা যাইত। বারুদের কৌটাটি এক রজ্জু দ্বারা বণিক মহাশয়ের বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা লম্বমান থাকিত এবং তাহাতে গঙ্গা বারি সঞ্চিত থাকিত। দ্রব্যাদি বিক্রয় কালে বণিক মহাশয় উহা উপলক্ষ করিয়া বলিতেন ;—

'গলায় আমার গঙ্গার পানি,
তামাক খেয়ে হাত ধুই আমি।'

অবশ্য মিল হইল না কিন্তু আমরা তজ্জন্য দায়ী নহি, আমরা বণিক মহাশয়ের কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র।

এই মিষ্টান্ন-বণিকের দৈনন্দিন কার্য্যে একটু সুন্দর শৃঙ্খলা ছিল। অতি প্রত্যুষে নিতান্ত সেকেলে লোকের মত তিনি প্রাতঃ স্নানান্তে শুচী হইয়া টীনের বাক্সটী মস্তকে লইয়া আমাদিগের পাঠশালায় দর্শন দিতেন, তাঁহার পূর্ব্বে

কোন ফেরিওয়ালাই উপস্থিত হইতে পারিত না এবং আমরাও তিনি না আসিলে কোন খাদ্য দ্রব্যই ক্রয় করিতাম না। আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনে তাঁহার কোন ক্রটিই ছিল না কিন্তু তৎকালোচিত প্রবৃত্তি-পরায়ণ আমরা, তাঁহার সহিত যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি, একথা এখন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতে পারি না। বণিক মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যবেক্ষণে ও বাদানুবাদে অনেক সময় ব্যয় হইত। কেহবা বণিক মহাশয়ের কপালের ফোঁটা, কেহ তিলক, কেহ বক্ষের উপর চন্দন লিখিত "হরের নামৈব কেবলম্" ইত্যাদির অর্থ-জিজ্ঞাসা করিত, কেহবা ঐ অবকাশে তাঁহার নামাবলি খানি সরাইয়া ফেলিত। এইরূপ শত শত প্রশ্ন এবং ক্ষুদ্র উৎপীড়ন ও অত্যাচারে বণিক মহাশয় বড়ই কোপান্বিত হইতেন বটে কিন্তু গুরুমহাশয় কোন বালককে তজ্জন্য তিরস্কার, প্রহার বা ভৎসনা করিতে উদ্যত হইলে, বণিক মহাশয় যেরূপ তাহার সাপক্ষতা করিতেন, এমন আর কোন ব্যক্তি পারিতেন কি না সন্দেহ!

আমাদিগের অনেকেরই বাটীতে জল-যোগের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বাটীতে জলখাবার খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। পেট বেদনা, অক্ষুধা, পাঠশালায় যাইবার দেরি, এইরূপ কতই না অন্তরায় উপস্থিত হইত। অনেক সময়ে গুরুমহাশয় নিজ হইতে পয়সা দিয়া অনেক বালককে খাবার কিনিয়া দিতেন, পরে তাঁহার আত্মীয় প্রভৃতির নিকট তাহা চাহিয়া লইতেন, আবার অনেকে বাটী হইতে পয়সা আনিয়া বণিক মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিত। প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে প্রথম পাঠশালায় আসিতেন এবং তথা হইতে বাহির হইয়া বণিক মহাশয় অন্যত্র গমন করিতেন এবং আবার বৈকালেও পাঠশালায় খাবার না যোগাইয়া তিনি আর কোথাও যাইতেন না।

৪

বণিক মহাশয়ের পণ্য-দ্রব্যের বিবরণ তাঁহার নিজ কথাতেই বলিব। তাঁহার প্রস্তুত খাদ্য-সামগ্রী অপূর্ব্ব না হইলেও জীবনের সেই সুমধুর প্রাতঃকালে অতীব চমৎকার বলিয়াই বোধ হইত।

(চাই) অবাকমোণ্ডা সিঙ্গেড়া রসকরা চাই,
ছানার মুড়কী, রসমুণ্ডী, তিলেখাজা চাই,
জোড়ামোণ্ডা, রসগোল্লা, ছানাবড়া চাই,
বিক্রয়কারী বণিকমশাই।'

অনেকানেক বিখ্যাত ময়রার সন্দেশের রসাস্বাদন* ঘটিয়াছে কিন্তু বণিকমহাশয়ের উপরোক্ত অবাক মোণ্ডার সহিত বুঝি কোন-টারই তুলনা হয় না, হয়ত আস্বাদন শক্তি তখন পরিপক্কতা লাভ করে নাই কিন্তু তাহা বলিয়া এখনও যদি কেহ বণিকমহাশয়ের মিষ্টান্নের নিন্দা করেন,তাহা হইলে আজিও স্থির থাকিতে পারি না!

বণিক মহাশয় কেবল সুর করিয়া তাঁহার মিষ্টান্নগুলির নাম উচ্চারণ করতঃ ক্রেতা আহ্বান করিতেন তাহা নহে, তাঁহার আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষাও, তাহার সহিত সাধারণে জ্ঞাপন করিতেন এবং দেব দেবীর নামও ক্রেতাগণকে শুনাইতেন। এক কথায় তিনি ইহকাল পর-কাল দুই চিন্তাই একত্র করিতেন এবং তাহাতেই

তাঁহার আনন্দ উৎসাহ দেখা যাইত! তাঁহার কতই না ছড়া রচনা ছিল এবং তিনি কতই ভঙ্গী করিয়া ঐ সমস্ত আবৃত্তি করিতেন! সব ছড়া এখন মনে পড়ে না, যতদূর স্মরণ করিতে পারি—পাঠক পাঠিকাগণকে তাহা উপহার দিতেছি। প্রথমে তিনি আত্মপরিচয় দিতেন;—

"জন্ম আমার মোদক কুলে,
বেড়াই আমি ছেলে ভুলে,
গলায় আমার গঙ্গার জল
মন আমার হরি বল।

পরে প্রায়ই বিক্রেয় দ্রব্যের নাম করিতেন এবং শেষে দেবদেবীর নাম থাকিত। দরিদ্র শিষ্ট বণিক মহাশয় নিজ অবস্থার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিতেন না:—

'দুঃখে কাটে বণিক মহাশয়ের দিন,
হরিহে আমায় দাও হে সুদিন।'

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কলিকাতায় শীল বংশের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। পুনঃজন্মে আস্থাবান বণিক মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার ঐ বংশে জন্ম হয় এবং চির দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করেন, তিনি বলিতেন:—

'এবার ম'রে জন্মাব কলকাতার সহরে,
কাতারে কাতারে লোক যেথা ফিরে,
জন্ম লব আমি মতি শীলের বংশে,
সেপাই শান্ত্রি সব ঘুরবে আশে পাশে;
বালাম চেলের ভাত কলের জলে করবে হজম,
দুবেলা দুধের বাটী খাব আমি রাজার
মতন। ইত্যাদি।

৫

এইরূপে নিত্যই বণিক মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ হইত। যখন পাঠশালা ছাড়িয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, তখন বণিকমহাশয়ের সঙ্গ ও দর্শন লাভ আমাদিগের নিকট বিরল হইয়া উঠিল। কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বণিক-মহাশয়ের খোঁজ লইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে চক্ষে জল রাখিতে পারি নাই।

পাঠশালায় বিরাজিত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেবের বার মাসে তের পার্ব্বণ পুনর্ব্বার প্রচলিত হইয়াছে—কিন্তু সেই সুরকী বাঁধান রাস্তার উপর হরিসভা বাটীর উত্তর গায় গলিপথের দক্ষিণে ক্ষুদ্র জীর্ণ একতালা কোটাখানি ভগ্ন স্তুপে পরিণত হইয়াছে।

ক্রিয়াই যদি ইচ্ছার পরিণাম হয়, তাহা হইলে বণিক মহাশয় এতদিনে শীল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অজ্ঞান ও জ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭ কিন্তু এই সমস্তের মূল অনুসন্ধান কি নিমিত্তে? ইহার উত্তর এই যে, কেবল কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্তে নহে। অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড, যোগ ও ভক্তিসাধন ক্রিয়ার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ থাকা মনে করেন। সুতরাং উপাধির সহিত জ্ঞানকে মিশ্রিত

করেন। অতএব উক্ত অবয়ব সমস্ত যে, মূল শ্রুতি ও সূত্র সমূহের অবধারিত তাৎপর্য্যের অনুসারী, তাহাই প্রদর্শনার্থ এই অনুসন্ধান।

১৮ বিশেষতঃ বেদান্তসার গ্রন্থের পাঠকগণ অনেকে তাহা অবগত নহেন। ঐ সব অবয়বের শ্রৌতসম্বন্ধ জ্ঞাত হইলে তাঁহারা উপাদেয় জ্ঞান লাভ করিবেন। তন্নিমিত্তে এই বিবরণ প্রদান করিতেছি।

১৯ (ক) উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্ত কহে। তন্মধ্যে উপনিষদই মূল বেদান্ত। তাহা স্বতোসিদ্ধ, অপৌরুষেয় এবং প্রত্যাদিষ্ট। তৎসমস্তই এবং মন্ত্রব্রাহ্মণোক্ত কতিপয় শ্রুতি, বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া পরিগণিত।

২০ ব্রহ্মসূত্রসমূহ পরমারাধ্য মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত। ইহাই বেদান্তদর্শন এবং উক্ত জ্ঞান-কাণ্ডীয় শ্রুতিসমূহের মীমাংসা শাস্ত্র। উহাতে ৫৫০টী সূত্র বিদ্যমান। সূত্রে সূত্রে বিশেষ বিশেষ শ্রুতিগুলির বিচার ও মীমাংসা গ্রথিত আছে।

২১ ঐ উভয় শাস্ত্রই বেদান্ত। এই সংজ্ঞা সর্ববাদিসম্মত। সন্ন্যাসীগণের আশ্রমে ও ব্রাহ্মণদিগের টোলে উভয়েরই একত্রে অধ্যাপনা হয় শ্রীমান্ যোগীন্দ্র, বেদান্ত শব্দের ঐ অর্থই লিখিয়াছেন।

২২ একটী কথা মনে রাখার যোগ্য। ব্রহ্মই আদ্যন্তমধ্যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য। যাঁহারা বেদান্ত অধ্যয়ন করিবেন,তাঁহারা অগ্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবেন—ইহাই উদ্দেশ্য।

২৩ (খ) অধিকারী ? "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে "অথ" শব্দের অর্থ চিত্তশুদ্ধির অনন্তর। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। যাঁহার তাহা হইয়াছে, তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী।

২৪ যোগীন্দ্র বিশদরূপে চিত্তশুদ্ধির ও অধিকারীর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। তাহা সমস্তই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। সুকৃতিমান্ পুরুষেরা সকলেই তাহা শাস্ত্রবিধি অনুসারে পালন করেন। যথা :—

২৫ সামান্যতঃ সকল বেদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ উপনিষৎ শ্রবণ; নিত্য সন্ধ্যা-উপাসনাদির অনুষ্ঠান; জাতকর্ম্ম অন্নাসন বিবাহাদি যজ্ঞ সম্পাদন; দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়াকলাপ নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঈশ্বরে সমর্পণ। তদ্ভিন্ন সাধন চতুষ্টয়। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে। এই সমস্তের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত পবিত্র, শান্ত, নির্ম্মল ও নিষ্কাম হয়। তাহারই নাম চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়।

২৬ সদানন্দের চিত্তশুদ্ধির সকল লক্ষণ শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যে নাই। তাহাতে কেবল সাধনচতুষ্টয়ই চিত্তশুদ্ধির হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—"তস্মাদথ শব্দেন যথোক্ত সাধন সংপত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।" অর্থ—এস্থলে অথ শব্দের যথোক্ত সাধন-সম্পত্তির আনন্তর্য্য অর্থসিদ্ধ। সাধন-সম্পত্তির বিভাগ উক্ত হইতেছে।

(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। অর্থাৎ আত্মা নিত্য, দেহাদি অনিত্য এই বিচার।

(২) ইহামুত্র ফল ভোগবিরাগ। অর্থাৎ ইহকাল পরকালের ফলভোগে বৈরাগ্য।

(৩) শমদমাদি সাধন। যথা—'শম' শান্তি। 'দম' ইন্দ্রিয়-সংযম। 'উপরতি' ইন্দ্রিয় ধারণা। 'তিতিক্ষা' দন্দ্ব-সহিষ্ণুতা। 'সমাধান' বিক্ষেপ চলন বর্জ্জিতা ব্রহ্মনিষ্ঠা। 'শ্রদ্ধা' গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস।

(৪) মুমুক্ষুত্ব। অর্থাৎ মোক্ষের ইচ্ছা। সদানন্দের বেদান্তসারে এইগুলিও আছে এবং তদতিরিক্ত বেদার্থজ্ঞানের আবশ্যকতা ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে।

২৭ ঐ সকল আচার শ্রুতিসিদ্ধ। "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনশনেন।" বেদাধ্যায়ন যজ্ঞ দান তপস্যা ও উপবাসাদি ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণেরা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমান্ সদানন্দ তদনুসারে বেদার্থের সামান্য জ্ঞান, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি তপস্যা এবং নৈমিত্তিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়া লিখিয়াছেন। এইগুলির নাম ধর্ম্মানুষ্ঠান।

২৮ তাঁহার কথিত "আপাততঃ সকল বেদার্থে জ্ঞানের আবশ্যকতা।" এই উক্তিটীর এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে বেদান্তশাস্ত্রে ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী হইতে পারিবে না। তবে যে পরিমাণ বেদাধ্যয়ন স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত, কেবল তাহাই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তাহা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু উভয়ের পক্ষে সমান।

২৯ ঐ উক্তিতে "আপাততঃ" শব্দ আছে। তাহার অর্থ "সামান্যতঃ।" বিশেষতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে "বেদ" শব্দে "বেদান্ত;" অর্থাৎ উপনিষৎ। যদি উপনিষৎ অভ্যস্ত থাকে তবে বেদান্তদর্শনে ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মে।

৩০ অতঃপর "ধর্ম্মানুষ্ঠান।" ইহা বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম। ইহা কেবল গৃহীরই অনুষ্ঠেয়। কেন না, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া একেবারে সন্ন্যাসপদ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের তাহা পালন করিতে হয় না। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বিনাই তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে। তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই চিত্তশুদ্ধির হেতু। *

৩১ এই দৃষ্টিতে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীত বেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।" ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অগ্রেও অধীতবেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে। কিন্তু অনেকে, শঙ্করের এই উক্তি ধরিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানকে একেবারে অস্বীকার করেন। তাঁহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে বা বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে, ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মবিচার প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচার প্রয়োজনীয় বোধ করেন না। কিন্তু ঐ উক্তি কেবল ব্রহ্মচারীর পক্ষে। গৃহস্থের জন্য নহে। শ্রীমান্

* "ন তাবদ্বেদাধ্যয়নং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকার হেতুস্তস্য ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ সাধারণত্বাত্তন্মাত্রেণেঽনিয়মেন প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ নাপিধর্ম্মবিচার প্রাগপিধর্ম্মবিচারাদধিত বেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। নাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানমিহ জিজ্ঞাসা হেতুঃ বিনাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানং ব্রহ্মচর্য্যাদেব বিরক্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দর্শনাৎ।" "তস্মান্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাঃ হেতুঃ।" "আপাততো বিচারেণেদং পর্য্যবধারণ মন্তরেণাধিগতাঽখিলো বেদার্থো যেন সতথা।" "বেদশব্দো বেদান্তবিষয়ঃ" (বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা)।

সদানিন্দের চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা প্রধানতঃ গৃহীর পক্ষে।

৩২ তথাপি একটী বিজ্ঞাপন-যোগ্য কথা আছে। ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম্মজ নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলভেদ আছে। জ্ঞানে মোক্ষ, কর্ম্মে জন্মমৃত্যু অবধারিত। কর্ম্মফল ও দেহাত্মজ্ঞান, উভয়ে বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধির হেতু।

৩৩ ঐ সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট শুদ্ধচিত্ত পুরুষ বেদান্তশাস্ত্রের অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। এক্ষেত্রে এই "অধিকারী" শব্দটী গুরুতর। ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার লক্ষ্য, তিনিই অধিকারী। নতুবা অনেক বিদ্যার্থী, অধ্যাপকের নিকট বেদান্ত পাঠ করেন, তাহা লৌকিক-পাণ্ডিত্যের নিমিত্তে। তাঁহারা বিধিবিহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নহেন।

৩৪ বেদান্তসারে তাদৃশ বিধিবিহিত অধিকারী, "প্রমাতা" শব্দে, আর তাঁহার বিজ্ঞেয়-ব্রহ্ম "প্রমেয়" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। 'প্রমাতা' অর্থাৎ জ্ঞাতা, জিজ্ঞাসু, সংস্কৃত পাত্র। আর "প্রমেয়" জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসারূপ ক্রিয়ার কর্ম্মপদ। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্র হইতে উক্ত গ্রন্থে এতগুলি তত্ত্বকথা আকর্ষিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

৺চন্দ্রশেখর বসু।

সংযম ও সম্ভোগ।

সংযম ও সম্ভোগ দুইটীর মধ্যে প্রভেদ অনেক ও উভয় শব্দই বিপরীত অর্থ-বোধক। সংযমী মনুষ্য, তাহার চিত্তবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবানের স্বরূপ-মূর্ত্তি দর্শন করতঃ পাপরাশি বিনাশ করিয়া ফেলে; সংসার প্রলোভনে না ভুলিয়া, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া, সম্পদে আকুল না হইয়া, বিপদে ধীর থাকিয়া, সংযমী পুরুষ যে বিমলানন্দ অনুভব করেন, সম্ভোগ তৎপর মনুষ্য দুর্ব্বিপাক বিষয়-বিষ আস্বাদন করিয়া, বাহ্যিক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, সম্পদে অহঙ্কারী এবং বিপদে অস্থির হইয়া, দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া কি সেই সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়? সংযমী পুরুষ যে হৃদয়ে পুণ্যময় পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া, ভগবৎ আরাধনায় নিরত থাকেন, সম্ভোগী পুরুষ কি সেই হৃদয়ে পাপ বিভীষিকার জলন্ত অনল প্রজ্বলিত করিয়া,শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে? সংযমী পুরুষ রাত্রিতে জাগ্রত থাকে এবং দিনে নিদ্রা যায়, অর্থাৎ সকল প্রাণী যখন মোহ নিদ্রায় আবৃত থাকিয়া, চিন্ময় ভগবানকে বিস্মৃত হয়, তখন সে ঈশ্বরকে কদাচ ভুলে না, শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যথা ;—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

প্রাণিগণ যখন এই প্রপঞ্চময় সংসার-নাট্যকে সত্য বলিয়া মনে করে, সংযমী পুরুষ তখন দিব্য-জ্ঞান-নেত্রে ইহাকে মায়াময় বলিয়াই বিবেচনা করে। সংযমী পুরুষ সম্ভোগী হইতে পারে, কিন্তু সম্ভোগী পুরুষ কদাচ সংযমী হইতে পারে না। এই জন্য ঈশ্বর-সদৃশ প্রাচীন ঋষিগণ অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নতুবা যখন যৌবনের প্রমত্ত-ইন্দ্রিয়-নিচয় মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক মানব গণকে পাপের

দুরত্যয় গহ্বরে লইয়া যায়, যখন রিপুগণ প্রলয়-কালীন ঘনঘটার ন্যায় মানবগণের হৃদয়-গগণ আবৃত করিয়া গভীর-নিনাদে আতঙ্ক সঞ্চার করে, যখন রমণীগণের বিলোল-কটাক্ষপাতে অত্যন্ত শিক্ষিত পুরুষের মনও বিচলিত করিয়া তুলে, যখন লজ্জা, ভয়, শোক আসিয়া মানবকে জর্জ্জরিত করে, যখন স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শৌর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী যৌবনের পঙ্কিল-প্রবাহে ভাসিয়া যায়, তখন সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় গার্হস্থাশ্রমে সংযমী পুরুষ ভিন্ন কে অবিচলিত ভাবে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাই শ্রেয়স্কাম প্রাচীন ঋষিগণ অগ্রে সংযমী এবং তৎপরে যোগী হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে মনঃ-সংযমের আবশ্যক। শারীরিক সংযম ভিন্ন মানসিক সংযম হইতে পারে না। সুতরাং অগ্রে শারীরিক সংযমের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শারীরিক সংযম,—আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সকল সময়েই সাধিত হওয়া আবশ্যক। অনুতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময় নব্য-শিক্ষিতগণের অনেকেই রসনার বাসনা নিবৃত্তি করিতে অক্ষম হইয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর, কদর্য্য দ্রব্য * ভক্ষণ করায় রোগাক্রান্ত হইয়া, এই ধরাধাম হইতে অকালেই অবসর গ্রহণ করিতেছেন এবং সংযম শিক্ষার অভাবেই জাতিধর্ম্ম ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। জাতির পুনর্গঠন করিতে হইলে প্রথমতঃ সংযম শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে; স্বধর্ম্মের প্রতি যাহাতে লোকের মতি স্থির থাকে, তাহা করিতে হইবে। নতুবা পাশ্চাত্য-শিক্ষার কৃত্রিম-আলোকে জাতিধর্ম্ম লোপ পাইবে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর উপায় নাই। সত্য বটে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, কিন্তু সংযমের অভাবে অপকারও যথেষ্ট হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের দোহাই দিয়া, এক জাতিত্ব লাভ করিবার নাম লইয়া, অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বিধর্ম্মীগণের সহিত একত্রে ভোজন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ অসদাচরণকে কদাচ ভাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহাকে স্বধর্ম্মের সংহারক বলিয়া মনে হয়। এক জাতিত্ব কি? একতা কাহাকে বলে? ইহার মর্ম্ম অনেকেই সম্যক অবগত হইতে না পারিয়া, বিপরীত পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। কেবল বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে শ্রেয়োঃ-লাভ কিছুতেই হইবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মূল ঠিক না করিয়া গাছে জল ঢালিলে গাছ সমূলে বিনষ্ট হইবে। রোগ ঠিক না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে যেমন সেই ঔষধ সেবনে কোন ফলই হয় না। সেইরূপ পাপ দুরীভূত না করিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে সমাজের উন্নতি না হইয়া বরং ধ্বংস সাধন করা হইবে। সংযম শিক্ষার অভাবেই সমাজ অধঃপতনের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে। সংযমের অভাবেই

* নিজ নিজ ধর্ম্মানুমোদিত খাদ্য ব্যতিত অন্য খাদ্য রসনা তৃপ্তিকর হইলেও তাহাকে কদর্য্য খাদ্য বলা দোষ হয় না।

বালকগণ এবং নব্য শিক্ষিতগণ খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিতেছে না। সমাজের ঈদৃশ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে যে পরিণামে তাহারা কিম্ভূতকিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। শাস্ত্রেই আছে ;—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ সীতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমাপ্নোতি আচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥

(মনুসংহিতা)

সদাচার হইতেই আয়ুঃ লাভ করিতে পারা যায় ; এই সদাচার হইতেই অক্ষয়-ধন লাভ হয়। অপিচ এই সদাচারই কু-লক্ষণ বিনাশ করিয়া থাকে। সংযমের অভাব বশতঃই পরম কল্যাণ-কর সদাচারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, শিক্ষিত-গণ খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিতেছেন না। ইহাতে তাঁহারা নিজেরাই আত্ম বিনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সংযম শিক্ষা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলেরই আবশ্যক। সকলেই একটু বিশেষভাবে এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিলে, সংযম ও সম্ভোগের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

জাতি বিচার।

তৃতীয় কথা।

সমাজ ও সামাজিক উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণ স্বার্থপরতার সরল মোহে পতিত হইয়া যে জাতিবিচারের প্রতিষ্ঠা করে নাই, এ কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বার আমরা জাতি বিচার বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু জাতি বিচার বুঝিবার পূর্ব্বে সমাজ ও সামাজিক উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। নতুবা সমাজের সহিত জাতি বিচারের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে না।

সমাজ কথাটীর অর্থ কি ? সম্=তুল্য বা সহিত+অজ=গমন করা। সমযাত্রীর দলকে সমাজ বলে। তুমি, আমি আর পাঁচ জন এক সঙ্গে যদি কোন এক পথের পথিক হই, তবে আমাদের ঐ দলকে সমাজ বলিবে। তুমি, আমি আর পাঁচজন; যদি কোন এক সাধারণ উদ্দেশ্য লইয়া থাকি, তবে আমাদের এদলকেও সমাজ বলা যায়। আমরা মনুষ্য, আমরা জানি না কবে কোন্ দেশ হইতে আমরা যাত্রা করিয়াছি, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পথ হাঁটিয়া আসিতেছি। পথ আর ফুরায় না, হাঁটাও আর শেষ হয় না। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাই-তেছে,চলিয়া চলিয়া পায়ে রক্ত ছুটিতেছে, তবুও এ যাত্রার অবসান হইতে চাহে না। সকলেই এক পথের পথিক, কিন্তু সব আগু পিছু। ঠিক সঙ্গের সঙ্গী মিলে না। যাহা হউক, কেবল এক পথের পথিক বলিয়া, সকলেরই উপনীত হইবার স্থল এক বলিয়া আমাদের দলকেও মনুষ্য সমাজ বলা যায়। আবার দেশভেদে, অবস্থা ভেদে এই মনুষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা সমাজে বিভক্ত। কিন্তু আমরা সে মহাযাত্রার কথা ভুলিয়াছি। আমরা এখন কেবল দল বাঁধি আর জোট পাকাই। নানা ধর্ম্মে নানা প্রথার মহা সমাজ, যত সমাজে পরিণত করি, আর বোঝা বোঝা কাঁটা লইয়া যাত্রার পথে

নিক্ষেপ করি, জ্ঞান নাই যে পর্ব্বত ফেলিলেও আমাদের তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। ভগবানেরও সাধ্য নাই আমাদিগকে মাঝ রাস্তায় বিশ্রাম দেন। আমরা নিজের কাঁটা নিজে মাড়াইয়া যাই। পায়ে রক্তপাত হয়! দোষ নিজের!

যাহা হউক, অসভ্য অবস্থায় এরূপ সমাজ বিভাগও ছিল না। তখন বন্য পশুর মত যে যার চিন্তায় ব্যস্ত থাকিত। আপন আপন ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য অহর্নিশ পরস্পরের সংঘর্ষণ হইত। মায়া ছিল না মমতা ছিল না, সুধু রক্তপাত। কেবল মায়ের প্রাণে সূক্ষ্ম একটী স্নেহের ধারা বর্ত্তমান ছিল। সেই মাতৃ স্নেহ টুকুই সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপাদান। ওই নির্ম্মল ধারা হইতেই ক্রমশঃ সহানুভূতি, একতা, জ্ঞান, সভ্যতা, একে একে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মাতার স্নেহ-পাশে ভ্রাতা, ভগ্নী একত্রে বদ্ধ থাকায় পরস্পরের মধ্যে সেই মাতৃ স্নেহের প্রতিচ্ছায়ারূপে সহানুভূতি ও একতা প্রকাশ পায় ও এক একটী পরিবার বদ্ধ হয়। এইরূপে এক পরিবারের সহিত আদান, প্রদান, বিবাহ, সম্পদে, বিপদে সাহায্য ইত্যাদি হইতে, অন্য পরিবারের একতা ও সহানুভূতি জন্মায় ও এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সম্বদ্ধ হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্র দল উক্ত প্রকারে ক্রমশঃ সহানুভূতিতে আবদ্ধ হইয়া সমাচারী ও সমধর্ম্মী হইয়া এক একটি সমাজে পরিণত হয়।

এইরূপ বিভিন্ন দল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ—স্ত্রী ও শস্যভূমি লইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিত। তাহারই ফল-স্বরূপে সামাজিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হইতে ও সহানুভূতি, দয়া, স্নেহাদি বিকাশ পাইতে লাগিল। তাহা হইতে ক্রমে দুর্ব্বলকে রক্ষা, অনাশ্রয়কে আশ্রয় দান, প্রভৃতি ব্যক্তিগত নীতি ও অন্যান্য সমাজের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সমাজের বল বুদ্ধি পরিবর্দ্ধনের জন্য সাধারণ হইতে লোক ও ধন সংগ্রহ করিয়া একটী সাধারণী বল সংস্থাপনরূপে সামাজিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। তার পর ওই সাধারণী বল সঞ্চয় ক্রমশঃ রাজশক্তিতে এবং সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়মে পরিণত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চিন্তা, ভয় ও কর্ত্তৃত্ব, মনুষ্য উপলব্ধি করিতে লাগিল, ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলিয়া চিনিল ও জ্ঞান হিসাবে ব্যক্তিবিশেষকে মনোনীত করিয়া তাহারই নিকট হইতে তদ্বিষয়ক রহস্যাদির মর্ম্মগ্রহণে কতকৃতার্থ হইতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্মশক্তিও সমাজ বদ্ধমূল হইল।

কিন্তু এই স্থল হইতে বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আকার ধারণ করিল। অভাবই আবিষ্কারের মূল। যে সমাজ যে বিষয়ের অভাব অনুভব করিল, সে সমাজের লক্ষ্য সেই অভাবেরই নিরাকরণের দিকে পতিত হইল। দেশগুণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ভিন্ন ভিন্নরূপে অভাবে পীড়িত হইতে লাগিল। সমাজের লক্ষ্য ও ভিন্ন ভিন্ন হইল এবং তাহা হইতে ব্যক্তিগত প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অন্যান্য সমাজ অল্প বিস্তর অনুর্ব্বর দেশে বসবাস হেতু খাদ্যাদির অভাবই বিলক্ষণ উপলব্ধি করিল। সুতরাং অন্ন-

দারিদ্র্য নিরাকরণই—তাহাদের সমাজগত ও ব্যক্তিগত লক্ষ্য হইল। এইরূপে কেবল মাত্র দৈহিক অভাব মোচনে নিযুক্ত থাকিতেথাকিতে ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া বিলাসিতা, রিপু-প্রাবল্য প্রভৃতি দোষে দূষিত হইয়া উঠিল। কেবল মাত্র হিন্দু সমাজ সে অভাবে পতিত হইল না। চিরশস্ত-শ্যামলা, হিম-ধারা—পরিপুষ্টা হিরণ্য-গর্ভা ভারতে আবার দারিদ্র্য কোথায়? আজি-কার মত, ভারতে এত অন্নশস্যের অভাব হইয়া দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিত না। তখন এ ধর্ম্মের মন্দিরে এত কুষ্ঠগ্রস্তের আবির্ভাব হয় নাই। ভারতের ধন রত্ন তখন ভারতেই স্তূপিকৃত থাকিত। ভারতবাসী বিক্রয় করুক, দান করুক, ফেলুক, ছড়াক, ভারতের বাহিরে কিছু যাইত না। চঞ্চলা লক্ষ্মী তখন ভারতে অচলা ছিল। তার উপর ভারতের ষড়ঋতু তাহাতে মণি-কাঞ্চন সংযোগ করিত। দেশের স্বাস্থ্য, দেশের ঋতু মনুষ্যের বল বুদ্ধির উপর যথেষ্ট আধিপত্য করে। ভারতের মতন, এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ ষড়ঋতু পালিত মণিরত্নময় দেশ জগতে আর কোথায়? দেশের লোক দেশের গুণে সবলকায়, দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয় সরল হইয়া উঠিল। এই স্থল হইতেই হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিল। * হিন্দুর ধনধান্যের অভাব ছিল না। হিন্দুকে দেহের দিকে চাহিতে হইল না। সুতরাং প্রকৃতির দিকে চাহিল। হিন্দুর চক্ষু ফুটিল। এই যে সহস্র সূর্য্য শালিনী অবাঙ্মনসগোচরা, অবিশ্রান্তা, চিরক্রীড়মাণা, নিত্য নব সৌন্দর্য্যশালিনী, নব উন্মেষিণী, ভীমকান্তা, অনন্ত প্রকৃতি চির ভ্রাম্যমানা, চিরগতিশীল—ইহার আন্তরিক উদ্দেশ্য কি? ইহার এ বিরাট ক্রিয়ার কি কোন বিরাট উদ্দেশ্য নাই? ইহার এ খাটুনি,— বীরামহীন, বিশ্রামহীন, ক্লান্তিহীন খাটুনি— ইহা কি উদ্দেশ্য হীন? বিরাগ নাই, বিরক্তি নাই, অহর্নিশ ছুটিতেছে, চলিতেছে, ক্রিয়া করিতেছে;—শক্তি হইতে জড়, জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে চৈতন্য, ছোট হইতে বড়, বড় হইতে আরও বড়, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর— এই যে প্রকৃতির ক্রিয়া, ইহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? পঞ্চভূত হইতে জড়জগত, জড়জগত হইতে উদ্ভিদ জগৎ, আর উদ্ভিদ হইতে জীব— এই যে প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ, ইহা কি কোন মুখ্য উদ্দেশ্য হীন? প্রকৃতি অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত যত্নে অনন্ত পাণ্ডিত্য সহকারে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া স্তরের পর স্তর গাঁথিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া শেষ যে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যে মনুষ্যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ, সেই মনুষ্য সৃজনই কি প্রকৃতির বিরাট উদ্দেশ্যের শেষ ফল, মহা যাত্রার শেষ সীমা? প্রকৃতি এতদূর আনিয়া এত কৌশল, এত যত্নে এমন আত্মময়, এমন জ্ঞানময় মনুষ্য সৃজিত করিয়া এই খানেই কি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে? অথবা সেই মনুষ্যের সামান্য আহার বিহার সংক্রান্ত দৈহিক সুখ ভোগের জন্যই কি প্রকৃতি এতকাল খাটিয়া

* 'It was only in a Country like India with all its physical advantages and disadvantages that such a rich development of philosophycal thought, as we can watch in the Six Systems of Philosophy could have taken place.' Vide Max mullers, "Six Systems of Indian Philosophy."

আসিতেছে? ইহা অপেক্ষা কি তাহার মহৎ উদ্দেশ্য নাই? অসম্ভব!

হিন্দু প্রাণ ভরিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া অনশনে অটল দেহে বসিয়া, কতকাল ধরিয়া এই কথা ভাবিল। তখন প্রকৃতি চিনিল। হিন্দু প্রকৃতি চিনিল। প্রকৃতির উদ্দেশ্য চিনিল? প্রকৃতির বাসনার ধন সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষ চিনিল। হিন্দু প্রকৃতির অভাব বুঝিল। বুঝিল—সগুণা প্রকৃতি নির্গুণা হইতে চাহে। মহা ঈশ্বরের সগুণ অংশ নির্গুণ অংশে মিলাইতে চাহে। তাই সে সগুণ অংশে এত ক্রিয়া—মনুষ্য সেই মহাক্রিয়ার মহাফল। সেই মহা পথের শেষ সোপান। এইখান হইতেই প্রকৃতি—পুরুষে মিলাইতে চাহে। তাই মনুষ্য—জ্ঞান, তাই—আত্মা। হিন্দুর আত্মজ্ঞান হইল। ত্রিদিবের বিমল আলোক সম্পাতে জগৎ উদ্ভাসিত হইল। প্রকৃতি-জননীর আনন্দাশ্রু সম্পাতে হিন্দু-সমাজ-তরু মুঞ্জরিত হইল। আর অন্যান্য অভাব-পেষিত সমাজ পার্থিব সুখান্বেষী হইয়া ঘোরতর অভাবে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তাহাদের কোন অভাবই ঘুচিল না।

হিন্দু ও অপরাপর সমাজের এই স্বর্গ নরক পার্থক্য এইরূপে সম্পাদিত হইল।

হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্য যে ধর্ম্ম, সে কথা পূর্ব্বেই সপ্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দু আহারে, বিহারে, শয়নে, পুণ্য করিতে, পাপ করিতে সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম লয়। ঈশ্বরের মুখ চাহে। হিন্দুর দস্যু অবধি দেবী আরাধনা করিয়া দস্যুতা করে। হিন্দু যে মজ্জায় মজ্জায় ঈশ্বরানুগ্রহার্থী, ঈশ্বর-কৃপাভিলাষী, ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায়। হিন্দু সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে। হিন্দুর জীবন ধারণ, শরীর পালন, সকলই এক ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্র। হিন্দুর ব্যক্তিগত, সমাজগত সহায় সম্বল, আশা ভরসা লক্ষ্য কেবল—ঈশ্বর। উদ্দেশ্য কেবল—ধর্ম্ম। নির্গুণে লীন হওয়া—মক্ষ। হিন্দু সমাজ—ধর্ম্ম উদ্দেশী।

এখন আমাদিগকে কয়েকটী বিষয় দেখিতে হইবে। প্রথম,—জাতিভেদ প্রথা—হিন্দুর এ উদ্দেশ্য সাধনে কিরূপ সাহায্য করে। যদি দেখা যায়, জাতিভেদ হিন্দুর এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী, তবে ইহা যে অপরিত্যজ্য সে বিষয়ে আর কোন কথা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ,—জাতিভেদ ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া কোন নূতন দোষ সৃজিত করে কি না? অর্থাৎ পার্থিব সুখ শান্তি সাধন পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটায় কি না? তৃতীয়তঃ,—যদি কোন দোষ সৃজন করে, তবে তাহা উপকারের তুলনায় বহনীয় কি না? যদি দেখা যায় যে, ধর্ম্ম-সাধনে ইহা যথেষ্ট উপকারী, কিন্তু পার্থিব সামাজিক সুখের পথে অন্তরায়, তাহা হইলেও ইহা অপরিহার্য্য। কেন না আমাদের মূল উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তৎসাধন পক্ষে যাহা বিশেষ সাহায্যকারী তাহা যদি অপর কোন বিষয়ে একটু অন্তরায় হয়, তাহা হইলেও তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু বিঘ্ন দূরের কথা। আমরা দেখাইব যে, জাতিভেদ পার্থিব সুখ-শান্তিসাধন পক্ষেও অধিক বলশালী। এমন কি জাতিভেদ না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে যথেচ্ছাচারীতা আসিয়া পড়ে।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবসান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার প্রান্তদেশ ;—কানন।

(কালপুরুষের প্রবেশ)

কালপুরুষ। অদৃষ্টের দোষে লভিনু অন্তক নাম ;
হায় যথা সু-চির বিরহ, আশা ভঙ্গ হৃদয়
বেদন,
অশ্রুজলে প্লাবন যথায়, উঠে ঘন করুণ
রোদন ;
তথা মম চির অধিকার ;—
কর্ম্ম গুণে নামের মহিমা,
পরিচিত হয়েছি এমনি,
শ্রবণ মাত্রেতে শিহরিয়া উঠে জীবকুল।
জীবের অদৃষ্ট চিত্র-পটে
লিখে ধাতা অব্যর্থ লিখন, কর্ম্ম গুণে,
পরমায়ু বিধি নিরমিত ;
ভাগ্যবশে নিমিত্তের ভাগী আমি তার ;
সুখের সে শয়ন মন্দিরে ;
ঘুমায় দম্পতি প্রেমালসে,
শ্রান্ত হিয়া পরশে পরশে,
দেখে কত সুখের স্বপন।
হয়ত অমনি, ধরি কাল সর্পবেশ—
পশি গৃহ মাঝে
ভেঙ্গে দিই সুখের স্বপন
চির তরে তার।
দুঃখিনী জননী আহা একটি রতন ;
সে মরিলে ফুরায় সকল আশা,
সেই পুত্র বিনা ধরা মাঝে
নাহি তার ঠাই ;
তারে লয়ে করি টানাটানি।
অসহ জীবন ভার যার,
সদা যাচে আশ্রয় আমার
পাশে তার, স্বেচ্ছায় না পারি যাইবারে ;
—এবে পুনঃ কি ভীষণ কর্ত্তব্য সাধনা,
দেবাদেশে করিনু স্বীকার,
অযোধ্যার চির সুখ-হাসি,
অতলে ডুবাতে হবে ;
ভাবি সেই কেমনে পারিব।

(দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া)

উজলিয়া অম্বর প্রদেশ, আসে বুঝি
মায়াদেবী,
করি অনুরোধ : মমতায় করিয়া হরণ
ত্যজ এ আনন্দ আগার ;—
নহে সাধ্য না হবে আমার,
দেখি কিবা বলে দেবী !

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। যাও দেব ! ছাড়ি এ অযোধ্যাধাম ;
দেবকার্য্য হবে না সাধিতে,
এ অযোধ্যাপুরী
মর্ত্তে যেন দেব উপবন ;
ভেঙ্গ নাক' এ নিকুঞ্জ শোভা।
চারু হাস্য ডুবাইও না অতল সাগরে।
রাম রাজ্যে নাহি নিরানন্দ লেশ,
শোক, দুঃখ নাহি পায় স্থান,
শান্তির প্রবাহ বহে প্রতি ঘরে ঘরে ;
কাতর অন্তরে মাগি ভিক্ষা তব পায়।
ছদ্মবেশে ছ'ল না রামেরে।
শোকের সাগরে ভাসাইও না
এ কোশলপুরী।

আরও কিছুদিন সুখে থাক এ অযোধ্যাবাসী।
কালপুরুষ। কি না তুমি জান দেবী—
অন্তরযামিনী ;
রোধিবারে অদৃষ্টের গতি
সাধ্য কভু নাহিক আমার ;
দেব আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি
ভাঙ্গা গড়া প্রকৃতির লীলা,
উপলক্ষ মাত্র আমি।
বিধিবশে শ্মশান প্রান্তরে,
ফুটাই মন্দার ফুল।
রম্য উপবনে জ্বেলে দিই শ্মশান-অনল।
বিধি গুণে নবীন যৌবনে
নব বালা হয় পতিহীনা ;
কিসলয়ে শুখায় কুসুম-কলি ;
পুত্রহীনা স্থবিরা জননী।
মাতৃহীন অনাথ বালক
শুভাশুভ নিয়তির লীলা ;
রাম সঙ্গে লক্ষণ বিরহ
বটে দেবী অসহ যাতনা ;
জানি মায়ে! অযোধ্যার মাঝে
বহিবে শোকের ঝড়—
মহাশোকে ডুবিবে অযোধ্যাবাসী।
কিন্তু দেবি! কি সাধ্য আমার ?
নিবারিতে পারি কিগো নিয়তির গতি ?
মম অনুরোধ,
শুন দেবী জগন্মোহিনী ;
কিছু দিন তরে, সঙ্গে লয়ে স্নেহ মমতারে,
ত্যজ তুমি এ অযোধ্যাপুরী।
মায়া। কেমনে ছাড়িব বল এ কোশলপুর!
হে কৃতান্ত! স্মরিলে বিদরে প্রাণ ;
পারে কি ছাড়িতে পিক বসন্ত-আগার ?
মায়া আমি, স্বপ্ন মোর সু-চিরসঙ্গিনী ;
বিশ্ব বিমোহিণী শক্তি মোর ;
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি ত্রিভুবন।
কিন্তু দেব! অযোধ্যার মায়া
অভিভূত করেছে আমারে।
কাঃ-পুঃ। সকলি তা জানি দেবি!
কিন্তু দেবাদেশ, মায়ালেশ
না রবে হেথায়।
বৃথা শ্রম হবে সবাকার ;
হবে না'ক লক্ষণ বর্জ্জন।
মায়াময় আপনি ভুলিয়ে
মুগ্ধ এবে মর্ত্তের মায়ায় ;
গঠ এবে কঠিন পাষাণে হিয়া তাঁর,
স্নেহ শূন্য কর সে কোমল প্রাণ।
তা না হ'লে দেবী, লক্ষণে হরিতে
সাধ্য নাহি হইবে আমার,
অপার্থিব স্নেহ ভক্তি পাশে
বাঁধা দুটি বীরের হৃদয়,
নিরদয় তুমি না হইলে,
কার সাধ্য ছিঁড়ে সে বন্ধন।
মায়া। না না দেবদূত!
এ আদেশ করো না আমারে,
পারিব না ছাড়িতে এ সুখধাম।
অবিরাম দহিবে হৃদয় স্তর।
পারিব না লুকাতে নয়ন জল ;
হায় দেব! ভেবে দেখ মনে
কি ভীষণ হাহাকার ;—
উঠিবে অচিরে পুর মাঝে।
কত হৃদি বিদীর্ণ হইবে বজ্রাঘাতে ;
কত স্বর্ণলতা ধূলায় ধূসর হবে,
শুখাবে কত যে ফুল
লক্ষণে বর্জ্জণ যদি করেন রাঘব।
তা'হলে সৌমিত্রী নাহি রাখিবে জীবন ;
সুখ-স্বপ্ন মুগ্ধা সুকোমলা
উর্ম্মিলার ভাঙ্গিবে হৃদয়খানি।
ভ্রাতৃশোকে রামচন্দ্র ত্যজিবেন দেহ।
প্রতি গৃহে উঠিবে রোদনধ্বনি—
বৈজয়ন্ত সম এই স্বর্ণ-নিকেতন—
অচিরেই হইবে শ্মশান।
কাঃ-পুঃ। কি করিব বল দেবী ?
সৃষ্টি মোর কর্ত্তব্য সাধিতে,
মোর পরশনে হল কত যুগান্তর ;
কত সৃষ্টি কাল্যানলে হল ভস্মীভূত।
অন্তরে করুণা নাহি মোর
নিষ্ঠুরতা তাও নাহি হৃদে,

এ জগত অদৃষ্টের স্বক্ষ সূত্রে অতি—
রয়েছে গ্রথিত সদা ;
কর্ম্মফল ভুঞ্জে সদা জীবকুল।
সৃষ্টি আর ধ্বংসের মাঝারে
আছি আমি অনাদি অনন্তকাল ;
সত্বঃ, রজঃ, তমঃ তিন গুণ সমবায়ে
প্রকৃতি রচেছে বিশ্ব—
মহাকাল টানিছে আপন দিকে
ভোক্তা নাই, কর্ত্তা আমি তার।
লীলা কাল পূর্ণ এবে হল,।
রাম-লীলা হবে অবসান
ইচ্ছাতে কি পারি নিবারিতে ?
মায়া। তবে কেন ছাড়িতে অযোধ্যাপুরী
অনুরোধ করিছ আমারে !
ধ্বংস যদি প্রকৃতির লীলা,
হ'ক ধ্বংস, রব আমি
এ শ্মশান ভূমে !
প্রেমের বন্ধনে, সবাকার প্রাণে,
দিই গ্রন্থী যতন করিয়া।
কাঃ-পুঃ। না দেবী, যাতনা পাবে বড়
উচ্চরোলে কাঁদিবে আবাল বৃদ্ধ।
সে রোদনে ফাটিবে পাষাণস্তর ;
দ্রব হবে কঠিন হৃদয়।
যাও দেবী আপন নিলয়ে
দেবাদেশে অনুরোধি তোমা
অনায়াসে হবে মোর উদ্দেশ্য সাধন।
মায়া। দেব ! নারিব লঙ্ঘিতে,
অনুরোধ রাখিব তোমার।
যাই তবে ছাড়ি, এ আনন্দপুরী।
কিন্তু হায়! বুঝিতে নারিনু,
সৃষ্টির রহস্য তত্ত্ব।
সুখাবে যদ্যপি, কেন তবে হাসে ফুল ;
নিশ্চয় ভাঙ্গিবে যদি সাধ,
কেন তবে রচিলা কমল-কুঞ্জ ?
ধ্বংস মাত্র পরিণাম যার
সে জগতে কেন গড় সৌন্দর্য্যের রেখা ?
কেন তথা স্নেহ ভালবাসা ;
গত আশা যাহে পাসরিয়া ?
সুখ স্মৃতি কি লাগি বিরাজে তথা।
কেন বিশ্ব হল না'ক মরুভূমি ময় !
কেন হ'ল জীবের সঞ্চার ?
—এ জগতে শুধু কি গো রোদনই সার।
কাঃ-পুঃ। না জানি কেমনে দেবী
বুঝিব এ লীলা !
বিচিত্র প্রকৃতি ক্রীড়া
খেলা ঘর পাতি—
খেলে যথা সরলা বালিকা ;
ভাঙ্গে গড়ে আপনার মনে।
তেমনি গো এ ভব-মন্দির
প্রকৃতির লীলা-নিকেতন।
যাও তবে বিশ্ব-বিমোহিনী
পবনে করিয়া ভর,
আমিও সন্ন্যাসী বেশ ধরি,
যাই শীঘ্র রামের সকাশে,
ঐ দেখ অনতি দূরেতে
আসে নর দুই জন,
অন্তর্দ্ধান হই দোঁহে মোরা।
মায়া। যাই, যেতে চাই ; চরণ না চলে—
অশ্রুজল নিবারিতে নারি,
দূর দৃষ্টি করি প্রসারিত
নেহরিয়ে অযোধ্যার ভবিষ্য গগন ;
হে কোশলপুরী, দিন দুই চারি
হাসরে সুখের হাসি ;
নিবে যাবে প্রবল পবনে,
আনন্দ দেউটী তব ;
সুখ স্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিবে।
এ মাধুরী, মধুর উৎস,
না বহিবে হৃদয়ে তোমার আর ;
সরযুর প্রসন্ন প্রবাহে
মৃতদেহ বহিবে কেবল।
যাও তবে ভগ্ন দূত ;
হইনু বিদায়।

(পটক্ষেপন)

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীমহেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

চন্দ্রশেখর বসু

আলোচনা, চৈত্র, ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩২০।

গোজাতির অবনতি ও ভারতের কৃষি।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। এক কালে যে ভারত কৃষি-ব্যাপারে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল, আজ বিজ্ঞানের প্রতিভাবলে পাশ্চাত্য দেশের সমক্ষে সভ্যতা ও ব্যবসায়ের নিম্নস্তরে স্থান পাইয়াছে। এই অবনতির কারণ আমাদের দৈন্য, গো-কুলের নানা কারণে ধ্বংস, প্রতিযোগিতা, বিলাস-প্রিয়তা, স্বকার্য্যে ঔদাস্য, জাতীয় চরিত্র গঠনে পরাঙ্মুখতা ইত্যাদি। গো-বলে আমাদের সুবিস্তীর্ণ দেশের কৃষি পরিচালিত হয়। সেই গো-কুলের ক্রমিক অবনতিতে আমাদের দেশের কৃষির যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গো-কুলের উচ্ছেদে আমরা ঘি, দুধ, ছানা, মাখন, ননী, সর, খোয়া, দধি ইত্যাদি গো-জাত খাদ্য সামগ্রী দেখিতে পাই না। কত শত শিশু ভেজাল-মিশ্রিত, কীটাণুপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধ পানে যে রোগ বীজে জর্জ্জরীভূত হইতেছে, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে মল্লিখিত একটী প্রবন্ধ সেদিন ২৪ পরগণা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতকাংশ অত্রস্থানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা দেখিলে কি আমাদের দেশের বালমৃত্যুর সংখ্যাধিক্যে হৃৎকম্প হয় না?

অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুর নিকটে গো-জাতি অতি পূজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। কেননা গো-জাতির সঙ্গে আমাদিগের জীবন মরণের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। গো-জাতি কৃষি ও কৃষকের একমাত্র সম্বল, গৃহস্থের পরম মঙ্গলকারী এবং শিশুকুলের জীবন। গো-দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি হিন্দুর পূজা পার্ব্বণের নিত্য নৈমিত্তিক উপাদান। সুতরাং গো ভিন্ন আমাদিগের দৈনন্দিন জীবন চলে না। হিন্দু-জাতি মাংসাশী নহে। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, মাখন, সর, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্যই হিন্দুর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু এই পরম মঙ্গলাকর গো-জাতি যে দিন দিনই খরতরবেগে অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা কত জনে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইতেছেন? গো-জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আজ দধি, ঘৃত, ছানা, মাখন, ক্ষীর প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। একমাত্র ধনী লোক ব্যতীত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি খাওয়া একান্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে। যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে

আজ সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ সম্প্রদায় দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। দুগ্ধজাত পুষ্টিকর খাদ্য ত দূরের কথা, গো-জাতি যে ভাবে অবনতির দিকে চলিয়াছে, ইহার প্রতিকার না হইলে, কালে হয়ত চাউল, ডাউল ও তরকারীর অভাবও বিশেষরূপে অনুভূত হইবে। কেননা, গো-জাতিই এদেশে কৃষি-কার্য্যের এক মাত্র সম্বল। কিন্তু যেরূপ দ্রুতগতিতে এই গো-জাতির অপকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহাতে চাউল ডাউলের জন্যও বা আমাদিগকে শেষে ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া কালাতিপাত করিতে হয়। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ নানা বিষয়ে গলাবাজি করিয়া দেশ মাতাইয়া তুলিতেছেন. কিন্তু কিসে এই মহা সমস্যার প্রতিকার হয়, সে বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা নিজেকে যতই কেন উন্নত বলিয়া মনে করি না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কিছুমাত্র সাধিত হয় নাই। প্রাচীন মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদের অনেকেরই অধোগতি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অতি প্রাচীন যুগ হইতেই গো-জাতির স্থান হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্র মতে পরমোপকারী গাভীর যথারীতি সেবা পরিচর্য্যা না করিয়া গৃহস্থ মাত্রেরই জলগ্রহণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু পশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হিন্দু মুসলমান মাত্রেই আজ মাতৃতুল্যা পূজনীয়া গো-জননীর রক্ষা ও সেবায় একান্ত অমনোযোগী। অবহেলায়, অযত্নে, খাদ্যাভাবে আজ সহস্র সহস্র গাভী অকালে মৃত্যুর করাল গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা হিন্দু সন্তান বলিয়া গৌরব করি, কিন্তু হিন্দুর সেই শাস্ত্রাজ্ঞা পালন করিতে একান্ত উদাসীন। এই উদাসীনতায় আমাদিগকে যে মহা পাপে নিমগ্ন হইতে হইয়াছে এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে আরম্ভ-না হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। সহরে টাকায় চারিসের মাত্র দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহাও আবার জল-মিশ্রিত। পল্লীগ্রামের অনেক স্থলে দুগ্ধ আদৌ পাওয়া যায় না। অনেক গৃহস্থকে দুগ্ধের সাধ বাধ্য হইয়াই ভুলিতে হইয়াছে। দুগ্ধের অভাবে কত পিতা তাহার প্রাণ-প্রিয় শিশুর অকালমৃত্যু দেখিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, গোজাতির উন্নতির প্রতি উপেক্ষায় আমাদিগের যে পাপ স্পর্শিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও আরম্ভ হইয়াছে। এখন হইতেও যদি আমরা গোজাতির উন্নতির প্রতি তৎপর না হই, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যতে আরও যে কত কষ্ট আছে,কে জানে? গোজাতির ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে আজ হিন্দু জাতিরও অবনতি হইতেছে। দুগ্ধ এরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, দরিদ্রেরা যে দুগ্ধ খাইবে তাহাও দূরের কথা, তাহাদের দুগ্ধ দর্শন করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্তেরা অতি কষ্টে শিশুর জন্য যৎসামান্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাতে শিশুর অর্দ্ধাশনে দিন কাটে। আজ ঘরে ঘরে শিশুর পীড়া—ঘরে ঘরে শিশুর অকাল-মৃত্যু। কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, কি করিলে গোজাতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সমাজের নেতৃবৃন্দকেও

চিন্তা করিবার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। বিগত ২।১২।'১৩ তারিখের বার্ত্তা-বহে "গোজাতির অবনতি" শীর্ষক যে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গোজাতির অবনতিতে যে আমাদের সামাজিক, দৈহিক এবং আধ্যা-ত্মিক অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। গোজাতির সহিত হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ও সাংসারিক সম্বন্ধ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গোবলের সাহায্যে আমাদের কৃষি কার্য্য হয়। সেই গোবলের অবনতিতে আমাদের যে দিন দিন কি হানি সংঘটিত হইতেছে, তাহা হিন্দু ও গৃহস্থ মাত্রেই বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। গো জাতির সম্বন্ধে একখানি সম্পূর্ণ জ্ঞাতব্য পুস্তক আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এ বিষয়ে আমি সময়ে সময়ে ২।৪ খানি পত্র ও প্রবন্ধ ডেলি নিউস্, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায় দেশের লোকের মনযোগ আকর্ষণ জন্য প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেশের লোক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন কই? খাঁটি দুগ্ধ ত দেশে পাওয়া দিন ২ কঠিন হইতেছে। সেই জন্য লোকের মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, লোকের আয়ুর হ্রাস হই তেছে। কৃষকগণ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কৃষিবলদের ছয় গুণ দাম দিয়াও কিনিতে পায় না। ইহার কারণ কি? অবাধে ছুরিকার চালনা, দুষ্ট লোকের দ্বারা বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কয়েকটিই ইহার প্রধান কারণ। আমি এই সকল বিষয়ে গোপাল-বান্ধব নামক একখানা পুস্তক লিখি-য়াছি। ইহাতে গো সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গো পালন, গো পরি-চর্য্যা, গো জনন, দুগ্ধ ব্যবসাদি সম্বন্ধে বিলাতী ও ফরাসী শত সহস্র পুস্তক আছে। কিন্তু এক টাকা মূল্যে ঐ পুস্তক আমাদের দেশে এই প্রথম। প্রত্যেক হিন্দু ও কৃষকের তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বহুল পুস্তক এবং সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে দেশের লোকের জ্ঞান বিস্তার জন্য প্রকা-শিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিলাত প্রভৃতি দেশের লোক গো খাদক হইলে ও তাহারা গো পালন করিতে জানে। আমরা নামে গো পূজা করি, কাজে ঠিক তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি। যতদিন দুধ পাই, তত দিন কোন মতে গাভীকে কিছু কিছু খাইতে দিই, তাহার পর মাঠে বাঁধিয়া আসি এবং সন্ধ্যার সময় ঘরে আনিয়া ২।৪ আঁটি খড় দিয়া থাকি। আমাদের দেশের বার আনা নিঃস্ব কৃষক ইহাই করে। যাঁহারা বড় আমীর, রাজা মহারাজা, তাঁহাদের কাগজে কলমে সবই বরাদ্দ আছে, কাজে কিন্তু সব ফাঁক। তাঁহারা নিজেদের গৃহস্থালী দেখেন না বলিয়া অনেক রাজা বাবুদের গাভীর অবস্থা শোচনীয় এবং কঙ্কাল সার। বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে গোয়ালাদের ও খোঁড়ে গাভীর রক্ষণ জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি, সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্ম্মাতেও এইরূপ ক্রেডিট্ সোসাইটি সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ উপকার ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। আমাদের বঙ্গে এরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন আশু প্রার্থনীয়। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশে গো-কুলের জন্য

ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানী অনেক আছে। ইহারা গো, মেষ, ঘোড়া, ছাগল, বাছুর, বলদ, ষাঁড়ের জীবন-বীমা করিয়া লয় এবং তাহাদের মৃত্যু ঘটিলে কতক পরিমাণ মূল্য দিয়া নিঃস্ব কৃষক-কুলের সাহায্য করে। আমাদের দেশে এরূপ পশুর জন্য জীবন-বীমা সমিতি: নাই। হ্যানমার (Hanmer Cow Insurance society in Flintshire,) নগরের পশুর জীবন-বীমা সমিতি ইহার একটি প্রধান এবং জীবন্ত উদাহরণ।

এখন দেখা যাক, খাঁটী ও সস্তা দুগ্ধ পাইতে হইলে কি করা আমাদের কর্ত্তব্য। নির্ম্মল খাঁটী দুগ্ধ সস্তা দরে পাইতে হইলে, আমাদের সর্ব্বপ্রথমে গো-কুলের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে বিধিবদ্ধ নির্ব্বাচন এবং পৃথক করণবিধি আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। যে নব গোবৃন্দ অকালে কশাইর ছুরিকা রঞ্জিত করে, তাহাও নিয়মবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। এদেশে কৃষি বলদের বিশেষ অভাব হওয়ায় চাষের বলদ অল্প মূল্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য কৃষিরও দেশে দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। তাহার পূরণ জন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর মন সন্নিবেশ করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে বলিষ্ট বলদের আমদানী ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক। ইহার জন্য পল্লীগ্রামের ধর্ম্মের ষাঁড়গুলির সংরক্ষণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভাল ভাল ষাঁড় ও বকনা জনন-ক্রিয়ার জন্য আমদানী করা কর্ত্তব্য। এই সকল ষাঁড় বা বকনা একস্থান হইতে অপর স্থানে বিনা ব্যয়ে অন্ততঃ স্বল্প ব্যয়ে নীত হয় ও বহন খরচা না লাগে, তাহার জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করান কর্ত্তব্য, পাশ্চাত্য প্রদেশে এইরূপ গোকুলের সংরক্ষণকারী আইন আছে। কিন্তু ভারতের মত হতভাগা দেশে তাহা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে বিলাত হইতে Union Cattle Steam ship Co. Ld. জনন ক্রিয়ার জন্য উপযোগী ষাঁড় বলদ, মেষ ঘোড়া, গাভী বিনা খরচায় লইয়া গিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থা রেল ও জাহাজ কোম্পানীদের দ্বারায় বিশেষ চেষ্টা করিয়া করাইয়া লওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে রাজার কৃপাও বিশেষ প্রয়োজন।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গো জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় অবনতিও সংসাধিত হইতেছে। বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব নিবন্ধন ভেজাল দুগ্ধ পান করিয়া আজ ভারতের ঘরে ঘরে শত সহস্র সুকুমার শিশু কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া, সুরম্য উদ্যানের কীট-দংষ্ট কুসুমকোরকের ন্যায় অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া, কালকবলে পতিত হইতেছে। শিশুকুলের এই শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে কত সংসার আজ পুষ্প-বিহীন উদ্যানের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে! গো-দুগ্ধই শিশুর জীবন। সেই গো-দুগ্ধের অনাটন বশতঃ আজ ভারতীয় শিশুকুলের জীবন রক্ষা এক মহা সমস্যা-কর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। দেশে খাঁটী দুধের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাতে বয়স্ক লোক না হয়,

শাক ভাত খাইয়াই দিন কাটাইল, কিন্তু কেবল মাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশুকুলের প্রাণ রক্ষার উপায় কি? দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের অনেককেই আজ এই দুগ্ধের অভাব "ঘোলে" মিঠাইতে হইতেছে, কিন্তু "ঘোলে" যদি প্রকৃতই সে অভাব দূরীভূত হইত, তবে ভাবনার বিষয় ছিল না। আজ এ দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শিশুর জীবন রক্ষার জন্য নানারূপ অসার, কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, কেহ ময়দা, কেহ সুজি, কেহ এরারুট, কেহ বার্লি, কেহ সাবু জাল দিয়া শিশুকুলের জীবন রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। আবার বহু লোক সুজি সাবুর পর্য্যন্ত যোগাড় করিতে না পারিয়া ভাতের মাড় খাওয়াইয়া শিশুর জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ফলে আজ এ দেশে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা দিন দিনই খরতর বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মহা সমস্যার প্রতীকারের উপায় কি? এই বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘৃত প্রভৃতি যাহাতে সুলভ ও সহজ প্রাপ্য হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে এত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইল কেন, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আমাদের মনে হয় যে ইহার কারণ, অবাধ গোহত্যা এবং উপযুক্ত গোচারণ ভূমির অভাব। এই দুইটী মুখ্য কারণেই এদেশের গো-জাতির অবনতি সংঘটিত হইতেছে। এই দুইটী কারণ যাহাতে দূরীভূত হয়, সকলেরই তজ্জন্য সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

আমাদের মফঃস্বল সহযোগী "ত্রিপুরা-গাইড" সম্প্রতি একটী হিসাব তুলিয়া অন্য দেশ অপেক্ষা এদেশে কচি শিশুর মৃত্যু সংখ্যা কত বেশী তাহা দেখাইয়াছেন। সহযোগী বলিতেছেন,—বর্ত্তমান সময়ে দেশে দুগ্ধ ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য এত মহার্ঘ্য যে লোকেরা উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে না। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়াতে স্তন্য দুগ্ধেরও অভাব। এজন্যই শিশুগণ অল্পাহারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে শিশুদিগের অকাল মৃত্যু সংখ্যার কিরূপ পার্থক্য তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বয়স	ভারতবর্ষে মৃত্যুসংখ্যা	ইংলণ্ডে মৃত্যুসংখ্যা
১ হইতে ২ বৎসর বয়সে	৪৮	৮
২ — ৩ ,, ,,	১১	৯
৩ — ৪ ,, ,,	৫	৭
৪ — ৫ ,, ,,	১১	৯

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে এক হইতে দুই বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত এদেশে কিরূপ ভীষণ! এই সময়ে শিশুগণ কেবল মাত্র মাতৃ-স্তন্যের উপর বাঁচিয়া থাকে। মাতৃ স্তন্য উপযুক্ত পরিমাণে না পাওয়াতেই যে ইহাদের এইরূপ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়, তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে পর্য্যন্ত দেশে পুষ্টিকর ও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পাওয়া না যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুদিগের এইরূপ অকাল মৃত্যুর সংখ্যা কমিতে পারে না। আজকাল দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যত একেবারে অদৃশ্যই হইয়াছে।

ধান, চাউলের মূল্যও দ্বিগুণ ত্রিগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিতে পায় না। এই খাদ্যসমস্যা দূর করাই দেশের প্রধানতম প্রয়োজনীয় বিষয়। মিঃ যশোয়ালা মহোদয়ের মতে দেশের এই অবস্থা দূর করিতে হইলে গো জাতির উন্নতি করা একান্ত দরকার। কৃষি প্রধান ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য এবং দেশের অধিবাসিবৃন্দের প্রয়োজনীয় দুগ্ধাদির জন্য গো-রক্ষণের প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে গো রক্ষার জন্য হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে ও মুসলমান সম্প্রদায়ও মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে এই ভাবটী বিশেষ ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, তজ্জন্য দেশবাসী মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সহযোগীর এই মন্তব্যের উপর আর টিকাটিপ্পনি অনাবশ্যক।

দেশীয় গো-জাতির অবনতির সহিত ভারতের সর্ব্বত্রই কৃষির অবনতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যে বলদ ১৫৲ টাকায় পাওয়া যাইত, তাহা এখন ৬০৲ টাকাতেও পাওয়া যায় না। সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি? গভর্ণমেণ্ট সে দিন বাবু কৃষ্ণলাল দত্তকে দিয়া এই সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান সমিতি বসাইয়া তাহার দ্বারায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, খাদ্য দ্রব্য দুর্মূল্য হওয়াতেই সকল বিষয়ের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্য অর্থাৎ শস্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি, তাহা অতঃপর দেখা কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনা হয় যে, দেশের লোকের খাদ্যের সংস্থান না রাখিয়া দেশের যাবতীয় শস্য বিদেশে রপ্তানি, জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমিক হ্রাস, যেহেতু কৃষকগণের কৃষিবিদ্যায় সম্যক অভিজ্ঞতা নাই বা বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতিগুলি তাহাদের শিক্ষা দিবার দেশে প্রচুর স্কুল বা বিদ্যালয়, লেক্চারের ব্যবস্থা বা অনুরূপ সংস্থান নাই। এই কৃষির অবনতির প্রধান কারণই আমাদের গো-জাতির অবনতি। গো-জাতির উন্নতি কি রূপে সংসাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের দেখা একান্ত প্রয়োজন। ইহা দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় নীতি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এই গুলি মৎ-প্রণীত "গোপাল বান্ধব" নামক পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বিধিবদ্ধ নির্ব্বাচন এবং পৃথককরণ দ্বারা স্থানীয় গোকুলের বিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহা আমি অপরাপর অনেক সংবাদ পত্রে লিখিয়া চিন্তাশীল দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। গোশক্তি এবং কৃষির সহিত আমাদের দেশে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অতএব একের উন্নতিতে অন্যটির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য গোকুলের উন্নতির জন্য রাজা প্রজা সকলেরই এই জীবন-সংগ্রামের দুর্দ্দিনে উদ্যোগী হওয়া উচিৎ। দেশে রাজার চেষ্টায় প্রজার আবেদনে বহুল গোচরণ ভূমি থাকা কর্ত্তব্য। কৃষি ক্ষেত্রের বীজ বাছাই জন্য এবং দুগ্ধ নির্ব্বাচন জন্য স্থানে স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে দুগ্ধ ব্যবসায় দেশে উত্তমরূপ ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হয়, তাহার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। গো-কুলের সুচিকিৎসার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা

হওয়ার দরকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কৃষি-বিভাগ হইতে বা বঙ্গবিহারের বড় লোকগণের অনুগ্রহে প্রকাশিত হইয়া কৃষক কুলে এবং গৃহস্থলোকগণের মধ্যে বিতরিত হওয়া কর্ত্তব্য। গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার বৃহৎ পুস্তক অর্থা-ভাবে প্রকাশিত করিতে পারিতেছি না। দেশের কোন সদাশয়, হিন্দুপ্রাণ মহাশয় ব্যক্তি এই সৎকার্য্যে অগ্রসর হইলে দেশের কৃষি ও ব্যবসায়ের বিশেষ হিত সাধিত হয়।

আমাদের দেশে ডেয়ারি ব্যবসা সম্বন্ধে কোন পত্রিকা নাই। আজকাল আলোচনা, ব্যবসায়ী, ব্যবসা ও বাণিজ্য, গৃহস্থ প্রভৃতি পত্রিকায় ইক-নমিক্ বিষয়ে বা গো-দুগ্ধ বা গো-সেবা অথবা গোপালন বা পরিচর্য্যা সম্বন্ধে কখন কখন দুই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে এই বঙ্গবিহার, উৎকল, শ্রীহট্ট প্রদেশের সমস্ত কৃষক ও গোপালক গৃহস্থের অভাব মিটিতে পারে কি? 'বসুধা পত্রিকায়' গোচিকিৎসা সম্বন্ধে বেশ প্রবন্ধ গুলি প্রকাশিত হইতেছে। আমার বিবেচনা হয় যে গোতত্ত্ব, গোচিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, গো জীবন, গো-পালন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যতগুলি পুস্তক ঐ সম্বন্ধে আমাদের বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণ নহে। গো, মেষ, অশ্ব, ছাগলাদি গৃহপালিত পশু "পালন রক্ষণ ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে সহস্র সহস্র পুস্তকাবলী আছে! পশু চিকিৎসা সম্বন্ধেও বিলাত ও আমেরিকায় কম বই বুলেটীন, সারকুলার নাই বা সাধারণ কৃষক কুলের অবগতির জন্য প্রচারিত হইতে ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু আমাদেরই এই দীন ভারতে তাহার কি আছে বলুন দেখি, কয়জন লোক এইরূপ প্রবন্ধ পাঠ করেন বা ঐ প্রবন্ধ জানিতে চেষ্টা করেন?

আমরা কাজের সময় বিমুখ হই এবং বাক্ যুদ্ধে খুবই পটু এবং অগ্রসর। আমি দেশের মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ও নব্য যুবক বৃন্দ (যাঁহারা বিগত বন্যায় প্রকৃত ভারত-সন্তানের পরিচয় দিয়াছিলেন) তাঁহাদের এ সম্বন্ধে পথ প্রদর্শক হইতে বলি এবং প্রস্তাব করি যে স্বেচ্ছা-সেবক সম্প্রদায় দেশের রাজা মহারাজগণকে ধরিয়া কহিয়া কৃষির ও গো জাতির উন্নতি কল্পে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করুন। নচেৎ জাতি রূপে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান নিশ্চিত। জীবন সংগ্রাম দিন দিনই তীক্ষ্ণতর হইতেছে, তাহার চিন্তার সময় এইবার আসি-য়াছে।

পাশ্চাত্য অনুকরণে "গো-পাল বান্ধব" লিখিত হইয়াছে। তাহা প্রত্যেক কৃষক এবং গৃহস্থের পাঠ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা বিভাগে এই রূপ পুস্তক পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইবার এই কৃষি প্রধান ভারতের উপযুক্ত নহে কি? এদিকে ডাইরেকটার বাহাদুরের এবং স্যার মুখোপাধ্যা-য়ের দৃষ্টি পড়িলেই ভাল হয়। স্যার এ, টি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিশেষজ্ঞ হিন্দু, গো-পালক এবং গো-রক্ষক। তিনি কি দেশের গোকুলের রক্ষার জন্য একটু চেষ্টিত হইয়া, মহা-রাজ বর্দ্ধমান, মহারাজ নন্দী প্রভৃতির মত দেশের গণ্যমান্য মহোদয়গণকে এ মহৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিবেন না? আমার বক্তব্য যে দেশের গো-রক্ষা ও গো-জাতির উন্নতি করিতে

হইলে, চারণের ব্যবস্থা ও ধর্ম্মের ষাঁড় গুলির রক্ষা সর্ব্বতোভাবে আইন দ্বারা করাইবার উপায় বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত।

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে ও ভারতে যে কি প্রভেদ তাহা, পরের অংশে পাঠকগণের নয়ন সমক্ষে ধরিব। এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে ২।৪ টা দেশের অতি আবশ্যকীয় কথা বলা প্রয়োজন। গোজাতির উন্নতি বিধান ও রক্ষা কল্পে সে দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সহৃদয় ও দূরদর্শী মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় গো-কুল শুল্ক ১০৲ টাকা বৃদ্ধি করায় ইংরাজ ও মুসলমান সমাজে মহা আন্দোলন পড়িয়া যায়। হগ্ সাহেবের বাজারের কসাইকুল সমবেত হইয়া ধর্ম্মঘট করে। তাহার ফলে মেমসাহেব গণ কচি বাছুরের মাংস সময়ে না পাওয়ায় সন্ধ্যা ও সকালের দৈনিক সংবাদ পত্রে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। কোন ক্রমে সকলের বহু চেষ্টা ও বুঝানর পর ঐ গোলযোগ সমিত হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়ের এইরূপ প্রবর্ত্তন করার বহু ভাবী ফল পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ কতক পরিমাণ প্রাইম্ গাভীগণকে রক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া ভবিষ্যৎ কৃষির উন্নতি বিধান, দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ গো দুগ্ধের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ করণ। কিন্তু আমাদের দেশের লোক সকল এসব বিষয়ে মন দিতে পারেন না। কাজেই এইরূপ সদনুষ্ঠান যত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা বেশ বুঝা যায়। বকনা বা নব্য গাভী হননের সংখ্যা আমাদের দেশে শতকরা ৯০ টি, অথচ আমাদের দেশের অধিবাসী—অধিকাংশই হিন্দু। বিলাত,ইউরোপীয়,কন্টিনেন্ট আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কেপ্ কলোনি প্রভৃতি দেশ গো-খাদক দেশ বলিয়া জগতে বিদিত হইলেও ঐ সব দেশে আমি যত দূর দেখিয়াছি ও জানিয়াছি—দুগ্ধবতী ও দুগ্ধদাত্রী গাভী হননের প্রতিষেধক কোন বিধি না থাকিলেও কোন কৃষক বা গোউৎপাদক তাহাদের উপর ছুরীকা চালান করে না। ঐ সব গোভোজী দেশে বন্ধ্যা, ষাঁড়, পুং গোশাবক, রুগ্ন মোটা গাভীই কসাইর ছুরিকা রঞ্জন করিয়া থাকে। এই সব দেখিয়া আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা করা আবশ্যক। আর এক কথা ভারতীয় গো-জাতির উন্নতি বিধান করিতে হইলে জনোপযোগী ষাঁড়, বকনাদি পাশ্চাত্য দেশের মত বিনা ব্যয়ে রেল ও জাহাজ যোগে লইয়া যাইবার বিধি লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। ইহা কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে, পাশ্চাত্য দেশের এই অত্যুত্তম নিয়ম এই দেশে লোকের আগ্রহাতিশয়ে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়া লিপিবদ্ধ আইন প্রচলন ও প্রবর্ত্তন করাইতে না পারিলে নির্ব্বাণোন্মুখ ভরতীয় গো-মাতার পুনঃ বৃদ্ধিলাভ ও সমধিক কাল ভারতভূমে যদৃচ্ছা বিচরণ-দৃষ্টিলাভ-সুখে আমাদের অচিরেই বঞ্চিত হইতে হইবে। আমার বিবেচনা হয় যে চারণ, গো-সেবা, গো-পরিচর্য্যার জন্য যেমন কার্য্যক্ষম ভেটারিনারী ডাক্তারের দেশে বড়ই বেশী প্রয়োজন ও অভাব হইয়াছে, সেইরূপ গো-বল যাহাতে রেল ও জাহাজ যোগে পিঁজরা পোল ও জনন ক্রিয়ার জন্য বিনা-ব্যয়ে নীত হইতে পারে, তজ্জন্য দেশের যাবতীয়

সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রাদিতে তীব্র আন্দোলন করিয়া শাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই কাজে আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের লোকের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে মল্লিখিত বৃহৎ গোপাল-বান্ধব দ্বিতীয় ভাগ বহু চেষ্টা সত্বেও অর্থাভাবে প্রকাশিত হইতেছে না, হিন্দু প্রাণ বঙ্গবাসী ও গো-রক্ষণশীল স্বদেশবাসী মাত্রেই আমার এই সৎকার্য্যে সহায় হউন। কতিপয় উচ্চচেতা মনস্বী ব্যক্তি ইহার জন্য ১৫০৲ দেড় শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আর ৩০০৲ তিন শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাইলেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি। এ সম্বন্ধে "গোজনন" শীর্ষক প্রবন্ধের তৃতীয়াংশেও আমি বেঙ্গলী পত্রিকায় হিন্দু-প্রাণ, গোবৎসল স্বদেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় বঙ্গদেশের মধ্যে এই সৎকাজে কোন মহানুভবের আশ্বাস-বাণী পাইলাম না। আমরা যে নাম মাত্র হিন্দু এবং ধর্ম্মের নামে বহুবিধ বাহ্য আড়ম্বরে ও বাক্যের ছটায় লোকের মন ভুলাইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া থাকি, তাহাতে কোন মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে কার্য্যকারী সরল লোক খুবই কম।

গোপালবান্ধব প্রণেতা।
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল, উকীল
হাইকোর্ট, কলিকাতা।

বিশ্ব মিউনিসিপালিটী।

১

দেখিয়া বিস্মিত তুমি ভাবুক প্রবীণ্‌
মিউনিসিপালিটী কার্য্য কলিকাতা সহরে,
উদ্ভাবি কতই তত্ত্ব বিজ্ঞানে নবীন,
তুলিতেছে গরিমার উন্নত শিখরে।

২

শিখর প্রতিম উচ্চ রম্য হর্ম্ম্যতলে,
সুবিস্তীর্ণ রাজবর্ত্ম উদ্যান-মাঝারে;
হেথা সেথা সহরের কেমন কৌশলে,
বিতরিছে নলরন্ধ্রে সলিল-সম্ভার।

৩

স্থির ক্ষণ-প্রভাসম ধাঁধিয়া নয়ন,
উজলিছে কলিকাতা সুরপুরী সম;
সুসজ্জিত পথ ঘাট বিলাসী ভবন,
জ্বলিছে নিবিছে আলো ইন্দ্রজালোপম।

৪

উষার উদয় হতে আসি সম্মার্জ্জক,
সংগ্রহিয়া সহরের আবর্জ্জনা যত;
ভবন প্রাঙ্গন পথ বিপনি হট্টক,
বিধৌত মার্জ্জিত করে যত্নে অবিরত।

৫

সাধারণ স্বাস্থ্যতরে মিউনিসিপালিটী,
স্থানে স্থানে নির্ম্মিয়াছে দীর্ঘিকা উদ্যান;
"ইডেন" "বিডন পার্ক কিবা পরিপাটী,
"গোলদীঘি" "লালদীঘি" "কর্জ্জন-কানন।"

৬

সন্ধানিয়া পাতি পাতি মিউনিসিপাল চর,
মৃতজীব দেহ যত পুতি-গন্ধাধার,

যথাকালে যথাস্থানে করিছে অন্তর,
সাধিতেছে সহরের কল্যাণ অপার।

৭

তোমার সুষুপ্তিকালে বিলুপ্ত চেতনে,
প্রহরী পাহারা দেয় যেন বন্দী-জেল;
উষায় জাগাতে তোমা কর্ত্তব্য পালনে,
নিয়মিত ডাকে অই ডিং ডং বেল।

৮

অনাথ আতুর জন চিকিৎসার তরে,
রয়েছে সহরে ওই ভেষজ আলয়,
বিতরিতে বিদ্যার্থীরে বিদ্যা অকাতরে,
উন্মুক্ত রয়েছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়।

৯

নহত বিস্মিত তুমি সেত দূরকথা,
ভ্রমেও পড়েনা মনে দিবাদণ্ডপলে;
তোমার নিবাস ভূমি এ বিশ্ববারতা,
বিশ্ব মিউনিসিপালিটী চলে কার কলে?

১০

ভেদিয়া বসুধা দেহ ছুটি স্বাদুবারি,
নিয়মে সরিৎ সিন্ধু জলধি অপার
রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে দিবস শর্ব্বরী,
বিতরে সলিল ধারা আদেশে কাঁহার?

১১

বিনাসিতে ধ্বান্তরাশি উজলিয়া ধরা,
স্থাপিত অনন্ত ব্যোমে আলোক-আধার;
চিরদীপ্ত চিরোজ্জ্বল রবিশশী-তারা,
বিতরে আলোকরাশি আদেশে কাঁহার?

১২

কাঁহার আদেশে ভীম-বায়ু গ্রীষ্মাগমে,
সুনিয়মে বিশ্বতল দিতেছে ঝাঁটিয়া;
প্রাবৃটে পর্জ্জন্য পশি পয়োধারা ক্রমে,
তটিনী প্লাবিয়া কুল দেয় প্রক্ষালিয়া?

১৩

কোন্ শিল্পী বিরচিত এই বিশ্বমাঝ,
স্বাস্থ্যপ্রীতি প্রেমাস্পদ অযত্ন-সঞ্জাত;
ফলিত পুষ্পিত কুঞ্জ অভিরাম সাজ,
"হিমাদ্রি""মানসসর""নায়েগ্রা প্রপাত"?

১৪

গো মেষ মহিষ আদি ত্যজিলে জীবন,
বিদূরিতে নিঃশেষিতে বিশ্ব-স্বাস্থ্যতরে,
কোন্‌জন অবিলম্বে করেন্ প্রেরণ,
বায়স গৃধিণী কুর্ম্ম যত বিশ্বচরে?

১৫

বিপদ সঙ্কুল ঘোরা তামসী উদয়ে,
বিশ্বের পাহারা তরে ত্বরিত চেতন,
সারমেয় চৌকী দেয় কাঁহার আজ্ঞায়?
প্রভাতে পতত্রী গায় সঙ্গীত-চারণ।

১৬

কাঁর আজ্ঞাক্রমে দেখ অযত্ন-সুলভ,
এ বিশ্বের হেথা সেথা চতুর্দ্দিকময়,
রয়েছে ভেষজ বহু ভীষণ-দুর্লভ,
রয়েছে প্রকৃতিগত বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ গীতিকা।

(তাল একতালা)

ওরে মন ভৃঙ্গ করি নিদ্রাভঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ ফুল-মধু পান।

ত্রিতাপ যাতনা রবেনা, রবেনা,
দহিতে হবেনা ; স্নিগ্ধ হবে প্রাণ ॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সাধু সঙ্গ ধর,
সৎপ্রসঙ্গ শুধু দিবানিশি কর,
আপনা পাশরি কি কর, কি কর,
সাধু সেবা বিনা কিসে পরিত্রাণ।
ফুল হার ভ্রমে ধর কাল সাপ,
কাল পূর্ণ হলে পাবে মনস্তাপ,
দংশনের বিষে, বাড়িবে ত্রিতাপ,
বিষম জ্বালায় হবি অবসান।
কামিনী কাঞ্চনে ভুলনা রে আর,
ভেবে দেখ মনে কেবা হয় কার,
কার সনে কহ সম্বন্ধ কাহার,
মায়ার প্রকোপে অন্ধ সদা জ্ঞান।
পুত্র কন্যা দারা পেয়েছ খেলনা,
ভ্রান্ত হ'য়ে তুমি ও খেলা খেলোনা,
খেল সেই খেলা যাহা ফেলিতে হবেনা,
আসা যাওয়া ভবে হবে সমাধান ॥
সংসার ভুলিয়া মুখে বল হরি,
বিষয় বাসনা দূরে পরিহরি,
শান্তি লাভ হবে, ভ্রান্তি যাবে ছাড়ি,
কৃতাঞ্জলি করি, কর হরিধ্যান।
কবে মায়া পাশ হইবে ছেদন,
গোরা-নাম প্রেমে আসিবে রোদন,
কিঙ্কর কহিছে ঘুচিবে বেদন,
যে দিনে যাইবে মান, অভিমান ॥

দীন—শ্রীসত্যকিঙ্কর কাব্যকণ্ঠ।

নেপাল বাসিনী।

চির-তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমালয়-বক্ষঃ-বিরাজিত নেপাল-রাজ্যের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান। এক মাত্র পতিব্রতা পত্নী ব্যতীত এ জগতে তাঁহার আপনার জন আর কেহ ছিল না। কেবল মাত্র সতী সহধর্ম্মিণীর গুণে, তাঁহার অমিয়—মধুর প্রাণ প্রীতিকর ব্যবহারে ব্রাহ্মণ পরম সুখে সুদীর্ঘকাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ কাঙ্গালও নহেন, কু-লীন ও নহেন ; লক্ষপতি সামাজিক সুসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দাস দাসী ও দুর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনে তাঁহার গৃহ নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত। সুতরাং অপত্য অভাবে দম্পতার প্রাণে বিশেষ কোন বিষাদ ছিল না। তাঁহারা সদা প্রফুল্ল দেব-দম্পতীর ন্যায় নিয়ত পরম সুখে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন।

দম্পতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন স্বামীর বয়স বিরাশি বৎসর এবং স্ত্রীর বয়ক্রম আটাত্তর বর্ষ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সে কামগন্ধ-হীন শুষ্ক প্রাণ এখনও পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে নিয়ত ভরপুর। তাঁহারা ক্ষণ কালের জন্য একের অদর্শনে অন্যে আত্মহারা হইয়া যান—এক জনের সামান্য অসুখ-বিসুখে অপরে প্রাণে বেদনা পান। বৈতরণী-তীরস্থ অতি বৃদ্ধ দম্পতীর পবিত্র প্রাণে এমনি অমিয় মধুর প্রেমের টান—স্বামী-স্ত্রীর এমনি নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় ভালবাসা। দেব-দম্পতি এইরূপ পরম সুখে সংসার-স্বর্গ ভোগে নিমগ্ন, এমত সময় সহসা

এক দিন মহাকালের বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল—তিনি স্বর্গ লাভ করিলেন।

পতির লোকান্তর গতিতে পত্নীর বিশুষ্ক নয়ন প্রান্তে এক ফোঁটাও উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত হইল না। বৃদ্ধা পত্নী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ বা একটিবার 'আহা' শব্দটিও করিলেন না। পতির পরলোক গমনের মুহূর্ত্তকাল পরে পত্নী অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আপনার সমস্ত সম্পদ—ব্রাহ্মণের আজীবন সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্য-রাশি অনুচর, অনুগত এবং দুঃখী-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। আপনার জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিলেন না।

অনন্তর সেই পতি-ভক্তি-পরায়ণা ব্রাহ্মণ-পত্নী স্বামীর সহিত সহমরণ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু নেপাল রাজপুরুষেরা সতীর সে ইচ্ছা পূরণে বাধা প্রদান করিলেন। সতীর সহমৃতা হইবার ঐকান্তিক বাসনা পূর্ণ হইল না। বৃদ্ধা সমাগত রাজপুরুষদের নিকট বহু অনুনয়-বিনয়—অনেক কাকুতি-মিনতি, এমন কি অবশেষে অনেক কাঁদাকাটি পর্য্যন্ত করিলেন। কিন্তু তথাপি প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ বলিয়া রাজপুরুষগণ তাঁহার সে আবেদন-আব্দার রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। পতিব্রতা সতী সহমরণে নিরাশ হইয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিলেন। নয় দিন নিরম্বু উপবাস অন্তে দশম দিবসে সতী পতিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্বর্গধামে প্রয়াণ করিলেন। সতীর পতি ভক্তির পূর্ণাহুতি হইল। সতী ধর্ম্মেরই জয় হইল।

কবিরাজ—শ্রীবরদা কান্ত কবিরত্ন।

গান।

আমারি হৃদয় তটিনীর কূলে
কে যেন গাহিছে গান!
লতা বিতানের শীতল ছায়ায়,
বসিয়া পুলকে পাগলের প্রায়,
রাগিণী মিলা'য়ে মোহন বীণায়
তুলিতেছে মধুর তান!
আমারি হৃদয়-তটিনীর কূলে
কে যেন গাহিছে গান।
মানস ভরিয়া জাগিছে সে তান,
আকুল অধীর হয়েছে পরাণ,
সাগর-প্রেয়সী ডাকিতেছে বাণ,—
আপনা করিতে দান!
আমারি হৃদয় তটিনীর কূলে
কে যেন গাহিছে গান!
মাথা তুলে সুখে কোটি বীচিমালা,
জুড়াইছে যেন মরমের জ্বালা—
সুখেতে ভরিছে পরাণের ডালা
শুনি গীতি সুমহান!
আমারি হৃদয় তটিনীর কূলে
কে যেন গাহিছে গান!

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

৺চন্দ্রশেখর বসু।

(অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী)

সন ১২৪০ সালের ৮ই শ্রাবণ জেলা নদীয়ার অন্তর্গত উলা গ্রামে স্বনামধন্য মহাত্মা চন্দ্রশেখর বসুর জন্ম হয়। "বাল্যকালে তিনি পারস্য এবং

উর্দ্দু পড়িয়াছিলেন, পশ্চাৎ ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুদিন পড়িয়া বরিশালে গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ১৮৫৫ সালের এপ্রেল মাসে জুনিয়ার স্কলার্সিপ একজামিন দেন। পাস হইয়া গবর্ণমেন্ট স্কলার্সিপ এবং তরজমাতে অন্যান্য পুরস্কার পান। পশ্চাৎ কিছুদিন হুগলি কলেজে পাঠান্তে কলেজ পরিত্যাগ করেন। কার্য্যোপলক্ষে যশোহরে অবস্থান কালে তিনি এণ্ডারসন নামক কেম্ব্রিজ এম, এ এক ছোট পাদরী সাহেবকে তিনি হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন এবং উক্ত সাহেব তাঁহাকে বিস্তর ইংরাজি গ্রন্থ শিক্ষা দিতেন।

বরিশালে অবস্থান কালে চন্দ্রশেখরবাবুর সহিত তথাকার পাদরী রেভারেণ্ড জেমস্‌সেল সাহেবের সহিত বিশেষ আসুরক্তি জন্মিয়াছিল। পাদরী সেল সাহেব যখন যশোহরে বদলি হইলেন, তখন চন্দ্রশেখর বাবু সেখানে। ঐ সময়ে নদীয়া, যশোহর এবং রাজসাহী এই তিন জেলায় ভয়ানক রূপে নীল কুঠির অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া উঠে। রেভারেণ্ড জেম্‌স সেল সাহেব কয়েক খানি গ্রাম হইতে অত্যাচারের ঘটনা সকল লিখিয়া আনিবার জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করেন। তিনি তাহাতে কোমর বাঁধিলেন এবং যিনি শ্যামচাঁদ নামক দণ্ডধারী ছিলেন, তাঁহার বিস্তর অব্যবহার কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া সাহেবকে দিলেন। সাহেব তাহার উপর বড় বড় মন্তব্য লিখিয়া বিলাতে প্রেরণ করিলেন। উহারই তিন বৎসর পরে কলিকাতায় ইণ্ডিগো কমিশন বসে এবং সেল সাহেব তাহার একজন মেম্বর হন।

চন্দ্রশেখর বাবু একদিকে যেমন সারাজীবন শাস্ত্রানুশীলন করিয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ অনেকগুলি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সারাজীবন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ উচ্চ পদে বিশেষ গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খৃঃ বৰ্দ্ধমানের কালেক্টারিতে ২য় ক্লার্ক হন, তিনমাসের মধ্যে হেড রাইটার হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীল সংক্রান্ত আপীল এবং সেসন মকৰ্দ্দমার বিচারের নিমিত্ত আডিসনাল সিভিল ও সেসন্‌ জজ হবহাউসের অধীনে হেডক্লার্ক নিযুক্ত হন। তৎপরে নদীয়ায় জজ লিটিল ডেল সাহেবের অধীনে সেরেস্তাদার এবং রেজিষ্ট্রার পদে বাহাল হইলেন। ইহার পর বৰ্দ্ধমানের কলেকটার বার্ট সাহেবের হেডক্লার্ক হন। পশ্চাৎ ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব কালেক্টর হইলে তিনি সেরেস্তাদার হন। ১৮৬৫ খৃঃ সাহেব কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও পুলিশ কমিশনার হইয়া তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে সুপারিস করিয়াছিলেন। ছয়মাস অপেক্ষা করিলে তাহা হইত। কিন্তু তিনি চন্দ্রবাবুকে স্বীয় পিতা স্যারজেমস উইয়ার হগ বাটের ইণ্ডিগো কানসারণ ও জমীদারীর ম্যানেজার হইতে অনুরোধ করিলেন। স্বাধীনতা লাভের অনুরোধে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট পরিত্যাগ করিলেন। কি প্রকার অসাধারণ দক্ষতার সহিত, কি প্রকারে সকল প্রকার

অত্যাচার রহিত করিয়া, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সকল প্রকার নীচতা, উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিয়া, জমীদার প্রজা উভয়পক্ষের সন্তোষ ও মঙ্গল বিধান করিয়া তিনি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা এই অতি সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব।

ইহার পর তিনি ট্রাণ্ড ব্যাঙ্কের (এক্ষণে কলিকাতা পোর্টভুক্ত) সুপারিটেণ্ডেণ্ট পদে বাহাল হইলেন। ১৮৬৯ খৃঃ নবেম্বরে তিনি দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজারের পারসনেল এসিষ্টেণ্ট হইলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অবধি এই কার্য্য করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে (প্রত্যহ বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত) তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটের চারিদিকের বিশৃঙ্খলা দূর করতঃ কিরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; তাহার বিবরণ অধিক দিতে পারিলাম না। এইমাত্র বলিয়া রাখি, বিশাল স্বাধীন রাজ্যের কর্ত্তা হইলে শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ শক্তি জ্ঞানও ভূয়োদর্শন প্রয়োজন, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সম্যকরূপে বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক কলিকাতায় আসিয়া নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গের কথা হগ সাহেবকে জানাইলে তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ডিপুটি ইন্‌সপেক্টার (২৫০৲ বেতনে) করিয়া দিলেন, কিছুদিন পরে ৩০০৲ বেতনে নর্দ্দারণ ডিভিসনের কালেক্টর করিয়া দিলেন। তারপর তিনি এসিষ্টাণ্ট এসেসার হইলেন। এ কয়টী কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া পরে পরে তিনজন চেয়ারম্যানকে বিশেষ পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁহাকে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন। ১৮৮০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ৪০০৲ বেতনে এবং সেই সালে ২১ শে অক্টোবর ৫০০৲ বেতনে খড়গপুর পরগণার অধীনে এসিষ্টাণ্ট মেনেজারের পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৮২ সাল হইতে ১৯০২সাল পর্য্যন্ত দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের যাবতীয় বিভাগের কার্য্য কিরূপ নির্ভীকভাবে, ন্যায়পরতার সহিত এবং অমানুষিক দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত "বঙ্গভাষার লেখক" পুস্তকে পাঠ করিলে বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয়। ধার্ম্মিক মহারাজা তাঁহার দ্বারা প্রভূত উপকারের কৃতজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা বেতন পাইতেন, অবসর গ্রহণ সময়ে, তাহাই পেন্সন ধার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালের এপ্রেল মাস হইতে ১৯২০ সালের ১৫ই মে পর্য্যন্ত পাঁচ বর্ষ তিনি এসিষ্টাণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজারের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করেন। শেষ তিন বৎসর পাঁচমাস দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার প্রতি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের ১৬ই মে রাজপ্রদত্ত বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা পেন্‌সন শিরোধার্য্য পূর্ব্বক রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই দিন বেলা ৮টার সময় পরিবারবর্গের সহিত একখানি প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ সেলুন গাড়ীতে আরোহন করিয়া দ্বারভাঙ্গা হইতে যাত্রা করেন। তথায়

তাঁহাকে শেষ সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত অনেক সাহেব, মেম ও শতাধিক অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন এবং রাজ-ব্যাণ্ড মাষ্টার মিঃ আরমার প্রভৃতি সাহেব উচ্চরবে তাঁহার কল্যাণে জয়ধ্বনি করিলেন। পর পর আর দুইটি ষ্টেশনে অনেক রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের প্রায় ৩০ বৎসরের এবং সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪৪ বৎসরের চাকুরী সমাপ্ত হইল।

চন্দ্রবাবু অনেকগুলি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন! তৎ সমস্তই শাস্ত্রীয় ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক। তন্মধ্যে নিম্নস্থ আটখানি গ্রন্থ প্রধান।

অধিকারতত্ত্ব (১২৭৯ বঙ্গাব্দ মুদ্রিত) হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজকে প্রতিপালন, যাহার যেমন অধিকার তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান, স্বজাতীয় আচার ব্যবহার রক্ষা, শাক্ত বৈষ্ণবাদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ভূক্ত উক্তাধিকারিগণকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মতের যোগে ব্রহ্মজ্ঞান দান ইত্যাদি রূপ প্রচার ব্রত অবলম্বন করা, ব্রাহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ত্তব্য এই গ্রন্থে তাহারই প্রস্তাব।

(২) বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি (১২৮২ সালে) হইতে বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্যে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় উপদেশ।

(৩) বেদান্ত প্রবেশ (১২৮২) ষড়দর্শনের সংক্ষেপ বিবরণের সহিত বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃতি, শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক মত, অন্যান্য বৈদান্তিক প্রমাণ, রামমোহন রায়ের, বেদান্তভাষ্য ও তাঁহার কৃত মীমাংসার সংক্ষেপ বিবরণ।

(৪) সৃষ্টি (১২৮২)। ইহা বেদান্ত প্রবেশের পরিশিষ্ট স্বরূপ। ইহাতে অবধি মহদহঙ্কার, অণ্ড ও হিরণ্য গর্ভ প্রকরণ পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং ব্রহ্মার কৃত উদ্ভিদ, অন্ন তির্য্যক যোনি, দানব গন্ধর্ব্ব দেবতা এবং মানব পর্য্যন্ত বৈকারিক সৃষ্টির বিবরণ আছে। শ্রুতি বেদান্ত স্মৃতি, গীতা ও তন্ত্র সম্মত।

(৫) বেদান্ত দর্শন (১২৯২ সাল)। ইহাতে মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত শারীরিক সূত্রের প্রথম একাদশটী সূত্রের সংক্ষেপ ব্যাখ্যা আছে। প্রথমাবধি চতুর্থ সূত্রে জগৎসৃষ্টি এবং যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিন্ন প্রকৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পঞ্চমাবধি একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত সংখ্যামতাবলম্বীদিগের আপত্তি খণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আদ্যোপান্ত বেদান্ত প্রতিপাদ্য, নিরঞ্জণ ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রত্যুক্ত জ্ঞান রূপ অবয়ব দ্বারা পূর্ণ। ইহা প্রথমে ক্রমশঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৬) প্রলয়তত্ত্ব (১২৯২) এই গ্রন্থে শ্রুতি, বেদান্ত পুরাণ ও গীতার প্রতিপাদ্য প্রলয়রূপ অবয়বের বিস্তার আছে এবং আদ্যোপান্ত ব্রহ্মজ্ঞানই ইহার প্রতিপাদ্য। ইহার কতিপয় প্রকরণ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৭) পরলোকতত্ত্ব (১২৯২ সাল) এই গ্রন্থে ঐরূপ শাস্ত্রীয় পরলোকতত্ত্ব রূপ অবয়বের ব্যাখ্যা সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে। ইহাতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরের বিবরণ, পরলোকে যাইবার পথের বার্ত্তা, স্বর্গলোকের

সংস্থান এবং ভোগলক্ষণ, ব্রহ্মলোক ও তাহার সগুণ মুক্তির বিবরণ এবং নিগুর্ণ মুক্তির লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

(৮) হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ (১২৯১)। বৈদিক-ধর্ম্ম ও শাস্ত্র. শাস্ত্র-সমন্বয় ইহার বিষয়। বৈদিক নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিধর্ম্ম উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনা, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান, কর্ম্ম ব্রহ্ম সমন্বয়, দেব সমন্বয় ও শাস্ত্র সমন্বয় ইহার উদ্দেশ্য।

উপসংহারে আমরা চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের এক পরমাত্মীয়া কর্ত্তৃক লিখিত অতি সুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা দিয়া এই প্রবন্ধের মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলাম।

স্বনামধন্য মহাত্মা ৺ চন্দ্রশেখর বসু গত ৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় কলিকাতায় তদীয় ১৪ নং পারসীবাগানস্থ ভবনে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়াছে; আর তাঁহার সেই জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত সৌম্যমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইব না; আর সেই অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞানোদ্ভূত উদাত্ত গম্ভীর বাণী কাহাকেও অনুপ্রাণিত করিবে না। কিন্তু তিনি যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি অসম্যকপরিপুষ্টা মাতৃভাষাকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, সেগুলি চিরদিনই লোককে চরম জ্ঞানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

বাল্যে দারিদ্র্য, যৌবনে বিষয়োন্নতি ও বার্দ্ধক্যে বিশ্রাম, এ তিন অবস্থাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলী পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রতিভা, কার্য্যক্ষমতা ও কলঙ্কলেশহীন নৈতিক চরিত্রের বলে তিনি যশোহরে খৃষ্টান পাদরীর আট টাকা বেতনের শিক্ষকতা হইতে বিশাল দারভাঙ্গা রাজ্যের কর্ণধার হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই সুবিস্তীর্ণকাল অনেক বিচিত্র পার্থিব অভিজ্ঞতামণ্ডিত; কিন্তু সে অভিজ্ঞতা তাঁহাকে কখনও নীতিপথভ্রষ্ট করে নাই। যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইত, তাহা যথাশক্তি করিতেন; কাহারও মুখ চাহিয়া কোন কাজ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

অসাধারণ উৎসাহ ও শ্রমশীলতা তাঁহার সকল অবস্থাতেই প্রতিভাত হইয়াছে। জীবনের অপরাহ্নেও তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় থাকেন নাই। আজীবন সাহিত্যচর্চ্চার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ফলই তাঁহার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে।

"মানবকাব্য", "অধিকারতত্ত্ব", "সৃষ্টি", "প্রলয়তত্ত্ব", "পরলোকতত্ত্ব" ও "বেদান্তদর্শন" তাঁহার মুখ্যরচনা। তাঁহার সমস্ত রচনাই ভাষাসম্পদে প্রাঞ্জল, মনোজ্ঞ, শ্রবণাভিরাম ও ভাবসম্পদে প্রগাঢ়। তাঁহার সকল দার্শনিক গ্রন্থই মৌলিক চিন্তা-প্রসূত। দার্শনিক তথ্য বিচারে তিনি কখনও শাস্ত্রোক্তি ছাড়িয়া বৈদেশিক টীকাকারগণের উক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার "অধিকারতত্ত্ব" অপূর্ব্ব মনন ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচায়ক। স্বসমাজ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে থাকিয়া লোকে কিরূপে উচ্চ নিম্ন মানসিক অবস্থাভেদে উপাসনাপদ্ধতির বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া শেষে নিরঞ্জন ব্রহ্মের পূজাধিকারী হইতে পারে, তাহাই এই গ্রন্থে সাধারণ

ণের বোধগম্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানীরও যে লোকের মানসিক অবস্থা ও উপাসনা পদ্ধতির সামঞ্জস্য স্থাপনার্থ ভগবানের বিভিন্ন উপাধিযুক্ত রূপের পূজা সমর্থন ও প্রচার করা কর্ত্তব্য—ইহাও এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সর্ব্বদা তাঁহার ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার অর্পণ করিয়া তিনি জীবনের সকল কাজ নিশ্চিন্ত ভাবে করিয়া গিয়াছেন। ভগবানে চিত্তসমর্পণ করিয়া শত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া উঠিয়াছেন,শোকের বাত্যা নির্ব্বিকার চিত্তে সহিয়াছেন। এখন সে সকলের অবসান হইয়াছে। জীবনেই তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; এখন মরণে পরব্রহ্মে গিয়া মিশিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া সকলে বীতশোক হউন।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

বাবু।

দেশী শব্দের অর্থ দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে যত সহজ, বিদেশীয় ব্যক্তির পক্ষে তত নহে। এই কারণেই ইংরাজেরা দেশীয় কোনও বিষয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া প্রায়ই প্রমাদে পতিত হন। "বাবুর" ব্যাখ্যাও দুইটি বিশিষ্ট ইংরাজী কোষে এতদূর অবৈধ এবং ব্যাজযুক্ত হইয়াছে, যে আমরা এ বিষয়ে আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। উপরোক্ত কোষদ্বয়ে "বাবুর" যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পুরাতন ইংরাজী অভিধানের প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলিতেই দুর্লভ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে নূতন সংস্করণ Encyclopaedia Brittanicaয় 'বাবু', "কেরানী"রই প্রতিশব্দ এবং অর্দ্ধ ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ হিন্দু ভদ্রলোকের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। Chambers's Twentieth Century Dictionaryতেও 'বাবু' ঘৃণাসূচক সংজ্ঞা বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। দেশীয় অভিধানে যাহা সম্মানবোধক বলিয়া প্রচলিত, তাহাই বিদেশীয় কোষপ্রণেতা এবং সঙ্কলয়িতাগণের কপোলকল্পনাপ্রভাবে বিপরীত অর্থের প্রতিপাদক। "বাবু" শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া, দেশীয় কোষসকল হইতে অর্থ সংগ্রহ না করায় এবং কল্পিত ভ্রমসঙ্কুল অর্থ সন্নিবেশিত করায় বিলাতী কোষপ্রণেতা এবং সঙ্কলয়িতাগণের অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ পাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বাবু' ইংরাজী 'Mr' অপেক্ষাও গৌরবসূচক। 'Mr'যাহাকে তাহাকে বলা চলে, কিন্তু বাবুসম্বন্ধে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা খাটে না। 'বাবু' বলিলে জমীদার বুঝায়। উদাহরণ-স্বরূপ মুর্শীদাবাদের দীনবন্ধু 'বাবু', কাশীমবাজারের রাজা আশুতোষ নাথের পূর্ব্বপুরুষ, কান্ত 'বাবু', বর্ত্তমান কাশীমবাজারের মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ, লালা 'বাবু', পাইকপাড়া মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ। নবাবী সময়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী মাত্রেই 'বাবু' নামে অভিহিত হইতেন। 'বাবু'র প্রকৃত অর্থই হইল ধনী,এইভাবে লক্ষ্মীর সুখী বরপুত্রেরা সরস্বতীর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলেই নানাপ্রকার দোষে এবং পাপে বিজড়িত হইয়া পড়েন; তাঁহাদের সেই সকল স্খলন লক্ষ্য করিয়াই, "বাবুয়ানী" "বাবুগিরি" প্রভৃতি সৃষ্ট হয় এবং বিলাসিতাজ্ঞাপক হয়। যে

প্রকার নবাব হওয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে দোষাবহ নহে, কিন্তু "নবাবগণের উশৃঙ্খলতা" হইতে "নবাব" হওয়া কথাটি দোষাবহ এবং "নবাবি" ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক হইয়া পড়ে; সেই প্রকার স্থলবিশেষে "বাবু" ও "বাবুয়ানী"ও বুঝিতে হইবে। নামের অগ্রে 'বাবুর' ব্যবহার সর্ব্বদাই সম্মানসূচক। যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইংরাজ মহোদয়েরা "বাবুর" অর্থবিকৃতি ঘটাইয়াছেন, আমরাও ঠিক সেই যুক্তিই অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদের বড় সাধের "Mr" এরও অবিকল বিকৃতি ঘটাইতে পারি। আমরাও ত ইংরাজের অনুকরণপ্রিয় ব্যক্তি-গণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকি—"কি হে মিষ্টার", "তুমি মিষ্টার ব্যক্তি" প্রভৃতি। কিন্তু এই প্রকার বলি বলিয়াই কি আমরা আমাদের অভিধান গুলিতে ইহা ঘৃণাসূচক শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? সকল কথাইত ঘৃণার ভাবে উচ্চারণ করিলে ঘৃণাসূচক হয়। "পণ্ডিত" বলিলেওত ভঙ্গির গুণে "মূর্খ" বুঝায়। তাই বলিয়া কি পণ্ডিতের অর্থ মূর্খ লিখিতে হইবে?

সে যাহা হউক, ইংরাজেরা "বাবু" শব্দের দুর্গতি করিয়াছেন বলিয়া দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তাঁহারাত ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক বিষয়েরই নিন্দা করিতে সর্ব্বদাই পটু। তাহাদের অযথা গালাগালির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করাই যুক্তিযুক্ত। সত্য কি, তাহা অবগত হইয়া আমাদের আপনাপন পন্থা বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বাহিরের লোকে গালি দিয়াছে বলিয়া তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হওয়ায় লাভ নাই। কুন্নটায় যদি তাহার স্বর্ণাভরণের স্তূপ দেখাইয়া কুলবধূর অলঙ্কারা-ভাবের প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার সহিত বাকযুদ্ধ করিয়া ফল কি? কেহ যদি রাগ করিয়া আমাদের সমস্তই মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের সমস্ত মন্দ না হইলেই হইল। কিন্তু যদি আমাদের কিছু মন্দ থাকে, তাহা হইলে সে-গুলি নিতান্ত আমাদের বলিয়া উদাসীন থাকিলে চলিবে না এবং যদি অন্য কেহ তাহাদের উল্লেখ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি রাগিয়া লাল হইয়া উঠার স্বার্থকতাও নাই। স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, যে যাহা কিছু আমাদের সম্বন্ধে বলে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা শ্রদ্ধার সহিত ভাবিয়া দেখা উচিত। সে কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছে, ভাল ভাবে বলিয়াছে কি মন্দ ভাবে বলিয়াছে, তাহা তলাইয়া দেখিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

নামের অগ্রে "বাবু" বলিয়া লোকের সম্মান সূচনা করুক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে হু হু করিয়া যে বাবুয়ানীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে ক্ষোভযুক্ত আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা সম্মানের জন্য লালায়িত সত্য কিন্তু দেশময় "বাবুয়ানীর" প্রভাব বাড়িয়া চলিলে আমাদের সম্মান কি করিয়া বজায় থাকিতে পারে, তাহাত বুঝিতে পারি না। আমাদের সাধারণের যে কিছুমাত্র ও সম্মানবোধ আছে, তাহাওত অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারি না। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলেই "কোঁচারপত্তনের" অন্তরালে

"ছুঁচারকীর্ত্তন"; যবনিকা উত্তোলন করিলেই জাহির হইয়া পড়ে। পান, চা, চুরুট, এবং আরও কত প্রকার উপদ্রব বাবুদের প্রীত্যর্থে দোকানে দোকানে প্রকাশ্যভাবে সুসজ্জিত এবং সংরক্ষিত। অনেক স্থলেই "বাবুদের" উপায়ের ক্ষমতা চাকুরীর মাহিনা ২০৲। ২৫৲ কুড়ি পঁচিশ টাকার মধ্যেই আবদ্ধ। এই মাহিনা আবার শুধু মজুরিরই মূল্য নহে, লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করিবার ও বটে, তল্লাস করিলে জানা যায়. পেটরোগা চাকুরে বাঙ্গালী অন্য কিছু হজম করিতে না পারিলেও সাহেবের খিঁচুনী বেমালুম সহ্য করিতে পারে। ইহাইত বাবুদের অবস্থা এবং এই সকল বাবুরাই চা, চুরুট, পান ধ্বংশ করিবার এক একটি রাক্ষস। এই বাবুয়ানীকে ঝাঁটাইয়া না ফেলিলে সমাজের কিছুমাত্রও কল্যাণ হইতে পারে কি? ভগবান! দেশকে এই বাবুয়ানীর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। কুম্ভীর।

পুষ্পবতী।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

মহারাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। মহারাণী তাঁহার সন্দেহের বিষয় প্রকাশ করিলেন, তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ্য রূপে সকলকে বলিতে ত্রুটি করিলেন না। সকলেই যখন শুনিল রাজাকে অন্যায়রূপে বিষ প্রদানে মারিয়া ফেলা হইয়াছে, তখনই প্রজারা খেপিয়া উঠিল। জোতারাম ভয়ে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মহারাণী যে পত্র বৃটিস এজেন্টের নিকট লিখিয়াছেন, তদনুসারে মেজর অল্ডস্ স্বয়ং আসিয়া পৌছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজাকে আর জীবিত পাইলেন না, মহারাণী কাঁদিয়া আপন পুত্রকে নিজ দরখাস্ত সহ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন, সাহেব আদর করিয়া কুমারকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। তিনি তখনই কুমারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং তদনুসারে ভারতবর্ষের বড় লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট রিপোর্ট করিলেন। তিনি মহারাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া জোতারামকে জয়পুর হইতে ৩০ মাইল ব্যবধানে দেওসারে প্রেরণ করিলেন, এবং রূপাকে সহরের এক প্রান্তে এক খানি ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিলেন। প্রজারা রূপার উপর এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, সম্মুখে পাইলে অনায়াসে তাহাকে সকলে বধ করিত। রূপার উপর রাজ্যের সকলেই অসন্তুষ্ট ছিল, এত দিন রাজমাতার ভয়ে তাহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহসী হয় নাই, কিন্তু এখন তাহার ভীষণ পাপের কথা রাষ্ট্র হওয়াতে সকলেরই তাহার উপর বিজাতীয় ক্রোধ হইল। যদি এ সময় মেজর সাহেব তাহাকে রক্ষা না করিতেন, তবে প্রজারা তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত। এই জন্যই সাহেব রূপার বাটীর চারিদিকে উপযুক্ত বৃটিশ সিপাহী গার্ড রাখিলেন। মেজর সাহেব বেহারী সান ও অন্যান্য ঠাকুরদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং বিহারী সানকে পুনরায় প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং এত

দিনে মহারাণী কুমারের জন্য নিঃসন্ধ হইলেন। এক মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে এজেন্ট সাহেব ও বিহারী সাঁন প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য হিতৈষী ঠাকুরেরা সভ্য হইলেন। কুমার তাঁহার মাতার জিম্মায় থাকিলেন, কিন্তু রাজ্য-ভার কুমার সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্ট পূর্ণরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। জোতারা-মের আশা নির্মূল হইল; হুকুমচাঁদও আর রাজবাটীতে স্থান পাইলেন না, তিনি সপরি-বারে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

এই সুবন্দোবস্তে প্রজারা শান্ত হইল, কিন্তু জোতারাম ও রূপার প্রতি তাহাদের রাগ থামিল না। সাহেব প্রজাদিগকে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন—তাহাদিগকে বলিলেন যে, এক্ষণ বৃটিস গভর্ণমেণ্ট এই রাজ্য শাসন পর্য্য-বেক্ষণ করিবেন, আর তাহাদের কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নাই, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। কুমারের মঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন, তিনি সাবালক হইলেই রাজ্য ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন। প্রজারা অপাততঃ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইল।

মহারাণী কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিলেন না। রূপার কার্য্যে তিনি সকলকেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই ভাবে জয়পুর রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। বেহারি সান তাঁহার পুত্রসহ রাজবাটীর নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন ও রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। রাজা অভয় সিংহ এখন প্রায়ই রাজধানী যাতায়াত করিতে লাগিলেন, মথুরা সানও বন্ধু অভয় সিংহের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, তিনি যে কি লোভে যাতায়াত করেন, তাহা অভয় সিংহ বেশ বুঝিলেন। তিনি এখন প্রকাশ্য ভাবে লীলা-বতীর পিতাকে মথুরা সানের প্রণয়ের কথা বলিলেন। মথুরা সানের পিতা আজ কাল রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, অতএব আর আপত্তির কোন কারণ থাকিল না। রাজা অভয় সিংহ মথুরা সানের জন্য চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু নিজের জন্য কোন চেষ্টা করিতে পারিলেন না। বহু অনুসন্ধানেও পুষ্পবতীর পরিচয় পাইলেন না, পুষ্পবতীর পরিচয় না পাইলেই বা তাহাকে বিবাহ করিবেন কেমন করিয়া। এ সময় পাগলিনীর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, কিন্তু পাগ-লিনীকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। রাজা অভয় সিংহ পুষ্পবতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া-ছেন, এখন ইহা কতদূর গড়াইবে? তিনি এক দিন সমস্ত বিষয় মথুরা সানকে বলিলেন, মথুরা সানও এ বিষয় যথেষ্ট অনুসন্ধান করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। লীলাবতী চতুরা, সে জানিত পাগলিনীকে না পাইলে এ বিষয় উদ্ধার হইবে না। অতএব সে স্বয়ং অর্থ ব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক বিশ্বস্ত লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত করিল।

এক দিন লীলাবতী বলিল "সই! একটা বড় সুখবর।" পুষ্পবতী হাসিয়া বলিল" সুখবরত শুনেছি, আর নূতন খবর কি?" লীলাবতী টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া বলিল "রাজার যে বিয়ে ।"পুষ্পবতীর মুখখানি অমনি

পাণ্ডুবর্ণ হইল, সে বহু কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় সই ?" লীলাবতী দেখিল পুষ্পবতীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে। লীলাবতী ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে বলিল—"শুনেছি রাজধানীর কোন ঠাকুরের মেয়ের সঙ্গে, আমি সব জানি না. এই মাত্র শুন্‌লেম। এক মাস মধ্যে বিয়ে হবে।" পুষ্পবতী বহু কষ্টে উত্তর করিল—"বেশ ত।" আর কথা বলিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, লীলাও মনে মনে হাসিল। লীলাবতী পাগলিনীর অন্বেষণে বিরত হইল না।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ।

গঙ্গাতটে।

পশ্চিম গগণে ওই রাঙা রবি ডুবেছে।
রক্তিম কিরণ ছটা জলে ওই পড়েছে॥
শতেক প্রবাল আর সহস্র মাণিক যেন।
পড়েছে জাহ্নবী জলে মন মাঝে লয় হেন॥
মধুর রক্তিম রাগ সোহাগে বুকেতে ধরি।
কাঁপিছে লহরী গুলি ধীরে ধীরে মরি মরি॥
যেন গো তপনে তারা চাহে না বিদায় দিতে।
বিরহ ভয়েতে যেন কাঁপিছে আকুল চিতে॥
অজানা-বিরহ-ব্যথা প্রেয়সী যেমতি ধরে।
প্রাণেশে হৃদয় মাঝে ব্যাকুল আবেগ ভরে॥
তেমতি পরাণ-পণ—সোহাগে আঁকাড়ি ধরি।
শেষ রশ্মি রাখে বুকে অশেষ যতন করি॥
তবু যে যাবে. সে যাবে চলে,না রবে কিছুতে হায়।
শতেক যতনে আহা তারে না ফিরান যায়॥
তাই ধীরে গাঢ় ছায়ে ছবি বুঝি মুছে গেল।
এত যতনেও তারে ধরে রাখা নাহি গেল॥
আকুল পরাণে তাই বুক ফাটা দুখ লয়ে।
আছাড়ি 'পিছাড়ি' ওই ছুটিছে পাগল হয়ে॥
শুনাতে সাগরে বুঝি তাহার দুখের গাথা।
লভিতে সান্ত্বনা আর জুড়াতে প্রাণের ব্যথা॥

শ্রীব্রজবল্লভ দত্ত বর্ম্মা।

পুস্তক সমালোচনা।

সগরাভিষেক—শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ বসু মল্লিক রচিত একখানি নাটক; ইহা পাঠ করিয়া, লেখকের ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার চাতুর্য্য এবং ভাবুকতার প্রাচুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা একাধারে সাহিত্য এবং ধর্ম্ম পুস্তক। প্রত্যেক অধ্যায় গুলিই শিক্ষাপূর্ণ, তারল্যবর্জ্জিত এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে সংসারের এবং সাধনার দুই বিষয়ই আছে। এই পুস্তক রচনায় লেখক সাফল্যলাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আধুনিক নাটক গুলির অনেকই প্রলাপ পূর্ণ কিন্তু এই নাটকখানি তেমন নহে। পুস্তকখানি কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ মাত্র।

মালঞ্চ। (খণ্ডকাব্য) শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। আমরা ইহার কবিত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা নিন্দা করিতে যত পটু, প্রশংসা করিতে তত নহি, কিন্তু মালঞ্চের প্রশংসা করি। ইহাতে ভারতীয় অনেক কবিদের সাহিত্যের এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থাদির বিষয় বিশেষ পটুতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কবিতায় ওজস্বিতা ও ধর্ম্মভাব আছে এবং কোনও প্রকার তারল্য ঝঙ্কার সমন্বিত জঞ্জাল নাই।

রসমঞ্জরী। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম,এ প্রণীত সুন্দর মলাটে বাঁধা, সুন্দর পুস্তক; ইহার সমস্তই সুন্দর। ভূমিকাটি ভারি মনোমত হই-

য়াছে। বিশুদ্ধ এবং রুচিসঙ্গত ভাষায় নানা জাতীয়া নায়িকাবর্ণনা অত্যন্ত মনোরম, সুখপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের চেষ্টা সফল হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মূল্য ৸৹ আনা। বাঁধান ১৲ টাকা। কলিকাতা মডেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। লাইব্রেরীর ঠিকানা ঃ—২৭।২ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট।

নূরমহল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। হরিসাধন বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত,ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশে হরিসাধনবাবুর যথেষ্ট কৃতীত্ব আছে; বঙ্কিম বাবুর সময় হইতে তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে প্রাণপণ করিতেছেন, সুতরাং এই সুদীর্ঘ কালের পরিশ্রম যে তাঁহাকে সাফল্য প্রদান করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আলোচ্য গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ, ভাব এতাদৃশ সরল যে পাঠ করিতে করিতে আগ্রহান্বিত হইতে হয়। যাঁহারা তাঁহার রঙ্গমহল, শীশমহল পাঠ করিয়াছেন, নূরমহল তাহাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ২৲ টাকা। ১৬নং ক্যানীং ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পি, এম, বাগচী কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

যাত্রী। নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি গল্পের বই; শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ; মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ৸৵৹। পুস্তকখানি হাতে পাইয়াই,যখন অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই, তখন তাহার সমালোচনা করিব কি? যাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি, অকালে হটাৎ সেই প্রাণের ভাইকে স্নেহের বন্ধন কাটাইতে দেখিলে কোন ভাইয়ের প্রাণে আঘাত না লাগে। নফর প্রখর প্রতিভা লইয়াই ফুটিয়াছিল, গন্ধ বিতরণের সময় পাইল না, সংসার উদ্যানের দুরন্ত কাল-কীটে আমাদের আশার বাতি নিভাইয়া দিল। সকলকে কাঁদাইয়া সে আজ লোকান্তরে, স্বর্গীয় ব্যক্তির পুস্তকের সমালেচনা করা মহাদায় তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, গল্প রচনায় নফরচন্দ্র অনেকের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিত, ভগবান যদি তাহাকে জীবিত রাখিতেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্বর্গগত লেখকের কয়েকটী মাত্র সুন্দর সুন্দর গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্প পাঠক ইহা পাঠে প্রচুর সুখানুভব করিবেন। কলিকাতায় গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

লক্ষ্মণসেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত; ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্গাদাস বাবুর নাম, আজ কাল জানে না এমন লোক নাই এবং তাঁহার প্রতিভাও সর্ব্বতোমুখী, তাঁহার প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস"ই তাহার প্রমাণস্থল। লক্ষ্মণসেন পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, ইহাতে ভাষার চাতুর্য্য ও ভাবের মাধুর্য্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে ধর্ম্মভাবও বেশ পরিস্ফুট, পড়িতে পড়িতে হৃদয় আর্দ্র হয়, মন গলিয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক কবিকূল-চূড়ামণি জয়দেবের বিষয় ইহাতে বেশ সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে; পড়িতে খুব আগ্রহ জন্মায়। পুস্তকখানি আধুনিক রুচি অনুসারে সুন্দর ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ১॥৹ টাকা। হাওড়া কর্ম্মযোগ পুস্তক-ভাণ্ডারে এবং পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।